প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৬০

।। প্রচ্ছদ ।।
সুধীন ভট্টাচার্য

।। ব্লক ।।
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীনীলরতন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস (১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯) হইতে মুদ্রিত ।।

॥ লেখকের কথা ॥

প্রায় নয় বৎসর পূর্বে আমি 'যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি এবং উহা বাংলাদেশের কোন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাই। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া সম্পাদক মহাশয় যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে আরো কিছু তথ্যাদির সংকলন করিবার পরামর্শ দিলেন। তাহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী আরো গভীরভাবে পাঠ করিবার চেষ্টা করিলাম। ক্রমশই আমার মনে এই ধারণা দৃঢ় হইতে লাগিল যে, সামগ্রিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিগুরুর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, কার্যকলাপ ও রচনাবলীর তখনও পর্যন্ত প্রকৃত মূল্যায়ন হয় নাই। এবং তখন হইতেই আমি এই কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করিলাম।

রবীন্দ্র-রচনাবলী পাঠকালে এ কথাও আমার মনে হইয়াছে যে, দেশের ও বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কবি যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং নিজের যে সকল পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তদানীন্তন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার সেই সকল রচনা ও কর্মপ্রচেষ্টার তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবির সেই রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার ক্রমবিকাশের ধারাটি সম্যক্ উপলব্ধির জন্য আমি একদিকে যেমন তাঁহার রচনা ও কার্যের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া কবির নিজেরই রচনা হইতে তাঁহার বক্তব্য তুলিয়া ধরিয়াছি এবং তাঁহার কার্যাবলী বিশ্লেষণের প্রয়াস পাইয়াছি, অপরদিকে তেমনি তুলনামূলকভাবে তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ ও চিন্তানায়কগণের চিন্তা ও কর্মের পরিচয় হিসাবে তাঁহাদের নিজেদেরই বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি এবং তাঁহাদের কর্মধারার পরিচয় দিয়াছি। আমার মনে হয়, এইসকল ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের বক্তব্য আমার ভাষায় না বলিয়া তাঁহাদের নিজস্ব উক্তি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়াই শ্রেয়।

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে পিতৃব্যপ্রতিম শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমি দেখা করি। সেই সময় আমি আমার রচনার অংশবিশেষ তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাই, এবং আমার পরিকল্পনার কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলি। শুনিয়া তিনি আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিলেন। তিনি তাঁহার 'রবীন্দ্র-জীবনী'র সাহায্য লইবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। আমি 'রবীন্দ্রজীবনী'

অনুসরণ করিয়াছি ; এবং আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত এই ধরনের কোন কাজে অগ্রসর হইতে হইলে তাঁহার 'রবীন্দ্রজীবনী' (চার খণ্ড) অপরিহার্য গ্রন্থ। এইখানে আমি তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায় আমার বিশেষ বন্ধু, এবং নানাভাবে তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ বাহুল্যমাত্র।

এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে আমি পরমশ্রদ্ধাস্পদ মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবের নিকট হইতেও বড় উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন জাতীয় আন্দোলনের বহু তথ্য ও সংবাদ দিয়া তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থ রচনাকালে পুস্তকাদি দিয়া ও অন্যান্যভাবে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুবর শ্রীঅধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনির্মল চৌধুরী এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীসুপ্রকাশ রায় মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ লাইব্রেরী হইতেও বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির সাহায্য পাইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শ্রীসনৎ গুপ্ত মহাশয় প্রবাসী, Modern Review প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার পুরাতন ফাইলগুলি দেখিতে দিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলের নিকট আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইহা ছাড়া, অধ্যাপক হৃদয়রঞ্জন বিশ্বাস, অধ্যাপক কৌশাম্বীনাথ মল্লিক, অধ্যাপক জগদীশ্বর সান্যাল, অধ্যাপক মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীউমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডাঃ ননী গুহ, ডাঃ নৃপেন্দ্রকিশোর সাহা, ডাঃ গুণেন রায়, ডাঃ শক্তিসাধন কারক, ডাঃ শরদীশ রায়, শ্রীমুকুল বসু, শ্রীসুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবী সিংহ, শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীভূতেশচন্দ্র চৌধুরীর নিকট হইতেও আমি বিভিন্নভাবে সাহায্য পাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসরোজ দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে আমি যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাও ভুলিবার নহে। সকলের নাম উল্লেখ সম্ভব নহে, তবুও যাহাদের নিকট হইতে আমি বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের সকলের নিকট আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অনুলেখন, পুস্তকসংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে শ্রীমতী গীতশ্রী চক্রবর্তী, শ্রীমতী কণিকা চৌধুরী ও শ্রীমতী গৈরিকা সরকার যেভাবে পরিশ্রম ও সাহায্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বন্ধুবর শ্রীবঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা

জানাইতেছি। আমার মূল পাণ্ডুলিপিতে অনেকস্থানে তাঁহার পরামর্শগত রচনা-রীতি ও ভাষার পরিবর্তন করিতে হইয়াছে।

বিদ্যোদয় লাইব্রেরীর প্রধান শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 'বিদ্যোদয়ে'র কর্ণধার হিসাবে একমাত্র মুনাফার দিকে না তাকাইয়া ইতিপূর্বে তিনি অনেকগুলি অমূল্য মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বাংলাদেশের প্রকাশন-ক্ষেত্রে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। আমার এই গ্রন্থও তাঁহার সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। বর্তমান গ্রন্থখানি প্রথম খণ্ড। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন হইতে শুরু করিয়া ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান-কাল পর্যন্ত তদানীন্তন বাস্তব অবস্থার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ও চিন্তানায়কগণের রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যাবলীর বিস্তারিত পরিচয় তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আর একটি কথা, নানা কারণে গ্রন্থমধ্যে কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যেগুলি গুরুতর, সেগুলির একটি শুদ্ধিপত্র গ্রন্থশেষে সংযোজিত হইল। কিন্তু তথ্যের দিক হইতে একটি ত্রুটির কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। গ্রন্থমধ্যে ১০২নং পৃষ্ঠার ২৫ লাইনে আছে, "...সুধীন্দ্রনাথ ব্যবসা উপলক্ষে কুষ্টিয়া চলিয়া আসেন।" কিন্তু এ তথ্য ঠিক নহে। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট জানিতে পারিলাম, সুধীন্দ্রনাথ এই সময় ওকালতিতে প্রবেশ করেন।

এই গ্রন্থের অংশবিশেষ ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট সমাদর লাভ করিলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

নেপাল মজুমদার

হেতমপুর, বীরভূম

॥ বিষয়-নির্দেশ ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা

।। চিত্রসূচী ।।

[১]

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাংলাদেশের রেনেসাঁস আন্দোলনের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, এ-কথা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের বিষয় নহে। তবুও ইহার মূল কথাটি আমাদের আলোচনা করিতে হইবে।

আমাদের দেশের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ অত্যন্ত কৃশপ্রাণ এবং তাহা অগ্রসর হইয়াছে অত্যন্ত ক্ষীণ ধারায়। কিন্তু ইউরোপের নবজাগরণ অর্থাৎ রেনেসাঁস সর্বপ্রসারী ও একটি সর্বাত্মক বিপ্লব। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সংগীত, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি—সমস্ত দিকেই সেখানে নবজাগরণের প্রাণশক্তির দুর্বার প্রবাহ ও আত্মপ্রকাশ। আমাদের নবজাগরণের প্রত্যুষে আমরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবযুগের ইউরোপকে দেখিয়াছি। ফলে আমাদের মস্তিষ্ক দিয়া স্বকীয় কিছু মৌলিক চিন্তা করিতে হয় নাই। অথচ লক্-হিউম-দেকার্তে, রুশো-ভলটেয়ারের ইউরোপকে যথার্থভাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম কই? রেনেসাঁসের যুগ হইতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ (১৪৫৩ খ্রীঃ—১৮৩০ খ্রীঃ)—এই সুদীর্ঘকালব্যাপী ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষার যে উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়; লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, কেপ্‌লার, ব্রুনো, নিউটন হইতে ডারউইন পর্যন্ত, কিংবা বেকন, হব্‌স্, লক্, দেকার্তে, হিউম, কাণ্ট, হেগেল, রুশো, ভলটেয়ার, দিদেরো হইতে মিল, বেন্থাম পর্যন্ত যে সব প্রবল-প্রাণ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও মনীষীর আবির্ভাব দেখা যায়, আমাদের দেশে রেনেসাঁসের সব থেকে গৌরবোজ্জ্বল যুগেও ইঁহাদের সমকক্ষ মনীষী ও চিন্তাবিদ্ কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ইহার কারণ ইউরোপের বিশেষ সমাজ-অর্থনৈতিক (socio-economic) ব্যবস্থা। মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও তামসিকতার গর্ভ হইতে আধুনিক ইউরোপের যে বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক আত্মপ্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, সেই বিপ্লবের প্রেরণা আসিয়াছে তাহার আপন সমাজের গর্ভ হইতে। পক্ষান্তরে আমাদের নবজাগরণের প্রেরণা আমাদের বাস্তব সমাজব্যবস্থা হইতে যতখানি না আসিয়াছে, তাহা অপেক্ষাও অধিক আসিয়াছে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের রসাস্বাদনের ফলে, এবং তাহাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী শাসন উপলক্ষে

আমদানি হইয়া। রেনেসাঁসের জন্মক্ষণে ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে সেদিন ধনতন্ত্রের প্রাণশক্তির নিদারুণ আকূতি ও আবেগ দেখা দিয়াছিল। আধুনিক জড়বাদী দর্শন ও বিজ্ঞানের, আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য ও রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি ছিল সেদিন ইউরোপের ধনতান্ত্রিক উৎপাদিকা শক্তি ও তাহার সমাজব্যবস্থা। নবজাত ধনতন্ত্র ও বুর্জোয়া-সমাজ সেদিন ইউরোপে এক মহত্তর বিপ্লব সাধন করিয়াছিল।

কিন্তু আমাদের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'কল্যাণে' ধনতন্ত্র জন্মগ্রহণ করিলেও, এবং বহু দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাহা অতি ধীরে ধীরে ক্ষীণ ধারায় বিকশিত হইলেও একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-নীতি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক শক্তি-সম্পদকে ভাঙিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছিল। ইংরাজ তাহার সাম্রাজ্যবাদী শোষণযন্ত্রের নিষ্পেষণে জাতীয় শিল্প অথবা আমাদের বুর্জোয়াদের কোনো দৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে দেয় নাই। বস্তুত পক্ষে, উনিশ শতকের মধ্যভাগেই আমাদের দেশে ব্রিটিশ পুঁজির মাধ্যমেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন হয় (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপন, চা-বাগিচা প্রতিষ্ঠা ১৮৫২ সালে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে প্রথম কটন মিল, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রানীগঞ্জে প্রথম কোলিয়ারী, ১৮৫৫ সালে প্রথম জুট মিল স্থাপন, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কেবল কটন মিল অর্থাৎ বস্ত্রশিল্পের মাধ্যমেই দেশীয় পুঁজি কিয়ৎ পরিমাণে বিকাশ লাভ করিতে পারে।)। সেই কারণেই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কোনো দৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ না-থাকার জন্যই আমাদের রেনেসাঁস এত কৃশপ্রাণ, ক্ষীণ ও দুর্বল। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীরা ইংরাজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির দালালী কিংবা মুৎসুদ্দীগিরি অথবা সরকারী চাকরি করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র পর দেশে যে নূতন জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাঁহাদের অধিকাংশই ঐ বুদ্ধিজীবী মুৎসুদ্দীশ্রেণী হইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর-পরিবার তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদিকে ইঁহারা যেমন নূতন জমিদারী ক্রয় করিতেছিলেন, অপরদিকে ইংরাজ বণিকদের অনুকরণে নীলকুঠি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে তৎপর হইয়া উঠিলেন। অর্থাৎ আমাদের বুর্জোয়া-শ্রেণীর সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত অতি গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ঠিক এই কারণে তখনই সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম বা বিপ্লবের কোনো তাগিদ তাঁহাদের থাকিল না। তাই দেখা যায়, সাঁওতাল-বিদ্রোহ বা সিপাহী-বিদ্রোহ কিংবা নীল-বিদ্রোহের মতো এত বড়ো সুবর্ণ সুযোগেও

আমাদের বুর্জোয়ারা নেতৃত্ব দিতে পারেন নাই। কেননা সেদিন না-ছিল তাঁহাদের দৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ, না-ছিল তাঁহাদের চেতনা ও মানসিক প্রস্তুতি। তাই তাঁহাদের জীবনদর্শনে ও আচরণে যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ, অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ, সংস্কারবাদ ও বিপ্লববাদের এত তাত্ত্বিক গোঁজামিল ; তাই তাঁহাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে এতখানি দ্বিধা দ্বন্দ্ব জড়তা ও স্ববিরোধিতা। এক কথায়, আমাদের দর্শন ও সমাজবিপ্লবের প্রেরণা ও তাগিদ সমাজের ভিতর হইতে আসে নাই। তাই মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর ধার-করা প্রাণ-প্রবাহ সংস্কারবাদের খাতে ধীরে ধীরে সমাজের উপরে উপরে বহিয়াছে। তাই দর্শন-বিপ্লব না হইয়া হইল ধর্মসংস্কার, সমাজ-বিপ্লব না-হইয়া হইল সমাজ-সংস্কার, বৈপ্লবিক রাজনীতি না হইয়া হইল নিয়মতান্ত্রিক ও সংস্কারবাদী রাজনীতি। সর্বত্রই সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সহিত আমাদের বুর্জোয়াশ্রেণীর আপস-রফা চলিল, আর তাহার নীতি-কৌশল হইল সংস্কারবাদ (Reformism)। কিন্তু এই সংস্কারবাদী আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের পূর্বপ্রস্তুতি বলা যাইতে পারে। শুধু ইউরোপেই নয়, প্রত্যেক দেশেই সংস্কারবাদী আন্দোলনের বিশিষ্ট একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে ; তাহাকে লঘু করিয়া দেখাও ঠিক নহে।

কিন্তু আমাদের বুর্জোয়াদের এই সংস্কারবাদী আন্দোলন দেশের বৃহত্তম জনগণ অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের সেই বিপুল জনসাধারণকে এতটুকুও স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভারতের কৃষক বিদ্রোহগুলির প্রতি এবং ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিদ্রোহের প্রতি উপেক্ষা এমনিতেই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে জনগণকে সন্দিগ্ধ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, দেশের শাসনকার্যোপলক্ষে এবং বিদেশী ব্যবসায়ী কোম্পানীর কর্মচারী ও দালালদের মাধ্যমে যে বুদ্ধিজীবীদের সহিত গ্রামবাসীদের পরিচয় হইয়াছে, তাঁহারা ছিলেন দেশে ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ শাসন কায়েমে সহায়তাকারী। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা।

আমাদের দেশে সামন্ততন্ত্র ও উদীয়মান ধনতন্ত্রের বিরোধটি সরাসরি ও একমাত্র বিরোধ ছিল না। জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই তখন দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সর্বনাশের প্রত্যক্ষ কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনে দেশের সাধারণ ও কৃষিজীবী মানুষের জীবনে দুঃখকষ্ট তখন অবর্ণনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই প্রতিক্রিয়ায় স্বতস্ফূর্তভাবে সারা দেশব্যাপী বিক্ষিপ্ত কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিল, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় 'সিপাহী-বিদ্রোহ' (অংশত) জাতীয় বিদ্রোহ আকারে অভিব্যক্তি পাইল।

কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, তবুও বুদ্ধিজীবীরা ইংরাজবিরোধী বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারিলেন না কেন? পূর্বেই তাহার কারণ উল্লেখ করিয়াছি। তাছাড়া, অপর একটি প্রধান কারণ হইল, তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বৈত-চরিত্ররূপ। ভুলিলে চলিবে না যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তখনও একটি প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। শত শত বৎসরের জড়বৎ স্থিতিশীল জীর্ণ 'এশিয়াটিক' সমাজ-সভ্যতায় ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনিয়াছিল। 'একথা সত্য যে ইংরাজ তাহার জঘন্য স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই ভারতবর্ষে সমাজবিপ্লব সংঘটিত করিয়াছে এবং যেভাবে সে এই কাজে আগাইয়াছে তাহা অত্যন্ত বর্বরোচিত। তবুও ইংরাজের অপকর্ম যতই থাকুক না কেন, এই বিপ্লবের প্রবর্তন করিয়া সে তাহার নিজেরই অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের যন্ত্র হিসাবে কাজ করিয়াছে।' এই সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণেই আধুনিক সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের সহিত আমাদের বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় হইয়াছে। এই সকল কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তাঁহারা এশিয়ার পরিত্রাতা ও মুক্তিদাতা হিসাবে দেখিয়াছিলেন। তাছাড়া, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অর্থনৈতিক দিক হইতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইংরাজের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই ব্রিটিশ শাসনকে তাহার নিজের শ্রেণীস্বার্থের খাতিরেও প্রয়োজন হইয়াছিল। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এবং গণতান্ত্রিক শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের জন্য ইংরাজ-শাসনকেই তাঁহারা প্রধান অস্ত্র করিতে চাহিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে 'ভারত-সভা' ও 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' ইহাদের উত্তরসাধকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

ইংরাজ-শাসন বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই 'কল্যাণকামী রূপ'টি সম্পর্কে বাংলার রেনেসাঁসের নেতৃবর্গ কিরূপ মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন, রামমোহনের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে,

"Among other objects, in our solemn devotion, we frequently offer up our humble thanks to God, for the blessings of British Rule in India and sincerely pray, that it may continue in its beneficient operation for centuries to come."

[J. C. Ghose (edited)—English Works of Rammohan Roy. Vol. I. p. 230]

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর সগর্বে বলিয়াছিলেন,

"If we were to be asked, what Government we would prefer, English or any other, we would, one and all reply,

English by all means, ay, even in perference to Hindu Government." [India Gazette, July 4, 1831]

বিলাতে গিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে ইংরাজ-প্রশস্তি গাহিতে গিয়া এমন কথা বলিতেও দ্বিধা করেন নাই,

"It was England who sent out Clive and Cornwallis to benefit India by their counsels and arms. It was England that sent out to that distant nation the great man who had succeeded establishing peace in the world, and who was the first who first introduced a proper and permanent order of things in the East."

[Kishori Chand Mitra—Memoir of Dwarakanath Tagore. p. 94]

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তারপর বহুদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের সভামঞ্চ হইতে ইংরাজের উদ্দেশে এই একই স্বরে একই ভাষায় প্রশস্তি ও স্তুতিবাদ করা হইয়াছে। রেনেসাঁসের যুগ হইতে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বুর্জোয়া সমাজের অনুকূল সমাজ-অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার, মাতৃভাষা ও শিল্প-সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার প্রভৃতি আন্দোলনে তাঁহাদের সকল উদ্যম ও শক্তি নিয়োজিত করিয়া আসিয়াছেন।

[২]

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের এই রেনেসাঁস অর্থাৎ নবজাগরণ যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রামমোহন রায়। এতখানি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদার ও প্রবলপ্রাণ এবং বহুভাষাবিদ ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি সে যুগে আর দেখা যায় নাই। ইউরোপের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া তিনি হিন্দু বৌদ্ধ ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থরাজি পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল একটি গভীর সত্যানুসন্ধিৎসা ও আন্তরিকতা। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, ইংরাজী, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দখল ছিল। তাহা ছাড়া, বাংলা ভাষাকে নূতনভাবে রূপদান করার কাজে তাঁহার অবদান কম নহে; বাংলাদেশে ইংরাজী ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-প্রসারের আন্দোলনে মহাত্মা হেয়ারের পাশে রামমোহনের নামও চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। সতীদাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমাজসংস্কার আন্দোলনেও তাঁহার অবদান অপরিসীম। বাংলার মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল হিন্দু-

সমাজকে সর্বপ্রথম আঘাত হানিলেন রামমোহন রায়। অপরদিকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে, ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রবল শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিবার প্রথম আহ্বান শুনা গেল তাঁহার নিকট হইতে। রামমোহনই আধুনিক বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রকৃত জনক, তিনিই জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকৃত স্রষ্টা।

অপরদিকে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে বিপুল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন রামমোহন রায়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন,

"মানবের আত্মাকে রামমোহন অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। মনে করিতেন, এই মানবাত্মা সেই বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত। সকল প্রকার সামাজিক দাসত্ব ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও দাসত্বকে তিনি এইজন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এই কারণে পৃথিবীর যে-কোনো বিভাগে লোকে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিত তাহারই সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ হইত, এবং স্বাধীনতা লাভ-প্রয়াসে কোনো জাতি অকৃতকার্য হইতেছে জানিলে তিনি মর্মাহত হইতেন। ইটালীয়ানগণ অনেক চেষ্টার পর যখন অস্ট্রীয়াবাসিগণের নিকট পরাস্ত হইল, তখন সেই সংবাদে রামমোহন রায় কলিকাতাতে শয্যাস্থ হইলেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। অপরদিকে স্পেনে যখন নিয়মতন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল তখন তিনি আনন্দে কলিকাতার টাউন-হলে ভোজ দিলেন। তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মচারী ডিগ্‌বীসাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট কর্ম করিবার সময় ডিগ্‌বী অনেকবার দেখিয়াছেন যে রামমোহন রায় ফরাসী বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতাসহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, যদি দেখিতেন যে স্বাধীনতা পক্ষের পরাজয় হইতেছে তাহা হইলে দরদর ধারে তাঁহার দুই কপোলে অশ্রুধারা বহিত। কুমারী কলেট বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড-গমনকালে গুড্‌হোপ অন্তরীপে গিয়া জাহাজে পড়িয়া গিয়া রামমোহন রায়ের পা ভাঙিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, ফরাসী-জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছে তখন ভগ্নপদ লইয়াই সেই জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার জাহাজের কাপ্তেন অনেক নিষেধ করিলেন, সে নিষেধ তিনি কোনোমতেই শুনিলেন না; ভগ্নপদে অতিকষ্টে জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন। আসিবার সময় ফ্রান্সের জয়ধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন।"

[শিবনাথ শাস্ত্রী—প্রবন্ধাবলী]

বিস্ময়-বিমুগ্ধ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়া উঠিয়াছেন, "কী স্বাধীনতাপ্রিয়তা! কী মানবাত্মার মহত্বজ্ঞান!"

ভারতবর্ষে সে একটা এমন যুগ, যখন ইউরোপের সহিত আমাদের দেশের তুলনা করিয়া এদেশের বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের সম্পর্কে লজ্জা, হীনতা ও দৈন্য অনুভব করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টিকে আধুনিক ইউরোপ অভিভূত করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইউরোপের ঘটনাবলী ও প্রগতিশীল আন্দোলনের তাৎপর্য গ্রহণ করিবার মত বা সেই সম্পর্কে কিছু চিন্তা করিবার মত চিন্তার স্বচ্ছতা তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় নাই। অথচ সে-যুগের ভারতবর্ষে ইউরোপের প্রধান ঘটনাবলী ও শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল আন্দোলন এবং ভাবধারার সহিত রামমোহনের এই একাত্মবোধ কিরূপে সম্ভব হইল, ভাবিতে বিস্ময় লাগে।

স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকট হইতে নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র আদায় করিয়াও নেপ্‌ল্‌স্‌বাসিগণ পুনরায় অস্ট্রীয় সৈন্যগণ কর্তৃক পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলে রামমোহন সেই সংবাদ শুনিয়া মর্মাহত চিত্তে ১১ই আগস্ট ১৮২১-এ এক পত্রে (সিল্ক বাকিংহামকে) লিখিয়াছিলেন,

"...I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. (Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.")

স্পেনের স্বৈরাচার হইতে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তিসংবাদে উৎফুল্ল হইয়া রামমোহন তাঁহার বাসভবনে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেন। সেই ভোজসভায় তিনি বলিয়াছিলেন,

"What! Ought I to be insensible to the suffering of my fellow creatures wherever they are, or however unconnected by interests, religion or language?"

ইউরোপের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনগুলিকে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাইতেছেন ভারতবর্ষের মত পশ্চাৎপদ পরাধীন উপনিবেশের একজন অধিবাসী—সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের পক্ষে ইহা যেমন লজ্জাজনক, ভারতবাসীর পক্ষে ইহা ততোধিক গৌরবের কথা। ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক ভাবধারায় চিন্তা করিবার ইহাই প্রথম নজির; এবং এদেশের তদানীন্তন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রামমোহনের সমকালীন, এমনকি পরবর্তীকালে বহুকাল পর্যন্ত আমাদের

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাহাকেও এই ধরনের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করিতে দেখা যায় না। ইংলণ্ডে থাকিতে বেন্থাম, মিল, রস্কো প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও সুধীবর্গের সহিত রামমোহনের পরিচয় হয়। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে তখন Reform Bill-এর 'Second reading' চলিতেছে। রামমোহন বলিলেন, ঐ বিল পাস না করিলে তিনি ইংরাজ জাতির সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রিল বেডফোর্ড স্কোয়ার হইতে এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন,

"The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers, but between liberty and tyranny throughout the world ; between justice and injustice and between right and wrong.

"But from a reflection on the past events of history, we clearly perceive that liberal principles in politics and religion have been long gradually, but steadily, gaining ground, notwithstanding the opposition and obstinacy of despots and bigots."

রিফর্ম বিল পাস হইয়া যাওয়ার পর রামমোহন লিখিতেছেন (বেডফোর্ড স্কোয়ার, ৩১শে জুলাই ১৮৩২),

"I am now happy ...on the complete success of the Reform Bills, notwithstanding the violent opposition and want of political principles on the part of the aristocrats. The nation can no longer be a prey of the few who used to fill their purses at the expense, nay to the ruin, of the people for a period of upwards of fifty years. The Ministers have honestly and firmly discharged their duty, and provided the people, with means of securing their rights. I hope and pray that the people, the mighty people of England, may now in like manner do theirs, cherishing public spirit and liberal principles, at the same time banishing bribery, corruption and selfish interests, from public proceedings."

[গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ ॥ পৃঃ ৫৮-৫৯]

এতখানি রাজনৈতিক সচেতনতা ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা সমকালীন ভারতবর্ষে আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। তাছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মিলন ও ঐক্যের কথাও সর্বপ্রথম বলিয়াছেন রামমোহন রায়।

কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে, রামমোহন তখনই ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করিতে চাহিলেন না। রামমোহন ভাবিলেন, ইংরাজ শাসনের আওতার মধ্যে থাকিয়া আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আয়ত্ত করিয়া লওয়াই দেশের তৎকালীন অবস্থায় প্রাজ্ঞোচিত ও যুক্তিযুক্ত হইবে। তাই তিনি মন্তব্য করিলেন, ইংরাজেরা আমেরিকায় যেভাবে বসতি করিয়াছিল সেইভাবে তাহারা যদি ভারতবর্ষে বসতি করে, তবে ভারতের তাড়াতাড়ি মঙ্গল হইবে। তিনি বলিলেন,

"ধরুন, এখন হইতে প্রায় একশো বছরের মধ্যে, ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসিয়া এবং আধুনিক কলা, বিজ্ঞান এবং সাধারণ ও রাজনীতিক জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া ভারতবাসী উন্নততর চরিত্রের মালিক হইয়া উঠিল। তখন তাহাকে হেয় করিবার যদি কোনো অন্যায় বা নির্দয় নীতি গ্রহণ করা হয় তখন সে কি তাহাকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবে না? একথা ভুলিলে চলিবে না যে ভারতবর্ষের অবস্থা আয়ার্ল্যাণ্ডের অবস্থা হইতে অনেক পৃথক। আয়ার্ল্যাণ্ডে রাজদ্রোহসূচক কিছু ঘটিলে ইংরাজ নৌ-বাহিনী পাঠাইয়া তাহা দমন করা সহজ। কিন্তু ভারতবর্ষ যদি ঐ দেশের চারভাগের একভাগ জ্ঞান ও বীর্যের অধিকারী হয়, তাহা হইলে তাহার দূরত্ব, ঐশ্বর্য ও বিপুল জনসংখ্যার ফলে ··· মিত্ররাষ্ট্র হিসাবে একটি বিশেষ মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করিবে, অথবা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও অত্যন্ত চাঞ্চল্যকারী এক শক্তিশালী শত্রু হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকেই আপদগ্রস্ত করিয়া তুলিবে।"

[নরহরি কবিরাজ—স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা ।। পৃঃ ৬০]

অর্থাৎ ইংরাজের সহিত সহযোগিতার ভিত্তিতেই দেশ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে। কিন্তু সহযোগিতা বলিতে রামমোহন ইংরাজের শোষণ-শাসনকে নির্বিচারে সমর্থন করিতে বলেন নাই। ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুসরণে স্বদেশের জাতীয় স্বার্থের দাবিগুলি লইয়া আন্দোলন করিবার কথা তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন, ১৮২৩ সালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের চেষ্টা হইলে রামমোহন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আত্মশক্তি অর্জন ও জাতীয় প্রস্তুতির জন্য ধর্ম ও সমাজসংস্কার, গণতান্ত্রিক চেতনা ও আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকল্পে তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বস্তুতপক্ষে, ইহাই ছিল বাংলাদেশের সমগ্র রেনেসাঁস আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।

[৩]

ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের মধ্যে আমরা বুর্জোয়াদের প্রধানত তিনটি মরণান্তিক আঘাত হানিতে দেখিতে পাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় আঘাত আসিয়াছিল মার্টিন লুথার ও পরে ক্যালভিনের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম সংস্কার-আন্দোলনে। বুর্জোয়ারা তৃতীয় ও চূড়ান্ত আঘাত হানিল 'ফরাসী-বিপ্লবে'র (১৭৮৯) মাধ্যমে, আর সেই আঘাতেই ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের চূড়ান্ত পরাজয় হইল এবং ধনতন্ত্র জয়লাভ করিল। প্রোটেস্ট্যাণ্ট বা ধর্মসংস্কার-আন্দোলন হইল বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বিপ্লবের পূর্ব-প্রস্তুতি। ঐতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিলে এই 'ধর্মসংস্কার-আন্দোলন' অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতবর্ষে বাংলার রেনেসাঁসের যুগে 'ব্রাহ্মধর্ম' অনেকখানি ইউরোপের প্রোটেস্ট্যাণ্ট বা ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। রামমোহনের যুগ হইতে বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মধ্যে এই ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের উপর অত্যধিক ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়, এবং মূলত উহা হিন্দুধর্ম সংস্কার-আন্দোলন। প্রথম হইতেই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এই হিন্দুধর্ম সংস্কার-আন্দোলন শহর-বন্দরের (বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের) অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে উহা এতটুকুও স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলনে শহর ও গ্রামাঞ্চলের সাধারণ ও স্বল্পবিত্ত মানুষদেরও (Plebeian ও Yeomanry শ্রেণীর মানুষদেরও) ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। অথচ আমাদের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই কেন?

প্রথমত—ভারতবর্ষ বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু ভাষাভাষী মানুষের এক বিশাল দেশ। রেনেসাঁসের যুগে ইউরোপের কোনো দেশেই এত জাতি-উপজাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের সমস্যা ছিল না। ইউরোপের ধর্ম সংস্কার-আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল পোপ ও রোমান ক্যাথলিক চার্চ। দ্বিতীয়ত—আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে কৃষিপ্রধান গ্রামাঞ্চলে বুর্জোয়া সম্প্রদায় প্রায় একেবারেই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই বলিলেই চলে। একমাত্র কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী শহর-গুলিতে খুব অল্পসংখ্যক ইংরাজি-শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবী বা বুর্জোয়া সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহার কারণ আমাদের ঔপনিবেশিক পরাধীনতা, তাহার কারণ ইংরাজ সরকারের শিক্ষানীতি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকার জন্য জাপান আমাদের বহুপরে দেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন করিয়া অচিরেই উহাতে পারদর্শী হইয়া উঠে। অথচ আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত মফঃস্বল বা গ্রামাঞ্চলে ইংরাজি বা স্কুল-কলেজী শিক্ষার এতটুকুও ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৫৭ সালেই কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয়। বস্তুতপক্ষে উহার পর হইতেই গ্রামাঞ্চলে ধীরে ধীরে আধুনিক ইংরাজি-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হইতে থাকে। এই কারণেই কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের ধর্ম-ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করা গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

কিন্তু বাংলাদেশের রেনেসাঁস আন্দোলনে অন্যতম অসঙ্গতি ও দুর্বলতা দেখা দিয়াছে মুসলমান সম্প্রদায়কে লইয়া। সকলেই জানেন, নানাকারণে হিন্দুদের মত মুসলমানদের বুর্জোয়া-শ্রেণী তখনও গড়িয়া উঠে নাই। 'মুয়াফিজ ভূমি'গুলি নষ্ট করিয়া দিবার ফলে এবং বিশেষ করিয়া 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হওয়ার পর মুসলমান ভূম্যধিকারীগণ অধিকাংশই বিনষ্ট হইলেন। সাধারণভাবে ইঁহারা ইংরাজকে ভালো চোখে দেখিতেন না এবং ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর তাঁহাদের স্বাভাবিক বীতরাগ ছিল। ১৮৫৭ সালের পর স্যর সুলতান আহ্‌মদ খানই মুসলমান যুবকদের মধ্যে ইংরাজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আন্দোলন শুরু করিলেন। বস্তুতপক্ষে আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতে অধিক বিলম্ব হইয়াছে এবং এই কারণে মুসলমানদের পক্ষে সংস্কার-আন্দোলনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অপরদিকে, বাংলার এই রেনেসাঁস আন্দোলন মূলত হিন্দুধর্ম ও সমাজ-সংস্কার-আন্দোলন হওয়ার ফলে সাধারণভাবে উহা মুসলমানগণকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। আমাদের এই নবযুগে একমাত্র ডিরোজিওর শিষ্যগণ তথা 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীই সাধারণভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন। রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই গোষ্ঠীর প্রবক্তা ছিলেন। সে-যুগে ইঁহাদের মধ্যেই ইউরোপীয় জড়বাদী বা বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাব পড়িয়াছিল সবচেয়ে বেশী। প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁহারা যে প্রচণ্ড বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম করিয়াছিলেন আজিকার দিনেও তাহার তুলনা মিলে না। কিন্তু ইঁহারা ছিলেন কিছুটা উৎকেন্দ্রিক। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার ভাঙার নামে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা ইউরোপীয় কৃষ্টিকে যান্ত্রিকভাবে এদেশে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবুও বাংলাদেশে স্বদেশপ্রীতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত করিতে ইঁহাদের অবদান কম নহে। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শের পতাকাতলে বসিয়া ইঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আফ্রিকার দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে, মরিশস দ্বীপে কুলি চালানের বিরুদ্ধে এবং রায়তদের উপর অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইঁহারা সমালোচনা করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ১৮৫০ সালে 'কালা আইনের' (Black

Bill) বিরুদ্ধে রামগোপাল ঘোষ যে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন, তাহা সে-যুগের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিদেশী শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায় সেদিন একযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,

"…তখন দেশের এমনি অবস্থা যে, সেই উৎকৃষ্ট আইনগুলির সপক্ষে বলিবার জন্য কেহই ছিল না। তখন কেবলমাত্র রামগোপাল ঘোষ লেখনী ধারণ করিলেন; এবং 'A few Remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কলিকাতা-বাসী ইংরাজগণ তাঁহার প্রতি এমনি চটিয়া গেলেন যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া তাঁহাকে Agri-Horticultural Society-র সহকারী সভাপতির পদ হইতে অধঃকৃত করিলেন।…" [রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ।। পৃঃ ১২৭]

বস্তুতপক্ষে, এই ঘটনার পর হইতেই দেশে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন,

"কালা আইনের বিরোধী ইংরাজগণ জয়যুক্ত হইলেন; যে আন্দোলনের ঝড় উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া গেল…। কিন্তু দেশীয় শিক্ষিত দলের মনে একটা গভীর অসন্তোষ থাকিয়া গেল। একতা ও আন্দোলনের দ্বারা কি হয় তাহা তাঁহারা চক্ষের উপর দেখিলেন।…এই সকল কারণে শিক্ষিত দলের মধ্যে রাজনীতির আন্দোলনের জন্য সম্মিলিত হইবার বাসনা প্রবল হইল। তাঁহারা বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হওয়া আবশ্যক। সে সময়ে দেশীয় শিক্ষিত দলের মধ্যে দুইটি সভা ছিল; প্রথমটি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত Bengal Land-holders' Association বা বঙ্গদেশীয় জমিদার সভা।…কিন্তু দ্বারকানাথ বাবুর মৃত্যুর পর ইহা এক প্রকার মৃত্যু দশায় পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় সভাটির কথা উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি, তাহা জর্জ টমসনের প্রতিষ্ঠিত নব্যবঙ্গের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। এরূপ প্রশ্ন উঠিল, উভয় সভাকে মিলিত করা যায় কি না? রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির উদ্যোগে ও উৎসাহে অবশেষে ঐ সম্মিলন কার্য সমাধা হইল। ১৮৫১ সালের ৩১শে অক্টোবর এক সাধারণ সভা আহূত হইয়া, উক্ত উভয় সভা সম্মিলিত করিয়া বর্তমান 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপিত হইল।…" [ঐ ।। পৃঃ ১৯২-৯৩]

রাজা রাধাকান্ত দেব এই কমিটির প্রথম সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম সম্পাদক। কমিটির অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব,

রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রায় সাথে সাথেই অক্ষয়কুমার দত্ত-দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর প্রমুখ চিন্তানায়ক ও সমাজসংস্কারকগণ কর্তৃক ইংরাজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় ভাবধারা প্রসারের আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। ইঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় আধুনিক বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য জড়বাদী ভাবধারার উপর অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী সে যুগের শিক্ষিত সমাজ এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,

"...ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানত তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।...১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয় বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততা-বাদ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সাহায্যে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক গ্রন্থ সংকলিত হইল; ইহা চিরদিন মহর্ষির ধর্মজীবনের পরিণত ফলস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।..."

[ঐ ।। পৃঃ ২০০]

শুধু তাহাই নহে, অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা, স্বাস্থ্যচর্চা, মদ্যপান নিবারণ, নীলকরদের অত্যাচার ও রায়তদের দুরবস্থা প্রভৃতি বিষয়েও লেখা শুরু করেন।

অপরদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেশে শিক্ষাপ্রসার ও শিক্ষাপদ্ধতিতে এক বিরাট রূপান্তর আনিবার চেষ্টা করিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার পাশাপাশি ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষারও প্রচলন করেন। সাথে সাথে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা-প্রসারের উপরে গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,

"...জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি,—

শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরনের কতকগুলি লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সংকল্প। ইহার জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে।…"

[সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৩৯]

প্রধানত তাঁহারই প্রচেষ্টায় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ১০১টি পাঠশালা স্থাপিত হয় (১৮৪৪) এবং তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় উহার মাধ্যমে বাংলা শিক্ষার প্রসার ঘটে। তাছাড়া, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার-আন্দোলনে বিদ্যাসাগর সে-যুগের অন্যতম পুরোধাস্বরূপ ছিলেন। যদিও সমাজসংস্কার-আন্দোলনে 'বিধবা বিবাহ' প্রচলন করিবার জন্য তাঁহার নাম জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

বিদ্যাসাগরের প্রবল স্বাজাত্যবোধ এবং সরল অনাড়ম্বর অথচ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বহুকালব্যাপী আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠনে অদৃশ্যভাবে কাজ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধচিত্তে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই দিকটি উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,

"মহৎব্যক্তির এই নিজত্বপ্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র, একক, অন্যদিকে সমস্ত মানব জাতির সবর্ণ, সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপরদিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায়, আচারে-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালী ছিলেন; স্বজাতি ও শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় কেন, সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।"

[চরিত্র পূজা—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৪র্থ খণ্ড ।। পৃঃ ৪৮০]

ধর্মবিশ্বাসের দিক হইতে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর—উভয়েই ছিলেন কিছুটা সংশয়বাদী। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

"…অধ্যাত্ম শাস্ত্র, যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত অতীন্দ্রিয়,—অক্ষয়কুমারের তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু বিশ্ববস্তুর মূলে যে ভগবৎ সত্তা আছে, —সমস্ত

বৈচিত্র্য, বৈসাদৃশ্য ও আপাত-বিরোধের যিনি নিদান, সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের সংশয় ছিল না। জ্ঞানবাদ তাঁহাকে নিরীশ্বরবাদ অথবা সংশয়বাদের অতলস্পর্শী গহ্বরে নিক্ষেপ করে নাই। বিদ্যাসাগর যেমন পুরোপুরি কোঁৎপন্থী হইয়া পড়িয়াছিলেন···, হিন্দু, ব্রাহ্ম—কোনো ধর্মের প্রতি তাঁহার অন্তরের নিষ্ঠা ছিল না,—অক্ষয়কুমার সেই একই আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়াছিলেন, বরং তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ-জাত বিজ্ঞান ও গণিত চর্চা করিয়া ভৌমনীতি-নিয়মের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; তিনি জর্জ কুম্ব্ এবং কোঁতের তত্ত্বদর্শনও জানিতেন; কিন্তু ঈশ্বরবাদ ত্যাগ করেন নাই।"

[উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য ॥ পৃঃ ২৭৯]

এই সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ লেখকগণের আবির্ভাব বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা করিল। ইঁহাদের রচনা ও সাহিত্যকর্মে ক্রমেই স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রসার ঘটিতে থাকে। ইঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমে কবি ঈশ্বর গুপ্তের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,

"মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ।"

'মাতৃভাষা', 'স্বদেশ', 'ভারতের অবস্থা' ও 'ভারতের ভাগ্যবিপ্লব'—ঈশ্বর গুপ্তের এই চারিটি কবিতাকে বাংলার স্বাদেশিকতার প্রথম উদ্বোধন সংগীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'স্বদেশ' কবিতায় কবি লিখিয়াছেন;

"মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয়প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

অবশ্য একথাও সত্য যে, তৎকালীন অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মত ঈশ্বর গুপ্তও ইংরাজ-শাসন ও স্বজাতির স্বার্থের মধ্যে এক সমস্বার্থবোধ আবিষ্কার করিতেন। এই কারণেই সিপাহী-বিদ্রোহ ও কৃষক-বিদ্রোহগুলিকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই, এই কারণেই 'শিখ যুদ্ধ', 'কাবুল যুদ্ধ' ও 'ব্রহ্ম যুদ্ধে' ইংরাজ-বিজয়ে তিনি ইংরাজের জয়গান গাহিয়াছিলেন। তবু ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নীলকর ও রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র সমালোচনা ও বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ইংরাজি শিক্ষা বা প্রগতিশীল সমাজসংস্কার-আন্দোলনগুলিকে ভালো চোখে দেখিতে পারেন নাই। এই কারণেই তাঁহার ব্যক্তিজিবনে ও সাহিত্যকর্মে স্ববিরোধিতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্যবর্গের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সর্বাপেক্ষা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় লিখিতেছেন,

"রঙ্গলালের কাব্যের মূল সুর হইতেছে দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা। তাঁহার গুরুর কাব্যেও দেশপ্রীতি ফুটিয়াছিল বটে, কিন্তু সে প্রীতি আত্মসচেতন ছিল না। তাহা ছাড়া, ঈশ্বরচন্দ্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা অবধি পৌছাইতে পারেন নাই। রঙ্গলাল গুরুর অপেক্ষা একধাপ বেশী আগাইয়া গিয়াছেন। রঙ্গলালের ভাষাও ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর মার্জিত। রঙ্গলাল জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অনেকভাব ইংরেজ কবি স্কট, মূর ও বায়রনের লেখা হইতে আত্মসাৎ করিয়াছেন।...রঙ্গলাল যথার্থই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম কবি।..."

[বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ।। পৃঃ ১৫১]

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?"

রঙ্গলালের এই কবিতাটি সে-যুগে বিরাট আবেগ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই সময়ে বাংলা ভাষা ও গদ্যরচনার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালী ভাষা' একটি আলোড়নের সৃষ্টি করে।

ইহার অনতিকাল পরেই হরিশ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব।

এই সময়কার একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা নীল বিদ্রোহ (১৮৫৮-৫৯)। এই সময় হরিশ মুখোপাধ্যায় শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত নীল চাষীদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্পাদিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় তীব্র

ভাষায় লিখিতে থাকেন। প্রধানত তাঁহারই প্রচেষ্টার ফলে গভর্নমেণ্ট 'ইণ্ডিগো কমিশন' নিযুক্ত করেন। হরিশ এই কমিশনের সমক্ষে নীল চাষীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেন। ফলে নীলকর সাহেবদের সমস্ত ক্রোধ ও আক্রোশ গিয়া পড়িল হরিশের উপর। তাঁহারা আদালতে হিন্দু প্যাট্রিয়টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিলেন। মামলায় হরিশ সর্বস্বান্ত হইলেন। এই সব নানা হাঙ্গামা ও দুশ্চিন্তায় হরিশের শরীর ভাঙিয়া পড়িল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৬১)।

ঠিক এই কালেই সাহিত্যক্ষেত্রে দীনবন্ধু মিত্রের আত্মপ্রকাশ। ১৮৬০ সালে তাঁহার সুবিখ্যাত 'নীলদর্পণ' বাহির হইল। এই একটি মাত্র নাটক সমগ্র বঙ্গদেশকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন,

"...একদিকে যখন ইণ্ডিগো কমিশন ও পেট্রিয়টের সহিত বিবাদ প্রভৃতির উপক্রম, তখন অপরদিকে ১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের সুবিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন গ্রন্থবিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। 'নীলদর্পণ' কে লিখিল, তাহা জানিতে পারা গেল না; কিন্তু বাসাতে বাসাতে 'ময়রানী লো সই নীল গেজেছ কই ?' ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল। যতদূর স্মরণ হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। পাদরী জেমস্ লঙ্ সাহেব তাহা নিজের নামে প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ডেও আন্দোলন উপস্থিত হইল। নীলকরগণ আসল গ্রন্থকারকে না পাইয়া ইংলিসম্যান পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়া ১৮৬১ সালের ১৯শে জুলাই লং-এর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।" [রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।। পৃঃ ২২৪]

১৮৬১ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত 'মেঘনাদবধকাব্য' প্রকাশিত হয়। সমস্ত সংস্কার ও বন্ধনের বিরুদ্ধে মাইকেলের বিদ্রোহ সাধনা যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে এই কাব্যখানিতে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

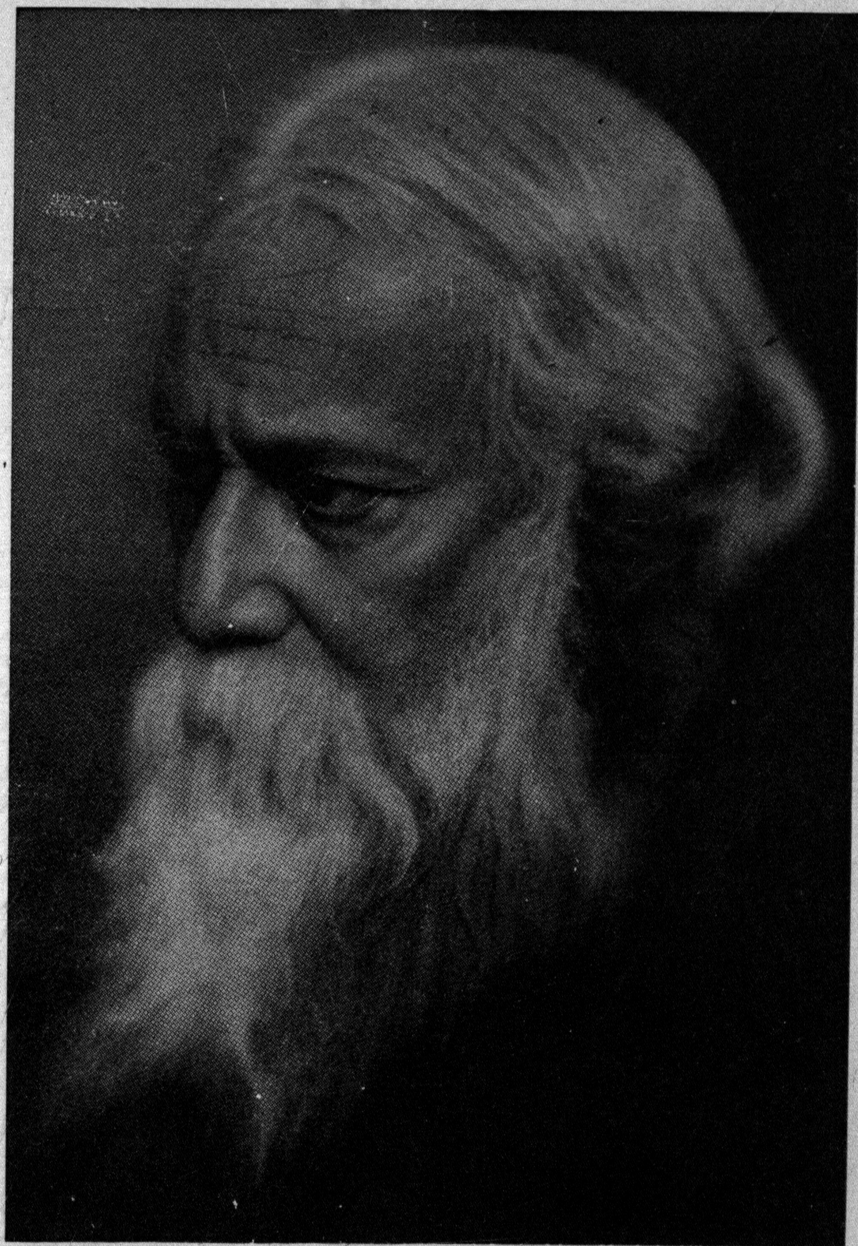
"মেঘনাদবধকাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসেব মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই।...ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে একটা বাঁধাবাধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও

কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন।…যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিল।" [সাহিত্য—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৮ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪১৩]

মাইকেল যেমন একদিকে প্রাচীন কুসংস্কার ও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি সে-যুগের অত্যুগ্র সাহেবিয়ানাকেও তিনি তীব্রভাবে বিদ্রূপ করিয়াছেন।

সংবাদপত্র-সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ', দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', হরিশের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' এবং রামগোপাল ঘোষের 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' সে-যুগে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী ভাবাধারার প্রসারে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

ইহার অনতিকাল পরেই সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, এবং স্বাদেশিকতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর আবির্ভাব বাংলায় তথা ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার জোয়ার আনিল।



॥ দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে ॥

জগতের মহান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের রচনা ও চিন্তাধারার মধ্যে সে যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বিরোধ-সংঘাতগুলি প্রতিফলিত হয়। কোনো মহান ও প্রবল-প্রাণ শিল্পীকে বুঝিতে হইলে সেই যুগটি এবং সেই দেশের সমাজ ও জাতীয় জীবনের সংগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলি ভালো করিয়া বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদটি বুঝিতে হইলে এ-দেশের তৎকালীন বিশেষ বাস্তব অবস্থাটি ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও রাজনৈতিক মতবাদ সবকিছুর সম্পর্কহীন নির্বিশেষ বা 'হঠাৎ-একদিন-পড়িয়া-পাওয়া' গোছের কিছু একটা সম্পূর্ণ মতবাদ নহে; তাহার শুরু আছে, অন্তর্বিরোধ আছে, ক্রমবিকাশ আছে—পরিপক্বতা আছে। শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ক্রম-পরিণতির ধারাটি আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।

এই অন্বেষণের উপাদান ও তথ্যাদি রবীন্দ্রনাথ কিংবা রবীন্দ্র-যুগের মস্তিষ্কের মধ্যেই শুধু নাই, সে-যুগের সমাজ-অর্থনৈতিক (Socio-economic) ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং তাহার ক্রমপরিণতির সুদীর্ঘ ধারাটির মধ্যেও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছড়াইয়া রহিয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদটিকে একটি বাস্তববাদী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিবার কথা বলিয়াছিলেন (ডঃ শচীন সেনের Political Philosophy of Rabindranath গ্রন্থের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে)। এই সম্পর্কে কবি সেদিন বলিয়াছিলেন,

"…বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্যরচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।…তেমনি করেই অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে

কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তাকে পাই।"

[রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত—কালান্তর ।। পৃঃ ৩৪১-৪২]

এই ধরনের বস্তুনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিলে আমরা রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদটি বুঝিতে পারিব।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনকালব্যাপী রচনাবলী, কাজকর্ম, সাধনা ও চিন্তাধারার ক্রমপরিণতির ধারাটি যদি এই ধরনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, তৎকালীন ভারতের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী ও গুরুতর সমস্যাগুলি তাঁহার চিন্তা-ভাবনার বিষয়বস্তু হইয়াছে। শুধু জাতীয় ক্ষেত্রেই নহে,—তৎকালীন সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় জ্বলন্ত সমস্যাবলী তাঁহাকে বিশেষভাবে বিচলিত করিয়াছে। সারা জীবন কবি বিশ্বসমস্যায় গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন—অজস্র লিখিয়াছেন, বিস্তর কথা বলিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনা এবং তাঁহার রচনাবলীর পর্যালোচনা করাই হইতেছে এই গ্রন্থ প্রণয়নের আসল উদ্দেশ্য ও কৈফিয়ত।

॥ জন্মকাল ॥

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে (১২৬৮ সন ২৫শে বৈশাখ) কলিকাতার বিখ্যাত 'ঠাকুর পরিবারে' রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল প্রায় সমস্ত দিক হইতেই জাতির ইতিহাসে এক মহা-সন্ধিক্ষণ। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতের ইতিহাসে একটি বিরাট পরিবর্তন ও রূপান্তর এই সময় হইতেই সূচিত হইয়াছে। অল্প কিছুকাল আগেই 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'সিপাহী বিদ্রোহ' ও 'নীল বিদ্রোহ' অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই বিদ্রোহগুলি একদিকে যেমন ভারতের ইংরাজ-শাসনকে বিপর্যস্ত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি ভারতের স্বাজাতিকতা ও জাতীয়তাবোধকে উদ্বোধিত করিয়া দিয়া গিয়াছে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয় এবং ভারতবর্ষ সরাসরি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শাসনাধীনে আসে। ভারতের আধুনিক শিল্পযুগের অতি প্রাথমিক ভিত্তি,—সেই রেলপথ, কয়লাকুঠি, পাটকল, কাপড়ের-কল, চা-বাগান ইত্যাদি শিল্পগুলির ভিত্তি স্থাপন হয় অল্প কিছুকাল আগেই (১৮৫২-৫৮ সালের মধ্যেই)। ১৮৬১ সালে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ বৎসরই 'Indian Council Act' পাশ হওয়ার ফলে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে বে-সরকারী সভ্য মনোনয়নের ব্যবস্থা হয়। অপরদিকে রামমোহন রায় প্রবর্তিত ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলন ক্রমশই গভীর ও ব্যাপক আকার ধারণ করিতে থাকে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাই বলিয়াছেন,

"বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল।..."

[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ॥ পৃঃ ২২৪-২৫]

একদিকে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, অপরদিকে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারার আন্দোলন দেশের শিক্ষিত সমাজে এক অভিনব জাগরণ ও প্রাণচাঞ্চল্য আনিয়া দিয়াছে। অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরিশ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় প্রতিভাধর ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতি ও চরিত্রে এক প্রচণ্ড রূপান্তর সূচনা করিল।

সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'সোমপ্রকাশ' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং সাহিত্যক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের আবির্ভাব বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যে এক অভিনব যুগের সূচনা করিয়াছে। এক কথায়—জাতির আত্মস্থ হওয়ার সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ;—এই সময় হইতে জাতির স্বজাত্যাভিমান ও জাতীয়তাবোধ সুতীব্র হইয়া উঠিতে থাকে।

।। ঠাকুর পরিবার ।।

রবীন্দ্রনাথের মানস ও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে তাঁহার পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভাবটি কম গুরুত্বপূর্ণ নহে, একথা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

অনেকেই জানেন যে, এমনিতেই পীরালিসমাজভুক্ত ঠাকুর পরিবার প্রাচীন হিন্দুসংস্কারগুলি মানিয়া চলিতেন না। ফলে সামাজিক দিক হইতে তাঁহারা প্রায় 'একঘরে' রহিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে কলিকাতায় আসিয়া বিদেশী ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলির দালালী ও মুৎসদ্দীগিরি করিয়া ইঁহারা আর্থিক দিক হইতে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বস্তুতপক্ষে দ্বারকানাথই ঠাকুর পরিবারের বিরাট জমিদারী ও ধনসম্পত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, দ্বারকানাথ ছিলেন তৎকালীন বুর্জোয়া সমাজের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা, রামমোহনের প্রধান সহায়ক। হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহনের পার্শ্বে থাকিয়া তিনি সংগ্রাম করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও 'জমিদার-সভা' স্থাপন, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে দ্রুত ডাক বিনিময় ব্যবস্থা, সতীদাহ-নিবারণ এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যাপারে রামমোহনের সাথে দ্বারকানাথের নামও স্মরণযোগ্য। তিনি অবশ্য রামমোহনের ধর্মমত গ্রহণ করেন নাই তবে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁহার আন্তরিক সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। হিন্দু সমাজের বহু কুসংস্কার তিনি ভাঙিয়া দিয়াছিলেন বটে, তবে তাঁহার পারিবারিক জীবনে পূজা ও আচার-অনুষ্ঠানে তিনি তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনিতে পারিলেন না, যেমন আনিলেন পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় এক নবযুগ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান হোতা। তিনিই রামমোহনের ধর্মমতকে পূর্ণ ও পরিণত রূপ দিয়া, ঐ ধর্মের নামকরণ করিলেন 'ব্রাহ্মধর্ম'। অবশ্য এই কার্যে তাঁহার সহায়ক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও কেশবচন্দ্র সেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্ব ও আদর্শ নিরূপণের কার্যে সীমিত ছিল না, ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভারতের মূল্যবান ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজি বাংলায় অনূদিত হইয়া পত্রিকাতে প্রকাশিত হইত। দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন হিন্দুধর্মের বহু

কুসংস্কার ও বিধিব্যবস্থা ভাঙিয়া দিয়া তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম ও তত্ত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির একটি বৈপ্লবিক রূপান্তর আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, 'রামমোহনের সময়ও প্রকাশ্যে বেদপাঠ হইত না, পাছে অব্রাহ্মণ কেহ শ্রবণ করিয়া ফেলে।' দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের উল্লেখযোগ্য সংস্কারগুলি সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের অবদান অধিকতর উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন,

"......অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মনীষার প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথের নিজের ও ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসের পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল। রামমোহন রায় যে একেশ্বরবাদী মণ্ডলী স্থাপন করেন, উহার মতবাদের নাম দেন 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম' (১৮২৬ আগস্ট ২০। ১৭৫০ শক ভাদ্র ৬)। ১৮৩০ অব্দে (জানুয়ারী ২৩। ১১ই মাঘ—বুধবার) চিৎপুর রোডে মণ্ডলীর নূতন মন্দির গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ভার লইবার পরে তত্ত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে স্থির হইল যে, অতঃপর বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম নামের পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম অবলম্বন করা হইবে (১৮৪৭ মে ২৮)। 'এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কি দুর্ধর্ষ মানসিক বলের পরিচয় তাহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না।' বেদ অভ্রান্ত ও ধর্মের উৎসরূপে এতকাল স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, সেই মতের ভাঙন ধরিল, 'শতসহস্র-যুগযুগান্তরের অর্জিত মানসিক শৃঙ্খল নির্বিবাদে ও সহজে খসিয়া গেল।'

"বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম যদি সত্যধর্ম না হয়, তবে সত্যধর্ম কী, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের সৃষ্টি। উপনিষদাদি বহু গ্রন্থ হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্পাদন করেন; কিন্তু কোথাও ঐ সব অংশের মূলনির্দেশ করেন নাই। ইহার কারণ বোধ হয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহে যুক্তি ও সহজ জ্ঞানের পরিপন্থী বহু মতবাদ আছে, তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথের মন পাশ্চাত্য দর্শন ও যুক্তিবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া তিনি কোনো প্রাচীন গ্রন্থকে 'শাস্ত্রে'র স্থান দিতে পারিলেন না। এইজন্য ভাষা উপনিষদাদি হইতে গৃহীত হইলেও ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় ও তাহার শৃঙ্খলা সম্পাদনের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।"

[রবীন্দ্রজীবনী : ১ম খণ্ড ।। পৃঃ ৯]

দেবেন্দ্রনাথের এই ধর্মমত ব্যাপকভাবে গৃহীত হউক বা নাই হউক নিঃসন্দেহে ইহা সনাতনী হিন্দু সমাজের ও ধর্মের বিরুদ্ধে একটি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ। কিন্তু

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম আসলে ইউরোপীয় যুক্তিবিজ্ঞানে পরিশোধিত হিন্দুধর্ম। বেদান্ত, উপনিষদ ও বৈদিক মন্ত্রের উপর তাঁহার ছিল অবিচলিত ভক্তি ও আস্থা; অপরদিকে মধ্যযুগীয় মরমীয়া সাধুসন্তদের প্রতিও তাঁহার গভীর আকর্ষণ ছিল। তাই তাঁহার ধর্মসাধনার মধ্যে একটি অতিন্দ্রীয় রহস্যবাদী অধ্যাত্ম-সাধনা প্রবল হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের উপর পিতার ও পরিবারিক ধর্মসাধনার এই ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল অসীম,—আলোচনাকালে আমরা ইহা দেখিতে পাইব।

শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি এবং গার্হস্থ্য আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও দেবেন্দ্রনাথ একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিলেন। তিনি পিতার শ্রাদ্ধ ও দ্বিতীয় কন্যা সুকুমারীর বিবাহ সনাতনী পৌত্তলিক পদ্ধতি বর্জন করিয়া 'বৈদিক প্রথাসম্মত অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানে' সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। মেয়েলী ও পারিবারিক অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রেও তিনি বহু পরিবর্তন আনিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

"...ব্রাহ্মধর্মমতে দেবেন্দ্রনাথের ইহাই প্রথম অপৌত্তলিক বিবাহ অনুষ্ঠান।... সুকুমারীর বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিলেন; পৌত্তলিকতা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, শালগ্রামশিলা, গঙ্গাজল ও হোমাগ্নি বর্জন করিয়া এক নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি সংকলন করিলেন ও তদনুযায়ী কন্যার বিবাহ দিলেন।

"নূতন পদ্ধতিমতে কন্যার বিবাহ দানের ফলে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের সামাজিক পরিধি আরো সংকীর্ণ হইয়া আসিল। ...নিজগৃহে পূজাপার্বণ বন্ধ হওয়ায় ও অন্যের গৃহে পূজাদিতে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করায় সাধারণ হিন্দুসমাজের সহিত ঠাকুর পরিবারের বিচ্ছেদটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

"গৃহদেবতার পূজা বন্ধ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাটীতে সমবেত ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। চণ্ডীমণ্ডপে দৈনিক ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তিত হইল, প্রতিমার পীঠস্থানে উপাসনার বেদী নির্মিত হইল; ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র শ্বেতপ্রস্তরে উৎকীর্ণ করিয়া ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত হইল। পূজাপার্বণ লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি কতকগুলি নূতন উৎসবের প্রচলন করিলেন; জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি সামাজিক নির্দোষ পার্বণগুলিও তাঁহার পরিবারে চলিত রহিল। নূতন উৎসবের মধ্যে 'মাঘোৎসব' (১১ই মাঘ) তাঁহারই প্রবর্তন; এ ছাড়া 'নববর্ষ' (১লা বৈশাখ), 'ভাদ্রোৎসব' (৬ই ভাদ্র), 'দীক্ষাদিন' (৭ই পৌষ) প্রভৃতি উৎসব প্রবর্তন করিয়া প্রাচীন পালপার্বণের অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করেন।"

[রবীন্দ্রজীবনী : ১ম খণ্ড ।। পৃঃ ১০-১১]

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের ও সমাজের অনেক কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে এমন একটি পরিচ্ছন্ন আভিজাত্যবোধ ছিল, যাহার ফলে তিনি বেশ কিছুটা রক্ষণশীলতা অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের নবীনপন্থী ও অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অংশটি যখন ধর্ম, সমাজ ও নারী প্রগতির ক্ষেত্রে সংস্কার-আন্দোলনকে আরো প্রসারিত করিতে চাহিলেন তখনই তাঁহাদের সাথে দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ শুরু হইল। বিরোধীপক্ষের নেতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়শিষ্য কেশবচন্দ্র সেন। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন,

"যাহা হউক প্রাচীন দলের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও যুবকদলের নেতা কেশবচন্দ্র সেন, ইঁহাদের মধ্যে পরামর্শ ও কার্যের একতা বহুদিন রহিল না। নবীন ব্রাহ্মগণ অধিক দিন মুখে জাতিভেদের নিন্দা করিয়া এবং কার্যত উপবীত ত্যাগ করিয়া এবং সকল জাতি মিলিয়া একত্র পান ভোজন করিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ সাল হইতেই তাঁহারা বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্যগণ বেদীতে বসিলে তাঁহারা উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উপবীতত্যাগী উপাচার্য নিযুক্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু নবীন ব্রাহ্মগণ যখন বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইঁহারা কতদূর যাইতে পারে ভাবিয়া চমকিয়া গেলেন। তাঁহার রক্ষণশীল প্রকৃতি আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদলে বিচ্ছেদ ঘটিল। অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্বতন্ত্র কার্যক্ষেত্র করিলেন; 'ধর্মতত্ত্ব' নামে মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন এবং ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ত্যাগ করিয়া 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' হইল।"

[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ।। পৃঃ ২৫০]

ইতিমধ্যে দেশের বাস্তব অবস্থার বহু পরিবর্তন হইয়াছে। সমাজ-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যে সব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সেগুলির ফলে, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন ধর্মশিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের আবরণে প্রধানত এতদিন যাহা চালিত হইয়াছে, তাহা ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে শুরু করিয়াছে। অর্থাৎ উদীয়মান যুবশক্তি এই সময় ক্রমশই রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সৃষ্টি করার কাজে অধিক তৎপর হইয়া উঠিতে থাকেন। ঠিক এই যুগসন্ধিক্ষণেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ ঠাকুর পরিবারেই যেন বেশী করিয়া দেখা দিল। বস্তুত সেই নব-প্রত্যুষে ঠাকুর পরিবারই যেন জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রধান উৎসকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,—ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ এবং এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজনারায়ণ বসু ও নবীনদের মধ্যে নবগোপাল মিত্র ইত্যাদি অনেকেই এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মাতিয়া উঠিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দা ও সংস্কার-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও যে সব প্রশ্নে কেশবের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল, স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের পুত্রেরাই দেবেন্দ্রনাথের সেই নিষেধের গণ্ডি ভাঙিয়া দিয়া প্রগতিশীল ভাবধারা আনয়ন করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ পুত্রদের পথ ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম ও সমাজ সংস্কার-আন্দোলন হইতে কার্যত অবসর গ্রহণ করিলেন।

এখন হইতেই দেবেন্দ্রনাথের পুত্রদের যুগ শুরু হইল। শিল্প, সাহিত্য, নাট্য, ললিতকলা চর্চায় এই পরিবার তখন বাংলা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ঠাকুর পরিবারের এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও শিল্পচর্চার আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথকে যে কী বিপুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে, সে সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখিয়াছেন,

"ছেলেবেলায় আমার এক মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের আবহাওয়া বহিত।···সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায় কাব্যে-গানে চিত্রে-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতে-ছিল।···বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা যখন গণদাদার রচিত 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কী করে' গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত।" [জীবনস্মৃতি ।। পৃঃ ৬৫]

এককথায়, প্রাচীন সনাতনী হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেমন ঠাকুর পরিবার সংগ্রাম শুরু করিলেন, তেমনি আধুনিক যুগের উদ্‌বোধন ও সৃষ্টির উন্মাদনায় তাঁহারা মাতিয়া উঠিলেন।

।। স্বাদেশিকতা ঃ হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভা ।।

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ, শিল্প ও সাহিত্য-সাধনা,—ঠাকুর পরিবারের এই ত্রয়ী সাধনার ধারাই সমভাবে বালক রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

সিপাহী বিদ্রোহ, বীটনের Black Bill-এর পরাজয় (১৮৫০) এবং নীল বিদ্রোহের (১৮৬০) পর থেকেই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইতে দেখা যায়। আমাদের এই জাতীয়তাবোধের পিছনে একটি গভীর রাজনৈতিক ও সমাজ-অর্থনৈতিক কারণ নিহিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতি পূর্ণভাবে কায়েম হইয়াছে—অর্থনীতির ভাষায় যাহাকে বলা যায় Finance Capital-এর যুগ। এই নূতন কৌশলে শোষণনীতির ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন অর্থনৈতিক বনিয়াদ প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছে—বিশেষ করিয়া ভারতের সমৃদ্ধ কুটির-শিল্প। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের কাঁচামাল সরবরাহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হইল, পক্ষান্তরে আমাদের অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য ইংলণ্ড হইতে আমদানি হইতে লাগিল। বস্তুত ভারতের কাঁচামাল দ্রুততর উপায়ে নিঃশেষ করিবার উদ্দেশ্যেই রেলপথ, পাটকল, কাপড়ের কল ইত্যাদির মাধ্যমে পুঁজি ও যন্ত্রশিল্পের আমদানি হইল। এককথায়, ভারতবর্ষের বুকে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ক্রমশই তীব্র হইতে শুরু করিল।

আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইহাতে বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। অপর-দিকে দেশবিদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস পাঠ ও ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হইতে থাকে, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোধাদের মধ্যে ছিলেন,—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র এবং ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই।

ইঁহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসুর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস ও ইতালীর স্বাধীনতা-

সংগ্রামের সংবাদই ছিল আমাদের এই জাগরণ ও প্রেরণার প্রধান উৎস। বিশেষত ইতালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের নীতি-কৌশল এবং ম্যাৎসিনি-গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বিচলিত ও মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু তখনই রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করিবার মত কোনো পূর্ব-প্রস্তুতি ও সঙ্গতি তাঁহাদের ছিল না।

ইতালীর গুপ্ত বৈপ্লবিক সংগঠনের অনুকরণে তখন দু'একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তবে উহাদের পিছনে তখনো কোনো সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও কার্য-সূচী ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগেই এই ধরনের একটি গুপ্ত সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল (সঞ্জীবনী সভা)।

আমাদের লক্ষ্যে তখনো পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজত্বের উৎখাতের প্রশ্নটিই আসে নাই, পরন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তখনও ইংরাজ-রাজত্বের প্রয়োজন প্রবলভাবে অনুভব করিতেছেন। ইংরাজ-শাসনের পক্ষপুটের আড়ালে তাঁহারা আরো পরিপুষ্ট হইতে চাহিয়াছেন—তাহার জাতীয় অর্থ নৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করিতে চাহিয়াছেন। সেই কারণে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পদ্ধতিটি ইঁহাদের অনুকূল নীতি হইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্পের প্রসার ও চাকরির ক্ষেত্রে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য ইঁহারা সংগ্রাম শুরু করিলেন। এইসব দাবিই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা, এবং নেতৃবর্গের লেখায়-বক্তৃতায় এইগুলিই প্রকট হইয়া দেখা দিল।

রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থে লিখিলেন,

"বর্তমান বঙ্গসমাজের রাজ্যবিষয়ক অবস্থা সন্তোষজনক নহে।……সেকালের বাঙালিরা তাঁহাদিগের রাজ্যসম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা তত ইংরেজি শিক্ষালাভ করিতেন না, তাঁহারা রাজ্যতত্ত্ব তত সূক্ষ্মরূপে বুঝিতেন না।…এই সকল কারণে তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজ্যসম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে নানা কারণে চতুর্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গবর্মেণ্টের দোষসকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদিগের হাত পা বাঁধা, সে সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদের কোনো কথাই চলে না।" [সেকাল ও একাল ।। পৃঃ ১৪০]

ঐ পুস্তকেই তিনি অন্যত্র লিখিতেছেন,

"বস্তুত জগৎশুদ্ধ লোক কি কখনও কেরাণী অথবা স্কুলমাস্টার অথবা উকীল

হইতে পারে ?···শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগের জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি। ইংলণ্ডের উপর আমাদের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আইলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি, কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে, বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আইলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই না। এমন কি বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না। দেশলাইটি পর্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুন জ্বালিতে পাই না। দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না।" [ঐ ।। পৃঃ ৬৪-৬৫]

চাকরি-ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও এদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষের অন্তর্বেদনা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখায় বাহির হইয়া আসিল। তিনি লিখিলেন, "বিড়াল পাতের নিকট থাকুক, মেঁও মেঁও করুক—মাছের কাঁটা খাক্···কিন্তু সিভিল সার্ভিসের দিকে নুলো বাড়ালেই চপেটাঘাত।" জাতীয় শিল্প গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া ভোলানাথ চন্দ্র লিখিলেন, "এখন আমাদের বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রয়োজন রয়েছে।···আমাদের আত্মকর্তৃত্বে জাতীয় স্কুল-কলেজ, জাতীয় সংবাদপত্র, জাতীয় ব্যাঙ্ক, জাতীয় চেম্বার অব কমার্স, জাতীয় মিল ও ফ্যাক্টরী, জাতীয় বাজার, ফার্ম-ডক্ প্রভৃতি তৈরি করতে হবে।"

[ভোলানাথ চন্দ্র—লাইফ অব দিগম্বর মিত্র ।। পৃঃ ৯৭-৯৯]

ঐতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিলে 'বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' (British Indian Association, 1851), 'ইণ্ডিয়ান লীগ' (Indian League, 1875), এবং 'ভারত-সভা' (Indian Association, 1876) এদেশের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মূলত এইগুলি ধনী-অভিজাত সম্প্রদায় ও উচ্চ সরকারী কর্মচারীদের আধা-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল।

ইহাদের মধ্যে ভারত-সভার কিছুটা স্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর আনন্দমোহন বসুর সহিত মিলিত হইয়া ভারত-সভা স্থাপন করিলেন (১৮৭৬)। আনন্দমোহন তাহার প্রথম সেক্রেটারি হইলেন। এদেশীয় সিবিলিয়ানগণের দাবি-দাওয়া লইয়া এ্যাজিটেশন আন্দোলন করাই ছিল এই সংগঠনের প্রধান কাজ।

কিন্তু ইণ্ডিয়ান লীগ বা ভারত-সভার পূর্বেই প্রথম স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সংগঠনের সূত্রপাত হইয়াছিল ঠাকুর পরিবার হইতেই। অবশ্য রাজনারায়ণ বসুই ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান ঋত্বিক।

১৮৬৫ খৃঃ তিনি ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

এবং নবগোপাল মিত্র প্রভৃতিকে লইয়া প্রথমে 'স্বাদেশিকদের সভা'র নামে একটি সংগঠন করেন। প্রায় দুই বৎসর পরে ইঁহারা ঐ কয়জনে মিলিয়া (প্রধানত ঠাকুর পরিবারের সর্বপ্রকার সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়) 'হিন্দুমেলা' স্থাপন করিলেন। দেশের শিল্প-সম্পদ, কৃষি, শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, কলা ও শিল্পচর্চা, ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি অর্থাৎ, জাতির সামগ্রিক জীবনে একটি স্বাদেশিকতাবোধ জাগরিত করাই ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। হিন্দুমেলা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

"স্বজাতীয়দের মধ্যে সভা স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করার উদ্দেশ্যে ১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১২ই এপ্রিল, ১৮৬৭) কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়া ভিলায় চৈত্রমেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয়। প্রথম তিন বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা চৈত্রমেলা নামে পরিচিত ছিল। প্রধানত কলিকাতার উপকণ্ঠে কোনো এক উদ্যানে প্রতি বৎসর এই মেলার আয়োজন হইত; জনচিত্তে দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিবার মানসে মেলায় জাতীয়-শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইত, দেশীয় ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রদর্শিত হইত; ইহা ছাড়া জাতীয়-সংগীত কবিতা পাঠ ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইত। এই মেলার পরিকল্পনাটি রাজনারায়ণ বসুর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে (৭ই আগস্ট, ১৮৬৫ তারিখে) প্রথম প্রকাশিত 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ও উৎসাহে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের নিকট এই স্বদেশী মেলা অশেষ প্রকার ঋণী। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম তিন বৎসর মেলার সম্পাদক এবং নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক ছিলেন।"

[দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫২ বৈশাখ-আষাঢ়]

১৮৬৭ সালের প্রথম অধিবেশনের পর হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পরবৎসর মেলার সাংবৎসরিক অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা সর্বসাধারণের সমক্ষে পাঠ করেন। ইহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,

"১৭৮৮ শকের চৈত্রসংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করাই তাহার উদ্দেশ্য।

"উদ্দেশ্য সাধনোপায় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়—

"১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে। তাঁহারা হিন্দু

জাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্যসকল সংসাধন জন্য একদলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণমধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্যে নিয়োগ করত এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

"২। প্রত্যেক বৎসর আমাদিগের হিন্দু সমাজের কতদূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য চৈত্রসংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

"৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্ধন করা যাইবে।

"৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

"৫। প্রতি মেলায় সংগীতনিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্ধন করা যাইবে।

"৬। যাঁহারা মল্লবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোকমধ্যে ব্যায়ামশিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।"

[গ্রন্থপরিচয়—জীবনস্মৃতি ।। পৃঃ ১৯২-৯৩]

হিন্দুমেলার উপরোক্ত মূল কার্যসূচী ও বিষয়গুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইতিপূর্বে এই ধরনের কোনো জাতীয় সংস্থা বা সংগঠন গড়িয়া উঠে নাই। দেশের স্বাবলম্বন ও একটি সর্বতোমুখী জাতীয় বিকাশের কথা ইঁহারা চিন্তা করিতেছিলেন। ধনী-অভিজাত শ্রেণী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, কৃষক, কারিগর, শিল্পী, মজুর—এককথায় দেশের আপামর জনসাধারণকে হিন্দুমেলার উৎসবপ্রাঙ্গণে সমবেত ও একত্রিত করিবার যে পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা তাঁহারা করিয়াছিলেন, ইতিপূর্বে তাহা আর দেখা যায় নাই। এইখানেই ইণ্ডিয়ান লীগ, ভারত-সভা বা পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সভা-সম্মেলনগুলির সহিত ইহার প্রধান পার্থক্য।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইহার একটি প্রধান দুর্বলতা ও মারাত্মক ত্রুটি রহিয়া গেল,—হিন্দুমেলা হিন্দু সম্প্রদায়ের বাহিরে অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের কথা ভাবিতে পারে নাই। বস্তুত হিন্দুমেলার সময় হইতেই বাংলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবল হইতে শুরু করে।

কিছুকাল পরে এই মেলার মূল উদ্যোক্তা, রাজনারায়ণ বসু An Old Hindu's Hope নামে একটি পুস্তিকা লিখিলেন। সেকালে এই পুস্তিকাটি এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিরাট চাঞ্চল্য আনিয়াছিল ;—এই আলোচনায় আমরা পরে আসিব। তবে হিন্দুমেলার এই উৎসব 'হিন্দু-ঘেঁষা' বা

সাম্প্রদায়িক-গন্ধী হইলেও তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইহা সর্বপ্রথম একটি ব্যাপক স্বাদেশিকতাবোধের জোয়ার আনিল। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ইহার ঐতিহাসিক ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

১৮৬৭ সালে যখন হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হয়, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বৎসর। বাল্যকাল হইতেই এই হিন্দুমেলা ও পারিবারের স্বদেশী উত্তেজনার আবহাওয়ায় কবি বড়ো হইয়া উঠিতেছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ একদিন কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথে পরিণত হইলেন, সেদিন হিন্দুমেলায় তাঁহারও ডাক পড়িল।

হিন্দুমেলার নবম অধিবেশন হয় পার্শীবাগানে। সেই অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম স্বদেশমূলক কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে পারিবারিক এই স্বদেশপ্রীতি যে গভীরভাবে তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা তিনি নিজ মুখেই বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। কবি স্বয়ং তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে এই সম্পর্কে লিখিতেছেন,

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

"আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

"লর্ড কার্জনের সময় দিল্লীদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ লিখিয়াছি, লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে—তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট রুসিয়াকেই ভয়

করিত কিন্তু চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। ...সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।..." [জীবনস্মৃতি ।। পৃঃ ৭৭-৭৮]

কবি এখানে হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া যে কবিতা পাঠের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বস্তুত উহা হিন্দুমেলায় কবির দ্বিতীয় কবিতা পাঠ। ১৮৭৫ খৃঃ পার্শীবাগানে হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে হিন্দুমেলার উপহার নামে সর্বপ্রথম তাঁহার স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। বালক কবির এই রচনাটি তৎকালীন স্বদেশাত্মক কবিতার ভাব ও আঙ্গিকে (নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও বিহারীলালের অনুসরণে) লেখা।

হিন্দুমেলার উপহার কবিতাটির কয়েকটি স্তবক এইরূপ,

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বতশিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায়।

৪

ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়,
কেনরে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস ! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

১৮

ভারতকঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন,
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া
আর কি কখনো দিবেরে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত ! হাসিবিরে পুনঃ
সেদিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে ?

২০

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারতকানন,
চন্দ্রসূর্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক।

২১

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারত সাগরের জলে,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

২২

মুছে যাক মোর স্মৃতির অক্ষর
শূন্যে হোক লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।

'জীবনস্মৃতি'তে কবি দিল্লীদরবার সম্পর্কে হিন্দুমেলায় যে কবিতাপাঠের কথা বলিয়াছেন, উহা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলার একাদশ অধিবেশনে পঠিত হয়। সমসাময়িক কোনো পত্র-পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে উহাকে একটু রদবদল করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। খুব সম্ভব স্বপ্নময়ী নাটকের প্রয়োজনের স্বার্থেই 'ব্রিটিশ'-এর স্থলে 'মোগল' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। হিন্দুমেলার উৎসব-প্রাঙ্গণে কবিতাটির মূল পাঠের সময় নিশ্চয়ই 'ব্রিটিশ' শব্দটি ছিল, নতুবা কবি একথা বলিবেন কেন যে,

"লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে—তখনকার ইংরেজ গবর্মেণ্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। টাইমস্ পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই।" [জীবনস্মৃতি ।। পৃঃ ৭৮]

স্পষ্টই বুঝা যায়—কবিতাটি মূলপাঠের সময় নিশ্চয়ই 'ব্রিটিশ' শব্দটি ছিল নতুবা কবির এতসব কথা বলিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। অথবা ইহাও হইতে পারে যে কবিতাটি মূলপাঠের সময় 'ব্রিটিশ' কথাটিই ছিল, পরবর্তীকালে লিটনের 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'-এর কবলে পড়িবার আশঙ্কায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী নাটকে কবিতাটি একটু রদবদল করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ব্রিটিশের স্থলে 'মোগল' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

দিল্লীদরবার সম্বন্ধীয় কবিতাটির অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ('ব্রিটিশ' শব্দটি এইস্থলে আমরা ব্যবহার করিয়াছি)।

"দেখিছ না অয়ি ভারত সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়কালের নিবিড় আঁধার ভারতভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?

... ...

তুমি শুনিতেছো ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি,

সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তবে এইসব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান ?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান ?
... ...
ব্রিটিশরাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ চরণে লোটাতে শির—
অই আসিতেছে জয়পুর রাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর !
হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে ?
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না,
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আর এক তান।"

ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ।

বিলাতের রক্ষণশীল দলের ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদী নেতা ডিস্‌রেলী তখন প্রধান মন্ত্রী। ডিস্‌রেলী তাঁহার যোগ্যতম শিষ্য লর্ড লিটনকে বড়লাট পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিস্‌রেলী একটি আইন পাশ করিয়া মহারানী ভিক্টোরিয়াকে 'কাইজার-ই-হিন্দ্' (ভারতের রাজ-রাজেশ্বরী) উপাধিতে ভূষিত করিলেন। লর্ড লিটন ১৮৭৭ সালে মোগল সম্রাটদের ন্যায় বিপুল সমারোহে ও ঐশ্বর্য-আড়ম্বরে দিল্লীদরবার আহ্বান করিয়া মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ঐ উপাধি-প্রদানের কথা ঘোষণা করিলেন।

ভারতের সামন্ত নৃপতি ও দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ ঐ দরবারে আনুষ্ঠানিক-ভাবে মহারানীর নিকট তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এতদিন এইসব দেশীয় রাজন্যবর্গ নামমাত্র হইলেও ব্রিটিশের 'মিত্ররাজ্য' হিসাবে

পরিগণিত হইয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু এই দিল্লীদরবারের পর প্রকাশ্যে ও আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে ব্রিটিশরাজের একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। দিল্লীতে মহাসমারোহে যখন দরবার হইতেছিল, ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক তখন অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। দক্ষিণ ভারতে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আর ইতিপূর্বে তেমন দেখা যায় নাই। বিশেষজ্ঞদের মতে এই দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় বাহান্ন লক্ষ লোক মারা যায়।

বালক রবীন্দ্রনাথের মানসপটে এই ভারতবর্ষের চিত্রটি উদিত হইয়া তাঁহাকে ভয়ানক বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারই প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুমেলার ঐ কবিতাটি বাহির হইয়া আসিল। দেশীয় রাজন্যবর্গের ঘৃণ্য ব্রিটিশ পদলেহন ও স্তুতিবাদে কিশোর কবির তীব্র স্বাজাত্যবোধ ভয়ানক আহত ও অপমানিত বোধ করিয়াছে। দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্রূপ জানাইয়া কিশোর কবি গাহিলেন,—

"ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আর এক তান।"

শুধু হিন্দুমেলাই নয়, ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে ইতালীর বৈপ্লবিক গুপ্ত সংগঠনগুলির অনুকরণে একটি গুপ্ত সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই গুপ্ত সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এই সংগঠনের নাম ছিল 'সঞ্জীবনী সভা'।

তখনই ব্রিটিশ রাজত্বের উৎখাত করা ইঁহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। তবে স্বদেশসেবা এবং কিছু বীর্যবান সাহসী ও দৃঢ় চরিত্রের দেশকর্মী সৃষ্টি করাই ছিল এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। ইঁহাদের স্বচ্ছ ও পরিষ্কার কোনো রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। ইঁহাদের চালচলন হাব-ভাব গুপ্ত ও সাংকেতিক ছিল। এই সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি হইতে জানা যায়,

"সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এই সভার সভ্য ছিলেন। পরে নবগোপাল বাবুকেও সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। সভার আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল ভাঙা ছোট টেবিল একখানি, কয়েকখানি ভাঙা চেয়ার ও আধখানা ছোট টানাপাখা—তাও আবার একদিক ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

"জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন

সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ-সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।

"আদি-ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে-জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুইপাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত ভারতের প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য (অর্থাৎ কিনা গল্পগুজব) আরম্ভ হইত।

"কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্‌ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্ত ভাষায় 'সঞ্জীবনী সভা'কে 'হাঞ্চ্‌ পাম্‌ হাফ্‌' বলা হইত।"

[জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ।। পৃঃ ১৬৬-৬৭]

এহেন সঞ্জীবনী সভায় কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথও একজন তরুণ সভ্য ছিলেন। বড়োদের সহিত তিনিও স্বাদেশিক উত্তেজনায় মাতিয়া উঠিয়া তাঁহাদের পাশে-পাশে থাকিয়া ঘুরাফিরা করিতেন। জীবনস্মৃতিতে কবি ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন (জীবনস্মৃতি ।। পৃঃ ৭৮-৭৯ দ্রষ্টব্য)।

শুধু সঞ্জীবনী সভাই নহে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বাদেশিক সাধনার নানা উদ্ভট পরিকল্পনা ও কর্মপ্রচেষ্টা ছিল। দেশের সর্বজনীন পোশাক কি ধরনের হইবে—সে লইয়া তাঁহার গবেষণার অন্ত ছিল না। স্বদেশী দেশলাইয়ের কারখানা, স্বদেশী কাপড়ের কল তৈয়ারির পিছনে এই স্বদেশ-পাগল মানুষটির বহু পরিশ্রম বহু অর্থ বহু উদ্যম ব্যয় হইয়াছে।

সর্বশেষ করুণ ও হাস্যকর ট্রাজেডির কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'জাহাজের খোল' প্রসঙ্গে। কিরূপে কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া জ্যোতিদাদা একটি জাহাজের খোল কিনিলেন এবং তাহাতে ইঞ্জিন বসাইয়া বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়া কিরূপে সর্বস্বান্ত হইয়া তিনি ঘরে ঢুকিলেন—সে কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া কবি যত কৌতুকাবহ রস সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বদেশ-পাগল দাদাটির সেই সব উদ্ভট মহৎ প্রচেষ্টার জন্য তদপেক্ষা গর্ব ও আবেগে তাঁহার লেখনী যেন সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই।

॥ বিলাত-ভ্রমণ ও বিশ্ব-সাহিত্যে প্রবেশ ॥

ঠাকুর পরিবারের সাহিত্য ও শিল্প-চর্চার আবহাওয়া যে বাল্যাবস্থা হইতেই রবীন্দ্র-মানসে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। ধর্মশাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং পাশ্চাত্য দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটি সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ পারিবারিক কালচারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। অতি অল্প বয়সে তিনি সেক্সপীয়রের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্য চর্চার বিষযে অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের প্রভাব খুব অল্প নহে, কবি নিজেই জীবনস্মৃতিতে একথা লিখিয়াছেন। অবশ্য কবির স্কুল-জীবনে সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রতি অনুরাগ বা প্রেরণা অন্তত শিক্ষায়তন হইতে বড়ো একটা পাইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

পরবর্তীকালে বিলাত-যাত্রার পূর্বে আমেদাবাদ বাসকালেই তাঁহার ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠে একাগ্র নিষ্ঠা দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদে সেশন-জজ ছিলেন। বিলাত-যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে ইংরাজী ভাষা, কথাবার্তা ও আদব-কায়দা সম্পর্কে কেতাদুরস্ত করাই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের আসল উদ্দেশ্য। এই সময় কবি ইংরাজী সাহিত্য গভীরভাবে পাঠ করিবার চেষ্টা করেন। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই 'জীবনস্মৃতি' (খসড়া পাণ্ডুলিপি-তে) লিখিয়াছেন,

"মেজদাকে বলিলাম, 'আমি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন।' তিনি আমার সম্মুখে টেন্ প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচার মাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমন কি অ্যাংলো-স্যাক্সন ও অ্যাংলো-নর্মান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। এইরূপ লেখার উপলক্ষে আমি সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মেজদাদার কাছারি হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত একান্ত চেষ্টায় ইংরেজি গ্রন্থের অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি।" [জীবনস্মৃতির খসড়া—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ পৌষ ॥ পৃঃ ১২১]

আমেদাবাদ ও বোম্বাই বাসকালে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে ইংরাজী সাহিত্যই পাঠ

করিয়াছিলেন তাহা নহে, সেই অল্প বয়সেই তিনি দান্তে, পেত্রার্ক, গ্যেটে প্রভৃতি মহাকবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং শুধু তাহাই নহে,—ভারতী পত্রিকায় তিনি এই সব কবিদের রচনার অংশ-বিশেষ তর্জমা করিয়া প্রকাশের জন্য পাঠাইতে লাগিলেন।

এই সময় ভারতীতে তাঁহার 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য' (১২৮৫ ভাদ্র), 'পিত্রার্ক ও লরা' (১২৮৫ আশ্বিন) এবং 'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' (১২৮৫ কার্তিক) প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৬।১৭ বৎসর বয়সের কবির পক্ষে ইহা কম দুঃসাহসের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁহার এই ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,

"I myself have tried to get at the wealth of beauty in the literature of the European languages, long before I gained a full right to their hospitality. When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through an English translation. I failed utterly, and felt it my pious duty to desist. Dante remained a closed book to me.

"I also wanted to know German literature and by reading Heine in translation I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not preserving. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language, which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.

"Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through the Faust. I believe I found my entrance to the palace not like one who has keys for all the doors but as a casual visitor who is tolerated in some general guest-room, comfortable but not intimate. Properly speaking I do not know my Goethe and in the same way many other great luminaries are dusky to me.

[Tagore in contemporary Indian Philosophy :
Edited by S. Radhakrishnan and Muirhead. P. 29.]

বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় মহাকবিদের রচনা পাঠ ঐ বয়সেই রবীন্দ্রনাথের চিত্তের প্রসারতা ও বিস্তার আনিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছে। এবং ইহা পরবর্তী-কালে তাঁহার দৃষ্টিতে স্বাদেশিক সংকীর্ণতার গণ্ডি ভাঙিয়া বিশ্বব্যাপী প্রসারতা আনিয়া দিতেও সাহায্য করিয়াছে। কবি-চিত্তের এই প্রসারতা আরও আনিয়া দিয়াছে তাঁহার বিলাত-ভ্রমণ এবং বিশ্ব-ভ্রমণ।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সহিত প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। কবির বয়স তখন প্রায় ১৭ বৎসর। মেজবৌদিদি তাঁহার শিশু পুত্রকন্যাদের লইয়া ইহার কিছুকাল পূর্বেই ব্রাইটনে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রাইটনের একটি স্কুলে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। পরে তারকনাথ পালিত মহাশয়ের পরামর্শক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে লণ্ডনে ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। সেখানে লোকেন পালিত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে পাঠকালে কবিকে সর্বাপেক্ষা গভীর আকর্ষণ করিয়াছিল মর্লি (হেন্‌রি মর্লি) সাহেবের পঠনরীতি ও সাহিত্যচর্চা। কবি বহুবার সশ্রদ্ধ চিত্তে মর্লি সাহেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে লোকেন পালিতের সহিত তাঁহার সাহিত্য চর্চার কথাও তিনি জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করিযাছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই বিলাত-ভ্রমণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যৌবনের প্রারম্ভেই এই ভ্রমণ তাঁহার ধর্মীয় গোঁড়ামি বা স্বাদেশিক সংকীর্ণতার বাধাগুলি অনেকখানি ভাঙিয়া দিয়াছে। ইংলণ্ডের স্বাধীনচেতা নরনারীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ, পার্লামেণ্টে গ্লাডস্টোন ও ব্রাইট প্রমুখ উদারমতাবলম্বী নেতৃবর্গের বাগ্মিতা, ইংলণ্ডের শিল্প-সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মনীষা তাঁহাকে অভিভূত ও মুগ্ধ করিয়াছিল।

শুধু তাহাই নহে,—ইউরোপীয় সংগীত, নৃত্য ও শিল্পকলার প্রাথমিক পাঠ তিনি এইবার ইংলণ্ড-বাসকালে বেশ কিছুটা লইয়াছিলেন। কবি তাঁহার জীবনস্মৃতি এবং য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ইহারা রবীন্দ্রমানস-গঠনের অমূল্য উপাদান।

॥ পারিবারিক অধ্যাত্ম সাধনার প্রভাব

শিশুকাল হইতেই ঠাকুর পরিবারের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনার ভাব কবির জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

কবির বয়স যখন ১১ বৎসর সেই সময় তাঁহার উপনয়ন হইয়া যায় (১৮৭৩ ফেব্রুয়ারি ৬)। দেবেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে পিতার শ্রাদ্ধ ও মধ্যম কন্যা সুকুমারীর বিবাহ অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম মতে দিয়াছিলেন একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

এইবার হিমালয় হইতে ফিরিয়াই (১৮৭২-এর শেষভাগে) কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রদ্বয়ের এক সাথেই (রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্র ও সত্যপ্রসাদ) উপনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। এই উপনয়ন-বিষয়ে তিনি আচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ-এর সহিত পরামর্শক্রমে বৈদিক মন্ত্র চয়ন করিয়া এক অভিনব ব্রাহ্মধর্ম-সম্মত উপনয়ন অনুষ্ঠানের বিধিব্যবস্থা উদ্ভাবন করিলেন। তদনুসারে বালকত্রয়ের উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। কবির জীবনে এই উপনয়ন ও গায়ত্রীমন্ত্রের প্রভাব অতীব গভীর হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বহুবার বহু ক্ষেত্রে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। জীবনস্মৃতিতে কবি এই সম্পর্কে লিখিতেছেন,

"একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিনজনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে (আনন্দচন্দ্র—লেখক) লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেক দিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে-সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারংবার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল।···

"নূতন ব্রাহ্ম হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে এই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম।

"···গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে,

কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শান-বাঁধানো মেজের এককোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না।···আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌছায় না।"

[জীবনস্মৃতি ।। পৃঃ ৪০-৪৩]

রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনব্যাপী এই ধর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রভাব প্রবল ছিল। শুধু উপনিষদাদির মন্ত্রের উপরই তাঁহার গভীর শ্রদ্ধাই ছিল না—আদি ব্রাহ্মসমাজের বহু বিধিব্যবস্থা ও সংস্কারাদি তিনি বহুদিন পযন্ত অন্ধভাবে মানিয়া চলিতেন। অবশ্য যুক্তিবাদের কঠোর শাস্ত্রীটি বহু বার বহু সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁহাকে তর্জনী তুলিয়া তিরস্কার করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনব্যাপী দুইটি পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়। একদিকে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদির প্রভাব, অপরদিকে ইউরোপীয দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর অসীম শ্রদ্ধা। একদিকে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার বৈদিক যুগের পুনরুত্থানের প্রয়াস, অপরদিকে আধুনিক গণতান্ত্রিকতা ও বিশ্বমানবতাবাদ—একদিকে আধ্যাত্মিকতা, অপরদিকে আধুনিক রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান,—এককথায় তাঁহার প্রাচীন চিন্তাধারার সহিত আধুনিক চিন্তাধারার বিরোধটি তাহার চিন্তায় ও সাধনায় অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার একটা আপস ও সংগতি রক্ষা করিয়া চলিতে চাহিয়াছেন—জগতের বহু জলন্ত প্রশ্নে ও সমস্যায় একটি মধ্যপন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বিশ্বের ও দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক গভীর সমস্যা ও প্রশ্নের ক্ষেত্রে আধুনিক রাজনীতির স্থানাধিকার করিয়াছে তাঁহার ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা, এ-কথা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার কাছে উপনিষদের মহান শ্লোকগুলি যেন অমৃতের সন্ধান দিয়াছে। বর্তমান বিশ্বের সমস্যাগুলি যত আধুনিকই হউক না কেন, উহার মূলকথা যেন প্রাচীন ঋষিরা চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। যেন জগতের চূড়ান্ত সমাধানগুলি ঐ শ্লোক ও মন্ত্রগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে, বাল্যকাল হইতেই কবিমানসে তাঁহার পারিবারিক ধর্মসাধনার ঐতিহ্যের প্রভাব। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন,

"রবীন্দ্রনাথের উপর ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থোদ্ধৃত উপনিষদাদির মন্ত্রের ও বিশেষভাবে

গায়ত্রীমন্ত্রের প্রভাব অতীব গভীর।…রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা পাঠে জানা যায় যে সংস্কৃত মন্ত্র ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ যেমন অকৃত্রিম তেমনি গভীর। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একসময় পর্যন্ত উপনয়নাদির হিন্দুসংস্কারে বিশ্বাসবান ছিলেন; কারণ আমরা দেখিতে পাই তিনি যথাবিধি জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করেন, কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত জামাতাকে উপনয়ন ধারণের জন্য অত্যন্ত জিদ্ করা হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল এইসব সামাজিক আচারকে স্বয়ং মানিয়া চলিয়াছিলেন। প্রাচীন মন্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে তাঁহার মজ্জাগত সামাজিক সংস্কারসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।…"

[রবীন্দ্রজীবনী : ১ম খণ্ড ।। পৃঃ ৩৬]

রবীন্দ্রজীবন আলোচনা-কালে দেখা যায় যে, প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধের কাল হইতেই তাঁহার প্রাচীন ধর্মসংস্কার ও চিন্তাধারার পরিবর্তন হইতেছে এবং ক্রমশ দেশের ও বিশ্বের সমাজ-অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী তাহার স্থানাধিকার করিতেছে। যথাস্থানে আলোচনাকালে দেখা যাইবে, ক্রমশ ঐ সময় হইতেই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞান-ঘেঁষা ও আধুনিক হইয়াছে।

বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের মানসিক সত্তার উপর তাঁহার পারিবারিক ধর্মসাধনা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব কত গভীর হইয়াছিল, কবি স্বয়ং শেষজীবনে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে তাহার একটা বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

"…আমার জন্ম যে-পরিবারে সে-পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে।…

উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না। বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনি আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহির ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।

"এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এই রকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।"

[মানবসত্য—মানুষের ধর্ম ॥ পৃঃ ৭৮-৭৯]

এইভাবে বাল্যকাল হইতেই পিতার ও পারিবারিক ধর্মসাধনার প্রভাবে কবি-মানস সংগঠিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'মিষ্টিক্‌ধর্মী' সাহিত্য ও জীবন-দর্শনের মূল-উৎস সন্ধানে আমাদের এইখানে আসিতে হইবে।

পরবর্তীকালে, 'প্রভাতসংগীত' রচনাকালে তাঁহার জীবনে প্রথম আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভাতসংগীত রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ২১ বৎসর। ইতিপূর্বে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'ভগ্নহৃদয়', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন।

প্রভাতসংগীত রচনাকালে তিনি কিছুদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত দশ নম্বর সদর স্ট্রীটের বাড়িতে ছিলেন। প্রভাতসংগীতের প্রথম কবিতাই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। ইহাতেই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবি-সত্তা বা অন্তর-প্রকৃতি প্রথম বর্হিমুখী উচ্ছ্বাসের বাধাবন্ধহীন মুক্তি পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্ম গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

"তখন প্রত্যূষে ওঠা প্রথা ছিল।···সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গির বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। তখন ওখানে ফ্রি ইস্কুল বলে একটা ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের হাতাটা দেখা যেত। সেদিকে চেয়ে দেখলুম, গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরাল থেকে, অমনি মনের পরদা খুলে গেল। মনে হল মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হল না তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।···

"সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে যে-ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল, তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে,—প্রভাতসংগীতের মধ্যে।···

"…অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে-জীবন সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে সেই অহং-এর খেলাঘরে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখি নি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

"এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এল বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগ-যুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে, অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলছি বিরাট পুরুষ। সেই যে মহামানব তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে। এই যে ডাক পড়ল, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে। এর আকর্ষণ মহা সমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়; সমস্ত স্পর্শ নিয়ে শেষে পড়ে এক জায়গায় যেখানে—

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

"সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল। মানবধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি

মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।"

[মানবসত্য—মানুষের ধর্ম ।। পৃঃ ৭৯-৮৬]

কবির এই আত্মবিশ্লেষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাকেই বলিতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তা, তথা রবীন্দ্রমানসের মূল মর্মকথা। প্রভাতসংগীতের মধ্যে রবীন্দ্রমানসের সর্বপ্রথম এমন একটি চেতনার উন্মেষ দেখিলাম যাহা বিশ্বপ্রকৃতি, সর্বোপরি মানুষের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও প্রেম এবং একাত্মবোধ আনিয়া দিয়াছে। সেই বয়সেই কবি আপনার মধ্যে 'মহামানবের মহাসমুদ্রে'র মিলনের আহ্বান শুনিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ ঔপনিষদিক মানবতাবাদ হইতে প্রাণ-শক্তি আহরণ করিতে চাহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, "একটি অভূতপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।"

কিন্তু ইহাতে শুধু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যেরই ভূমিকা লেখা হয় নাই, রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের রাজনীতির ভূমিকাও এই কবিতার মধ্যে লিখিত রহিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির মূল-উৎস অনুসন্ধানে বাহির হইলে শেষ পর্যন্ত আমরা কবির আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইব। কিন্তু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে কবি মহামানবের মহাসমুদ্রকেই দেখিলেন—নির্বিশেষ মানবতাকেই দেখিতে পাইলেন ; বিশেষ যুগের মানুষ, পৃথিবীর দেশে দেশে অগণিত সমস্যাভারক্লিষ্ট আর্ত মানবকে তিনি তখনও দেখিতে পান নাই।

পরবর্তীকালে জগতের ঘটনা-বিকাশের সাথে সাথে কবি-মানসের কী দ্রুত ও বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখিতে পাই। পৃথিবীর দেশে দেশে যেখানে মানুষ উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে, কবি-মনে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিক্রিয়া ও সাড়া জাগিয়াছে। মানুষের প্রতি এই অপরিসীম ভালোবাসা ও গভীর ঐকান্তিক দরদই তাঁহার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার আড়ষ্টতা সংকীর্ণতা ভাঙিয়া দিয়া ক্রমাগতই তাহা পরিবর্তিত ও পরিশোধিত করিয়াছে।

।। সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ ।।

আমাদের জাতীয় চেতনায় জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। আমাদের দেশের, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের জাতীয় জাগরণের পশ্চাতে আমাদের জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের যে বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে তাহার মূল্যায়ন সহজসাধ্য নহে। ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকগণের জাতীয়তাবাদমূলক সাহিত্যকর্মের পর্যালোচনার স্থান অন্যত্র, তবুও এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, বাংলার জাতীয় জাগরণের প্রায় সমস্ত উদ্দীপনা ও প্রেরণার পশ্চাতে আমাদের জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের অবদান কম নহে।

বাংলা সাহিত্যে স্বাদেশিকতা ও স্বদেশপ্রীতি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় প্রথম প্রকাশ পায়। বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুর পূজা করিবার আহ্বান জানাইতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই।

তাঁহার পর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'অবাস্তব, কাল্পনিক পরিবেশে স্থূল প্রণয়লীলার স্থানে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেশপ্রেমকে গ্রহণ করিলেন কাব্যের বিষয়রূপে।'

রঙ্গলালের প্রায় সমসাময়িক মহাকবি মধুসূদনের সাহিত্যকর্মেও আমরা তাঁহার সামন্ততন্ত্রের প্রতি ঘৃণা এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও স্বদেশপ্রীতির স্বাক্ষর দেখিতে পাই।

মধুসূদনের পরেই বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টার রচনায় তীব্র স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার জোয়ার আসিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার গদ্যরীতি ও উপন্যাস রচনায় বিরাট এক বৈপ্লবিক রূপান্তর আনিলেন, এবং শুধু তাহাই নহে,—বঙ্কিমচন্দ্র সারা দেশকে জাতীয়তার বেদমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাহিলেন। তাঁহার 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী'র মধ্যে সর্বপ্রথম এক বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের বজ্র-নির্ঘোষ শুনা গেল। প্রায় অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী সাহিত্য বাংলাদেশের স্বাদেশিক সংগ্রামে প্রবল প্রেরণা ও উদ্দীপনা যোগাইয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জুড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ভারতের জনমানসে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদ আলোচনা করিলে কয়েকটি স্ববিরোধী ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম জীবনে ইতালী ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। ইউরোপের স্বদেশপ্রীতি, বীরত্ব এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষাও তাঁহাকে এককালে মুগ্ধ করিয়াছিল। কালক্রমে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পররাজ্যলুণ্ঠন প্রবৃত্তি দেখিয়া ইউরোপ সম্পর্কে তাঁহার মোহভঙ্গ হয়। তিনি বলিলেন—"য়ুরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। য়ুরোপীয় patriotism-ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের সমৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্যজাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।" আরো বলিলেন, "...যে সমাজ বলবান সে দুর্বল সমাজের কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য য়ুরোপের এই রীতি।"

[মোহিতলাল মজুমদার—বাংলার নবযুগ]

একসময় ইউরোপের কাল্পনিক সমাজবাদের প্রভাবও তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। অপরদিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুধর্মসংস্কার আন্দোলনেও তাঁহার গভীর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে কিছুটা প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া পড়িয়াছিলেন এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতপক্ষে নব্যপন্থীদের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রগতিশীল দিকগুলির তিনি বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এবং এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-সাহিত্য 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ, 'পরান মণ্ডলদের' দেখা গেলেও তাঁহার উপন্যাস ও গল্পে 'পরান মণ্ডলদের' কোনো চরিত্র-চিত্রণ দেখা যায় না।

এই দিক হইতে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। শুধু পরান মণ্ডলরাই নহে, বাংলার কৃষককুলের অত্যন্ত নির্যাতিত শ্রেণীর কৃষকেরা নীলদর্পণের মঞ্চ অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

নীলকরদের অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী কিছু করিতে সাহস পান নাই বটে, কিন্তু সংবাদপত্র ও সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁহারা নির্যাতিত নীলচাষীদের পক্ষাবলম্বন করিয়া আগাইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার ফলে শাসক শ্রেণী ও নীলকর সাহেবদের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া ইহাদের অনেককেই নির্যাতন ও শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছে। মহাপ্রাণ হরিশ মুখোপাধ্যায় মৃত্যুর পরও তাহাদের রোষদৃষ্টি হইতে রেহাই পান নাই, হরিশের বিধবা স্ত্রী-পুত্রকেও অকথ্য লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে।

নীলদর্পণকে উপলক্ষ করিয়া বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সহিত ইংরাজ শাসন-

কর্তৃপক্ষ ও ইউরোপীয় নীলকর সাহেবদের বেশ একটি বিরোধ দেখা দিয়াছিল। নীলদর্পণ নাটকটি মঞ্চস্থ করিবার ব্যাপারে কলিকাতায় বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে একটি আলোড়ন ও সাড়া পড়িয়া যায়। রেভারেণ্ড লং-সাহেব নাটকখানির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য আদালতে শাস্তিভোগ করেন। তৎকালীন ভারত এবং বাংলাদেশের অন্য কোনো কৃষক বিদ্রোহের প্রতি আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এতখানি ব্যাপক সমর্থন লক্ষ্য করা যায় না।

সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন, ২৪ পরগনার তিতু মিঞার বিদ্রোহ, পাবনা ও বগুড়ার কৃষক অভ্যুত্থানগুলির মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশী নহে। এইসব কৃষক বিদ্রোহগুলির পিছনে যে গভীর নির্যাতন ও শোষণ ব্যবস্থার কারণগুলি নিহিত ছিল, মূলত তাহা এক। অথচ নীল বিদ্রোহই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সমর্থন লাভ করিল, অন্যগুলি করে নাই—ইহর কারণ কি? নীলকর সাহেবেরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী, এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী, ইহাই কি অন্যতম কারণ?

যাহাই হোক, আমাদের জাতীয় চেতনার ইতিহাসে নীলদর্পণের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, যাহা বঙ্কিমচন্দ্র বা সমকালীন এদেশীয় কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং সামাজিক মূল্যে যাহারা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, সেই সব 'তুচ্ছ লোকেরা'ও নীলদর্পণের পাত্র-পাত্রী হইয়াছে, ইহা চিন্তা করিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। পরবর্তী কালে নীলদর্পণের অনুকরণে 'জমিদার-দর্পণ' প্রভৃতি লিখিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

কিন্তু তবুও নীলদর্পণ আনন্দমঠের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। আনন্দমঠ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লিখিত। উপন্যাসখানিতে মুসলমান-রাজত্বের অবসান বর্ণিত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিবারই আহ্বান জানাইয়াছেন। স্বদেশী যুগে তাই আনন্দমঠ ছিল দেশকর্মীদের কাছে যেন 'অগ্নিবেদ'।

আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এক বীরপ্রসবিনী হিন্দু জাতি গড়িতে চাহিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সারা ভারতবর্ষকে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত দিয়া গেলেন। এই একটি মাত্র সংগীত আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আনন্দমঠে আমরা নীলদর্পণের নির্যাতিত কৃষক শ্রেণীর কথা শুনি নাই বটে, তবে আনন্দমঠেই আমরা জাতির মুক্তি আন্দোলনের কথা শুনিলাম, যদিও উপন্যাসখানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল যে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে আনন্দমঠ লিখিতেছেন (বঙ্গদর্শন : ৭ম খণ্ড, ১২৮৭ চৈত্র হইতে ৮ম খণ্ড, ১২৮৮ আশ্বিন এবং ৯ম খণ্ড, ১২৮৯ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ), প্রায় একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' লিখিতেছেন (ভারতী, ১২৮৮ কার্তিক হইতে ১২৮৯ আশ্বিন)। গ্রন্থাকারে উভয় রচনা দুইটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে। অথচ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির কী বিরাট পার্থক্য !

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বেই দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), মৃণালিনী (১৮৬৯), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮২) প্রভৃতি ঐতিহাসিক এবং জাতীয়তাবাদমূলক ও বীরত্বব্যঞ্জক রচনাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সাহিত্যে সে-এক উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগ। সেই যুগে প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটিয়া বীরত্ব-কাহিনী আবিষ্কারের নেশা আমাদের পাইয়া বসিয়াছিল। অর্ধেক ইতিহাস অর্ধেক সাহিত্য ও কল্পনার রঙচঙ মিশাইয়া আদর্শ বীরত্বব্যঞ্জক উপন্যাস সৃষ্টি করিবার দিকেই আমাদের ঝোঁক ছিল বেশী। এই কালের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে এক সময় বলেন,

"তখন আলেকজান্দারের থেকে আরম্ভ করে ক্লাইভের আমল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষ বারবার কিরকম পরাস্ত অপমানিত হয়ে এসেছে এই কাহিনীই দিনক্ষণ তারিখ ও নামমালা সমেত প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করেছি। এই অগৌরবের ইতিহাসমরুতে রাজপুতদের বীরত্বকাহিনীর ওয়েসিস থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ত্ব-পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হত। সকলেই জানেন, সে সময়কার বাংলা কাব্য নাটক উপন্যাস কিরকম দুঃসহ ব্যগ্রতায় টডের রাজস্থান দোহন করতে বসেছিল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দেশের মধ্যে আমাদের পরিচয় কামনা কিরকম উপবাসী হয়েছিল।...সেই দেশটাকে যদি আমরা দীন বলে জানি তা হলে বিদেশী বীর জাতির ইতিহাস পড়ে আমাদের দীনতাকে তাড়াবার শক্তি অন্তরের মধ্যে পাই নে।"

[বৃহত্তর ভারত—কালান্তর।। পৃঃ ৩০৬]

এমন একটি যুগে রবীন্দ্রনাথ বৌঠাকুরানীর হাট লিখিলেন। সেই উৎকট জাতীয়তাবাদের যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে কোনো আদর্শ বীর চরিত্র রূপে চিত্রিত না করিয়া তাঁহাকে নৃশংস দুরাচার রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি পান নাই। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১৮৬৯) নামক গ্রন্থ হইতেই বৌঠাকুরানীর হাট

লিখিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে প্রতাপ-চরিত্রের যে বর্ণনা আছে, রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরানীর হাটের প্রতাপ-চরিত্রের সহিত তাহার অনেকখানি সাদৃশ্য বা মিল আছে।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথকে ঐতিহাসিক 'বীরগাথার ভূত' পাইয়া বসে নাই। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। ইতিহাস হইতে জাতির শৌর্য, বীরত্ব, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের নজির খুঁজিয়া বাহির করিবার নামে তিনি কখনও সত্য-মিথ্যা ও কল্পনার রঙচঙ মিশাইয়া ইতিহাসকে বিকৃত করেন নাই। এক সময় রবীন্দ্রনাথকে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা প্রচারে পঞ্চমুখ দেখিতে পাই। কিন্তু কোথাও তিনি প্রাচীন হিন্দু জাতির শৌর্য, বীর্য ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন নাই। তিনি প্রাচীন ভারতের দর্শন, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক শক্তির মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

এ ক্ষেত্রে, সেই জাতীয়তাবাদী সাহিত্য সৃষ্টির যুগে, রবীন্দ্রনাথ যদি বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রমেশ দত্তকে অনুসরণ করিয়া প্রতাপ-চরিত্রকে আদর্শ বাঙালী বীর চরিত্র রূপে অঙ্কিত করিতেন তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই এবং এই বিষয়ে তখনই বেশ কিছুটা সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রতাপ-চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্র-রচনাবলীর ভূমিকায় লিখিতেছেন,

"স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলা দেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তী-কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১ম খণ্ড ।। পৃঃ ৩৭৪]

বৌঠাকুরানীর হাটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ একটি ঐতিহাসিক রাজপরিবারের কাহিনী লিখিতে গিয়া বাংলার জনজীবনেব চিত্র আঁকিতে ভুলেন নাই। অবশ্য ঐতিহাসিক দিক হইতে এইসব গ্রামবাসী নর-নারীদের ঠিক প্রতাপাদিত্যের যুগের বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ বৌঠাকুরানীর হাটের কাহিনী ভাঙিয়া 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি রচনা করেন।

॥ পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে মোহভঙ্গের শুরু ॥

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠারো বৎসর।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিলাত-ভ্রমণ (এবং বিদেশ-ভ্রমণ) অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পারিবারিক কালচারের আবহাওয়ায় ইউরোপীয় সংস্কৃতির সহিত যে পরোক্ষ পরিচয় ছিল, বিলাতে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিলেন। ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষা তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। পার্লামেণ্টে গ্লাডস্টোন ও জন ব্রাইটের বক্তৃতা, সেখানকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও গণতান্ত্রিক সামাজিক পরিবেশ, সেখানকার স্বাধীনচেতা নর-নারীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ প্রভৃতি দেখিয়া ইউরোপ সম্পর্কে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জন্মে। জীবনে বহুবার বহুক্ষেত্রে সশ্রদ্ধচিত্তে এই মহত্তর ইউরোপের কথা তিনি স্মরণ করিয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্তেও যখন তিনি ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া বার বার তাহাকে অভিসম্পাত ও বিনিপাত জানাইতেছেন, তখনও তিনি এই মহত্তম আধুনিক ইউরোপকে শ্রদ্ধা না জানাইয়া পারেন নাই। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধেও তিনি বাল্যস্মৃতি রোমন্থন করিয়া এই ইউরোপকে শ্রদ্ধা জানাইলেন। তিনি বলিলেন:

"বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্রপরিচয়।···তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে ; নিয়তই আলোচনা চলত সেক্স্‌পিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয় ঘোষণায়। তখন আমরা স্ব-জাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে এক সময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে।···মানবমৈত্রীর

বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

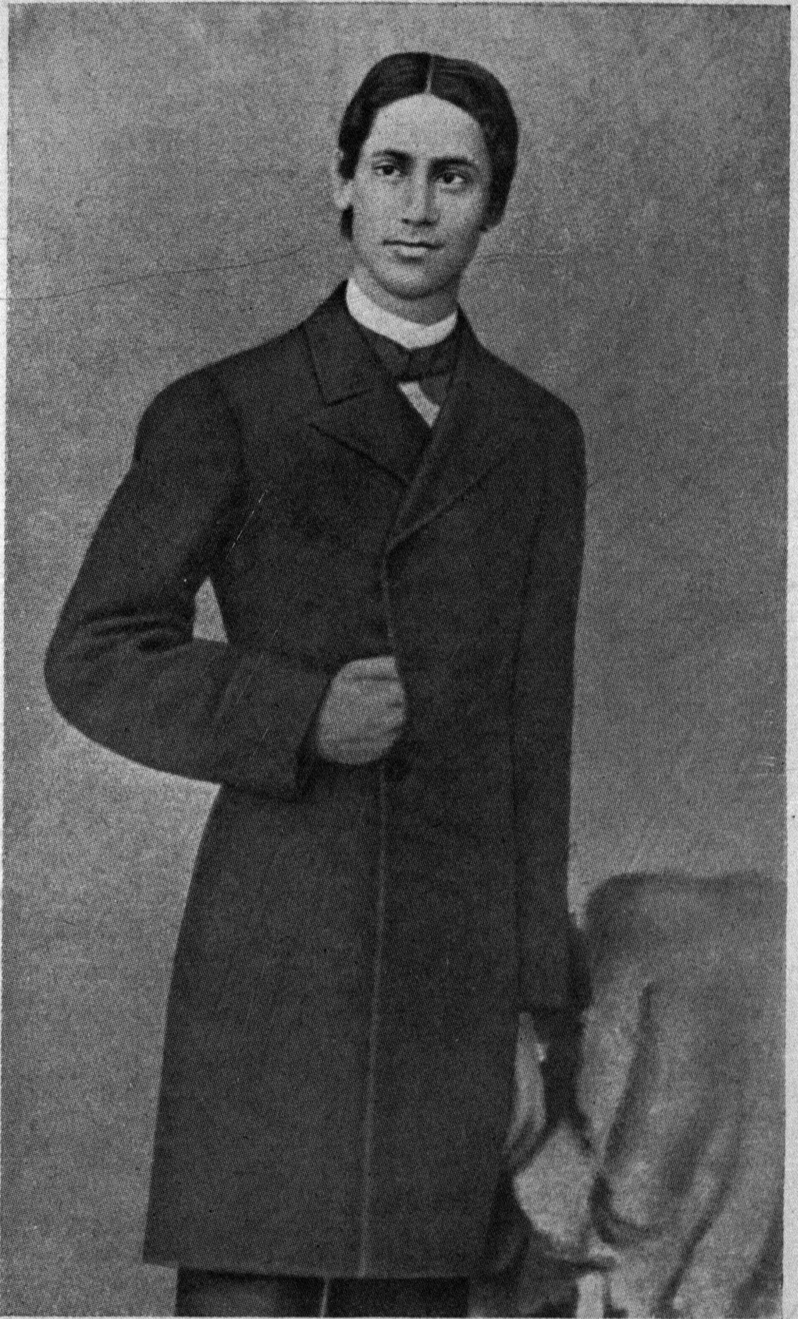
"আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম। সেই সময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেণ্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে।...তাই, ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

"...এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কি অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।" [সভ্যতার সঙ্কট—কালান্তর ॥ পৃঃ ৩৮২-৮৪]

এই লেখার কয়েক বৎসর পূর্বে 'কালান্তর' প্রবন্ধেও তিনি তাঁহার প্রথম জীবনের ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজ জাতির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রভাবের কথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বরঞ্চ পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে তাঁহার মনে সংশয় ও বিরুদ্ধভাব জন্মিতে থাকে। ইউরোপের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করিয়া, ইউরোপের সংগীত ও চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁহার উচ্চ ধারণার কোনো পরিবর্তন হয় নাই সত্য, পরন্তু দেশে ফিরিয়া ইউরোপীয় সংগীতের সহিত দেশীয় সংগীতের সংমিশ্রণের তাঁহার এক অভিনব প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, একথাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ-সভ্যতা ও রাজ-নীতিকে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইউরোপীয় জাতিগুলির পররাজ্য লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্যলিপ্সা দেখিতে পাইয়া তখন হইতেই ইউরোপীয় সভ্যতার উপর তাঁহার মনে সংশয় ও সন্দেহ জন্মিতে শুরু করে। ফলে ইউরোপকে গ্রহণ করিবার প্রশ্নে তাঁহার মনে একটি অন্তর্বিরোধ ও দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যথাসময়ে আলোচনাকালে আমরা ইহা দেখিতে পাইব।

বলা বাহুল্য,—রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিবিদ্ বা সমাজতাত্ত্বিক নহেন। রবীন্দ্রনাথ



বিলাতে : প্রথমবার

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে (কলিকাতা : ১৮৯০) নেতৃবৃন্দের সহিত রবীন্দ্রনাথ। বাম হইতে দক্ষিণে : উপবিষ্ট—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ মেহতা, দণ্ডায়মান—নলিনবিহারী সরকার, মনোমোহন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র মল্লিক, শেলী বন্দ্যোপাধ্যায়



কবি এবং সাহিত্যিক। সমাজ, সভ্যতা, বিশ্বসমস্যা ও জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে খুব গভীরভাবে কিছু চিন্তা করিবার মত বয়সটিও তখন অনুকূল নহে। বিলাত হইতে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সাহিত্য ও কাব্যচর্চায় তিনি ডুবিয়া গেলেন। বয়সটা পুরা রোমান্সের। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরীর সহিত দেশী ও বিলাতী সুরের সংমিশ্রণে এক অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। মাঝে মাঝে অভিনব ধরনের গীতিনাট্য রচনা ও তাহার অভিনয়ও চলিতেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানময়ী গীতিনাট্যে তিনি সুরসংযোজন এবং অভিনয় করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর বাল্মীকি প্রতিভা, ভগ্ন-হৃদয় এবং সন্ধ্যাসংগীত রচনা করিলেন।

কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন শিল্প-সৃষ্টির মধ্যেও মাঝে মাঝে কবির মনে গভীর প্রশ্ন দেখা দিয়াছে।

সন্ধ্যাসংগীত রচনার পরে ভারতীতে তিনি পর পর বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি লঘু রচনা লিখিলেন (১২৮৮ সালের শ্রাবণ হইতে ১২৮৯ সালের বৈশাখ পর্যন্ত)। উহাই পরে বিবিধ প্রসঙ্গ নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় (১৮৮৩ সেপ্টেম্বর)।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে এই গ্রন্থের কৈফিয়ত হিসাবে বলিয়াছিলেন, "সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে,—সেও একরকম যা-খুশি তাই লেখা।...তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম—মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কী লিখিব, সে খেয়াল ছিল না কিন্তু আমিই লিখিব এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা।" এই বলিয়া কবি লেখাগুলির গুরুত্ব লঘু করিতে চাহিয়াছেন। অবশ্য লেখাগুলি এমনিতেই বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ে এবং সবগুলির মধ্যেই তরল ও লঘু রস-সৃষ্টির চেষ্টা রহিয়াছে।

ইহার মধ্যে 'দয়ালু মাংসাশী' প্রবন্ধটিতে কবি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহাতে রস-সৃষ্টি ও পরিহাসচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তীব্র বিদ্রূপ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখিতেছেন,

"বিখ্যাত ইংরেজ কবি বলিয়াছেন যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাই, যেমন ছাগল, ভেড়া, গরু।...দেখা যাক্, বোকা জানোয়ারেরা কি খায়। তাহারা উদ্ভিজ্জ খায়। অতএব উদ্ভিজ্জ যাহারা খায় তাহারা বোকা। এমন দ্রব্য খাইবার আবশ্যক ? নির্বোধদের আমরা গাধা, গরু, ঘোড়া, হস্তিমূর্খ কহিয়া থাকি। কখনো বিড়াল, ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্রমূর্খ বলি না। উদ্ভিজ্জভোজীদের এমন নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, বুদ্ধির যথেষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করিলেও তাহাদের দুর্নাম ঘোচে না। নহিলে 'বাঁদর' বলিয়া সম্ভাষণ করিলে লোকে কেন মনে করে তাহাকে নির্বোধ

বলা হইল। উদ্ভিদ-ভোজী ভারতবর্ষকে ইংরাজশ্বাপদেরা দিব্যি হজম করিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু পাকযন্ত্রের প্রতি অল্প অল্প বিশ্বাস থাকাতে মাংসাশী কান্দাহার গ্রাস করিলেন, ভাল হজম হইল না ; পেটের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। মাংসাশী জুলুভূমি ও ট্রান্সভাল পেটে মূলেই সহিল না। ···অতএব মাংসাশী প্রাণীর লোভ এড়াইতে যদি ইচ্ছা থাকে তবে মাংসাশী হওয়া আবশ্যক। নহিলে আত্মত্ব বিসর্জন করিয়া পরের দেহে রক্ত নির্মাণ করাই আমাদের চরম সিদ্ধি হইবে।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী—অচলিত সংগ্রহ : ১ম খণ্ড ।। পৃঃ ৩৪৯]

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথ কী পটভূমিকায় এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ইংলণ্ডের তখন সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। পার্লামেণ্টে তখন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী ডিসরেলীর নেতৃত্বে রক্ষণশীল দলের মন্ত্রিত্ব। ডিস্‌রেলীর সময়ই দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ উপনিবেশ ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ প্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার আদেশ হয়। এবং তাঁহার সময়ই আফ্রিকার জুলুদের সহিত ইংরাজদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়।

এদিকে ভারতবর্ষে বড়লাট লিটনের আফগান-নীতির ফলে 'দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ' শুরু হইয়াছিল। যুদ্ধে আফগানদের পরাজয় হয়। লর্ড লিটন আফগানিস্তানকে বিভক্ত করিয়া কান্দাহারে একটি স্বতন্ত্ররাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন (১৮৮০)। কিন্তু ওদিকে পার্লামেণ্টে উদারনৈতিক দলের (গ্লাডস্টোন) জয়লাভ হওয়ার ফলে পূর্বতন আফগান-নীতি পরিত্যক্ত হইল। ফলে, লিটনকে পদত্যাগ করিতে হয়। তাঁহার পরিবর্তে লর্ড রিপন বড়লাট হইয়া আসিলেন। এই সময় আফগানিস্থানে গৃহবিবাদ শুরু হইয়া যায়। যাহা হউক, রিপন ব্রিটিশের জন্য কিছু সুবিধা আদায় করিয়া লইয়া আফগানিস্তান হইতে ব্রিটিশ সৈন্য সরাইয়া আনিলেন। এই সময় ইংরাজ-আফগান সন্ধির ফলে ব্রিটিশ বালুচিস্তান নামে একটি প্রদেশ গঠিত হইল এবং কোয়েটাতে সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থাও স্বীকৃত হইল। বোলান গিরিপথ ইংরাজদের দখলে আসিল।

(কিছুদিন পূর্বে চীনে আফিম ব্যবসাকে কেন্দ্র করিয়া ইংরাজ ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে চীনের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে ভারতী পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধটির নাম 'চীনে মরণের ব্যবসায়' (ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ ।। পৃঃ ৯৩-১০০)। এই সময় 'The Indo-British Opium Trade' নামে একটি পুস্তক পাঠের ফলে, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য উদ্দেশ্য ও যড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারেন। ডক্টর ক্রীস্টলীব (Theodore Christlieb) নামে একজন জার্মান পাদরী এই পুস্তিকার লেখক। রবীন্দ্রনাথ উহার ইংরাজী

তর্জমা পাঠ করিয়াছিলেন। এই পুস্তক পাঠ করিবার ফলে তাঁহার মনে একটি গভীর প্রতিক্রিয়া হয়,—তাহার ফলেই এই প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিতে তিনি চীনে ইংরাজের কূট অভিসন্ধির তীব্র সমালোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন,

"একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বিষপান করানো হইল। এমনতর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল,—'আমি অহিফেন খাইব না।' ইংরেজ বণিক কহিল 'সে কি হয়?' চীনের হাত দুইটি বাঁধিয়া তার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল, দিয়া কহিল—'যে আহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।' বহুদিন হইল ইংরেজেরা চীনে এই অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছেন।…"

তিনি আরও দেখাইলেন যে, ভারতবর্ষে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা আফিমের চাষ প্রবর্তন করার ফলে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে এ দেশেরও সর্বনাশ হইতেছে। তাই তিনি দেশবাসীকে এই বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই ইংরাজ ব্যবসায়ীরা আফিমের ব্যবসা উপলক্ষে চীনে উপস্থিত হয়। নির্লজ্জের মত তাহারা সেদিন একথাও ঘোষণা করিয়াছিল যে, আফিমের ব্যবসা-সূত্রে বলপ্রয়োগের দ্বারাও ইউরোপের সহিত চীনের যে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, ইহার ফলে অসভ্য চীন আস্তে আস্তে সভ্য হইয়া উঠিবে।

আসল কথা, ইংরাজ ব্যবসায়ীরা সমস্ত দেশটিকে চণ্ডুখোর বানাইয়া ক্লীব ও নির্জীব করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। অপরদিকে, এই ব্যবসা হইতে ইংরাজ ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি ডলার মুনাফা লাভ হইতে থাকে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এক ক্যাণ্টনেই ৪০,০০০ পেটি আফিম আমদানি হয়, যাহার বাজার-মূল্য প্রায় ৩০,০০০,০০০ সিলভার ডলার। ফলে, সমগ্র চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এক দারুণ বিপর্যয় আসিল। জাতির স্বাস্থ্যও অত্যন্ত বিপন্ন হইল। ইহার ফলে চীনের এক শ্রেণীর লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। হাজার হাজার পেটি আফিম রাজার আদেশে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার ফলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে 'অহিফেন যুদ্ধ' (First Opium War) শুরু হয়। যুদ্ধে প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ শক্তির নিকট চীনকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। ফলে চীনের কয়েকটি প্রদেশ ও বন্দর ইংরাজদের অধিকারে আসে। চীন ব্রিটিশের অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত হইল। ইংরাজদের এই ভাগ্যজয়ের ফলে আস্তে আস্তে অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রলুব্ধ হইয়া চীনের দিকে থাবা বাড়াইয়া আগাইয়া আসিল।

এইসব ঘটনা রবীন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন, এবং তাহার

ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে কী গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহাও এই রচনাগুলিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ জাতি ও ইউরোপীয় দেশগুলির এই বর্বর সাম্রাজ্য-লালসা কবির মনে গভীর রেখাপাত করিয়া চলিয়াছে। ফলে, ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাঁহার মনে আস্তে আস্তে একটি দারুণ ঘৃণা ও বীতরাগ জন্মিতে থাকে। ইংলণ্ডে থাকাকালে যে-ইউরোপ তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে, দেশে প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল পরেই সেই ইউরোপ সম্পর্কে তাঁহার তীব্র সংশয়, বিদ্বেষ ও বীতরাগ লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না। তাই 'সভ্যতার সঙ্কটে' ইউরোপের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আবার পরক্ষণই লিখিলেন,

"...এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম—সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত রূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।"

সেই ছেদ—সেই কাল যে এখন হইতেই শুরু হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। 'কালান্তর' প্রবন্ধেও তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি লিখিযাছেন,

"ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনো দিন কোথাও হয় নি।..."

[কালান্তর ।। পৃঃ ১৩]

স্বদেশেও তিনি উঠিতে বসিতে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্মম শোষণনীতি ও জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাইতেছেন। প্রতি মুহূর্তেই দেশবাসীকে এদেশীয় ইংরাজদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে দেখিতেছেন। 'Indian Mirror' নামে একটি এদেশীয় ইংরাজ পত্রিকা 'Englishman'কে উদ্ধৃত করিয়া সদম্ভে লিখিয়াছিলেন. 'Kick them first and then speak to them.' রবীন্দ্রনাথ এই ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। ভারতী (১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ) পত্রিকায় 'জুতা-ব্যবস্থা' নামক প্রবন্ধে তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিয়াছিলেন। দেশবাসীকে ইহা নীরবে সহ্য করিতে দেখিয়া ঐ প্রবন্ধে তিনি তাহাদের তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন নাই। এককথায়, ইউরোপ সম্পর্কে কবির মোহভঙ্গ শুরু হইল এখন হইতেই।)

॥ ইলবার্ট বিল ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত ॥

ইতিমধ্যে দেশে 'ইলবার্ট বিল' লইয়া প্রবল উত্তেজনা শুরু হইয়া গেল। লর্ড রিপন তখন বড়লাট। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবহার সচিব স্যর কুর্টনি ইলবার্ট একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করিলেন। এতদিন পর্যন্ত দেশীয় জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটগণ ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করিতে পারিতেন না; কিন্তু এই খসড়ায় দেশীয় বিচারকদের সেই অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ইউরোপীয়েরা ক্ষিপ্ত হইয়া এই বিলের তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত এই আপস হয় যে, ইউরোপীয়েরা ইচ্ছা করিলে বিচারের সময় ইউরোপীয় জুরীর জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বিল পাশ হইয়া যায়।

এই আন্দোলনের সময় দেশবাসী এদেশীয় ইউরোপীয়দের মানস-রূপটি অত্যন্ত নগ্নভাবে দেখিতে পাইল। দেখিতে পাইল, কী ভয়ঙ্কর তাহাদের স্বাজাত্য অহমিকা-বোধ ও জাতিবিদ্বেষ। তাহাদেরই ব্যবহারশাস্ত্রের (Jurisprudence) মৌলিকতম বিষয় ও আইন-সংস্কারগুলি যখনই এদেশে বিধিবদ্ধ হইতে চলিয়াছে তখনই তাহাদের মিথ্যা ও জঘন্য স্বাজাত্যাভিমানবোধ আহত হইয়াছে; নির্লজ্জের মত এই আইনকে বানচাল করিবার জন্য তাহারা সমস্বরে তর্জন-গর্জন শুরু করিয়াছে। এই 'ইলবার্ট বিল আন্দোলনে'র সময়ই ভারতবর্ষের তদানীন্তন পররাষ্ট্রসচিব সেটন্ কার্ অত্যন্ত লজ্জার সহিত মন্তব্য করেন,

"সামান্য বাঙ্‌লার অধিবাসী চা-কর কিংবা নীলকরের সহকারী থেকে আরম্ভ করে প্রাদেশিক রাজধানীর প্রখ্যাতনামা সংবাদপত্র সম্পাদক, প্রাদেশিক প্রধান রাজকর্মচারী থেকে আরম্ভ করে সিংহাসন অধিরূঢ় রাজপ্রতিনিধি পর্যন্ত উচ্চ-নীচ সকল ইংরেজ মনে মনে এই বিশ্বাস পোষণ করে আসছেন যে, তাঁরা এমন একটা জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন যে-জাতি ভগবৎ-নির্দেশেই অপর জাতিকে বশ্যতাধীনে আনবে ও শাসন করবে। এই আইন পাশ করার ফলে ইংরেজদের সেই সযত্নপোষিত ধারণা বিষম আঘাত লাভ করল।"—টমসন্ ও গ্যারেট

[জওহরলাল নেহরু—ভারত সন্ধানে ॥ পৃঃ ৩৬২]

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, দেশের এতবড়ো একটা উত্তেজনাকর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র

করিয়া দেশবাসী ও ইউরোপীয়দের মধ্যে যে ঘৃণা ও জাতিবিদ্বেষের ভাব তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, সে সম্পর্কে তাঁহার কোনো মন্তব্য বা প্রতিবাদ দেখা যায় না।

কিছুদিন পূর্বে সামান্য একটি ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের কারাগার হইয়া যায়। সে সম্পর্কেও তাঁহাকে কিছু মন্তব্য করিতে দেখা যায় না। রবীন্দ্রজীবনীকার আমাদের বলিতেছেন যে, তখন তিনি কারোয়ারে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট থাকায় কলিকাতার উত্তেজনার বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই,—কলিকাতায় থাকিলে কবির স্পর্শচেতন মন ইহাতে নিশ্চয়ই সাড়া দিত।

কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বা তাহার অনতিকাল পরে সারা দেশময় যে সব রাজনৈতিক উত্তেজনা ও আন্দোলন চলিতেছে তাহাকে রবীন্দ্রনাথ একেবারেই সমর্থন করেন নাই, পরন্তু এইসব রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিকে তিনি তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্রূপ করিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর দেশের রাজনৈতিক ও দেশহিতৈষী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য 'ন্যাশন্যাল ফাণ্ড' নামে একটি 'ফাণ্ড' বা ধনভাণ্ডার স্থাপন করিলেন। ইহার কিছুদিন পর সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ কয়েকজনের উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স' (২৮শে-৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩) আহ্বান করা হয়।

এইসব আন্দোলনের দাবি ও বিষয়বস্তুগুলি একান্তই বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর ছিল, ভারতের বৃহত্তর জনসাধারণের কোনো উল্লেখযোগ্য দাবি-দাওয়ার বিষয় লইয়া আন্দোলন করিবার কথা তখনও তাঁহাদের মনে উদয় হয় নাই। ফলে আন্দোলন কলিকাতা ও শহরাঞ্চলের বিশেষ একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এবং যুবকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইউরোপীয়দের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধালাভ ও জাতীয় অবমাননাকর বিষয়গুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই ছিল ইহাদের মূল লক্ষ্য। সে-যুগের আন্দোলন স্বভাবতই 'অ্যাজিটেশন'মূলক ছিল। সভাসমিতিতে ভাবাবেগপূর্ণ ও উত্তেজনাকর ভাষায় বক্তৃতা করিয়া ইংরাজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চলিত এবং বক্তৃতাগুলি ইংরাজী ভাষায় হইত।

রবীন্দ্রনাথ বা ঠাকুর পরিবারের লোকেরা কেহই এই ধরনের আন্দোলনগুলি ভালো চোখে দেখিতে পারেন নাই। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে এদেশীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ ই উৎকটভাবে ফুটিয়া উঠিত এবং দেশের সর্বসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা বিন্দুমাত্রও থাকিত না বলিয়াই তাঁহাদের এই বিরূপতা। রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তীব্র আক্রমণ করিয়া একটি প্রবন্ধে বলিলেন,

"এখন 'ভ্রাতাগণ', 'ভগ্নিগণ', 'ভারতমাতা' নামক কতকগুলা শব্দ সৃষ্টি

হইয়াছে, তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে ও তারাবাজির মত উত্তরোত্তর আসমানের দিকেই উড়িতেছে, অনেক দূর আকাশে উঠিয়া হঠাৎ আলো নিবিয়া যায় ও ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আমার মতে আকাশে এরূপ তুশো তারাবাজি উড়িলেও বিশেষ কোনো সুবিধা হয় না, আর ঘরের কোণে মিট্‌মিট্ করিয়া একটি মাটির প্রদীপ জ্বলিলেও অনেক কাজে দেখে।"

[চেঁচিয়ে বলা--ভারতী, ১২৮৯ ।। পৃঃ ৫১১-১৬]

তখন 'নেশন', 'ন্যাশন্যাল', 'ন্যাশান্যালিজিম্' প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যাপক ব্যবহারও প্রচলন হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন,

"ন্যাশনল শব্দটার ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। ন্যাশনল থিয়েটর, ন্যাশনল মেলা, ন্যাশনল পেপর ইত্যাদি,···। সম্প্রতি ন্যাশনল ফণ্ড্ আর একটা কথা শুনা যাইতেছে।···একমাত্র political agitation-ই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।"

তিনি বলিলেন, "আমাদের দেশে political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।·· ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই।· ইংরেজদের কাছে ভিক্ষা পাইয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না।···ভিক্ষার ফল অস্থায়ী—আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী।···গবর্মেণ্টকে চেতন করাইতে তাহারা যে পরিশ্রম করিতেছেন, নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম করিলে যে বিস্তর শুভফল হইত।" [ন্যাশনল ফণ্ড—ভারতী, ১২৯০ কার্তিক]

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের political agitation-গুলিকে সমর্থন করিতেছেন না, পরন্তু তীব্র বিরোধিতা করিতেছেন। এইসব প্রবন্ধগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, তিনি সে-যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। কেননা উহার মধ্যে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উৎকট শ্রেণীস্বার্থই প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির স্থলে সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনকেই অগ্রাধিকার দিতে চাহিলেন। রাজনীতির প্রতি সন্দেহ ও বীতরাগ তাঁহার এখন হইতেই পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলিলেন,

"আমাদের সমাজের পদে পদে এতশতপ্রকার কর্তব্য রহিয়াছে যে, কতকগুলো বাঁধিবোল বলিয়া সময় ও উদ্যম নষ্ট করা উচিত হয় না।···এত সামাজিক শত্রু চারিদিকে রহিয়াছে তাহাদের কে নাশ করিবে!···আগে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাহরণ সংগ্রহ কর, ভাবিতে আরম্ভ কর ও বলিতে শেখ, তাহা হইলে আর

সকলে শুনিতে আরম্ভ করিবে।" এইসব সামাজিক সংস্কারের সহিত তিনি শিক্ষা-সংস্কারের উপর জোর দিয়া বলিলেন, "বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।" [ন্যাশনল ফণ্ড—ভারতী, ১২৯০ কার্তিক ।। পৃঃ ২৯৩]

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ জনসংযোগ ও জনচেতনার উপর এখন হইতেই জোর দিতে চাহিয়াছেন। সেই যুগের বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনে জনস্বার্থের প্রতি উদাসীনতা বা জনসংযোগহীনতা তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে। সে-যুগের রাজনীতি, ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিকতার 'ঢঙসর্বস্ব' আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহাদের আবেদন-নিবেদনের সবটাই ছিল উপরওয়ালাদের কাছে অর্থাৎ ইংরাজ সরকারের কাছে, দেশের জনগণের কাছে নহে। তাই তাঁহাদের ভাষার মাধ্যম ছিল ইংরাজী। কিন্তু দেশের জনগণকে সচেতন করিতে হইলে তাহা জনগণের ভাষা হওয়া দরকার—বাংলা ভাষা হওয়া দরকার।

অপরদিকে দেশের জনসাধারণের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যে, জনসাধারণ 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' রহিয়া গিয়াছে। স্বাদেশিক প্রস্তুতিতে রবীন্দ্রনাথ জনশিক্ষাকে সর্বাগ্রাধিকার দিতে চাহিলেন; এবং সে-শিক্ষা বাংলাভাষার মাধ্যমে হওয়া দরকার। "বঙ্গবিদ্যালয়ে ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।"—এই কথা বাংলাদেশে বোধ হয় বিদ্যাসাগরের পরে রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনা গেল। সেই যুগে এই কথা বলার তাৎপর্য যে কী গভীর তাহা নিশ্চয়ই কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না।

সেই যুগের আন্দোলনে ইংরাজ রাজপুরুষদের নিকট হইতে সমর্থন বা 'বাহবা' পাইবার অত্যুগ্র লোভ ছিল। যাহাদের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ এত 'নালিশ' তাহাদের নিকট হইতেই এই স্বীকৃতি পাইবার লালসাকে রবীন্দ্রনাথ মানসিক দৈন্য বলিয়া অভিহিত করিলেন। কিছুদিন আগে টাউন হলে কয়েকজন ইংরাজ রাজপুরুষকে লইয়া একটি জনসভা হয়। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় মর্যাদাবোধ যেন অত্যন্ত স্পর্শচেতন হইয়া পড়ে। তিনি কঠোর বিদ্রূপ ও শ্লেষাত্মক ভাষায় তাহাদের আক্রমণ করিয়া লিখিলেন,

"সেদিন টাউন হলে একটা মস্ত তামাশা হইয়া গিয়াছে। দুইচারিজন ইংরেজে মিলিয়া আশ্বাসের ডুগডুগি বাজাইতেছিলেন ও দেশের কতকগুলি বড়লোক বড় বড় পাগ্‌ড়ি পরিয়া নাচন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।···

"···যাহারা দেশকে অপমান করে দেশের কোনো সুপুত্র তাহাদের সহিত সম্পর্ক

রাখিতে পারে না। একটুখানি সুযোগের প্রত্যাশায় যাহারা দাঁতের সমস্তটা বাহির করিয়া তাহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে যাইতে পারে তাহাদিগকে দেখিলে নিতান্তই ঘৃণাবোধ হয়।"

[টৌনহলের তামাশা—ভারতী, ১২৯০ পৌষ ।। পৃঃ ৪১৮ ২১]

সেকালে ইংরাজ রাজপুরুষদের হাতে এদেশীয় মানুষেরা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কিভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইত, সে-ইতিহাস কাহারও অজানা নাই। তাহারা যে 'রাজার জাত', তাহারা যে আমাদের 'দণ্ডমুণ্ডের হর্তা-কর্তা বিধাতা'—সে-কথাটা উঠিতে-বসিতে, খাইতে-শুইতে তাহাদের বুটের লাথি খাইয়া বুঝিতে হইত। অসহায় দেশবাসী নিরুপায় রুদ্ধ আক্রোশে গুমরিয়া মরিত। জাতির এই অপমানের জ্বালা রবীন্দ্রনাথকেও ভোগ করিতে হইয়াছে। এই সময়কার 'হাতে-কলমে' নামক প্রবন্ধে তিনি ইহার প্রতিরোধের আহ্বান জানাইলেন,

"আজকাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরেজ কর্তৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা-না-একটা শুনিতেই হয়।···

"· যতবার মফঃস্বলে একজন ইংরেজ একজন দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করে, যতবার এই দেশীয়ের পরাভব হয়, যতবার সে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া সেই অত্যাচার ও পরাভব নীরবে সহ্য করিয়া যায়, যতবার সে নিজেকে সর্বতোভাবে অসহায় বলিয়া অনুভব করে, ততবারই যে আমাদের দেশ দাসত্বের গহ্বরে এক-পা করিয়া আরও নাবিতে থাকে। কেবল কতকগুলো মুখের কথায় তুমি তাহাকে আত্মমর্যাদা শিক্ষা দিবে কি করিয়া?···শিক্ষা দিতে চাও এক কাজ কর। একবার একজন ইংরেজের হাত হইতে একজন এদেশীয়কে ত্রাণ কর। একবারও সে বুঝিতে পারুক ইংরেজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে।···ইংরেজের প্রতিদিনকার ব্যবহারগত যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া যখন দেশের লোকেরা আপনাদিগকে কতকটা তাহাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিবে, তখনই আমাদের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হইবে, দাসত্বের থরথর-ভীতি দূর হইবে ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব। সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরেজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভদিন বা কখন আসিবে, যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোককে সাহায্য করিবে। এ যে শিক্ষা, এ যথার্থ শিক্ষা, এ জিহ্বার ব্যায়াম নহে, ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা।" [হাতে-কলমে—ভারতী, ১২৯১ আশ্বিন ।। পৃঃ ২৩৪]

রবীন্দ্রনাথ এমনি একটি উদাহরণ দিলেন। দেশের যাবতীয় সমস্যা ও দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে তিনি দেশকর্মীদের সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন না করিয়া

তাহাদের স্বয়ং প্রতিকারের জন্য আগাইয়া আসিবার আহ্বান জানাইলেন। এইখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার মত যে, রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের (State or Government) ভূমিকাটি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সরকার দেশের সম্পদকে যেভাবে নিঃশেষ করিতেছিল এবং শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দিক হইতে তখন যেসব অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চলিতেছিল, তাহার গুরুত্বকে লঘু করিয়া দেখা ঠিক ছিল না। অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য এ্যাজিটেশন-আন্দোলনের বিরাট তাৎপর্যটি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থায়, রাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনাপর্বে, আন্দোলন ঐ ধরনের 'এ্যাজিটেশন'-মূলক হইতে বাধ্য। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এইসব আন্দোলনের ত্রুটিবিচ্যুতি ও নেতিমূলক যে-সব বিষয়গুলির দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করিয়া জনসংযোগ ও শিক্ষা-সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের ডাক দিলেন, ঐতিহাসিক দিক হইতে উহার তাৎপর্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবু প্রায় এই সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির প্রতি বীতরাগ লক্ষ্য করা গেল।

কংগ্রেস

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসরই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। সারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলেই জানেন যে, অ্যালন অক্টোভিয়ান হিউম্ নামক জনৈক ইংরাজ সিবিলিয়ান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রকৃত জনক। মিঃ হিউমের এই সংগঠন গড়িয়া তুলিবার পশ্চাতে যে বিশেষ গূঢ় উদ্দেশ্যটি ছিল, সেই সম্পর্কে শ্রীসীতারামীয়া তাঁহার 'The History of the Indian National Congress' গ্রন্থে লিখিতেছেন,

"...Mr. Hume had unimpeachable evidence that the political discontent was going underground....Not that an organised mutiny was ahead but that the people pervaded with a sense of hopelessness, wanted to do something, by which was merely meant 'a sudden violent outbreak of sporadic crime, murders of obnoxious persons, robbery of bankers and looting of bazzars, acts really of lawlessness which by a due coalescense of forces might any day develop into a National Revolt.' Such were the agrarian riots of the Deccan in Bombay. Hume thereupon resolved to open a safety valve for this unrest and the Congress was such an outlet."

[The History of the Indian National Congress. p. 8]

বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কিংবা রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল না। সেযুগের কংগ্রেস ছিল, সেকালের সরকারী কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবীদের একটি আধারাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সারা ভারতের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং বুদ্ধিজীবীদের একটি নিখিল ভারত সংগঠনের মধ্যে সংহত ও সংঘবদ্ধ করাই ছিল ইহার অতি প্রাথমিক লক্ষ্য।

ব্রিটিশের উপর কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের ছিল অসীম আস্থা। ইংরাজী শিক্ষা ও

শাসন-সংস্কারগুলির জন্য ইংরাজের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় ইহাদের মাথা নত হইয়া আসিত। তখন কংগ্রেস ইংরাজ-শাসনের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া উহারই পক্ষপুটের আড়ালে আশ্রয় লইয়া নিজেদের পরিপুষ্ট ও সাবালক করিয়া তুলিবার কথা সগর্বে ও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম বোম্বাই অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপসংহারে বলিলেন,

"Much had been done by Great Britain for the benifit of India, and the whole country was truly grateful to her for it. She had given them order, she had given them railways, and, above all, she had given them the inestimable blessing of Western education. But a great deal still remained to be done. The more progress the people made in education and material prosperity, the greater would be the insight into political matters and the keener their desire for political advancement. He thought that their desire to be governed according to the ideas of government prevalent in Europe was in no way incompatible with their thorough loyalty to the British Government. All that they desired was, that the basis of the Government should be widened and that the people should have their proper and legitimate share in it. The discussion that would take place in this Congress would, he believed, be as advantageous to the ruling authorities as, he was sure, it would be to the people at large."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. pp. 3-4]

কংগ্রেসের দ্বিতীয়-অধিবেশন হয় কলিকাতায় (১৮৮৬)। কলিকাতা-অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন দাদাভাই নৌরজী। প্রায় চারিশতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। সভাপতির অভিভাষণে ব্রিটিশ-প্রশস্তি গাহিয়া নৌরজী বলিলেন,

'It is our good fortune that we are under a rule which makes it possible for us to meet in this manner. (*Cheers*). ...Such a thing is possible under British rule and British rule only (*Loud cheers.*) Then I put the question plainly : Is this Congress a nursery for sedition and rebellion against the British Government (*Cries of No, no !*) or,

is it another stone in the foundation of the stability of that Government? (*Cries of Yes, Ces*)...

"...Let us speak out like men and proclaim that we are loyal to the backbone (*Cheers*); that we understand these benefits English rule has conferred upon us; that we thoroughly appreciate the education that has given to us, the new light, which has been poured upon us, turning us from darkness into light and teaching us the new lesson that kings are made for the people, not people for their kings; and this new lesson we have learned amidst the darkness of Asiatic despotism only by the light of free English civilisation. (*Loud cheers*)..." [Ibid. pp. 6-8.]

ভারতবর্ষে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যে সব থেকে অনুগত ও বিশ্বস্ত রাজভক্ত প্রজা,—কবে কখন 'সেক্রেটারী অব স্টেট' এবং অন্যান্য রাজপুরুষেরা এই মর্মে মন্তব্য ও সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া তিনি বিনীত কণ্ঠে ইংরাজের কাছে আবেদন জানাইলেন,

"We can, therefore, proceed with the utmost serenity and with every confidence that our rulers do understand us; that they do understand our motives and give credit to our expressions of loyalty, and we need not in the least care for any impeachment of disloyalty or any charge of harbouring wild ideas of subverting the British power that may be put forth by ignorant irresponsible or ill-disposed individuals or cliques. (*Loud cheers*)..." [Ibid. p. 9]

ইহা হইতেই সে-যুগের কংগ্রেস নেতৃবর্গের ও কংগ্রেস সেবীদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাধারার প্রকৃতিটি স্পষ্ট হইয়া পড়ে। ইহার পূর্বে সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ও অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহগুলিকে কি কারণে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সমর্থন করিতে পারেন নাই, তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাহার প্রধান কারণ, আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কোনো দৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ ছিল না। ভারতের জাতীয় শিল্প তখনও ভালোভাবে গড়িয়া উঠে নাই এবং সদ্যপ্রসূত শিল্পপতিশ্রেণীর সহিত তখনও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সংযোগ স্থাপিত হয় নাই। রুজি-রোজগার ও কর্মসংস্থানের দিক হইতে ইহারা ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইংরাজ সরকারের উপর নির্ভরশীল। দেশীয় সিবিলিয়ান, উচ্চ রাজকর্মচারী, উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার ও কিছু অভিজাতশ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ই

ছিলেন এই আন্দোলনের প্রাণ-স্বরূপ। ইংরাজ-পূর্বকালের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার তুলনায় এইসব বুদ্ধিজীবীরা অধিকতর সুবিধা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুভব করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা-সম্পদের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্য ও ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনও তাঁহাদের এতখানি অভিভূত করিয়াছিল যে, এদেশে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-নীতির প্রকৃত রূপটি তাঁহাদের কাছে ধরা পড়ে নাই বা তাহার গুরুত্ব লঘু হইয়া পড়িয়াছে। দাদাভাই নৌরজী বলিলেন, তাঁহারা 'হাড়ে-মজ্জায়' ব্রিটিশ-ভক্ত। কথাটা মিথ্যা নহে।

এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণরূপটি যে তাঁহারা একেবারেই দেখিতে পান নাই এমন নহে। তাঁহাদের ধারণা—ইংরাজের, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের, বিবেক ও হৃদয় আছে। ঠিকমত তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের কথাগুলি আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে বলিতে পারিলে তাহার সুবিচার হইবে।

পার্লামেণ্টের সনদ (১৮৩৩), মহারানীর ঘোষণাপত্র (১৮৫৮), হাইকোর্ট স্থাপন ও কাউন্সিল এ্যাক্ট (১৮৬১), লিটনের আমলে 'স্ট্যাটুটারী সিভিল সার্ভিস' (১৮৭৯), রিপনের আমলে 'লোকাল গবর্নমেণ্ট এ্যাক্ট' ও 'ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট', 'হাণ্টার কমিশন', 'ইলবার্ট বিল' এবং সর্বশেষে লর্ড ডাফরিনের আমলে 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন'—বস্তুত এইসব সংস্কারগুলির ফলে তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে বুঝিবা আস্তে আস্তে দেশবাসীর দাবিগুলি ইংরাজ মানিয়া লইবে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা তখন তাঁহারা ধারণার মধ্যেও আনিতে পারেন নাই। এমনকি জাতীয়-শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দাবি-দাওয়াও কংগ্রেসের প্রথম যুগে বহুদিন পর্যন্ত শোনা যায় নাই। সে যুগের কংগ্রেসের দাবি-দাওয়ার মধ্যে তৎকালীন নেতৃত্বের শ্রেণী-চরিত্রের রূপটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যথা—একটি 'রয়েল-কমিশন' নিযুক্ত করিবার দাবি, সদ্য-নিযুক্ত 'পাবলিক সার্ভিস কমিশনে' গবর্নমেণ্টের পূর্বাপর ঘোষণানুযায়ী অধিকতর স্বদেশীয় ব্যক্তি নিযুক্ত করিবার এবং ইংরাজ সিবিলিয়ানদের ন্যায় তাহাদের সম-অধিকার দানের দাবি, ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) অধিক সম্প্রসারণ ও সংস্কার এবং নির্বাচনমূলক প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যবস্থার দাবি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আদর্শ (Ideology), তত্ত্ব ও রাজনীতির বালাই তাঁহাদের ছিল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেণ্টের সনদ ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের 'মহারানীর ঘোষণাপত্র'ই ছিল

তাঁহাদের সকল উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস। এইসব ঘোষণাপত্রের কথা বলিতে গিয়া নেতৃবর্গ সে-যুগে কিরকম ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া পড়িতেন, কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

তখন 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' বসিয়াছে। কংগ্রেসমঞ্চ হইতে লর্ড ডাফরিন ও কমিশনকে লক্ষ্য করিয়া নৌরজী বলিলেন (১৮৮৬),

"As another proof of the intentions of our British rulers, as far back as 53 years ago, when the natives of India did not themselves fully understand their rights, the statesmen of England, of their own free will, decided what the policy of England ought to be towards India. Long and important was the debate ; the question was discussed from all points of view ; the danger of giving political power to the people, the insufficiency of their capacity and other considerations were all fully weighed, and the conclusion was come to, in unmistakable and unambiguous terms, that the policy of British rule should be a policy of justice (*Cheers*), the policy of advancement of one-sixth of the human race (*Cheers*) ; India was to be regarded as a trust placed by God in their hands, and in the due discharge of that trust, they resolved that they would follow the 'plain path of duty' as Mr. Macaulay called it ; ..This was the essence of the policy of 1833 and in the act of that year it was laid down :

'That no native of the said territories, nor any natural-born subject of His Majesty resident therein shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour or any of them, be disabled from holding any place, office or employment under the said company. (*Prolonged cheering*).

"We do not, we could not, ask for more than this ; and all we have to press upon the Commission and Government is, that they should now honestly grant us in practice here what Great Britain freely conceded to us 50 years ago, when we ourselves were too little enlightened even to ask for it." (*Loud cheers*)

'মহারানীর ঘোষণার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি বলিলেন, "...the English nation came forward, animated by the same high and noble resolves, as before, and gave us that glorious

Proclamation which we should for ever prize and reverence as our Magna Charta, greater even than the Charter of 1833. ...but it constitutes such a grand and glorious charter of our liberties that I think every child, as it begins to gather intelligence and to lisp its mother-tongue, ought to be made to commit it to memory. (*Cheers*)"

[Ibid—pp. 15-16]

এমনি একটি সুবিধাবাদ ও তোষণনীতির মধ্যে কংগ্রেসের জন্ম হয়। এই দাসসুলভ তোষণনীতির জন্য ইঁহাদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। কেননা শ্রেণী হিসাবে বুদ্ধিজীবীরা তখন ইংরাজ সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

তবুও কংগ্রেসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে একেবারেই লঘু করিয়া দেখা ঠিক হইবে না। দেশের শাসনকার্য দেশের যোগ্য লোকদের দ্বারা চালিত হইবে—এই দাবি অত্যন্ত সীমাবদ্ধক্ষেত্রে হইলেও কংগ্রেস সারা ভারতবর্ষের জাতীয় দাবি হিসাবে উপস্থিত করিয়াছে। সারা ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দাবিতে সর্বভারতীয় বা নিখিল ভারত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের অভ্যুদয় একটি অতীব ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, শুরু হইতেই মুসলমানগণ কংগ্রেস হইতে দূরে দূরে থাকিলেন। তৎকালীন মুসলমান সমাজের অন্যতম নেতা স্যর সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের বিরোধী ছিলেন। তবুও একশ্রেণীর মুসলমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কংগ্রেসে যোগদান করিলেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মাত্র ২ জন, দ্বিতীয় অধিবেশনে ৩৩ জন এবং ষষ্ঠ অধিবেশনে ১৫৬ জন মুসলমান প্রতিনিধি (মোট ৭০২ জন প্রতিনিধির মধ্যে) যোগদান করিয়াছিলেন।

।। কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথ ।।

ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসের এই আবির্ভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ কিছু প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, তবে সে সম্পর্কে তিনি কোথাও কোন মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। এই অধিবেশনেই কংগ্রেসমণ্ডপে তিনি 'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি গাহিয়াছিলেন। তবে স্পষ্টই বুঝা যায়, কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন এবং নির্লজ্জ ইংরাজস্তুতি তাঁহার আদৌ ভালো লাগে নাই। অল্প কিছুকাল আগে বাংলাদেশে 'ইলবার্ট বিল আন্দোলন'-যুগের রাজনীতির সহিত কংগ্রেস-রাজনীতির বিশেষ কোনো পার্থক্য তিনি লক্ষ্য করিলেন না। স্বভাবতই কংগ্রেসের এই নব আন্দোলনের উন্মাদনাকে তিনি একটু সন্দেহের চোখে দেখিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়।

অপরদিকে, কংগ্রেস-আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলাদেশে নূতন এক ধর্ম-আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে থাকে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই ধর্ম-আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বে ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলন-গুলিকে যে খুব ভালো চোখে দেখিতে পারেন নাই—একথা প্রায় সকলেরই জানা আছে। বঙ্কিম-সাহিত্যে দেশ জাতীয়তাবাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তবুও ধর্ম জিজ্ঞাসা ও সামাজিক প্রশ্নে তিনি সনাতনী হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার পক্ষে ছিলেন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য-দর্শনের সহিত গীতার সমন্বয় করিয়া হিন্দুধর্মের এক নব-ভাষ্য রচনা করিতে শুরু করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ লইয়া লেখনীর মাধ্যমে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কী কারণে বুঝা যায় না, এই সময় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'ব্রাহ্মধর্মবাদ' যেন প্রবল হইয়া উঠে। বোধ হয়, সম্পাদকপদে বৃত হইয়া উহার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে তিনি অতি-সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময় ভারতী পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্মকে 'পৃথিবীর ধর্ম' বলিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি

এমন কথাও বলিলেন, "ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীর ধর্ম বটে, পৃথিবীকে আমরা এ ধর্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারি না, চাহিও না। ব্রাহ্মধর্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষের নিকট ঋণী।" [রাজা রামমোহন রায়—ভারতী, ১২৯১ মাঘ ।। পৃঃ ৪৫৮-৭০]

ইহা হইতেই বুঝা যায়, তাঁহার মধ্যে সেদিন একটি উগ্র ধর্ম-অহমিকাবোধ দেখা দিয়াছিল। অবশ্য বৈদিক সংস্কৃতির নামে তিনি কখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার মহত্তম অবদানগুলির অবমাননা সহ্য করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ থাকিতে পারে,—এই সময় শশধর তর্কচূড়ামণির প্রভাবে পড়িয়া চন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ একদল হিন্দুধর্মের 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা করিয়া যখন 'আর্যামি'র কোলাহল তুলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন কী তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভাষায় তাঁহাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক মাত্রই জানেন, এই সময় 'দামু ও চামু' (১২৯২), 'আর্য ও অনার্য' (১২৯১) প্রভৃতি ব্যঙ্গ-রচনাগুলি কী প্রসঙ্গে ও কাহাদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। হিন্দুসমাজের বাল্যবিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কারগুলি লইয়াও উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুসংস্কারপন্থীদের সহিত তাঁহার মসীযুদ্ধ শুরু হয়। 'হিন্দুবিবাহ' নামক একটি প্রবন্ধে (ভারতী, ১২৯৪ আশ্বিন ।। পৃঃ ৩১৪-৪৮), তিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে প্রগতিশীল কথা বলিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন 'মানসী' কাব্যরচনায় ব্যস্ত। এই সময়ে বেশ কিছুদিন তাঁহাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাব্য ও শিল্পসৃষ্টিতে নিমগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বয়সটি রোমান্সের। তাই মানসী রচনার রোমান্টিক পরিবেশের সন্ধানে কখনো দার্জিলিঙে, কখনো বা গাজিপুরে গোলাপ বাগিচার সন্ধানে বাহির হন। মানসী রচনা শেষ করিয়া পর পর কবি 'মায়ার খেলা', 'রাজারানী', 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটক ও গীতি-নাট্যগুলি রচনা করেন।

কিন্তু দীর্ঘদিন এই একটানা কাব্যচর্চা ও শিল্পসাধনা,—জাগতিক সমস্ত সমস্যা হইতে এই পলায়নপরতার ফলে মাঝে মাঝে মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও আত্মসমালোচনার ভাবও জাগে। তারই ফলে 'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি' প্রভৃতি কবিতাগুলি বাহির হইয়া আসে। মাঝে মাঝে 'মস্ত আশা সর্পসম ফোঁসে।' ইচ্ছা হয়—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' অথবা

"বিপদমাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে সূর্যালোতে, সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে মত্ত হাসি টুটে।..." [দুরন্ত আশা]

এই নিরুপদ্রব জীবনে মাঝে মাঝে কবি বিবেকের তীব্র কষাঘাত অনুভব করেন। তাহারই অভিঘাতে লিখেন 'মন্ত্রী-অভিষেক'। কলিকাতায় 'এমারেল্ড থিয়েটারে' এই বক্তৃতা পাঠ করেন (১৮৯০, মে ১৫)। কী রাজনৈতিক পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং-এর আমলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা (Indian Council) গঠিত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা আদৌ প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না, সমস্ত সদস্যই ইংরাজ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন। প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি ও কথঞ্চিৎ প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের মৃদু গুঞ্জন তুলিতে থাকেন। উচ্চ রাজকার্যে অধিকতর স্বদেশী নিয়োগ ও ইংরাজ সিভিলিয়ানদের ন্যায় সম-অধিকারের দাবিও কংগ্রেসমঞ্চ হইতে শুনা গেল। এই বিষয়ে তদন্তের জন্য 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' বসিল (১৮৮৬)।

সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতেই ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ও এদেশীয় ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসনের পক্ষে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী অধিক আগ্রহশীল এবং আপাতত তাহাদের নিকট হইতে বিপদের আশঙ্কা নাই। সেই কারণে, কংগ্রেস তাহার সূচনাপর্বে বহু ইংরাজ রাজপুরুষ ও পার্লামেণ্টের উদারনৈতিক দলের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসনের সুদূরপ্রসারী স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া ইংরাজ এইসব বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দাবি-দাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন এবং কিছু কিছু শাসন-সংস্কারও করিতে চাহিয়াছিলেন। এ-ব্যাপারে পার্লামেণ্টের উদারনৈতিক দলের আগ্রহ ছিল বেশী।

কিন্তু ১৮৮৬ সালে আয়র্লণ্ডে হোমরুলের প্রশ্নে গ্লাডস্টোনকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়, এবং রক্ষণশীল দলের জয় হয়। লর্ড সলস্‌বেরি তখন প্রধানমন্ত্রী, ভারত-সচিব হইলেন লর্ড ক্রস্। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (এইচিশন্ কমিশন) তদন্ত-রিপোর্ট বাহির হইল এবং কিছুদিন পরে উহার উপর ভারত সরকারের মন্তব্যলিপিও প্রকাশিত হইল। ঐ বৎসরই চার্লস ব্রাডলাফ (Charles Bradlaugh) দীর্ঘ ১১ মাস তদন্তের পর ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন প্রথার অনুকূলে 'হাউস অব কমন্সে' তাঁহার 'Indian Councils Reform Bill' আনয়ন করিলেন। ফলে সেখানে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হইল। W. Hunter এবং Sir R. Garth-এর মত কিছু প্রতিক্রিয়াশীল সদস্য হিন্দু-মুসলমানের কাল্পনিক বিরোধের জিগিরও তুলিলেন।

এই গোলমালের মধ্যে ভারত-সচিব লর্ড ক্রস্ 'হাউস অব লর্ডসে' তাঁহার

'Indian Councils Bill' উপস্থাপিত করিলেন। এই বিলে বর্ধিত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের বাজেটে অংশ গ্রহণ ও প্রশ্নোত্তরের অধিকার থাকিলেও নির্বাচিত সদস্য প্রেরণের অধিকারটি নানা অজুহাতে অত্যন্ত চতুরতার সহিত বাদ দেওয়া হইয়াছিল। প্রাচ্যদেশীয় ঐতিহ্যে নির্বাচন-ব্যবস্থা কোনোকালেই ছিল না, সুতরাং ভারতীয় পরিপাকযন্ত্রে নির্বাচন-ব্যবস্থা আদৌ পরিপাক হইবে না, ইহাই হইল প্রধান মন্ত্রী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রধান অজুহাত। এই বিল হাউস অব কমন্সে আসিবামাত্রই উদারনৈতিক দলের পক্ষ হইতে ব্রাডলাফ (Bradlaugh) তীব্র আক্রমণ করিলেন এবং পাল্টা একটি নূতন বিল আনিলেন।

ভারতবর্ষেও কংগ্রেসমঞ্চ হইতে প্রতিনিধিমূলক নির্বাচনের পক্ষে এই বিলের তীব্র সমালোচনা চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রী-অভিষেক প্রবন্ধে নির্বাচনের পক্ষ লইয়া লিখিলেন,

"নির্বাচন করিবে কে? গবর্মেণ্ট করিবেন, না আমরা করিব?··· গবর্মেণ্টের দ্বারা মন্ত্রী নিয়োগ অপেক্ষা সাধারণ লোকের দ্বারা মন্ত্রী-অভিষেক অনেক কারণে আমাদের নিকট প্রার্থনীয় মনে হয়।···মীমাংসা করিবার পূর্বে সহজ বুদ্ধিতে এই প্রশ্ন উদয় হয়, কাহার সুবিধার জন্য এই নির্বাচনের আবশ্যক হইয়াছে? আমাদেরই জন্য।···অতএব সকলেই বলিবেন ভারত শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষেরই উন্নতি। আমাদেরই সুবিধা আমাদেরই কাজ। সেই আমাদের কাজের জন্য আমাদের লোকের সাহায্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। সহজেই মনে হয় আমরা বাছিয়া দিলে কাজটাও ভালো হইবে, আমাদের মনেরও সন্তোষ হইবে।"

প্রধানমন্ত্রী লর্ড সল্‌স্‌বেরি (Lord Salisbury) নির্বাচনপ্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি তুলিয়া বলিলেন, "···the principle of election or government by representation was not an eastern idea, and that it did not fit eastern traditions or eastern minds." এই দেশীয় ইংরাজী সংবাদপত্রগুলি সলস্‌বেরির যুক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে লাগিলেন যে 'ভারতবর্ষীয়েরা প্রাচ্যজাতীয়, অতএব তাহাদের হস্তে মন্ত্রি-অভিষেকের ভার দিলে তাহারা নিজেরাই অসন্তুষ্ট হইবে।' রবীন্দ্রনাথ ইহাদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া বলিলেন,

"পূর্ব ও পশ্চিম যদিও বিপরীত দিক তথাপি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানব প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিরোধী ধর্মাবলম্বী নহে।··আমাদের মানব-প্রকৃতির এতদূর পর্যন্ত বিকার হয় নাই যে, তোমরা যখন মহৎ অধিকার আমাদের হস্তে তুলিয়া দিবে তখন আমরা অসন্তুষ্ট হইব!

"আর কিছু না হউক তোমাদের নিকটে আমাদের বেদনা, আমাদের অভাব জানাইবার অধিকার আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলে অধিকতর সুখ-সম্ভোগের কারণ হইবে এটুকু আমরা পূর্বদিকে বাস করিয়াও একরকম বুঝিতে পারি। অপেক্ষাকৃত পশ্চিমবাসী যোদ্ধজাতীয়দের মানসিক প্রকৃতি যে এবিষয়ে আমাদের হইতে কিছুমাত্র পৃথক্ তাহাও মনে করিতে পারি না। অতএব দুঃখনিবেদনের স্বাধীন অধিকার পাইলে ভারতবর্ষ যে অসন্তুষ্ট হইবে, ইংলণ্ডবাসী ভারত-হিতৈষীগণকে এরূপ গুরুতর দুশ্চিন্তা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিতে পারি।"

ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসন-সংস্কারগুলির উপর সেদিন রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছুটা মোহ দেখা যায়। এই ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের হীন ও জঘন্য অভিসন্ধি ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার মানস-পট হইতে অপসারিত হইয়াছিল। মহত্তর বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজ-চরিত্রই তাঁহার মানসপটে ভাসিতেছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজের শাসন-সংস্কারগুলির পিছনে তিনি সেই বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজকেই দেখিতেছিলেন। তাহাদেরই উদ্দেশে তিনি বলিলেন, 'তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নাহিলে নীরব থাকিতাম।' সেদিনের কংগ্রেস-আন্দোলনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সমর্থনের কথাও তিনি ঘোষণা করিলেন, 'কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না···।'

বহুদিন পর ইহার কৈফিয়ত হিসাবে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,

"যখন 'মন্ত্রী-অভিষেক' লিখেছিলুম, তারপর এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে, তাই এ লেখাটি এখনকার মনের মাপে মিলবে না। দুই কালের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুবা, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচালুম পায়ের শিকল আরো ইঞ্চি কয়েক লম্বা করে দেবার জন্য।···তখন সেই ইঞ্চি দুয়েকের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখ রাঙানির জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ ছিল আমার ওকালতি সেকালের পরিমিত ভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে।" [শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ মাঘ ।। পৃঃ ৪৭৫]

মনে হয়, কোন ব্যক্তিত্বশালী কংগ্রেস নেতার প্রভাব ও অনুরোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ১৮৯০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে সভাপতি ফিরোজ শাহ মেহতা, রবীন্দ্রনাথ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির যুক্ত ফটো আছে।

পার্লামেন্টারী শাসন-সংস্কারের প্রতি তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবর্গের অত্যধিক মোহের অপর একটি কারণ হইতেছে, পার্লামেন্টে গ্লাডস্টোন প্রমুখ উদার মতাবলম্বীদের (আপেক্ষিকভাবে) নমনীয় ঔপনিবেশিকবাদ। চার্লস ব্রাডলাফ (Bradlaugh) হাউস অব কমন্সে লর্ড ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া পাল্টা যে নূতন বিল পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে (সীমাবদ্ধভাবেও) নির্বাচনের পক্ষে কথা বলা হইয়াছিল এবং গ্লাডস্টোনের তাহাতে পূর্ণ সম্মতি ছিল। ইহার ফলে তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল, ইংলণ্ডে যথার্থই এক ধরনের বিবেকী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষের যথার্থ কল্যাণ কামনা করেন।

সে-যুগের কংগ্রেস নেতৃবর্গের পার্লামেন্টের উদার মতাবলম্বীদের উপর কী অসীম শ্রদ্ধা ও আস্থার ভাব ছিল, তাহা নিম্নের একটি দৃষ্টান্ত হইতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ১৮৯০ সালে কলিকাতা-কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে ফিরোজ্ শাহ্ মেহ্তা এক জায়গায় বলিলেন,

"...Mr. Bradlaugh has hit upon the notable expedient of ploughing with Lord Cross's heifer. He has already introduced a new Bill, based on the same lines as Lord Cross's Bill, but vivifying it by the affirmation of the principle for which we are fighting. That Bill will be laid before you for your consideration..........."

"The new Bill has on the other hand, all the elements of success in its favour. Its most striking merit is that it gathers round it the cautious, the carefully weighed and responsible opinions of some of the best Viceroys we have ever had....

"...You are aware that Mr. Bradlaugh has recently declared that he was authorised to say that the course persued by him in reference to the Government Bill, in endeavouring to obtain a recognition of the elective principle, was approved by Mr. Gladstone who intended to have supported him by speech...."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. pp. 70-73.]

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

।। দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা ।।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগস্ট রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন।

পথিমধ্যে কবি জাহাজে সমুদ্র-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। জলপথে বিচিত্র নৈসর্গিক চিত্র, বিভিন্ন দেশের নরনারীর বিচিত্র মনোভাব ইত্যাদির বিবরণ 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'তে আমরা পাই। ইহার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা তিনি ঐ পুস্তকে লিখিয়াছেন। একজন উচ্চ রাজকর্মচারী ভারতীয়দের প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের দাবির বিরূপ সমালোচনা করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,

"তোমরা সর্বদা আমাদের প্রতি প্রকাশ্য ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা দেখাইয়া থাক, সেইটি আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে অসহ্য। অন্তরের মধ্যে সেই অপমান অনুভব করি বলেই আমরা জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য আজ এত চেষ্টা করচি।···আমাদের দেশের বর্তমান প্রধান দুর্দশা হচ্চে এই যে, যারা আমাদের আন্তরিক ঘৃণা করে তারাই আমাদের বলপূর্বক উপকার করতে আসে। যারা আমাদের মানুষ জ্ঞান করে না, তারাই আমাদের শান্তিরক্ষা করে, লেখাপড়া শেখায় সুবিচার করবার চেষ্টা করে। প্রতিদিন এরকম অবজ্ঞার দান গ্রহণ করতে বাধ্য হলে আমাদের আত্মসম্মান আর থাকে না।" [য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ।। পৃঃ ৩৫]

ইহা হইতেই বোঝা যায়, কবির জাতীয় মর্যাদাবোধ কী সুতীব্র ছিল।

ইতালী ও ফ্রান্স ঘুরিয়া তাঁহারা ইংলণ্ডে আসিয়া পৌছাইলেন (১০ই সেপ্টেম্বর)। কিন্তু এই ইংলণ্ড তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিল না। এইবারে ইংলণ্ডে থাকিতে প্রায়ই স্যাভয় থিয়েটার ও লাইসীয়ম নাট্যশালায় যাইতেন, ন্যাশন্যাল গ্যালারীর চিত্র-সংকলনগুলিও তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, কিন্তু তবু ইংলণ্ড এইবার তাঁহাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিতে পারিল না। কবির মানসিক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য ইংলণ্ড আসিবার পথেই লক্ষ্য করা গিয়াছিল। কিন্তু এখানে আসিয়া অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন এবং ৯ই অক্টোবর দেশের পথে যাত্রা করিয়া ৩রা নভেম্বর বোম্বাই পৌছিলেন।

ইংলণ্ড যাত্রাকালে কবির বয়স ২৯ বৎসর ছিল। একেবারে কাঁচা বয়স বলা চলে না। অথচ তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিতে তেমন গভীরত্ব দেখা যায় না। *'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার গভীর রসপিপাসু মনটির* পরিচয় পাই বটে, কিন্তু জীবন ও জগতের গভীর বাস্তব সমস্যাগুলি তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ইংলণ্ড ইউরোপ তথা পৃথিবীর চিন্তা-জগতে এক দারুণ বিপ্লব আনিয়াছে। তখন ডারউইনের 'Descent of Man' ও ক্রপট্‌কিনের 'Mutual Aid' তত্ত্ব লইয়া উত্তেজনাপূর্ণ সমালোচনা চলিতেছে। ১৮৮৭ সালেই কার্ল মার্কসের 'Das Kapital' ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবৎসরই স্যামুয়েল মুর কর্তৃক 'Communist Manifesto'-র ইংরাজী তর্জমা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ সালে এঙ্গেলসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হয়। অপরদিকে সিড্‌নি ওয়েব্‌ ও বার্নার্ড শ এই সময় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার করিতেছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বার্নার্ড শ-র 'Fabian Essays' প্রকাশিত হয়। ইহার কিছুই তাঁহাকে স্পর্শও করিল না। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, এই ইংলণ্ডকে তিনি কেন দেখিতে পাইলেন না। উনিশ শতকের শেষভাগে যে সব মহামনীষী ইংলণ্ডে বসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সাধন-সম্পদে জগতের যে জ্ঞান-ভণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার সিংহদরজা রবীন্দ্রনাথের নিকট উন্মুক্ত হইল না।

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সভ্যতার গভীর মর্মকেন্দ্রে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি দূর হইতেই সমস্যাগুলিকে যেন স্পর্শ করিয়াই চলিয়া আসিলেন।

তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কবি-প্রকৃতি। মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও জগতের সমস্যাবলী অহোরাত্র তীব্র মর্মপীড়ায় তখনও তাঁহাকে অশান্ত ও অস্থির করিয়া তুলে নাই। মানসীর কবির অভিষ্ট 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম' হইতে পারে না—মানসী কাব্যে যে অশান্তি, হতাশা ও গভীর নৈরাশ্যবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার পিছনে রহিয়াছে যৌবনের ও মানবের শাশ্বত প্রেমের গভীর বেদনাবোধ। আধুনিক যন্ত্রযুগের বাস্তব জীবনের কর্মচাঞ্চল্য তাঁহার কাছে রূঢ় ও কর্কশ বোধ হইয়াছে। ফলে ইউরোপকে তাঁহার ভালো লাগিল না, দেশে প্রিয়জনের সান্নিধ্য ও বাংলার গ্রাম-প্রকৃতির মধ্যে ফিরিবার বাসনা অদম্য হইয়া উঠিল।

কবি 'জীবনস্মৃতির খসড়া'য় তাঁহার এই সময়কার মানস-প্রকৃতির একটি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। কবির পরবর্তী চিন্তাধারায় ও কার্যকলাপে সেই মানস-প্রকৃতির গভীর প্রভাব রহিয়াছে। তাই উহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"…যে-বিলাত যাইতেছিলাম সেখানকার জীবনের উদ্দীপনাকে কোনোমতেই আমার হৃদয় গ্রহণ করিতে পারে নাই। আমি আর-একবার বিলাতে যাইবার সময় লিখিয়াছিলাম—

'নিচেকার ডেকে বিদ্যুতের প্রখর আলোক, আমোদ-প্রমোদের উচ্ছ্বাস, মেলামেশার ধুম, গান-বাজনা এবং কখনো কখনো ঘূর্ণীনৃত্যের উৎকট উন্মত্ততা। এদিকে আকাশের পূর্বপ্রান্তে ধীরে ধীরে চন্দ্র উঠছে; তারাগুলি ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে, সমুদ্র প্রশান্ত ও বাতাস মৃদু হয়ে এসেছে: অপার সমুদ্রতল থেকে অসীম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা, এক অনির্বচনীয় শান্তি নীরব উপাসনার মতো ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আমার মনে হতে লাগল, যথার্থ সুখ কাকে বলে এরা ঠিক জানে না। সুখকে চাবকে চাবকে যতক্ষণ মত্ততার সীমায় না নিয়ে যেতে পারে ততক্ষণ এদের যথেষ্ট হয় না। প্রচণ্ড জীবন ওদের যেন অভিশাপের মতো নিশিদিন তাড়া করছে; ওরা একটা মস্ত লোহার রেলগাড়ির মতো চোখ রাঙিয়ে, পৃথিবী কাঁপিয়ে, হাঁপিয়ে, ধুঁইয়ে, জ্বলে, ছুটে, প্রকৃতির দুই ধারের সৌন্দর্যের মাঝখান দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে চলে যায়। কর্ম বলে একটা জিনিস আছে বটে কিন্তু তারই কাছে আমাদের মানবজীবনের সমস্ত স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার জন্যেই আমরা জন্মগ্রহণ করি নি—সৌন্দর্য আছে, অন্তঃকরণ আছে, সে দুটো খুব উঁচু জিনিস।

"আমি বৈলাতিক কর্মশীলতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেছি না। আমি নিজের কথা বলিতেছি। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার অন্নের মতোই আবশ্যক ছিল।…"

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার অল্পকালমধ্যেই কয়েকটি চিঠির উল্লেখ করিয়া ঐ খসড়ার এক জায়গায় কবি বলিতেছেন,

"…আশ্চর্য এই, আমার সবচেয়ে ভয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা, সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্‌ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই, এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারি দোষের মনে করে। হয়তো একটা কারখানায় নয়তো ব্যাঙ্কে নয়তো পার্লামেণ্টে সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে। শহরের রাস্তা যেমন ব্যবসাবাণিজ্য গাড়িঘোড়া চলবার জন্যে ইঁট-বাঁধানো-কঠিন, তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজ্‌নেস্ চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো, —তাতে একটি কোমল তৃণ, একটি অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই।

ভারি ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কী জানি তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত আকাশপূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না।

"এখনকার কোনো কোনো নূতন মনস্তত্ত্ব পড়িলে আভাস পাওয়া যায় যে একটা মানুষের মধ্যে যেন অনেকগুলা মানুষ জটলা করিয়া বাস করে, তাহাদের স্বভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমার মধ্যেকার যে অকেজো অদ্ভুত মানুষটা সুদীর্ঘকাল আমার উপর কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছে,—যে-মানুষটা শিশুকালে বর্ষার মেঘ ঘনাইতে দেখিলে পশ্চিমের ও দক্ষিণের বারান্দায় অসংযত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইত··· তাহারই জবানি কথা এই ক্ষুদ্র জীবনচরিতের মধ্যে অনেক প্রকাশিত হইবে। কিন্তু এ-কথাও বলিয়া রাখিব, আমার মধ্যে অন্য ব্যক্তিও আছে—যথাসময়ে তাহারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।" [পাণ্ডুলিপি—জীবনস্মৃতি ।। পৃঃ ২১৬]

ইহাই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি। এই বিশেষ কবি-প্রকৃতিই অন্যতম কারণ, যাহার জন্য ইউরোপ তাঁহার ভালো লাগে নাই। একথা সত্য যে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে চূড়ান্ত উৎকেন্দ্রিক করিয়া ছাড়িয়াছে—জীবন হইতে কাব্য, হৃদয়াবেগ ও সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু ইহাই কি ইউরোপীয় সভ্যতার চূড়ান্ত বা সব কথা?

ইংলণ্ডকে তাঁহার ভালো না-লাগিবার আর একটি কারণ, ইংরাজ জাতির সাম্রাজ্যবাদী লালসা। ইংলণ্ডের এই সমৃদ্ধির পিছনে রহিয়াছে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মত মহাদেশগুলির সম্পদ অপহরণ ও শোষণ—তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইংরাজ কবি টমাস হুডের (Thomas Hood) 'Song of the Chirt' পড়িয়া তাহার মনে যে গভীর প্রতিক্রিয়া হয় তাহা তিনি 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র খসড়ায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন,

"ভেবে দেখলে এর একটা অন্ধকার দিক আছে—'SONG OF SHIRT' পড়লে তা টের পাওয়া যায়—এই সুখ-সমৃদ্ধির অন্তরালে কী অসহ্য দারিদ্র্য আপনার জীবনপাত করচে—সেটা আমাদের চোখে পড়ে না—কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসেব জমা হচ্ছে। প্রকৃতিতে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই।···আমাদের ভারতবর্ষে অনাদৃত দুর্বল অজ্ঞান বহুযত্নলব্ধ জ্ঞানকে বিনাশ করেচে। যদি সভ্যতা আপনাকে রক্ষা করতে চায় ত প্রতিবেশীকে আপনার সমান করে তুলুক। দুটো শক্তি যত একসঙ্গে সাম্য রক্ষা করে কাজ করে ততই মঙ্গল। —যেমন আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ—স্বার্থ এবং পরার্থ—আপনার উন্নতি ও চতুষ্পার্শ্বের উন্নতি—নইলে চতুষ্পার্শ্ব তার প্রতিশোধ তোলে—বর্বরতা সভ্যতাকে ধ্বংস করে।

আমার ত সেইজন্যে মনে হয়—আশ্চর্য নেই যে ভবিষ্যতে কাফ্রিরা য়ুরোপ জয় করবে।···য়ুরোপীয় সভ্যতার আদিজননী গ্রীসকে যে তুর্ক জাতি অভিভূত করবে একি পেরিক্লীসের সময়ে কেউ কল্পনা করতে পারত? আলোকের মধ্যে ভয় নেই, কেননা তার উপর সহস্র চক্ষু পড়ে আছে—কিন্তু যেখানে অন্ধকার জমা হচ্চে, বিপদ সেইখানেই গোপনে বল সঞ্চয় করচে—সেইখানেই প্রলয়ের গুপ্ত জন্মভূমি।"

[বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র ।। পৃঃ ১৫৮]

এই লেখা পড়িয়া মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদ ও আধুনিক জগতের সমস্যাগুলি সম্পর্কে কবি চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। তাছাড়া ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনের কয়েকটি প্রগতিশীল বিষয়ে তাঁহার আকর্ষণও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত সেখানকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নারী-স্বাধীনতা। দেশে ফিরিবার অনতিকাল পরে 'হিতবাদী' পত্রিকায় তাঁহার 'অকাল-বিবাহ' প্রবন্ধ লইয়া চন্দ্রনাথ বসুর সহিত যে বিতর্ক হয় তাহাতে তাঁহার চিন্তায় ইউরোপীয় ভাবধারার প্রভাব দেখা যায়। আসলকথা, দুইবার বিলাত-ভ্রমণের পর তাঁহার মনে একটি গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে, যাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মানসী পুস্তিকা আকারে বাহির হয়। এই সময় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় মানসীর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, উহার মধ্যে despair ও resignation-এর ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। জবাবে কবি সেই পত্রের এক জায়গায় লিখিয়াছিলেন,

"···এখন এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলচে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্চে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করচে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এই জন্যে সবশুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা ও ঔদাস্য।"···

[চিঠিপত্র : ৫ম খণ্ড ।। ১৮৯১, জানুয়ারী ২৯]

কবির এই আত্মবিশ্লেষণ হইতে তাঁহার মানস-প্রকৃতির অন্তর্বিরোধের স্বরূপটি কিছুটা স্পষ্ট বুঝা যায়।

॥ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে ।

বিলাত হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথকে জমিদারি দেখাশুনার ব্যাপারে উত্তরবঙ্গে যাইতে হইল। কবির জীবনে সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি যে, তাঁহাকে জমিদার সাজিতে হইয়াছিল। জমিদারি প্রথাকে রবীন্দ্রনাথ কী চোখে দেখিয়াছিলেন তাহা পরে আলোচনা করিব, তবে রবীন্দ্রনাথ জমিদার-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে 'জমিদার' হইতে পারেন নাই, এ-কথা অত্যুক্তি নহে। "লেখাপড়া শিখিয়া বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসিতে পারেন নাই' আর দশজনের মত সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভও তিনি করিতে পারেন নাই, ব্যক্তিগতভাবে উপার্জনের কোনো অবলম্বনও ছিল না। এই অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের আদেশ কতকটা বাধ্য হইয়াই মানিয়া লইতে হইয়াছিল। জমিদারিতে তাঁহার আসক্তি ও লোভ ছিল এ-কথা বলা যায় না। অবশ্য রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ জমিদারিবিদ্যায় ও বিষয়-বুদ্ধিতে বাংলার জমিদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতেন এ-কথা পূর্ববঙ্গের কোনো জমিদারের মুখে শোনা।" 'জমিদারিবিদ্যায় ও বিষয়-বুদ্ধিতে' বাংলার শ্রেষ্ঠ জমিদার অর্থে তিনি কি বলিতে চাহিয়াছেন বুঝা যায় না। তবে সে-যুগে জমিদারি চালাইতে হইলে যে শঠতা, চৌর্যবৃত্তি, ক্রূরতা ও অন্যান্য গুণাবলীর (!!) প্রয়োজন হইত, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাহা ছিল না এ-কথা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা যায়। 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র কবি এবং একজন 'পাকা-জমিদারে'র মধ্যে কী করিয়া সঙ্গতি থাকিতে পারে, তাহা জানিবার কৌতূহল থাকিয়া যায়।

এই পতিসরে থাকাকালীন 'ছিন্নপত্রে' আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র পাই, যাহাতে জমিদারির সহিত তাঁহার কবিপ্রকৃতির অসঙ্গতি ও বিরোধটি অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। একখানি পত্রে তিনি লিখিতেছেন,

"সকালে উঠে···লিখছিলুম···এমংকালে···রাজকার্য উপস্থিত হল—প্রধান-মন্ত্রী মৃদুস্বরে বললেন, একবার রাজসভায় আসতে হচ্ছে। কি করা যায় লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠতে হল—সেখানে ঘণ্টাখানেক দুরূহ রাজকার্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসচি। আমার মনে মনে হাসি পায়—আমার

নিজের অপার গাম্ভীর্য ও অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কি মস্তলোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপর বসে বসে ভান করছি যেন এই সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভূত আর কি হতে পারে! অন্তরেব মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই সমস্ত ছেলেপিলে-গরুলাঙ্গল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়।···কি জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে! **Prestige** মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানতো, তাহলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়।"

[ছিন্নপত্র—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫১ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ পৃঃ ৭৪-৭৫]

ইহাতে 'জমিদারে'র মুখোশ-পরা মানুষটির অন্তরের কথাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যাহাই হউক, জমিদারী-কার্যোপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের একটি বড়ো লাভ হইয়াছিল এই যে বাংলার বৃহত্তর কৃষক-সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র মানুষ ও তাহাদের মনস্তত্ত্বের সহিত তাঁহার বাস্তব পরিচয় ও অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যাগুলিও তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া পদ্মা ও উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁহার কাব্যপ্রবাহে অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করিতেছেন, এই উত্তরবঙ্গ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। বর্তমানে উহা দুইভাগে দুইটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছে। 'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধটি 'স্বদেশ' গ্রন্থে এবং 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধটি 'সমাজ' পুস্তকে স্থানলাভ করিয়াছে।

নানা দিক দিয়া এই প্রবন্ধ দুইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পর্যালোচনা করিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অপরদিকে জাতীয় জীবনের আদর্শ ও নীতির দিক হইতে

প্রচণ্ড বিভ্রান্তি ও দিশাহারার ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। দীর্ঘ প্রায় দেড়শত বৎসর ইংরাজ-শাসনের ফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনে বহু বিপর্যয় ও পরিবর্তন হইয়াছে। ইউরোপের সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি আমাদের আদর্শ ও চিন্তাজগতেও ভয়ানক আলোড়ন আনিয়াছে। সকলেরই মনে গভীর প্রশ্ন;—এই নূতন ভাবধারা—এই ইউরোপকে তাহারা কী চোখে দেখিবে। ভারতের প্রাচীন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার প্রশ্নেই বা কী দৃষ্টিভঙ্গি হইবে। অর্থাৎ ইংরাজ-শাসনের ফলে আমাদের বাস্তবজীবনে যে বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, আমাদের চিন্তা ও আদর্শের জগতেও তাহার অনিবার্য প্রতিফলন দেখা গেল। কিন্তু সে-যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন সুস্থ বিচারবোধ অথবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না—আশাও করা যায় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু 'আইডিয়া'র ক্ষেত্রে অথবা পুস্তক পাঠ করার ফলেই আসে না, তাহার জন্য অনুকূল সামাজিক পরিবর্তনেরও আবশ্যক হয়। ইংরাজ-শাসনের ফলে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের বৃহত্তর সমাজ-অর্থনৈতিক জীবনে কোনো গুণগত পরিবর্তন দেখা গেল না। ভারতবর্ষে যথার্থভাবে শিল্প-বিপ্লব হয় নাই—প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজই কোনোক্রমে বাঁচিয়া রহিল। ফলে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহিলেও আমাদের পশ্চাৎ-ভাগ বাঁধা রহিল প্রাচীন সমাজ-সংস্কৃতির খোঁটায়। অপরদিকে পরাধীনতাব জ্বালায় একটি উগ্র ও তীব্র জাতীয়তাবোধও জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের প্রাচীন ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নীতি, সব কিছুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ কবিবার ঝোঁকও দেখা গিয়াছে। চারিদিকে নূতন করিয়া ধর্ম আন্দোলনের প্রবাহও দেখা দিয়াছে। এমনই একটি সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বলা বাহুল্য, নূতন ও পুরাতন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য বৈজ্ঞানিক কিংবা যুক্তিপূর্ণ হয় নাই। সে-যুগের প্রবন্ধ লেখকদের মত আবেগ-উচ্ছ্বাস, অতিকথন ও বর্ণনার চাপে তাঁহার আসল বক্তব্যই যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। নূতন ও প্রাচীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাহাকেও তিনি সমর্থন করিলেন না। কিন্তু তবুও প্রাচীন ভারতের দিকেই তাঁহার যেন গভীর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। 'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধে তিনি প্রাচীনপন্থীদের বক্তব্যকে এইভাবে রাখিতেছেন,

"হায়, ভারতবর্ষের পুরপ্রাচীর ভেঙে ফেলে এই অনাবৃত বিশাল কর্মক্ষেত্রের

মধ্যে আমাদের কে এনে দাঁড় করালে! আমরা চতুর্দিকে মানসিক বাঁধ নির্মাণ করে কালস্রোত বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত নিজের মনের মতো গুছিয়ে নিয়ে বসেছিলুম। চঞ্চল পরিবর্তন ভারতবর্ষের বাহিরে সমুদ্রের মতো নিশিদিন গর্জন করত, আমরা অটল স্থিরত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে গতিশীল নিখিল সংসারের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে বসেছিলুম। এমন সময় কোন্ ছিদ্রপথ দিযে চির-অশান্ত মানবস্রোত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত ছারখার করে দিলে। পুরাতনের মধ্যে নূতন মিশিয়ে, বিশ্বাসের মধ্যে সংশয় এনে, সন্তোষের মধ্যে দুরাশার আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে সমস্ত বিপর্যস্ত করে দিলে!"

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,

"তোমরা অনেক জেনেছ, অনেক পেয়েছ কিন্তু সুখ পেযেছ কি? আমরা যে বিশ্বসংসারকে মায়া বলে বসে আছি এবং তোমরা যে একে ধ্রুব সত্য বলে খেটে মরছ, তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছ? তোমরা যে নিত্য নূতন অভাব আবিষ্কার করে দরিদ্রের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়াচ্ছ, গৃহের স্বাস্থ্যজনক আশ্রয় থেকে অবিশ্রাম কর্মের উত্তেজনায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ, কর্মকেই সমস্ত জীবনের কর্তা করে উন্মাদনাকে বিশ্রামের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছ, তোমরা কি স্পষ্ট জানো তোমাদের উন্নতি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

"আমরা সম্পূর্ণ জানি আমরা কোথায় এসেছি। আমরা গৃহের মধ্যে অল্প অভাব এবং গাঢ় স্নেহ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র নিকটকর্তব্যসকল পালন করে যাচ্ছি।···

"ভারতবর্ষ সুখ চায় নি, সন্তোষ চেয়েছিল, তা পেয়েওছে এবং সর্বতোভাবে সর্বত্র তার প্রতিষ্ঠা করেছে। এখন আর তার কিছু করবার নেই। সে বরঞ্চ তার বিশ্রাম-কক্ষে বসে তোমাদের উন্মাদ জীবন-উৎপ্লব দেখে তোমাদের সভ্যতার চরম সফলতা সম্বন্ধে মনে মনে সংশয় অনুভব করতে পারে।··না, কল যে রকম হঠাৎ বিগড়ে যায়, উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাষ্প ও তাপ সঞ্চয় করে এঞ্জিন যে রকম সহসা ফেটে যায়, একপথবর্তী দুই বিপরীতমুখী রেলগাড়ি পরস্পরের সংঘাতে যেমন অকস্মাৎ বিপর্যস্ত হয় সেই রকম প্রবল বেগে একটা নিদারুণ অপঘাত-সমাপ্তি প্রাপ্তি হবে?"

রবীন্দ্রনাথ এখানে ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে গভীর সংশয় প্রকাশ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, তিনি পাশ্চাত্য দেশের ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছেন।

কিন্তু পরিবর্তন একটা আসিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা কতকটা অনিবার্যভাবে

আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অপরদিকে প্রাচীন হিন্দুসমাজও আর নাই; বর্ণ, বৃত্তি অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে একটি ওলটপালট ও বিপর্যয় হইয়া গিয়াছে। তাই তিনি এই নগ্ন বাস্তব সত্যটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া প্রাচীনপন্থীদের প্রতি বলিলেন,

"কিন্তু সম্প্রতি ব্যাপারটা এইরকম হয়েছে যে, আমরা জটা নখ কেটে ফেলেছি বটে, সংসারের মধ্যে প্রবেশ করে সমাজের লোকের সঙ্গে মিশতেও আরম্ভ করেছি, কিন্তু মনের ভাবের পরিবর্তন করতে পারি নি। এখনো আমরা বলি, আমাদের পিতৃপুরুষেরা শুদ্ধমাত্র হরীতকী সেবন করে নগ্নদেহে মহত্ত্বলাভ করেছিলেন, অতএব আমাদের কাছে বেশভূষা আহারবিহার চালচলনের এত সমাদর কেন?' এই বলে আমরা ধুতির কোঁচাটা বিস্তারপূর্বক পিঠের উপর তুলে দিয়ে দ্বারের সম্মুখে বসে কর্মক্ষেত্রের প্রতি অলস অনাসক্ত দৃষ্টিপাতপূর্বক বায়ু সেবন করি।

"এটা আমাদের স্মরণ নেই যে যোগাসনে যা পরম সম্মানার্হ, সমাজের মধ্যে তা বর্বরতা। প্রাণ না থাকলে দেহ যেমন অপবিত্র, ভাব না থাকলে বাহ্যানুষ্ঠানও তদ্রূপ।

"তোমার আমার মতো লোক যারা তপস্যাও করি নে হবিষ্যও খাই নে, জুতো মোজা পরে ট্রামে চড়ে পান চিবতে চিবতে নিয়মিত আপিসে ইস্কুলে যাই, যাদের আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করে দেখে কিছুতেই প্রতীতি হয় না এরা দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ্য, গৌতম, জরৎকারু, বৈশম্পায়ন কিংবা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন; ছাত্রবৃন্দ— যাদের বালখিল্য তপস্বী বলে এ পর্যন্ত কারো ভ্রম হয় নি; একদিন তিনসন্ধ্যা স্নান করে একটা হরীতকী মুখে দিলে যাদের তারপরে একাদিক্রমে কিছুকাল আপিস কিংবা কলেজ কামাই করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে ঐ রকম ব্রহ্মচর্যের বাহ্যাড়ম্বর করা, পৃথিবীব অধিকাংশ উদ্যোগপরায়ণ মান্যজাতীয়ের প্রতি খর্ব নাসিকা সীট্‌কার করা কেবলমাত্র যে অদ্ভুত, অসঙ্গত, হাস্যকর তা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক।"

কিন্তু তাহা হইলে উপায় কি—পথ কোথায়—সমাধান কিসে? তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"কিন্তু তার চেয়ে যদি সত্যকে ভালোবাসি; বিশ্বাস অনুসারে কাজ করি; ঘরের ছেলেদের রাশীকৃত মিথ্যার মধ্যে গোলগাল গলগ্রহের মতো না করে তুলে সত্যের শিক্ষায় সরল সবল দৃঢ় করে উন্নত মস্তকে দাঁড় করাতে পারি; যদি মনের মধ্যে এমন নিরভিমান উদারতার চর্চা করতে পারি যে চতুর্দিক থেকে জ্ঞান এবং মহত্ত্বকে সানন্দে সবিনয়ে সাদর সম্ভাষণ করে আনতে পারি, যদি সংগীত শিল্প

সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার আলোচনা করে,—দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে,—পৃথিবীতে সমস্ত তন্নতন্ন করে নিরীক্ষণ করে এবং মনোযোগ সহকারে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে আপনাকে চারিদিকে উন্মুক্ত বিকশিত করে তুলতে পারি তাহলে আমি যাকে হিন্দুয়ানি বলে থাকি তা সম্পূর্ণ টিকবে কিনা বলতে পারি নে, কিন্তু প্রাচীনকালে যে সজীব সচেষ্ট তেজস্বী হিন্দুসভ্যতা ছিল তার সঙ্গে অনেকটা আপনাদের ঐক্যসাধন করতে পারব।···

"নিজের মধ্যে সজীব মনুষ্যত্ব থাকলে তবেই প্রাচীন এবং আধুনিক মনুষ্যত্বকে, পূর্ব ও পশ্চিমের মনুষ্যত্বকে নিজের ব্যবহারে আনতে পারা যায়।

"মৃত মনুষ্যই যেখানে পড়ে আছে সম্পূর্ণরূপে সেইখানকারই। জীবিত মনুষ্য দশ-দিকের কেন্দ্রস্থলে, সে ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য এবং বিপরীতের মধ্যে সেতুস্থাপন করে সকল সত্যের মধ্যে আপনার অধিকার বিস্তার করে; একদিকে নত না হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হওয়াকেই সে আপনার প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করে।" [স্বদেশ ॥ পৃঃ ১-২১]

'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে'র মধ্যেও তিনি সেই একই কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন। ইউরোপের সমৃদ্ধির পশ্চাতে রহিয়াছে তাহার ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। ইউরোপের যন্ত্র-সভ্যতা কিভাবে শ্রমজীবী শ্রেণী ও নীচুতলার অগণিত জনমানবকে শোষণ করিয়া মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীকে স্ফীত করিয়া তুলিতেছে তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। ইংরাজ কবি টমাস্ হুডের 'SONG OF THE SHIRT' নামে কবিতাপাঠের ফলে তাঁহার মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি তাঁহার ডায়ারির খসড়ায় মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'যেখানে অন্ধকার জমা হচ্চে, বিপদ সেইখানেই গোপন বল সঞ্চয় করচে, সেইখানেই প্রলয়ের গুপ্তভূমি।' 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র ভূমিকায় বলিলেন, "প্রকৃতির আইন অনুসারে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই···।"

[প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১২শ খণ্ড ॥ পৃঃ ২৩৭]

ইউরোপের নারী-স্বাধীনতা, পারিবারিক ও দাম্পত্য-জীবনের কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কেও তিনি ইহাতে মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, ইউরোপের নরনারী পারিবারিক ও দাম্পত্য-জীবনের মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পরস্পরকে প্রতিযোগী হিসাবে দেখিতেছে। তাঁহার ধারনা—ভালোবাসাহীন এই যান্ত্রিক সম্পর্কে দাম্পত্য-জীবন কখনও সুখকর ও বাঞ্ছনীয় নয়, এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মসুখসর্বস্ব ইউরোপীয় নারীদের তুলনায় দেশের অন্তঃপুরচারিণীরা অধিক সুখী।

বলা বাহুল্য, কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি নিতান্তই একদেশদর্শী এবং ভারতবর্ষীয়ের চোখে দেখা। ইউরোপের বুর্জোয়া সভ্যতায় নরনারীর—বিশেষ করিয়া বুর্জোয়া

সমাজের দাম্পত্য-জীবন ও নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে অসুস্থ-জীবনবোধ সত্যই ন্যক্কারজনক ও ঘৃণ্য; কিন্তু উহাই তো ইউরোপীয় নারী-স্বাধীনতার সব কথা নয়। উহা একটি আংশিক চিত্রমাত্র,—উহার অন্য প্রগতিশীল দিকও আছে। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে উহার কতকগুলি অনিবার্য অসঙ্গতি ও সমস্যা দেখা যায়—মানুষ তাহা দূর করিবার চেষ্টা করে। ইউরোপের নারী-স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পৃথিবীর নারী-সমাজের মুক্তির প্রথম সূচনা করিয়াছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের নারী-স্বাধীনতার প্রগতিশীল দিকগুলির প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নানা পরিবর্তন আসিতেছে, সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এদেশের নারীদের সমস্যার কথা চিন্তা করিতেছেন। তিনি বলিলেন,

"···দেশের আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতই ভিন্ন আকার ধারণ করছে এবং সেই সূত্রে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মতো বোধ হচ্চে। সেই সঙ্গে ক্রমশ আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা পরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চলবে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে উন্নত উৎসাহীভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে।

"অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হোলে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে, ইংরেজি যে জানে এবং ইংরেজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মতো দাঁড়াচ্চে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্চে। একজনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর একজনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন।" [প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১২শ খণ্ড ॥ পৃঃ ২৪৫-৪৬]

॥ 'সাধনা'র যুগে রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী ॥

১২৯৮ সালে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সুধীন্দ্রনাথ নামে সম্পাদক থাকিলেও, রবীন্দ্রনাথই এই পত্রিকার প্রধান লেখক ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই সাধনা পত্রিকায়ই রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' ও তাঁহার তৎকালীন বহু রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়।

পত্রিকার প্রকাশের প্রথম ভাগেই চন্দ্রনাথবাবুর সহিত তাঁহার 'আহারতত্ত্ব' লইয়া একচোট বাদ-প্রতিবাদ হইয়া যায়। মাথায় তাঁহার তখনও বিলাতের বা ইউরোপীয় সংস্কৃতির পর্যালোচনা করিবার উগ্র ঝোঁক চাপিয়া রহিয়াছে। 'কর্মের উমেদার' (সাধনা, ১২৯৮ মাঘ) নামক একটি প্রবন্ধে তিনি ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমালোচনা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের ধারণা—আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল লক্ষ্য হইতেছে, 'জীবন-সম্ভোগের উপকরণ ও বস্তু কত বিচিত্র ও বিভিন্নভাবে বৃদ্ধি করা যায়।' তিনি বলিলেন,

"···সভ্যতার অসংখ্য আসবাব যোগাইয়া ওঠা দিন দিন অসামান্য চেষ্টাসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কল বাড়িতেছে এবং মানুষও কলের মতো খাটিতেছে।··· লোহার কলের সঙ্গে রক্তমাংসের মানুষকে সমান খাটিতে হইতেছে। কেবল বণিক সম্প্রদায় লাভ করিতেছেন ও ধনী সম্প্রদায় আরামে আছেন।"

কিন্তু ইউরোপের সজীব ও স্বাধীনচেতা মানুষ এই অন্যায় ব্যবস্থা বেশী দিন মানিয়া লইবেন না, রবীন্দ্রনাথ তাহা বিশ্বাস করেন। তাই তিনি বলিলেন,

"য়ুরোপের মনুষ্যত্ব এইরূপ জীবন্ত এবং প্রবল থাকাতেই সহজে কোনো বিকারের আশঙ্কা হয় না। কোনোরূপ বাড়াবাড়ি ঘটিলেই আপনিই তাহা সংশোধনের চেষ্টা জাগিয়া উঠে।···মানুষ যেখানে স্বাধীন এবং স্বাধীনতাপ্রিয় সেখানে সত্বরই হউক বিলম্বেই হউক সংশোধনের পথ মুক্ত আছে।"

এই যান্ত্রিকতা যেন এদেশের লোককেও পাইয়া বসিয়াছে। সহস্র সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং বিধিনিষেধের চাপে এদেশের মানুষের স্বাধীন চিন্তা যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তিনি বলিলেন,

"...আমাদের মানসিক রাজ্যে আমরা যন্ত্রের রাজত্বই বহন করিয়া আসিতেছি।...আমরা কলের কাজ করিবার জন্য একেবারে কলে তৈয়ারী হইয়াছি। মনু পরাশর ভৃগু নারদ সকলে মিলিয়া আমাদের আত্মকর্তৃত্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন...কখনো এমন স্বপ্নেও ভাবি না যে, স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা আমাদের এ-অবস্থার কোনো প্রতিকার হইতে পারে।"

[কর্মের উমেদার—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১২শ খণ্ড ।। পৃঃ ৪৬৭-৭১]

লক্ষ্য করিবার বিষয়,—ইউরোপ সম্পর্কে কবির তখনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সংস্কৃতির ঐ 'উপকরণ—Fetishism' জীবনের সুসম সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলিয়াছে,—কবি মাত্রেরই এই অভিযোগ। অথচ এইসব উপকরণকে বাদ দিয়াও তো সভ্যতা আগাইতে পারে না। এবং উপকরণ-সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইল আধুনিক যন্ত্রশিল্প-সভ্যতা। পাশ্চাত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ শেষ পর্যন্ত এই 'কর্ম' ও 'যন্ত্র'-এর বিরুদ্ধে আসিয়া পৌছাইতেছে। অথচ তিনি ধনতন্ত্রকেও দেখিতে পাইতেছেন, এমন কি ভাবিকালের সমাজ-বিপ্লবকেও দেখিতে পাইতেছেন; যদিও সে-দেখার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনার স্বচ্ছতা ছিল না।

ইহার কিছুদিন পরে 'স্ত্রীমজুর' নামে একটি প্রবন্ধে স্ত্রীমজুর সমস্যা লইয়া তিনি আলোচনা করিলেন। খুব সম্ভবত স্ত্রীমজুরদের পক্ষ লইয়া কিংবা ইহার বিভিন্ন সমস্যা লইয়া ইতিপূর্বে এদেশে কেহ আলোচনা করেন নাই। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ল্যান্সডাউনের সময় যে 'কারখানা-আইন' পাশ হয়, তাহাতে স্ত্রীমজুরদের যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজ করান না-হয়, তজ্জন্য কিছুটা আইনগত সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, কলমালিকরা কোথাও সে আইন মানিয়া চলিত না।

ইহার প্রায় বৎসরখানেক পরে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য রাজসাহীতে ছিলেন। বন্ধুবর লোকেন পালিত তখন রাজসাহীর জেলা-জজ্। রবীন্দ্রনাথ লোকেন পালিতের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে সান্ধ্যসভায় বহু গুণীজনের সমাবেশ হইত। এই রাজসাহীতেই তিনি তাঁহার শিক্ষা-সম্পর্কীয় বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' একটি জনসভায় (রাজসাহী এ্যাসোসিয়েশনে) পাঠ করেন। প্রবন্ধটি সাধনায় ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ ও অবকাশ এখানে নাই। তবুও ইহার মূল কথাটি অতি অবশ্যই আলোচনা করা দরকার। কেননা এদেশের ইংরাজ সরকারের তৎকালীন শিক্ষানীতির মূল কথাটি রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম

উদঘাটন করিয়া দেখাইলেন। তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীন জাতীয় শিক্ষানীতির মূল্ কথাটি পরিষ্কার করিয়া দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করিলেন। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য বা জ্ঞান-বিজ্ঞান পাঠের বিরোধী নহেন। কিন্তু উহার সহিত দেশের 'স্বাধীন পাঠে'রও আবশ্যকতার কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন,

"অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হয় না।" [শিক্ষা ।। পৃঃ ৭]

তাঁহার বক্তব্য, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষা আমরা পাই, আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত তাহার কোথাও সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকে না। ফলে তাহা কখনও আমাদের আন্তরিক বিকাশ ঘটাইতে পারিতেছে না। এই অসঙ্গতি ও বিরোধের মূলকথাটাই হইতেছে, দেশের বৃহত্তর জনজীবনের সহিত এই শিক্ষার কোনো সংযোগই ঘটিতে পারিতেছে না। কেননা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমাদের জনশিক্ষার বা জনজাগরণের কোনোই সম্ভাবনা নাই। তিনি বলিলেন,

"দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনো গতি নাই একথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।" তিনি আরও বলিলেন,

"রাজা কত আসিতেছে, কত যাইতেছে, পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরেজ আসিল, আবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে—কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলাই চলিবে।···ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায়, তবে পরশু ঐ বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বড় বড় সৌধবুদ্বুদের মতো প্রতীয়মান হইবে।"

[গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১২শ খণ্ড ।। পৃঃ ৬১৮]

স্মরণ থাকিতে পারে, বেশ কিছুকাল আগে হইতেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা-ভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষাকে সর্বপ্রসারী করিয়া তুলিবার কথা চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। ১২৯০ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি একই কথা বলিয়াছেন—"বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।"

[ন্যাশনাল ফণ্ড—ভারতী, ১২৯০ কার্তিক ।। পৃঃ ২৯৩]

যাহাই হউক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথা সর্বপ্রথম বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের কাছ হইতেই শোনা গেল। তিনি বলিলেন,

"আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের

সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য।" [শিক্ষার হেরফের—শিক্ষা ।। পৃঃ-১৩]

এই প্রবন্ধটি সেযুগে বাংলাদেশে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, সে সম্পর্কে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন,

"বাংলার তৎকালীন মনীষীরা একবাক্যে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিলেন। কারণ এযাবৎ এদেশে শিক্ষাসম্বন্ধে ক্রিটিসিজম্ তেমনভাবে হয় নাই। শিক্ষার গলদ কোন্‌খানে তিনি ঠিক সেই স্থানটিই নির্দেশ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে লিখিলেন যে তিনি প্রবন্ধটি দুইবার পাঠ করিয়াছেন, 'প্রতিছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে।' জাস্টিস্ (১৮৮৮) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যানসেলর (১৮৯০-৯২), তিনি লেখকের মতামত অনুমোদন করিয়া পত্র দেন, আনন্দমোহন বসু ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম র‍্যাংলার, তিনিও কবির মত সমর্থন করিলেন।"

[রবীন্দ্রজীবনী : ১ম খণ্ড ।। পৃঃ ২৭১]

রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১২শ খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়ে' ইহাদের মন্তব্যগুলি সংকলিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দেশের জাতীয়তাবাদের প্রধান মুখপাত্র সেই কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে তখনও পর্যন্ত মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা নীতির পক্ষে কোনো কথাই শোনা গেল না। পরন্তু মাতৃভাষাগুলি সম্পর্কে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি লজ্জা ও সংকোচমিশ্রিত ভাব ছিল। এমন কি বাংলাদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনগুলিতেও নেতৃবর্গ ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতাদি করিতেন। ইহার কিছুকাল পরে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনীতেই তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সহিত রবীন্দ্রনাথ-গোষ্ঠীর বিরোধ বাধে। যথা-সময়ে আমরা এ আলোচনায় আসিব।

এই সময় 'স্যুর লেপেল গ্রিফিন' নামক জনৈক ইংরাজ বাঙালী জাতির চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া অত্যন্ত অভদ্রোচিত ও কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করিয়া 'ফর্ট নাইট্‌লি রিভ্যু' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। জাতির এই অপমান রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নীরবে সহ্য করা সম্ভব হয় নাই। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক ও বিদ্রুপাত্মক ভাষায় উহার প্রতিবাদ করিয়া সাধনা পত্রিকায় একটা জবাব দিলেন (সার লেপেল গ্রিফিন—সাধনা, ১২৯৯ শ্রাবণ)। তিনি লিখিলেন,

"কুকুর-সম্প্রদায়ের মধ্যে খেঁকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে। তাহাদের খেঁই খেঁই আওয়াজের মধ্যে কোনোপ্রকার গাম্ভীর্য অথবা গৌরব নাই, কিন্তু সিংহের জাতে খেঁকি সিংহ কখনো শুনা যায় নাই। সার লেপেল গ্রিফিন

জুন মাসের 'ফর্ট নাইট্‌লি রিভিয়ু' পত্রে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারি-একটা থেই থেই আওয়াজ দিতেছে। ইহাতে লেখকের জাতি নিরূপণ করা কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।"

জাতীয় চরিত্রের অবমাননা হইলে রবীন্দ্রনাথের লেখনীও অত্যন্ত কঠোর ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার হইতে পারে। তিনি বলিলেন, মাঝে মাঝে শত্রুপক্ষ হইতে দুই-একটা ধাক্কা খাইলে কাজ দেয়, জাতির আলস্য ও তন্দ্রা ভাঙিয়া যায়। তিনি বলিলেন,

"কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় যেমনি হউক, বাঙালিদের তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, উক্ত আওয়াজের আর কোনো ফল না হউক, আমাদিগকে সজাগ করিয়া রাখে। যে সময় একটুখানি নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসে ঠিক সেই সময়ে যদি এইরকম একটা বিদেশী হঠাৎ আমাদের প্রতি খেঁকাইয়া আসে তাহাতে চট্ করিয়া আমাদের তন্দ্রা ভাঙিয়া যাইতে পারে।"

তিনি শালীনতাপূর্ণ ভাষায় গ্রিফিন সাহেবকে আত্মস্থ করিতে চাহিলেন,

"...আমি একটা তত্ত্ব বাঁধিযাছিলাম যে, ইংরেজ রাজপুরুষের লেখায় যদি-বা কোনো কারণে উদারতার অভাব লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্যে একটা সংযত আত্মমর্যাদা থাকে ; কারণ, যে লোক সৌভাগ্যবান এবং ক্ষমতাবান তাহার লেখার মধ্যে একটি বিনয় এবং সেই বিনয়ের মধ্যে একটি প্রবল পৌরুষ থাকে। আমাদের মতো যাহারা দুর্ভাগ্য, যাহাদের মুখ ছাড়া আর কিছু নাই, সময়ে সময়ে অক্ষম আক্রোশে তাহারা অমিতভাষী হইয়া আপনার নিরুপায় দৌর্বল্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু গ্রিফিনের লেখা ইংরেজি বড়ো কাগজে বাহির হইয়া থাকে, এবং সেইসঙ্গে আমার প্রিয়তত্ত্বটিকে বিসর্জন দিতে হয়।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫৩৫-৩৬]

সেই সময়ে বাংলাদেশে সরকারপক্ষ হইতে ফৌজদারি আদালতগুলি হইতে জুরি প্রথার অবসান করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। বাংলার তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যর চার্লস আলফ্রেড ইলিয়টের রিপোর্টেও এই জুরিপ্রথা অবসানের পক্ষে মন্তব্য করা হইয়াছিল। হাইকোর্টও জুরিপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিলেন। ইহাদের যুক্তির স্বপক্ষে একটি কথাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, এদেশীয় চরিত্রে জুরিপ্রথা সহ্য হইবে না—এদেশীয়রা 'জুরি প্রথা'র উপযুক্ত নহে। সারা দেশে শিক্ষিত সমাজে ইহা তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার করিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলিলেন,

"No complaint reached the Government from the

people affected that the system had failed. It is the overflowing desire on the part of the Government to do good to us that has been the cause of the withdrawal of this system! Save us from our well-wishers, say I. I could have understood the action of Government if there had been any hue and cry in the country on the subject...

..."The only safeguard which accused persons have against this system in Sessions Cases is Trial by Jury. And now the notification of the Lieutenant-Governor of Bengal withdraws this safeguard from the seven districts in Bengal where it existed, and the whole people of India has been threatened with a like withdrawal. The question is not a provincial but an imperial one, and of the highest importance. I, therefore, think it is our duty to take this question up, and help our Bengal brethren to the utmost extent of our power to get back what they have lost, and to see that other parts of the country are not overtaken by the same fate."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. p.p. 114-16]

সারা বাংলাদেশে 'জুরি প্রথার' অবসান লইয়া যখন তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় কটকে কিছুকাল বিহারীলাল গুপ্তের আতিথ্য লইয়াছিলেন। বিহারীলাল তখন কটকের জেলা-জজ। এই কটকবাসকালে এদেশীয় ইংরাজ শিক্ষিত শ্রেণীর সম্পর্কে তাঁহার কতকগুলি তিক্ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। সেগুলি সম্পর্কে আমরা 'ছিন্নপত্রে' জানিতে পাই। কটকের Raven Shaw কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ একদিন বিহারীবাবুর বাড়িতে সান্ধ্য-ভোজের মজলিসে বাঙালী-চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা অসহ্য পীড়াদায়ক ও অপমানকর বোধ হইয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইন্দিরা দেবীকে যে পত্রটি লেখেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক যাতনার অবস্থাটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অংশবিশেষ এইরূপ,

"জানিস বোধ হয় গবর্মেণ্ট আমাদের দেশে জুরি প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চেয়েছিল বলে চারিদিকে ভারি একটা আপত্তি উঠেচে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ের কথা তুলে···তর্ক করতে লাগল। · বলল এ দেশের moral standard low—এখানকার life-এর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়। আমার যে কি রকম করছিল সে তোকে কি বলব! আমার

বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না।···একজন বাঙালীর নিমন্ত্রণে এসে বাঙালীর মধ্যে বসে যারা এরকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না তারা আমাদের কি চক্ষে দেখে!"

[বিশ্বভারতী পত্রিকা---১৩৫১, তৃতীয় সংখ্যা ।। পৃঃ ১৪৪]

ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া 'অপমানের প্রতিকার' নামে সাধনা পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। যথাসময়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরই পুরীতে আর একটি ঘটনায় এদেশীয় ইংরাজ রাজপুরুষদের সম্বন্ধে তাঁহার ঘৃণার ভাব অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিল। পুরীতে রবীন্দ্রনাথ ও বিহারীবাবু সস্ত্রীক একদিন স্থানীয় ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করিবার পর খবর আসিল যে, পরদিন সকালে আসিলে পর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এই ঘটনায় তিনি অত্যন্ত অপমানবোধ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখিয়াছিলেন,

"আমাদেরই দেশের লোকের দোষ তারা পেটের দায়ে মানের দায়ে উমেদারী করতে সেলাম করতে যায়, সাহেবের আদিষ্ট সময়ে দ্বারদেশে অপেক্ষা করে থাকে সুতরাং, আমি বঙ্গনামধারী এক ব্যক্তি যে আস্ফালন করে ম্যাজিস্ট্রেট এবং ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নীর উপর সামাজিক কর্তব্যরক্ষাস্বরূপ 'কল' করতে যাব এ তাদের মনেও হয় নি।···পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট আমার সঙ্গে পরদিন সাক্ষাৎ করলে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করলে আমি কি তাতে ভারি খুসি হয়েছিলুম?···নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে বড় বেশি স্পষ্ট অভিমান প্রকাশ করা হয় এবং তাতে যথার্থ অভিমানের খর্বতা হয়—তা ছাড়া বিহারীবাবুদের বিশেষ ক্ষুণ্ণ করা হয়।"

উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহেই আছেন। মাঝখানে রাজসাহীতে লোকেন পালিতের কাছে যান, আবার বর্ষশেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে কলিকাতাও যাইতে হয়। কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টির দিক হইতে এই সময় তাঁহার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রচনার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে,—'সোনার তরী', 'পঞ্চভূতের ডায়েরি', 'চিত্রাঙ্গদা', 'গোড়ায়-গলদ', 'বিদায়-অভিশাপ' ইত্যাদি।

ভাদ্র মাসের (১৩০০) প্রথমদিকে কবি কলিকাতায় আসিলেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি লইয়া কলিকাতায় তখন খুব উত্তেজনা চলিতেছে। এই সময়ই চৈতন্য লাইব্রেরিতে এক জনসভায় তিনি 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রকে পূর্বাহ্ণেই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া শোনাইতে হইয়াছিল। খুব সম্ভবত বক্তৃতার কোনো অংশ

সিডিশন্ পর্যায়ে পড়ে কিনা তাহা জানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি শুনিবার পর অবশ্য তিনি সানন্দে সভাপতিত্ব করিতে রাজী হইয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধে ইংরাজ জাতির বর্ণবিদ্বেষ ও জাতীয় আত্মম্ভরিতা বর্ণনা করিতে গিয়া প্রথমেই তিনি ম্যাথু আর্নল্ড-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিলেন,

"There is nothing like love and admiration of bringing people to a likeness with what they love and admire ; but the Englishman seems never to dream of employing these influences upon a race he wants to fuse with himself. He employs simply material interests for his work of fusion ; and, beyond these nothing except scorn and rebuke. Accordingly there is no vital union between him and the races he has annexed."

ভারতে ইংরাজের স্বরূপ ইহা অপেক্ষাও ভয়াবহ। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"ইংরেজও আপনার চরিত্রের মধ্যে ঔদ্ধত্যকে যেন কিছু বিশেষ গৌরবের সহিত পালন করে। তাহার দ্বৈপায়ন সংকীর্ণতার মধ্যে সে যে অটল, এবং ভ্রমণ অথবা রাজত্ব উপলক্ষে সে যাহাদের সংস্রবে আসে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার যে কিছুমাত্র প্রয়াস পায় না, সাধারণ "জন"-পুঙ্গব এই গুণটিকে মনে মনে কিছু যেন শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে। তাহার ভাবখানা এই, ঢেঁকি যেমন স্বর্গেও ঢেঁকি তেমনি ইংরেজ সর্বত্রই খাড়া ইংরেজ, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবার জো নাই।

"আমাদের কোনো শত্রুর উপদ্রব নাই, বিপদের আশঙ্কা নাই, কেবল বুকের উপর অকস্মাৎ সেই বুটটা আসিয়া পড়ে। তাহাতে আমরা বেদনা পাই…কিন্তু ইংরেজ সর্বত্রই ইংরেজ, কোথাও সে আপনার বুটজোড়াটা খুলিয়া আসিতে রাজি নহে।"

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য,—ইংরাজ কোথাও ভারতবাসীর অন্তরলোকে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে না—অন্তর জয় করা তো দূরের কথা বরঞ্চ দূর হইতে এদেশীয়দের ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তিনি বলিলেন,

" ‥মানুষ তো জড়যন্ত্র নহে যে তাহাকে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়া যাইবে ; এমন কি পতিত ভারতবর্ষেরও একটা হৃদয় আছে এবং সে হৃদয়টা সে তাহার জামার আস্তিনে ঝুলাইয়া রাখে নাই।…

"…মানুষের অত্যন্ত কাছে যাইবার যে ক্ষমতা সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা।

"ইংরেজের বিস্তর ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেইটি নাই। সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে, কিন্তু কিছুতেই কাছে আসিতে চাহে না। কোনোমতে উপকারটা

সারিয়া ফেলিয়া অমনি তাড়াতাড়ি সরিতে পারিলে বাঁচে। তাহার পরে সে ক্লাবে গিয়া পেগ খাইয়া বিলিয়ার্ড খেলিয়া অনুগৃহীতদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগ-পূর্বক তাহাদের বিজাতীয় অস্তিত্ব শরীরমনের নিকট হইতে যথাসাধ্য দূরীকৃত করিয়া রাখে।"

এদেশীয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ ও রাজপুরুষদের আচরণ, ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করিতে গিয়া বলিলেন,

"সর্ব-প্রথম সংকট বর্ণ লইয়া। শরীরের বর্ণ টা যেমন ধুইয়া-মুছিয়া কিছুতেই দূর করা যায় না তেমনি বর্ণসম্বন্ধীয় যে সংস্কার সেটা মন হইতে তাড়ানো বড়ো কঠিন। শ্বেতকায় আর্যগণ কালো রঙটাকে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। ···কথাটা সকলেই বুঝিবেন। শ্বেত-কৃষ্ণে যেন দিনরাত্রির ভেদ। শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত, কর্মশীল, অনুসন্ধানতৎপর ; আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিশ্চেষ্ট, কর্মহীন, স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট।···কথাটা এই যে, কালো রঙ দেখিবামাত্র শ্বেতজাতির মন কিছু বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না।

"তার পরে বসনভূষণ-অভ্যাস-আচারে প্রত্যেক বিষয়েই এমন-সকল বৈসাদৃশ্য আছে যাহা হৃদয়কে কেবলই প্রতিহত করিতে থাকে।

"তাহার পরে, আমাদের মধ্যে ইংরেজেরা যেভাবে আমাদের সম্বন্ধে বলা-কহা করে, চিন্তামাত্র না করিয়া আমাদের প্রতি যে-সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করে, এবং আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে না জানিয়াও আমাদের যে-সমস্ত কুৎসাবাদ করিয়া থাকে, প্রত্যেক সামান্য কথাটিতে আমাদের প্রতি যে বদ্ধমূল অপ্রেম প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নবাগত ইংরেজ অল্পে অল্পে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না।"

এইসব ইংরাজ রাজপুরুষদের হাতে লাঞ্ছনা ও অপমান কী নিরুপায় ও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে দিনের পর দিন দেশবাসীকে ভোগ করিতে হইতেছে, তাহারই করুণ বিবরণ দিতে গিয়া তিনি এক জায়গায় বলিলেন,

"···কে না জানে, দরিদ্র বাঙালি কর্মচারীগণ কতদিন সুগভীর নির্বেদ এবং সুতীব্র ধিক্‌কারের সহিত আপিস হইতে চলিয়া আসে, তাহাদের অপমানিত জীবন কী অসহ্য দুর্ভর বলিয়া বোধ হয়—সে তীব্রতা এত আত্যন্তিক যে, সে অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে, কিন্তু তথাপি তাহার পরদিন যথাসময়ে ধুতির উপর চাপকানটি পরিয়া সেই আপিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেই মসীলিপ্ত ডেস্কে চামড়ায় বাঁধানো বৃহৎ খাতাটি খুলিয়া সেই পিঙ্গলবর্ণ বড়োসাহেবের রূঢ় লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতে থাকে। হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া

সেকি এক মুহূর্তে আপনার বৃহৎ সংসারটিকে ডুবাইতে পারে।...আমরা প্রাণ দিতে উদ্যত হইলে অনেকগুলি নিরুপায় নারী, অনেকগুলি অসহায় শিশু ব্যাকুল বাহু উত্তোলন করিয়া আমাদের কল্পনাচক্ষে উদিত হয়।..."

তারপর এদেশের ইংরাজ সংবাদপত্রগুলির ও ইংরাজ সাহিত্যিক-কবিদের ভারত-বিদ্বেষের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,

"তাহার পরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইংরেজি খবরের কাগজ আমাদের প্রতিকূলপক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে। চা রুটি এবং আণ্ডার সহিত আমাদের নিন্দাবাদ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ছোটো হাজরির অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।...

"ইংরেজ কবিগণ গ্রীস ইটালি হাঙ্গেরি পোলাণ্ডের দুঃখে অশ্রুমোচন করিয়াছেন। আমরা ততটা অশ্রুপাতের অধিকারী নহি, কিন্তু এ-পর্যন্ত মহাত্মা এড্‌বিন্‌ আর্নল্‌ড্‌ ব্যতীত আর কোনো ইংরেজ-কবি কোনো প্রসঙ্গ উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি ব্যক্ত করেন নাই।...

"ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দের লইয়া আজকাল ইংরেজি নভেল অনেকগুলি বাহির হইতেছে। শুনিতে পাই, আধুনিক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাড্‌ইয়ার্ড কিপ্‌লিং প্রতিভায় অগ্রগণ্য। তাঁহার ভারতবর্ষীয় গল্প লইয়া ইংরাজ পাঠকেরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন।

"উক্ত গল্পগুলি পড়িয়া তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত ইংরেজ কবির মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি। সমালোচনা উপলক্ষে এড্‌মণ্ড গস্‌ বলিতেছেন,

'এই-সকল গল্প পড়িতে পড়িতে ভারতবর্ষীয় সেনানিবাসগুলিকে জনহীন বালুকা-সমুদ্রের মধ্যবর্তী এক-একটি দ্বীপের মতো বোধ হয়। চারি দিকেই ভারতবর্ষের অপরিসীম মরুময়তা—অখ্যাত, একঘেয়ে, প্রকাণ্ড। সেখানে কেবল কালা আদমি, পারিয়া কুকুর, পাঠান এবং সবুজ বর্ণের টিয়া পাখি, চিল এবং কুম্ভীর এবং লম্বা ঘাসের নির্জন ক্ষেত্র। এই মরুসমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বীপে কতকগুলি যুবাপুরুষ বিধবা মহারানীর কার্য করিতে এবং তাঁহার অধীনস্থ পূর্বদেশীয় ধনসম্পদপূর্ণ বর্বর সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সুদূর ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছে।'

"ইংরেজের তুলিতে ভারতবর্ষের এই শুষ্ক শোভাহীন চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া মন নৈরাশ্যে বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষ তো এমন নয়। কিন্তু ইংরেজের ভারতবর্ষ কি এত তফাত।"

ঐ প্রবন্ধে তিনি ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের রূপটি খুলিয়া ধরিলেন,

"ইংলণ্ড্‌ উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গরুটির মতো দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কার রাখিতে এবং খোলবিচালি জোগাইতে

কোনো আলস্য নাই, এই অস্থাবর সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয় সে পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখনো দৌরাত্ম্য করে সেজন্য শিং দুটা ঘষিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই···। ···আর, হতভাগ্য ভারতবর্ষের কোথাও একটা হৃদয় আছে এবং সেই হৃদয়ের সঙ্গে কোথাও একটু যোগ থাকা আবশ্যক সে কথার কোনো আভাসমাত্র থাকে না। ভারতবর্ষ কেবল হিসাবের খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাতের দ্বারায় নির্দিষ্ট। ইংলণ্ডের প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকের কাছে ভারতবর্ষের কেবল মন-দরে সের-দরে টাকার দরে সিকার দরে গৌরব।···ভারতবর্ষের সহিত যদি কেবল তাহার স্বার্থের সম্পর্কই দৃঢ় হয় তবে যে শ্যামাঙ্গিনী গাভীটি আজ দুধ দিতেছে কালে গোপকুলের অযথা বংশবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে তাহার লেজটুকু এবং ক্ষুরটুকু পর্যন্ত তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। এই স্বার্থের চক্ষে দেখা হয় বলিয়াই তো ল্যাঙ্কাশিয়র নিরুপায় ভারতবর্ষের তাঁতের উপর মাশুল বসাইয়াছে আর নিজের মাল বিনা মাশুলে চালান করিতেছে।”

অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, রবীন্দ্রনাথ যখন বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে সারা জাতির লাঞ্ছনা ও অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়া ইংরাজকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া একটির পর একটি অভিযোগ করিতেছেন তখন কিন্তু কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে উহার স্বপক্ষে কোনো কথা বলিতে শোনা গেল না। ইংরাজ জাতির ন্যায়পরতা ও মহানুভবতার উপর কংগ্রেসের তখনও অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজী বলিলেন,

"...I for one have not the shadow of a doubt that in dealing with such justice-loving, fair-minded people as the British, we may rest fully assured that we shall not work in vain. It is this conviction which has supported me against all difficulties. I have never faltered in my faith in the British character and have always believed that the time will come when the sentiments of the British Nation and our Gracious Sovereign proclaimed to us in our Great Charter of the Proclamation of 1858 will be realised, viz—'In their prosperity will be our strength, in their contentment our best reward.' "

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. p. 159]

রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের এই আবেদন-নিবেদন—এই বক্তৃতা ও বাগাড়ম্বরকে লক্ষ্য করিয়া ঐ প্রবন্ধে বলিলেন,

“আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কী অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইলাম। কেবল

বক্তৃতা এবং আবেদন? কী বর্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি। কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই-বা কাজ চলে এবং কতটুকুই-বা ফল হয়।"

অবশ্য তখনও তিনি পরিষ্কার কোনো পথ দেখিতে পাইতেছিলেন না। তিনি জাতিকে পাণ্ডবদের ন্যায় অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া বল সঞ্চয় করিতে বলিলেন,

"আমাদেরও এখন আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণের অবস্থা, এখন আমাদের অজ্ঞাতবাসের সময়।"

যে ইংরাজ প্রতি মুহূর্তে আমাদের অপমান করিতেছে তাহাদের হইতে সর্বতোভাবে দূরে থাকিবার তিনি পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন,

"অতএব, সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া রাজাপ্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে, ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট কর্তব্যসকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না।…আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত, সম্মানের সহিত, রাজসাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।"

[ইংরেজ ও ভারতবাসী—রবীন্দ্র-রচনাবলী: ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৩৭৯-৪০২]

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না—সক্রিয়ভাবে রাজনীতি তিনি কখনও করেন নাই। কিন্তু জাতীয় নিগ্রহ ও অবমাননার কাঁটাগুলি অহরহ তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে। মানসিক যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিলে তীব্র ও কঠোর ভাষায় উহার নিন্দা ও প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। স্মরণ রাখা দরকার—সেটা 'সোনার তরী'র যুগ। 'পুরস্কার' বা 'মানস-সুন্দরী'র কবির পক্ষে কী করিয়া 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' লেখা সম্ভব, তাহা ভাবিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না।

ইহার কিছুকাল পরে সাধনার সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'ইংরেজের আতঙ্ক' (সাধনা, ১৩০০ পৌষ) নামক প্রবন্ধটি লিখিলেন।

১৮৯০ সালের 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল বিলে'র আন্দোলনের পর হইতেই কংগ্রেস ক্রমশই এদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। বলা বাহুল্য, ইংরাজ সরকার ইহাকে খুব ভালো চোখে দেখিতে পারিল না। সরকারপক্ষ হইতে নানা উপায়ে—নানা কৌশলে ভারতের এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও নবজাগ্রত জাতীয় ঐক্য-চেতনায় ফাটল ও বিরোধ বাধাইবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ইংরাজ সরকার এই কথাটা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধটি যদি পাকা-পোক্ত

করা যায়, এ দেশে ইংরাজ-শাসনের বনিয়াদটিও তাহা হইলে চিরস্থায়ী হইয়া উঠিবে। কংগ্রেসের সূচনাকাল হইতেই কংগ্রেস হইতে মুসলমান সমাজ যে কিছুটা দূরে দূরে থাকিতে লাগিলেন, তাহার গূঢ় কারণ সকলের নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠিল। এমন সময় ইংরাজের হাতে একটি সুবর্ণ সুযোগ আসিয়া গেল।

এই সময় মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে এক নব হিন্দু-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তিনিই সার্বজনীন গণপতি উৎসবের প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং এই উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়া উহাকে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের দিকে প্রসারিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তৎকালীন অন্যান্য জাতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ন্যায় তিলকও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতেই চিন্তা করিতেছিলেন। জাতীয় ঐক্য বলিতে তিনি সমগ্র ভারতের হিন্দু জাতির ঐক্য বুঝিতেন। এই সময় তিনি 'গোরক্ষণী সভা' আন্দোলন অর্থাৎ গোরক্ষা সম্বন্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কারকে উদ্বোধিত করিয়া হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিতে চাহিলেন। বলা বাহুল্য,—এই গোরক্ষা আন্দোলন রাজনীতিবিদের চোখে নিঃসন্দেহ অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া বিবেচিত হইবে কিন্তু ঐতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিলে সে যুগে ইহার অবদান কম নয়। তবে এই আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায় যতখানি আশঙ্কিত ও উত্তেজিত না হইয়াছেন ইংরাজ সরকার তাহার সহস্র গুণ বেশী বিপদ ও আশঙ্কা গণিতে লাগিলেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কথা চিন্তা করিয়া। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বোম্বাই বিহার উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাধিয়া গেল। এই বিরোধের পশ্চাতে একটি অদৃশ্য হস্তও পরিষ্কার দেখা গেল।

ইহারই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের আতঙ্ক নামক প্রবন্ধটি লিখিলেন।

ইংরাজের আতঙ্কের পরিণাম যে কী মর্মান্তিক হইতে পারে,—একটি ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহকে রবীন্দ্রনাথ কী চোখে দেখিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পাঠকের কৌতূহল হওয়া স্বভাবিক। তাহা ছাড়া ইহা প্রসঙ্গবহির্ভূত হইবে না বিবেচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেণ্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরেজ সাঁওতালকে ভালো করিয়া চিনিত না। তাহারা কী চায়, কেন বাহির হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিল না।

এ দিকে পথের মধ্যে পুলিশ তাহাদের সহিত লাগিল, আহারও ফুরাইয়া গেল—পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গবর্মেণ্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিস্যাৎ করিতে লাগিল।

"এই ঘটনার উপলক্ষে হাণ্টার-সাহেব বলেন, ভারতবর্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-সম্প্রদায়ের সংখ্যা অল্প এবং তাহারা বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতীয় অধিবাসীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।···যখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ এইরূপ কোনো কারণে অকস্মাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে তখনই গবর্মেণ্টের মাথা ঠাণ্ডা রাখা বিশেষরূপে আবশ্যক হয়।···

"উপরি-উক্ত সাঁওতাল-উপপ্লবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমত সমাধা করিয়া এবং বীরভূমের রাঙা মাটি সাঁওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরেজ-রাজ হতভাগ্য বন্যদিগের দুঃখনিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আওয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভালো করিয়া শুনিলেন তখন বুঝিলেন, তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে।···"

বলা বাহুল্য, সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিবরণ ও তথ্য নির্ভুল নহে। অবশ্য তখনও পর্যন্ত সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা হয় নাই। কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল কারণটির কথা বিবেচনা করিয়া কবি নিরীহ সাঁওতাল কৃষকদের প্রতি যে মর্মবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন তাহাও লক্ষ্য করিবার মত। সমকালীন আর কোনো কবি সাহিত্যিক বা নেতৃস্থানীয়কে সেটুকুও সমবেদনা জানাইতে দেখা যায় নাই।

যাহাই হউক, উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"ইংরেজ যখন কোনো কারণে আমাদিগকে ভয় করে তখনই সেটা আমাদের পক্ষে বড়ো ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়—তখনই ভয়ের কম্পনে দয়ামায়া সুবিচার আপাদমস্তক টলমল করিতে থাকে।

"ইংরেজ হঠাৎ কন্‌গ্রেসের মূর্তি দেখিয়া প্রথমটা আচমকা ডরাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণ, মানুষ চিরসংস্কারবশত স্বদেশী জুজুকে যতটা ভয় করে, বিদেশী বিভীষিকাকে ততটা নহে। এইজন্য ভারতবর্ষের সুখশয়নাগারে হঠাৎ সেই পোলিটিক্যাল জুজুর আবির্ভাব দেখিয়া ইংরেজের সুস্থ প্লীহাও চমকিয়া উঠিয়াছিল।

"কিন্তু কন্‌গ্রেসটার উপরে প্রত্যক্ষভাবে কোনোরূপে আঘাত করা হয় নাই।···

"···এই নবনির্মিত জাতীয় জয়ঢাকের উপরে কাঠি না মারিয়া তাহাকে তলে তলে ছিদ্র করিবার আয়োজন করা হইল। মুসলমানেরা প্রথমে কন্‌গ্রেসে যোগ দিবার উপক্রম করিয়া সহসা যে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তাহার কারণ বোঝা নিতান্ত কঠিন নহে,······

"কিন্তু এতদিনে ইংরেজ এ কথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিক্‌স্ তেমন মারাত্মক নহে।···মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কন্‌গ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।

"কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজের ভারত-শাসনক্ষেত্রে আর একটা নূতন ভয় আসিয়া দেখা দিয়াছে। সেটা আর কিছু নয় গোরক্ষণী সভা। যাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই সভাটি স্থাপন করা হইয়াছে তাহারা যতটা নিরীহ, সভাটাকে ততটা নিরীহ বলিয়া ইংরেজের ধারণা হইল না।

"কারণ ইংরেজ ইহা বুঝিয়াছে যে স্বদেশ ও স্বজাতি-রক্ষার জন্য যে হিন্দু এক হইতে পারে না, গোষ্ঠ এবং গোজাতি-রক্ষার জন্য চাই কি তাহারা এক হইতেও পারে।···

"এই কারণে গোরক্ষণী সভাটা ইংরেজের পক্ষে কিছু বিশেষ আতঙ্কজনক হইতে পারে। ফলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।"

সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, এই গোরক্ষণী আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো আস্থা বা সহানুভূতিও নাই। আসলে ইহার অজুহাতে সরকারপক্ষ হইতে যে সব হীন জঘণ্য অপকৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে তিনি তাহারই সমলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন,

"কিন্তু গবর্মেণ্ট বলিতে যে কাহাকে বুঝায় আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।··· স্যর ওয়েডারবর্ন লিখিয়াছেন, এই-সমস্ত উপদ্রবে গবর্মেণ্টের কিছু হাত আছে; ল্যান্সডাউন বলেন, এমন কথা যে বলে সে অত্যন্ত দুষ্ট। আমরা ইহার একটা সামঞ্জস্য করিয়া লই।···

"হিন্দুমুসলমানে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্মেণ্টের পলিসি-সম্মত না হইতে পারে, কিন্তু গবর্মেণ্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরেজ বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে যে এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে, আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস। তুলার বস্তার মধ্যে আগুন ফেলিয়া যখন সমস্তটা ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল তখন প্রবল পদাঘাতের দ্বারা সেটা নির্বাণ করা হইতেছে; তুলা বেচারি একে তো পুড়িল, তাহার পরে লাথিটাও অপর্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে হইল।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫৩৭-৪১]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ-নীতিকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাকে বিদ্রূপও করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না। তাহা হইতেছে, গোরক্ষার মত একটি কুসংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া যখন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও

মনোমালিন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্ররোচিত এবং উত্তেজিত হইতেছে, এবং যে সময় নাকি হিন্দু-মুসলিম জাতীয় ঐক্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিবেচিত হইতেছে, তখনও তিনি ইহার প্রতিবাদ করিলেন না। অথচ প্রাচীন সংস্কার-পন্থীদের বহু প্রতিক্রিয়াশীল মতামতকে তিনি তর্ক ও যুক্তির দ্বারা খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করিয়াছেন। মনে হয়, সম্ভবত এই আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক তিলকের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাভাব বশতই তিনি উহার প্রত্যক্ষ সমালোচনা করিলেন না।

এমন সময় দক্ষিণ-আফ্রিকায় 'ম্যাটাবিলি-যুদ্ধে'র খবর আসিয়া পৌছিল। 'ট্রুথ' (Truth) নামে একটি বিলাতী সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে তিনি ম্যাটাবিলি-যুদ্ধের কিছু কিছু সংবাদ পাইলেন।

সে এক উদ্দাম সাম্রাজ্য-বিস্তারের যুগ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মনী, রাশিয়া, প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার আপন আপন উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া আফ্রিকার স্বর্ণ ও খনিজ সম্পদ এবং কাঁচামালের লোভে বিশাল আফ্রিকা মহাদেশটিকে আপনাদের মধ্যে ভাঁগ-বাটোয়ারা করিয়া লইবার তীব্র প্রতিযোগিতা পড়িয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অধিক তৎপর হইয়া উঠে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংলণ্ডের একমাত্র কেপ-কলোনির উপর অধিকার ছিল; ১৮৭০ হইতে ১৯০০—এই কয় বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ড আস্তে আস্তে নাটাল, রোডেসিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, গোল্ডকোস্ট, সোমালিল্যাণ্ড, উগাণ্ডা ও মিশর দখল করিয়া লয়। আমাদের আলোচ্য পর্বে, ইংরাজ-সৈন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাটাবিলিদের এবং মিশর-বিদ্রোহ (আরবি পাশার নেতৃত্বে)-কে উৎখাত করিতে ব্যস্ত। 'ট্রুথ' পত্রিকায় ঐ বিবরণ পড়িয়া ইউরোপীয় শক্তিগুলির উন্মত্ত-সাম্রাজ্য-লালসা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কী প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল দেখা যাক। সাধনা পত্রিকায় 'রাজনীতির-দ্বিধা' নামক একটি প্রবন্ধে (সাধনা, ১৩০০ চৈত্র) তিনি লিখিতেছেন,

"য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য, যত সদয়, যত ন্যায়পর, বাহিরে ততটা নহে, এ-পর্যন্ত ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।···

"সভ্য খৃস্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অস্ট্রেলিয়ায় কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না! দক্ষিণ-আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি-যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, অখৃস্টানের গালে খৃস্টানি চড় কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

"...ট্রুথ-নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়েকটি পত্র ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

"পাঠ করিয়া যে কেহ বিশেষ আশ্বস্ত হইবেন বা আনন্দলাভ করিবেন এরূপ আশা দিতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝিতে পারিবেন, সভ্য জাতি যাহাকে আপনার অপেক্ষা অল্প সভ্য জ্ঞান করে তাহার নিকট আপন সভ্যতাকে এবং সেই সঙ্গে সেই অসভ্যটাকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। উনিশ শত বৎসরের চিরসঞ্চিত সভ্যনীতি য়ুরোপীয় আলোকিত নাট্যমঞ্চের বাহিরে অন্ধকার নেপথ্যদেশে ক্ষণপরিহিত ছদ্মবেশের মতো খসিয়া পড়ে; এবং সেখানে যে আদিম উলঙ্গ মানুষ বাহির হইয়া পড়ে উলঙ্গ ম্যাটাবিলি তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

"...বর্বর লবেঙ্গুলা ইংরেজদের প্রতি ব্যবহারে যে উদারতা এবং উন্নত বীর-হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে, ইংরেজদের ক্রূর ব্যবহার তাহার নিকট লজ্জায় ম্লান হইয়া রহিয়াছে, ইংরেজদের পত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।"

বিলাতী সংবাদপত্রেই ইংরাজ সাম্রাজ্যনীতির সমালোচনা করিতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের ধারণা হইল, ইংলণ্ডের একশ্রেণীর মধ্যে ন্যায় ও বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে। তাঁহার ধারণা, "ইংরেজের যখন গৌরবের মধ্যাহ্নকাল ছিল তখন নীতির সূক্ষ্ম গণ্ডিগুলা এক লম্ফে সে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিত। যখন আবশ্যক তখন অন্যায় করিতে হইবে।" কিন্তু এখন ইংরাজ তাহা নির্বিচারে করিতে পারে না, এখন আর সে দম্ভ করিয়া বলিতে পারে না, "কিসের ম্যাটাবিলি, কেই-বা লবেঙ্গুলা। আমি ইংরেজ, আমি তোমার সোনার খনি, তোমার গরুর পাল লুঠিতে ইচ্ছা করি।" এখন তাহাকে সমালোচনা ও বিবেকবুদ্ধির সম্মুখীন হইতে হয়। তাহারই জন্য তাহাকে নানা ছল, নানা কৌশল, নানা মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়। তিনি বলিলেন,

"এইজন্য আমাদের কর্তৃজাতীয়দের মধ্য হইতে আজকাল দুই সুরের গলা শুনা যায়। একদল প্রবলতার পক্ষপাতী, আর একদল প্রেম এবং শান্তি এবং সুবিচার জগতে বিস্তার করিতে চাহে।

"...আজকাল ভারতবর্ষীয় ইংরেজ-সম্প্রদায় ইহাই লইয়া সুতীব্র আক্ষেপ করে। তাহারা বলে, আমরা জোরের সহিত যে কাজটা করিতে চাই, ইংলণ্ডীয় ভ্রাতারা তাহাতে বাধা দিয়া বসে, সকল কথাতেই নৈতিক কৈফিয়ত দিতে হয়। যখন দস্যু ড্রেক সমুদ্রদিগ্‌বিজয় করিয়া বেড়াইত, যখন ক্লাইভ ভারতভূমিতে ব্রিটিশ ধ্বজা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল, তখন নীতির কৈফিয়ত দিতে হইলে ঘরের বাহিরে ইংরেজের ছেলের এক ছটাক জমি মিলিত না।

"কিন্তু এমন করিয়া যতই বিলাপ কর, কিছুতেই আর সেই অখণ্ড দোর্দণ্ড বলের বয়সে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। এখন কোনো জুলুমের কাজ করিতে বসিলেই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটা দ্বিধা উপস্থিত হইবে। এখন যদি নিপীড়িত ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে তবে স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকিলেও নিদেন গুটিকতক লোকও তাহার সদ্‌বিচার করিতে উদ্যত হইবে।···এইজন্য বিদেশে ইংরেজ আজকাল কিঞ্চিৎ দুর্বল, এবং সেজন্য সে সর্বদা অধৈর্য প্রকাশ করে।"

বুঝা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথ তখনও ইংলণ্ডের একশ্রেণীর ন্যায় ও বিবেকবুদ্ধির উপর কিছুটা আস্থা রাখিতেছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের কোনো কার্যকরী ক্ষমতার উপর অতিরিক্ত মোহও রাখিতেন না। তিনি মনে করিতেছেন, ইংরাজ জাতির একটি বিষম মানসিক সংকট উপস্থিত হইয়াছে,

"এক হিসাবে ইহার মধ্যে কতকটা শোচনীয়তা আছে। এ দিকে ক্ষুধার জ্বালাও নিবারণ হয় নাই, ও দিকে পরের অন্নও কাড়িতে পারিবে না, এ এক বিষম সংকট।···অপরপক্ষে পেট, ভরিয়া খাইতেও হইবে। ক্রমে বংশবৃদ্ধি ও স্থানাভাব হইতেছে এবং সভ্যতার উন্নতি-সহকারে জীবনের আবশ্যক উপকরণ অতিরিক্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।

"অতএব পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক, মোটা-বেতনের ইংরেজ কর্মচারীকে এক্সচেঞ্জের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সেই জন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্যদ্রব্যে মাশুল বসানো আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি ল্যাঙ্কাশিয়রের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় তবে তুলার উপর মাশুল বসানো যাইতে পারে। তৎপরিবর্তে বরঞ্চ পাবলিক ওয়ার্কস্‌ কিছু খাটো করিয়া এবং দুর্ভিক্ষ ফণ্ড্‌ বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।"

[রাজনীতির দ্বিধা—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪০৪-৮]

নানাদিক দিয়া এই প্রবন্ধটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাটাবিলি-যুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের ইংরাজ-শাসন, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে ; তিনি এখন সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক রূপটি দেখিতে পাইতেছেন। সাম্রাজ্যবাদকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা এদেশে এই প্রথম দেখা গেল। দ্বিতীয়ত আফ্রিকার নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের সহিত এই গভীর একাত্মতাবোধ ইতিপূর্বে এদেশে আর কোনো কবি, সাহিত্যিক কিংবা অন্য কোনো দেশনেতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। হতভাগ্য ম্যাটাবিলিদের প্রতি অকুণ্ঠ আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা বোধ হয় একমাত্র কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আসিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত কঠোর ও তীক্ষ্ণ ভাষায় সাম্রাজ্যবাদকে বিদ্রূপ করিলেন কিন্তু তবুও ইংলণ্ডের

বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উপর তাঁহার তখনও আস্থার ভাব বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিরোধ-সংগ্রামের কথা চিন্তা করিতে পারিতেছেন না (করা সম্ভবও নহে, কেননা সেটা সাম্রাজ্য প্রসারের যুগ)। তিনি দেখিতেছেন, ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর মধ্যে বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে। সেই জাগ্রত বিবেক-বুদ্ধির উপরও যেন ভরসা করিয়া বলিলেন,

"কিন্তু যতদিন ইংরেজ প্রকৃতির কোথাও এই সচেতন ধর্মবুদ্ধির প্রভাব থাকিবে, যতদিন তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সুকৃতি-দুষ্কৃতির একটি বিচারক বর্তমান থাকিবে, ততদিন আমাদের সভাসমিতি বাড়িয়া চলিবে; আমাদের সংবাদ-পত্র ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। ইহাতে আমাদের বলবান ইংরেজগণ বিফল গাত্রদাহে যতই অধীর হইয়া উঠিবে, আমাদের উৎসাহ এবং উদ্যমের আবশ্যকতা ততই আরও বাড়াইয়া তুলিবে মাত্র।" [ঐ—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪০৯-১০]

মুখে একথা বলিলেও রবীন্দ্রনাথ ভালো করিয়াই জানিতেন যে মুষ্টিমেয় দুই-চারিজন বিবেকী মানুষের কথায় ইংরাজ চলিবে না। ইংলণ্ডের রাজনীতি বা স্যাম্রাজ্যনীতি নির্ধারণে ইঁহাদের কোনোই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নাই। "ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন—"ইংরেজ সর্বত্রই খাড়া ইংরেজ—কোথাও সে আপনার বুট জোড়াটা খুলিয়া আসিতে রাজি নহে" কিংবা "ইংলণ্ডের প্র্যাক্‌টিকাল লোকের কাছে ভারতবর্ষের কেবল মণ-দরে, সের-দরে, টাকার-দরে, সিকার-দরে গৌরব।"

আসলকথা, রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের বিবেকী মানুষের উপর খুব বেশী ভরসা করিতেন না, যদিও তাঁহাদের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধার ভাব ছিল।

এবার ফিরাও মোরে ॥

সাম্রাজ্যবাদের এই বর্বরোচিত উলঙ্গ আত্মপ্রকাশ, কবির মনে এক গভীর উত্তেজনা ও আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিকে আর্ত ও নিপীড়িত মানুষের ক্রন্দনের মাঝে কবি আর 'মানসী' কিংবা 'সোনার তরী'র সুরে তার বাঁধিতে পারিলেন না। এই আর্ত জনস্রোত যেন কবির মানসসুন্দরীর জায়গা দখল করিয়া লইতে চাহিয়াছে—কবি যেন নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতেছেন। তাহারই গভীর প্রতিক্রিয়ায় লিখিলেন অমর কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে' (১৩০০, ২৩শে ফাল্গুন)। কবির জীবনে আজ সংগ্রামের ডাক আসিয়াছে।

"সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে। কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন্ অন্ধকার কারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়। স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার,···"

আবার তখনই যেন করুণ কণ্ঠে মিনতি করিয়া বলিতেছেন,

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর।···"

কাব্যের কল্পলোক হইতে নামিয়া আসিয়া কবি যেন কঠিন বাস্তবের সঙ্গে

সংগ্রামের জন্য আত্ম-প্রস্তুতি করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই সংগ্রামশীলতা (combativeness) অত্যন্ত সাময়িক;—পরবর্তী জীবনে মাঝে মাঝে এই সংগ্রামশীল মনটি প্রবল গর্জনে ফাটিয়া পড়িতে চাহিয়াছে। কিন্তু সক্রিয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হইতে পারিলেন না। সারা জীবন রবীন্দ্রনাথের মনে এই গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব—এই গভীর মর্মপীড়ন শুনিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা-আন্দোলনের যুগে 'এবার ফিরাও মোরে' দেশকর্মীদের মুখে মুখে ফিরিত। ঐতিহাসিক দিক হইতে কবিতাটি বাংলা কাব্যজগতে এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে। এই কবিতাতেই সর্বপ্রথম বাংলার দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিপীড়িত গ্রামবাসী জনতার একটি জলন্ত বাস্তব চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশকর্মীদেরও তিনি অঙ্গুলী-নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন এই জনতার দিকে,

"...ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্নখুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।..."

এই হইতেছে, বাংলাদেশের গ্রাম-জনতার জলন্ত বাস্তব চিত্র। ইহাদের কথা কেহ ভাবে না, ইহাদের কথা কেহ বলে না,—ইহাই কবির গভীর অন্তর্বেদনার কথা। কংগ্রেসের কর্মসূচীতে তখন এই জনতার কোনো স্থানও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ আত্ম-দীক্ষার ছলে দেশকর্মীদের সামনে এই 'জনতার কর্মসূচী' মেলিয়া ধরিলেন।

"...এই-সব মূঢ় ম্লান মূকমুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্তে তুলিয়া শির' একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;...'

তিনি বলিলেন,

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।..."

বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে কিংবা রাজনীতিতে এই কথা, এই সুর পূর্বে শোনা যায় নাই। দেশসেবকদের নৈতিক চরিত্র গঠনের আদর্শের ক্ষেত্রে বলিলেন

"মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রু জলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে,
তার কাছে জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি।..."

একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার মতো যে, রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন জাতীয়তাবাদী কবিদের মতো রাজস্থান কিংবা ভারতের ইতিহাস হইতে সামরিক শৌর্য ও বীরত্বের কোনো নজির খুঁজিতে যান নাই। তাঁহার আধ্যাত্মিক মানবতার আদর্শের সহিত যাঁহাদের চরিত্রের মিল আছে—সেই বুদ্ধ, অশোক, হর্ষ, চৈতন্যদেবের আদর্শকেই দেশসেবকদেব সম্মুখে মেলিয়া ধরিলেন।

কিছুকাল পরে 'রাজা ও প্রজা' নামক একটি প্রবন্ধে (সাধনা, ১৩০১ চৈত্র) রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের ভারতবিদ্বেষী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করিলেন। যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ লিখিলেন তাহা কবির ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া দেওয়াই শ্রেয়।

"সিভিলিয়ান রাডীচি-সাহেব আইনলঙ্ঘনপূর্বক উড়িষ্যার কোনো-এক জমিদারকে অপমান ও পীড়ন করাতে তৎকালীন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নর ম্যাক্‌ডোনেল-সাহেব অন্যায়কারীকে একবৎসরের জন্য নিগৃহীত করিয়াছিলেন।...

"অনতিকাল পরেই ম্যাক্‌ডোনেল-সাহেব যখন যথাসময়ে এলিয়ট সাহেবকে তাঁহার গদি ছাড়িয়া দিলেন তখন এলিয়ট আসিয়া ম্যাক্‌ডোনেলের বিচারলঙ্ঘন-পূর্বক রাডীচিকে নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিয়া উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।..."

তখন, প্রতিদিনই এমন কত ঘটনাই না ঘটিত।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের সহিত এদেশীয় ইংরাজদের একটি পার্থক্য দেখিতেছিলেন। এদেশীয় ইংরাজদের সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

"...স্বার্থের সহিত, ক্ষমতাগর্বের সহিত, পরাধীন দুর্বল জাতির নৈতিক আদর্শের সহিত, পরজাতিশাসনতন্ত্রের বিবিধ কুটিলতার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষীয় ইংরেজের একটা বিশেষ স্বতন্ত্র নূতন কর্তব্যনীতি গঠিত হইতে থাকে, তাহাকে অনেক সময় ইংলণ্ডের ইংরেজ ভালো করিয়া চেনে না।...

"দৃষ্টান্তস্বরূপে রাড্‌ইয়ার্ড্‌ কিপ্‌লিঙের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার অসামান্য দক্ষতা। সেই ক্ষমতাবলে তিনি ইংরেজের কল্পনাচক্ষে প্রাচ্যদেশকে একটি বৃহৎ পশুশালার মতো দাঁড় করাইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের ইংরেজকে বুঝাইতেছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্ট একটি সার্কাস কম্পানি। তাঁহারা নানাজাতীয় বিচিত্র অপরূপ জন্তুকে সভ্যজগৎসমক্ষে সুনিপুণভাবে নৃত্য করাইতেছেন। সুতীক্ষ্ণ কৌতূহলের সহিত এই জন্তুদিগের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, যথাপরিমাণে চাবুকের সহিত ভয় এবং অস্থিখণ্ডের প্রলোভন রাখিতে হইবে এবং কিয়ৎপরিমাণ পশুবাৎসল্যেরও আবশ্যক আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে নীতি প্রীতি ও সভ্যতা আনিতে গেলে সার্কাস রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে এবং অধিকারী মহাশয়েরও বিপদের সম্ভাবনা।"

এইসব ভারতবিদ্বেষী ইংরাজ সাহিত্যিক ও রাজপুরুষদের আচরণ ও ব্যবহারে কবি যে কী পরিমাণ ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইতেছেন তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। স্বদেশ ও জাতির নিন্দা তিনি কোনোদিন সহ্য করিতে পারেন নাই। গর্বান্ধ সাম্রাজ্যবাদী-কবি কিপলিং-দের উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিলেন,

"রাড্‌ইয়ার্ড্‌ কিপ্‌লিং প্রভৃতি লেখকের লেখার মধ্যে যে একটি বলদর্প-মিশ্রিত নিষ্ঠুরতার আভাস অনুভব করা যায় তাহা হইতে মনে হয়, মানব মধ্যে মধ্যে সভ্যতার শততন্তুনির্মিত সূক্ষ্ম সুদৃঢ় জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আদিম অরণ্য প্রকৃতির বর্বরতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যে-এক সুতীব্র ক্ষমতা-মদিরার আস্বাদন পায় তাহাতে এই প্রচণ্ড মত্ততার সৃষ্টি করিতে পারে। এই প্রেমহীন কঠিন ক্ষমতাদম্ভ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের লেখনীতে অকৃত্রিম অসংকোচ পৌরুষ-আকারে একপ্রকার ভীষণ রমণীয়তা ধারণ করে; তাহা ইংরেজের পক্ষে সাহিত্য, কিন্তু আমাদের পক্ষে মৃত্যুর নিদান।"

তিনি বলিলেন,

"আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, কেবল ভারতবর্ষে নহে ইংলণ্ডেও ক্রমে ক্রমে এই ধারণা বিস্তৃত হইতেছে যে, য়ুরোপের নীতি কেবল য়ুরোপের জন্য। ভারতবর্ষীয়েরা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে, সভ্যনীতি তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে।

"এরূপ অবস্থায় আমাদের ন্যায়ান্যায়বোধ প্রবল হইয়া উঠিলে ইংরেজের রাজনীতি বিপথগামী হইতে পারিবে না। ইংরেজ যখন জানিবে সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার কাজের বিচার করিতেছে তখন ভারতবর্ষকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারিবে না।

"সম্প্রতি তাহার লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যাইতেছে।...তথাপি এখনও সম্পূর্ণ ফল ফলে নাই। আমাদের সম্বন্ধে সকল সময়ে সকল অবস্থায় নীতি মানিয়া চলাকে ইংরেজ দুর্বলতা-স্বীকার বলিয়া দেখে। আমাদের প্রতি অপরাধ করিয়া তাঁহাদের কেহ ন্যায়বিচারে দণ্ডনীয় হয় ইহা তাঁহারা লজ্জাজনক ও ক্ষতিজনক বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহারা মনে করেন, ভারতবর্ষীয়ের নিকট ইহাতে ইংরেজের জোর কমিয়া যায়।...বোধ করি রাভীচি-সাহেবের অসময়ে পদোন্নতি উপরিউক্ত পলিসিবশত।"

কিন্তু তাহা হইলে উপায় কি,—পথ কোথায়? তাহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন,

"যখন আমরা বহুকালব্যাপী পরাধীনতার বিষময় শিক্ষা ভুলিতে পারিব, যখন প্রবলের অন্যায়াচরণকে বিধির বিধানের স্বরূপ নী[illegible] অবশ্যসহ বলিয়া স্থির

করিব না, যখন অন্যায়ের প্রতিবিধান-চেষ্টা নিষ্ফল হইলেও তাহাকে কর্তব্য বলিয়া জানিব এবং সেজন্য ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হইব না, তখন আমাদের যথার্থ আনন্দের দিন উপস্থিত হইবে। তখন ব্রিটিশ গবর্মেন্টের ন্যায়পরতা কদাচ স্বার্থ পলিসি এবং ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হইবে না, অটল পর্বতের ন্যায় প্রজাহৃদয়ের দৃঢ়ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

[রাজা ও প্রজা—রবীন্দ্র রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫৪২-৪৮]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন অন্যান্য নেতাদের মতই ব্রিটিশ রাজত্বের উৎখাত বা স্বাধীনতার কথা তখনও চিন্তা করিতে পারিতেছেন না। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতো তিনিও ইংলণ্ডের ন্যায়নীতি ও সুবিচার ভারতবর্ষীয় প্রজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করিয়া তুলিবার কথা চিন্তা করিতেছেন।

'জুরি-বিচার' পুনঃপ্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশে তখনও আন্দোলন চলিতেছে। জুরি-বিচার-প্রথা প্রত্যাহার করিয়া লইয়া স্বপক্ষে এদেশীয় ইংরাজ সমাজ বার বার এই কথাটাই বলিয়া আসিতেছিলেন যে, এদেশীয় লোকের ধর্মনীতি ও ন্যায়নীতির উন্নত আদর্শ নাই—জুরি হইবার উপযুক্ত মানসিক ও চারিত্রিক গুণাবলী ইহাদের নাই। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের মুখে 'ন্যায়নীতি ও ধর্মনীতি'র বড়াই রবীন্দ্রনাথ সহ্য করিতে পারিলেন না। সাধনা পত্রিকায় 'অপমানের প্রতিকার' (সাধনা —১৩০১ ভাদ্র) নামক একটি প্রবন্ধে তিনি এদেশীয় ইংরাজ সমাজের ন্যায়-অন্যায় বোধ ও নৈতিক চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করিলেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে কটকে বিহারীলাল গুপ্তের বাড়িতে "র‍্যাভেন শ" কলেজের ইংরাজ অধ্যাপক যে ধরনের অশিষ্ট আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের শুরুতেই সেই ঘটনার অবতারণা করিয়া এদেশীয় ইংরাজ-চরিত্রের সমালোচনা করিলেন।

"আহারান্তে···প্রসঙ্গক্রমে জুরি প্রথার কথা উঠিল। ইংরেজ প্রোফেসর কহিলেন, যে দেশের লোক অর্ধসভ্য, অর্ধশিক্ষিত, যাহাদের ধর্মনীতির আদর্শ উন্নত নহে, জুরির অধিকার তাহাদের হস্তে কুফল প্রসব করে।

" আমাদের নৈতিক আদর্শ কত মাত্রা উঠিয়াছে অথবা নামিয়াছে জানি না, কিন্তু ইহা জানি, যাঁহার অতিথ্য ভোগ করিতেছি তাঁহার স্বজাতিকে পরুষ-বাক্যে অবমাননা করা আমাদের শিষ্টনীতির আদর্শের অনেক বাহিরে।

"অধ্যাপক মহাশয় আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, যেকথা কেবলমাত্র অমিষ্ট ও অশিষ্ট নহে, পরন্তু ইংরেজের মুখে অত্যন্ত অসংগত শুনিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, জীবনের পবিত্রতা, অর্থাৎ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করার পরম-

দূষণীয়তা সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা ইংরেজের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্পপরিমিত। সেইজন্য হত্যাকারীর প্রতি ভারতবর্ষীয় জুরির মনে যথোচিত বিদ্বেষের উদ্রেক হয় না।

"যাহারা মাংসাশী জাতি এবং যাহারা বিরাট হত্যাকাণ্ডের দ্বারা পৃথিবীর দুই নবাবিষ্কৃত মহাদেশের (এশিয়া ও আমেরিকা—লেখকের) মধ্যে আপনাদের বাসযোগ্য স্থান পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে, এবং সম্প্রতি তরবারির দ্বারা তৃতীয় মহাদেশের (আফ্রিকা মহাদেশ—লেখকের) প্রচ্ছন্ন বক্ষোদেশ অল্পে অল্পে বিদীর্ণ করিয়া তাহার শস্য-অংশটুকু সুখে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছে, তাহারা যদি নিমন্ত্রণ-সভায় আরামে ও স্পর্ধাভরে নৈতিক আদর্শের উচ্চ দণ্ডে চড়িয়া বসিয়া জীবনের পবিত্রতা ও প্রাণহিংসার অকর্তব্যতা সম্বন্ধে অহিংসক ভারতবর্ষকে উপদেশ দিতে থাকে তবে 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়াই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হয়।

"এই ঘটনা আজ বছর-দুয়েকের কথা হইবে। সকলেই জানেন, তাহার পরে এই দুই বৎসরের মধ্যে ইংরেজ-কর্তৃক অনেকগুলি ভারতবাসীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে এবং ইংরেজের আদালতে সেই-সকল হত্যাকাণ্ডে একজন ইংরেজেরও দোষ সপ্রমাণ হয় নাই। সংবাদপত্রে উপর্যুপরি এই-সকল সংবাদ পাঠ করা যায় এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি সেই মুণ্ডিতগুম্ফশশ্রু খড়্গনাসা ইংরেজ অধ্যাপকের তীব্র ঘৃণাবাক্য এবং জীবন-হনন সম্বন্ধে তাঁহাদের নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান মনে পড়ে। মনে পড়িয়া তিলমাত্র সান্ত্বনা লাভ হয় না।

"ভারতবর্ষীয়ের প্রাণ এবং ইংরেজের প্রাণ ফাঁসিকাষ্ঠের অটল তুলাদণ্ডে এক ওজনে তুলিত হইয়া থাকে ইহা বোধ হয় ইংরেজ মনে মনে রাজনৈতিক কুদৃষ্টান্তস্বরূপে গণ্য করে।"

জুরি-বিচার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজজাতির ন্যায়পরতা ও মহানুভবতার শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই পাড়িয়া তাহাদেরই পায়ের তলায় মাথা কুটিয়া কান্নাকাটি ও আবেদন-নিবেদন করিবে,—ইহাই ছিল সেযুগের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের ধারণা। এদেশেরই কেহ কেহ যে, তাহাদেরই বর্বরতা, দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার অভিযোগে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে পারেন, একথা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় কস্মিনকালেও কল্পনা করিতে পারে নাই।

সত্য সত্যই সে-যুগে অন্য কাহাকেও,—এমনকি কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকেও, জুরি-প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের স্বপক্ষে এই ধরনের যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলিতে শুনা যায় নাই। সে-যুগে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনগুলির সভাপতির

অভিভাষণে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না যে, এদেশীয় ইংরাজদের অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁহারা কোথাও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনা-কংগ্রেসে সভাপতি সুরেন্দ্রনাথকেই কেবল এই বিষয়ে কিছু বলিতে শোনা গেল। Criminal Cases Between Europeans And Indians—এই প্রশ্নে তিনি বলিলেন,

"In this connection I cannot help reffering to the deplorable instances of failure of justice in many criminal cases where Europeans are the accused and natives of India are the aggrieved party. It is a difficult and delicate matter to deal with ; but we have a right to appeal for help to all rightminded Englishmen interested in upholding the fair fame of British justice....Sir James Fitz-Stephens, a disciple of Carlyle,...declared from his place in the Supreme Legislative Council that a single act of injustice done or believed to be done was more disastrous to British rule than a great reverse on an Asiatic battle-field. It is because we know that this class of cases is creating a great deal of dissatisfaction and discontent among the masses and is weakening the hold of the Government upon them, that we feel it our duty to call prominent attention to that matter...."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. p. 239]

কংগ্রেসের এই বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির সহিত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কতখানি, পাঠক নিশ্চয়ই তাহা বুঝিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথ আরো বলিলেন,

"কিন্তু বারংবার য়ুরোপীয় অপরাধীর অব্যাহতি এবং তৎসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষীয়ের ঔদাসীন্যে ভারতবর্ষীয়ের প্রতি ইংরেজের আন্তরিক অবজ্ঞার পরিচয় দেয়। সেই অপমানের ধিক্কার শেলের ন্যায় স্থায়িভাবে হৃদয়ে বিঁধিয়া থাকে।··· প্রাচ্য ভারতবাসী যখন নিরর্থক গুলি খাইয়া, লাথি খাইয়া মরে তখন পাশ্চাত্য কর্তৃপুরুষদের কোনোপ্রকার দুর্ভাবনার লক্ষণ দেখা যায় না।···

"কিন্তু আমাদিগের প্রতি কর্তৃজাতীয়ের এই যে অবজ্ঞা, সেজন্য প্রধানত আমরাই ধিক্কারের যোগ্য। কারণ, একথা কিছুতেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না ; সম্মান নিজের হস্তে। আমরা সানুনাসিক স্বরে যে ভাবে ক্রমাগত নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে আমাদের আত্মমর্যাদার নিরতিশয় লাঘব হইতেছে।"

বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের ঐ আবেদন-নিবেদনের সুরকে আদৌ সমর্থন করিতেছেন না। প্রসঙ্গত তিনি দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। একটি ঘটনা এই যে, সেই খুলনার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বেল্‌-সাহেব সামান্য কারণে আদালতের একজন বাঙালী মুহুরিকে প্রহার করিয়া বসিলেন। নিরুপায় মুহুরি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন,—অন্য কেহ ইহার একটুও প্রতিবাদ করিলেন না। জাতির এই নির্বীর্য দাসসুলভ ক্লীবতা রবীন্দ্রনাথের অসহ্য বোধ হইল। উপরোক্ত মুহুরি-মারা মামলাটির প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,

…"কিন্তু ফরিয়াদির পক্ষের বাঙালি ব্যারিস্টার মহাশয় এই মকদ্দমা প্রসঙ্গে বারংবার বলিয়াছেন, মুহুরী-মারা কাজটা ইংরেজের অযোগ্য হইয়াছে, কারণ বেল্‌-সাহেবের জানা ছিল অথবা জানা উচিত ছিল যে, মুহুরী তাঁহাকে ফিরিয়া মারিতে পারে না।

"একথা যদি সত্য হয় তবে যথার্থ লজ্জার বিষয় মুহুরীর এবং মুহুরীর স্বজাতিবর্গের। কারণ, হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্বলতা কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্বলতা। একথা বলিতে পারি, মুহুরী যদি ফিরিয়া মারিত তবে বেল্‌-সাহেব যথার্থ ইংরেজের ন্যায় তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন।

"যথেষ্ট অপমানিত হইলেও একজন মুহুরী কোনো ইংরেজকে ফিরিয়া মারিতে পারে না, এই কথাটি ধ্রুবসত্যরূপে অম্লানমুখে স্বীকার করা এবং ইহারই উপরে ইংরেজকে বেশি করিয়া দোষার্হ করা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অনাবশ্যক এবং লজ্জাজনক আচরণ।

"মার খাওয়ার দরুন আইনমতে মুহুরীর যে-কোনো প্রতিকার প্রাপ্য তাহা হইতে সে তিলমাত্র বঞ্চিত না হয় তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার আঘাত এবং অপমান-বেদনার উপর সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া অজস্র পরিমাণে আহা-উহু করার এবং কেবলমাত্র বিদেশীকে গালিমন্দ দিবার কোনো কারণ দেখি না।…"

তিনি আরো বলিলেন, "এক বাঙালি যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালি যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকারসাধন বাঙালির নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না একথা যখন বাঙালি বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজেদের স্বভাবের মধ্যে। গবর্মেণ্ট কোনো আইনের দ্বারা, বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবেন না।"

'পুরস্কার', 'মানস-সুন্দরী' কিংবা 'উর্বশী'র কবি জাতিকে আজ এ কী নির্দেশ দিলেন! যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদকে নেহাত 'বৈষ্ণবী-মার্কা প্যান্‌সে-জ'লো' কিছু একটা মনে করিতেন, তাঁহারা কবির এই এক কথায় কিছুটা বিস্মিত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক।

আসলকথা, রবীন্দ্রনাথ জাতির কাপুরুষতা ও ক্লৈব্যকে কোনোদিনই সহ্য করেন নাই। তিনি জাতীয় মানস ও চরিত্রে একটি সর্বাত্মক নৈতিক দৃঢ়তা দান করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, আমাদের এই দাস-মনোবৃত্তি ও কাপুরুষতার মূল আরো গভীরে এবং সেই মূল আমাদের সমাজের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। জাতীয় জীবনের সেই অন্যায় ও ত্রুটিবিচ্যুতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া তিনি বলিলেন,

"বাঙালির প্রতি বাঙালি কিরূপ ব্যবহার করে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত, কারণ তাহারই উপর আমাদের সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে। আমরা কি আমাদের ভৃত্যদিগকে প্রহার করি না, আমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি ঔদ্ধত্য এবং নিম্ন-শ্রেণীস্থদিগের প্রতি সর্বদা অসম্মান প্রকাশ করি না। আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চে নীচে বিভক্ত; যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে।···ভদ্রলোকের নিকট 'চাষা-বেটা' প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে।···আমাদের সমাজে সর্বত্র অধস্তনের নিকট উচ্চতনের দাবির একেবারে সীমা নাই! স্তরে স্তরে প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে; তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতিমুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে।···

"গৃহের এবং সমাজের শিক্ষায় যখন আমরা সেই মনুষ্যত্ব উপার্জন করিতে পারিব তখন ইংরেজ আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে এবং অপমান করিতে সাহস করিবে না।" [অপমানের প্রতিকার—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃ: ৪১০-১৭]

এই প্রবন্ধে দেশবাসীকে যেমন তিনি একদিকে ইংরাজের অত্যাচার ও ও অপমানের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত ও প্রতিরোধের আহ্বান জানাইলেন,—অপরদিকে তিনি আমাদের সামাজিক লাঞ্ছনা ও পীড়নের কারণগুলি দূরীভূত করিবার কথা বলিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথ সেই

মুহূর্তে যে শ্রেণী-শোষণ বা বর্ণসমাজের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে কথা বলিতেছেন, তাহা নহে। তাঁহার সামাজিক ধারণা তখনও বর্ণসমাজের পক্ষে। ঐ প্রবন্ধেই তিনি বলিতেছেন,

"গুরুকে ভক্তি করিয়া ও প্রভুকে সেবা করিয়া ও মান্যলোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও মনুষ্যমাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্যাদা থাকা আবশ্যক তাহা রক্ষা করা যায়।"

রবীন্দ্রনাথ কিছুটা 'বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' ও জাতীয় মর্যাদাবোধের কথা বলিলেন।

ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ের সেতারা জেলার একটি সাম্প্রদায়িককারণ-ঘটিত মামলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়িল। পূর্বেই বলিয়াছি,—গোরক্ষা-আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া ইংরাজ-সরকার ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটাইবার কাজে অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেতারা জেলার 'বাই' নগরের ঘটনাটির পিছনে সত্যকারের কোনো সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল না। সেখানে বহুকাল হইতেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ছিল। হিন্দুদের একটি পূজা উপলক্ষে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া সেখানকার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট একটি আদেশ দিয়াছিলেন। হিন্দুরা সেই নিষেধাজ্ঞা মানিয়া লইতে পারেন নাই। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অপরাধে সেখানকার তেরো জন হিন্দুর জেল হয়। এই ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর আশঙ্কা জাগাইল। তিনি 'সুবিচারের অধিকার' নামক একটি প্রবন্ধে (সাধনা, ১৩০১ অগ্রহায়ণ) ইংরাজের হীন ও জঘন্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহিলেন। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি ঐ ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন,

"এমন করিয়া, যেখানে বিরোধ নাই সেখানে বিরোধ বাঁধিয়া উঠে, যেখানে বিদ্বেষের বীজমাত্র আছে সেখানে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রবল প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া মহাসমারোহে অশান্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়।...

"অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কন্‌গ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দুমুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।

"অথচ লর্ড ল্যান্সডাউন হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড হ্যারিস্ পর্যন্ত সকলেই বলিতেছেন, এমন কথা যে মুখে আনে সে পাষণ্ড মিথ্যাবাদী। ইংরেজ গবর্মেণ্ট

হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি যে অধিক পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন, এ অপবাদকেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।"...

"কিন্তু হিন্দু-মুসলমান বিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরো অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনোকালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া একপক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্যপক্ষের সাহস ও স্পর্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ এই সব লইয়া ইংরাজ-সরকারের নিকট দরবার করিবার পক্ষপাতী নহেন।

"গবর্মেণ্টের নিকট সকরুণ অথবা সাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখার কোনো আবশ্যক নাই, সে কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।"

দল বাঁধিয়া বিপ্লব করিবারও তিনি পক্ষপাতী নহেন। তাই তিনি বলিলেন,

"দল বাঁধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে—আমাদের সে শক্তিও নাই। কিন্তু দল বাঁধিলে যে একটি বৃহত্ত্ব এবং বল লাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ যে পার্টি বা দল গঠনের বিরোধী, ঠিক তাহা নহে। তাঁহার ধারণা দল বাঁধিবার উপযুক্ত সময় ও সুযোগ আমাদের সমাজে নাই। কেননা,

"...আমরা জানি যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে। যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ; আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট সহায়তা পাইব না—কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে।..."

সে যুগে দেশের অবস্থাটা প্রায় এই রকমই ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া যে দল-গঠন একেবারেই অসম্ভব ছিল বা তাহার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা থাকিবে না, ঐতিহাসিক একথা মানিয়া লইবেন না। আসল কথা দল বা সংগঠন লইয়া তিনি

অত মাথা ঘামাইতেন না। তিনি যখনই যাহা অন্যায় ও অবিচার বলিয়া মনে করিতেন, ব্যক্তিগত ভাবে তখনই তাহার প্রতিবাদ করিতেন। তিনি মনে করিতেছিলেন, দেশে তখন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আদর্শ ও উন্নত চরিত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজন। তিনি বলিলেন,

"যখন ভারতবর্ষে অন্তত কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয় ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরেজ অন্তরের সঙ্গে অনুভব করিবে যে, ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্টভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহারা কখনও ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না, এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।"

[সুবিচারের অধিকার—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ॥ পৃঃ ৪১৮-২৩]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ তখনও পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে গভীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারেন নাই। 'আমরা' বা 'আমাদের সমাজ' বলিতে তিনি হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে চিন্তা করিতেছিলেন। জাতীয় সমস্যাকে তিনি তখনও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থাকিয়া বিচার করিতে পারেন নাই।

'সাধনা' পত্রিকায় ইহাই তাঁহার সর্বশেষ রাজনৈতিক প্রবন্ধ। অবশ্য ঐ বৎসরে সাধনার মাঘ-সংখ্যায় 'আব্কারের আইন' নামক একটি প্রবন্ধে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে এবং কেহ কেহ অনুমান করেন প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাইতেছেন, 'প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই এবং সাধনায় উহা স্বাক্ষরিত নহে। তবে আমাদের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি তাঁহার রচিত বলিয়া দাগ দিয়া দিয়াছিলেন।' যাহাই হউক, প্রবন্ধটি এখনও পর্যন্ত নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রনাথের বলিয়া গৃহীত হয় নাই বলিয়া এখানে উহার আলোচনা করা ঠিক হইবে না।

নানাকারণে ১৩০২ সালের মাঝামাঝি সাধনা প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল (১৩০২, কার্তিকের পর)। ইহার প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে সুধীন্দ্রনাথ ব্যবসা উপলক্ষে কুষ্টিয়া চলিয়া আসেন। তাহার পর হইতেই রবীন্দ্রনাথ উহার সম্পাদনা করিয়া আসিতেছিলেন। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে সেটা 'চিত্রা'র শেষ-পর্ব। এই সময়ই তিনি তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'দুই বিঘা জমি' রচনা করিয়াছিলেন (১৩০২, জ্যৈষ্ঠ ৩১)।

নানা দিক দিয়া কবিতাটি বাংলার কাব্য-সাহিত্যে একটি নব যুগের সূচনা করিয়াছে। বাংলার শোষিত ও উৎপীড়িত কৃষক এই সর্বপ্রথম মুখর হইয়া বাংলা কাব্যে অবতীর্ণ হইলেন। উত্তম পুরুষের জবানীতে বাংলার নিপীড়িত

কৃষকদের লইয়া ইতিপূর্বে কোনো কবিতা রচনা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' আজ তাঁহার শোষিত সর্বহারা প্রজাদের সহিত যেন ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়ভাবে একাত্মা হইয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার 'ওরা' যেন 'আমি'তে পরিণত হইয়াছে; 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' আজ উপেন-চাষা, মহাজনের দেনার দায়ে যাহার একে একে সর্বস্ব গিয়া ভিটেবাড়ির 'দুই বিঘা জমি' শেষ সম্বল মাত্র হইয়াছে। সেই ভিটেবাড়িটুকুরও উপর জমিদারের লুব্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছে:

"শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই,
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়োজোর মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।'···

একজন নিঃস্ব দেনাগ্রস্ত চাষীর ভিটেবাড়িটুকুতে জমিদার-নন্দনের প্রমোদ-কানন গড়িয়া উঠে—ইহাই হইতেছে জমিদারী ব্যবস্থায় বাংলার কৃষক-জীবনের নিষ্ঠুর ট্রাজিক-পরিণতি। শুধু তাহাই নহে,—সেই নিঃস্ব মানুষটি যখন তাহার সাতপুরুষের ভিটেবাড়িখানি দিতে অস্বীকার করে, তখন জমিদার-মহাজনশ্রেণী কী হিংস্র ও উগ্র মূর্তি ধারণ করিতে পারে,—কত হীন জঘন্য অপকৌশল অবলম্বন করিতে পারে, ঐ কবিতায় তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। ইহার আখ্যানভাগ সকলেরই নিকট এতই সুপরিচিত যে উহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন বোধ করি না। 'উপেনবেশী রবীন্দ্রনাথ' বাংলার জাগ্রত বিবেক-বুদ্ধির নিকট আজ বিচার প্রার্থনা করিতেছেন,—বাংলার সর্বস্বান্ত ছিন্নমূল কৃষকদের পক্ষ লইয়া।

সাধনা বন্ধ হইয়া যাইবার পর রবীন্দ্রনাথ পতিসরেই আছেন। এই পতিসরেই তিনি 'চৈতালি'র অধিকাংশ কবিতাগুলি রচনা করেন (চৈত্র ১৩০২ হইতে শ্রাবণ ১৩০৩)। চৈতালির কয়েকটি কবিতায় তাঁহার স্বদেশমূলক ভাব ও চিন্তাধারা স্পষ্ট হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ জাতির চরিত্রে একটি ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা আনিবার কথা বলিতেছিলেন—যাহারা নির্ভীক, ন্যায়পর ও সত্যনিষ্ঠ হইবে, যাহারা আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিবে, যাহারা ইংরাজ বা বিদেশীয়দের অন্ধ অনুকরণ করিবে না, যাহারা মনে-প্রাণে স্বদেশী হইয়া উঠিবে। চৈতালি কাব্যগ্রন্থে 'স্নেহগ্রাস', 'বঙ্গমাতা', 'অভিমান', 'পরবেশ' প্রভৃতি কবিতায় উপরোক্ত ভাবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। স্নেহগ্রাসে কবি বলিলেন,

"অন্ধমোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি—
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী
হে জননী,...
বেষ্টন করিয়া তারে আগ্রহ পরশে
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ ?
...   .
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার,
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।"

বঙ্গমাতা কবিতায় ঐ কথাই আর একটু জোর দিয়া বলিলেন,

"পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমাব সন্তানে
...   .
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালোছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি।"

অভিমান কবিতায় তিনি তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন

"কারে দিব দোষ বন্ধু, কারে দিব দোষ !
বৃথা কর আস্ফালন, বৃথা কর রোষ।
যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করে নি সম্মান।
যতই কাগজে কাঁদি, যত দিই গালি,
কালামুখে পড়ে তত কলঙ্কের কালি।
যে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ
তারি কাছে তারি 'পরে তোমার নালিশ !

নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে—
তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাস্ নে ঢাক।"

অপমানের প্রতিকার ও সুবিচারের অধিকার প্রবন্ধে যে-কথা বলিয়াছিলেন, অভিমান কবিতায় তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপের সহিত কবি সেইকথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। পরবেশ কবিতায় তিনি বলিলেন,

"কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ।
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ।
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?
... ...
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি এ কী অহংকার।
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলংকার।

সেকালের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, এমনকি তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দও, চিন্তায়-ভাবনায়, পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে ইংরাজদের অনুকরণ করিতেন। কবি পরবেশ কবিতায় ইঁহাদের তীব্র ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে আক্রমণ করিয়া দেশের মধ্যে একটা তীব্র স্বাজাত্যবোধ জাগরিত করিতে চাহিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের সমালোচনা করিলেও কংগ্রেস হইতে দূরে ছিলেন না। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে (১৩০৩ বঙ্গাব্দ। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশতম অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন R. M. Sayani। কংগ্রেসের উদ্বোধনের দিন রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' গানটি উদ্বোধন-সংগীত হিসাবে গাহিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার লিখিয়াছেন,

"...১৮৯৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতেও তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যোগ দেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম্' নিজে সুরসংযোগ করিয়া গান করেন। সেই হইতে 'বন্দে মাতরম্' গান রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত সুরেই প্রতি বৎসর কংগ্রেসে গীত হইয়া আসিতেছে।"

[জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ।। পৃঃ ২৬]

স্মরণ থাকিতে পারে, ইহার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনেও রবীন্দ্রনাথ যোগদান করিয়াছিলেন। এবং সেবার তিনি 'আমরা

মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি সভামণ্ডপে গাহিয়াছিলেন। শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিতেই রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' গানটির প্রথম অংশটি সুরসংযোগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইয়াছিলেন।

প্রায় এক বৎসর পর ১৮৯৭ সালে জুন মাসে নাটোরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথও এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। এই সম্মেলনেই সভার কার্য পরিচালনা ও বক্তৃতার ভাষার মাধ্যম লইয়া প্রাচীনপন্থীদের সহিত রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ তরুণ দলটির বিরোধ বাধিল। বলা বাহুল্য, সেকালের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সকলেই নিজেদের ছোটখাটো একটি করিয়া বার্ক, ব্রাইট্, গ্লাডস্টোন মনে করিয়া তাঁহাদের অনুকরণে নাটকীয় ভঙ্গিতে ইংরাজী ভাষার বক্তৃতা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না। বেশ কিছুদিন হইতেই তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন, একথা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। তিনি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হইতে শুরু করিয়া সব কিছুতেই বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবি করিয়া আসিতেছিলেন। নাটোর-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ পূর্বাহ্ণেই অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ তরুণ প্রতিনিধিদের লইয়া বাংলা ভাষায় সভার কার্য পরিচালনা করিবার জন্য একটি আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সভার কার্য শুরু হইলে যথাসময়েই তরুণের দল বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ফলে দুই দলের মধ্যে প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ শুরু হইল। শেষ পর্যন্ত তরুণ দলেরই জয়লাভ হইল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরোয়া' পুস্তিকায় এই ঘটনাটির বিস্তারিত একটা সরস বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,

"আগে থেকেই ঠিক ছিল, রবিকাকা প্রস্তাব করবেন, প্রোভিন্সিয়েল কন্‌ফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে। আমরা ছোকরারা সবাই রবিকাকার দলে। আমরা বললুম, নিশ্চয়ই, প্রোভিন্সিয়েল কন্‌ফারেন্সে বাংলা ভাষার স্থান হওয়া চাই। রবিকাকাকে বললুম, ছেড়ো না, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব এজন্যে। সেই নিয়ে আমাদের বাধল চাঁইদের সঙ্গে। তাঁরা আর ঘাড় পাতেন না। ছোকরার দলের কথায় আমলই দেন না। তাঁরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয়, তেমনি এখানেও হবে—সব-কিছু ইংরেজিতে। অনেক তর্কাতর্কির পর দুটো দল হয়ে গেল। একদল বলবে বাংলাতে, আর একদল বলবে ইংরেজিতে। সবাই মিলে গেলুম প্যাণ্ডেলে। বসেছি সব, কন্‌ফারেন্স আরম্ভ হবে। রবিকাকার গান ছিল, গান তো আর ইংরেজিতে হতে পারে না, বাঙলা গানই হলো। 'সোনার বাংলা' গানটা বোধ হয় সেই সময়ে গাওয়া হয়েছিল—

"এখন প্রেসিডেন্ট উঠেছেন স্পীচ দিতে, ইংরেজিতে যেই না মুখ খোলা, আমরা ছোকরারা যারা ছিলুম বাংলা ভাষার দলে, সবাই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম—বাংলা, বাংলা। মুখ আর খুলতেই দিই না কাউকে। ইংরেজিতে কথা আরম্ভ করলেই আমরা চেঁচাতে থাকি—বাংলা, বাংলা। মহা মুশকিল, কেউ আর কিছু বলতে পারেন না। তবুও ঐ চেঁচামেচির মধ্যেই দু-একজন দু-একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন। লালমোহন ঘোষ ছিলেন ঘোরতর ইংরেজি-দুরস্ত, তাঁর মতো ইংরেজিতে কেউ বলতে পারত না, তিনি ছিলেন পার্লামেণ্টারী বক্তা—তিনি শেষটায় উঠে বাংলায় করলেন বক্তৃতা। কী সুন্দর তিনি বলেছিলেন, যেমন পারতেন তিনি ইংরেজিতে বলতে তেমনি চমৎকার তিনি বাংলাতেও বক্তৃতা করলেন! আমাদের উল্লাস দেখে কে, আমাদের তো জয়জয়কার। কন্‌ফারেন্সে বাংলা ভাষা চলিত হলো। সেই প্রথম আমরা পাবলিকলি বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।" [ঘরোয়া ।। পৃঃ ৪২-৪৩]

স্বাধীনতা ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের অন্যতম প্রধান কথাই হইতেছে—মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। অথবা এইভাবে বলা যায়—একটি জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ তাহার মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহিত পরস্পর ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধযুক্ত। সেই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অবদান যে কী গভীর তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

বহুকাল পরে, রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া সে-যুগের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমালোচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে সে-যুগের কংগ্রেসী রাজনীতির সহিত তাঁহার নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটি তিনি নিজেই অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন (ডঃ শচীন সেনের Political Philosophy of Rabindranath পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে)। তিনি বলিয়াছিলেন (১৩৩৬ সাল),

"সাধনা পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি।··· তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্মেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমতো কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্‌সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলীসভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না। রাজশাহী-সম্মিলনীতে নাটোরের

পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলা ভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্মেই আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। পর বৎসরে রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢাকা-কন্‌ফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদযোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে গালি সবচেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে। এত বড়ো দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম তার একটা কারণ, ইংরেজি ভাষা-শিক্ষায় বাল্যকাল থেকে আমি সত্যই অবহেলা করেছি, দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারের পরস্পর পত্র লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য হত।

[রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত—কালান্তর ॥ পৃঃ ৩৪৪-৪৫]

নাটোরের ঐ অপ্রীতিকর ঘটনার কিছুদিন পরই কবি লিখিলেন 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। এই কবিতায় তিনি বলিলেন,

'যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ।

বিদেশী জানে না তোরে, অনাদরে তাই
করে অপমান—
মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই
আপন সন্তান।

তোমার যা দৈন্য মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি।
পরধনে ধিক গর্ব। করি করজোড়,
ভরি ভিক্ষা ঝুলি।

পুণ্যহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে,
তাই যেন রুচে,
মোটাবস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।'

ঐ সব ঘটনার পর কবির স্বাজাত্যবোধ যে সুতীব্র হইয়া উঠিতেছে, তাহা এই কবিতার প্রতিটি ছত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সাধনার যুগে কংগ্রেসের সহিত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রধান পার্থক্য হইতেছে—রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডকে বা ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী রাজনীতিকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পরন্তু ইউরোপের বাহিরে, ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর সর্বত্রই তিনি ইংরাজকে ঘৃণ্য শোষক ও উৎপীড়ক রূপেই লক্ষ্য করিতেছেন। অবশ্য ইংলণ্ডের মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর বিবেকী মানুষের প্রতি তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধাভাব প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিতেছেন না।

অপরদিকে, কংগ্রেসের তখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর অসীম শ্রদ্ধা ও আস্থা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অসভ্য ও বর্বর দেশগুলিকে সভ্য ও সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সর্বত্রই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পবিত্র ধারক, বাহক ও রক্ষাকর্তা, ইহাই হইতেছে তৎকালীন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের ধারণা। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী রাজনীতি তাঁহাদের অভিভূত করিয়াছে। সর্বক্ষেত্রেই ইংলণ্ড তখন কংগ্রেসের আদর্শস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটি তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কংগ্রেস-নেতা সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনা-কংগ্রেসে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে সুরেন্দ্রনাথ এই বলিয়া উপসংহার করিলেন,

"...the impetus must come from England. To England we look for inspiration and guidance. To England we look for sympathy in the struggle. From England must come the crowning mandate which will enfranchise our people. England is our political guide and our moral preceptor in the exalted sphere of political duty. English history has taught us those principles of freedom which we cherish with our life-blood. We have been fed upon the strong food of English constitutional freedom...

"...The noblest heritage which we can leave to our children and our children's children is the heritage of enlarged rights, safeguarded by the loyal devotion and the fervent enthusiasm of an emancipated people. Let us so work with confidence in each other, with unwavering loyalty to the British connection...It is not severance that we look forward to—but unification, permanent

embodiment as an integral part of that great Empire which has given the rest of the world the models of free institutions—that is what we aim at...England is the august mother of free nations. She has covered the world with free States. Places, hitherto the chosen abode of barbarism, are now the home of freedom. Wherever floats the flag of England, there free Governments have been established...."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. p. 251-55]

এই যুগে রবীন্দ্রনাথ যে পরিষ্কার কিছু একটা পথ দেখিতে পাইতেছিলেন, এমন নহে। কিন্তু কংগ্রেসের ঐ আবেদন-নিবেদনের সুর তিনি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারেন নাই। তখন ইংরাজ-রাজত্বের উচ্ছেদ বা স্বাধীনতার কোনো প্রশ্নই উঠে নাই। তখনও পর্যন্ত দেশে ভালো করিয়া জাতীয়তাবোধই জাগ্রত হয় নাই। জাতীয় প্রস্তুতিই তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে সব-হইতে বড়ো কথা। এই জাতীয় প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একদিকে তিনি যেমন দৃঢ় চরিত্র গঠনের উপর জোর দিতেছেন, অন্যদিকে তেমনি একটি তীব্র স্বাজাত্য বা জাতীয় মর্যাদাবোধকে জাগরিত করিতে চাহিলেন; কখনও বা তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে দেশের সর্বত্র প্রসারিত করিতে চাহিলেন। এককথায়, তখন আমাদের চিন্তায়-ভাবনায়, পোশাকে-আশাকে, ভাবে-ভাষায় তিনি একটি সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীণ স্বদেশী কৃষ্টি গড়িয়া তুলিবার কথা চিন্তা করিতেছেন।

।। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ও জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে ।।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রবাহে আরো কয়েকটি প্রবল ভাবধারার স্রোত আসিয়া মিলিত হইল। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, অপর দিকে মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলকের অভ্যুদয় আমাদের ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনায় একটি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। উভয়েই ধর্ম আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের দিকে প্রসারিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তিলক শুধু জাতীয় আন্দোলনের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন না, তিনি আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সংঘর্ষের দিকে প্রসারিত করিতে চাহিলেন। তিলকের সংগ্রামের লক্ষ্য নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উৎখাত এবং স্বাধীনতালাভ। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ বলিতে তিনি বুঝিতেন—সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া এক অখণ্ড হিন্দু-রাজ্য। কংগ্রেসের ঐ আবেদন-নিবেদন কিংবা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি আদৌ সমর্থন করিতে পারিতেছিলেন না। তিলকের আদর্শ-পুরুষ—শিবাজী। শিবাজী ও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী একদিন অসীম বীরত্বের সহিত মুঘল-আক্রমণের হাত হইতে দক্ষিণ ভারতকে রক্ষা করিয়াছে—এই ঐতিহাসিক ঘটনাই ছিল তাঁহার রাজনৈতিক-সংগ্রামের মূল প্রেরণা ও উৎসাহ। এই শিবাজীর আদর্শেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য তিনি মহারাষ্ট্রে 'শিবাজী-উৎসবে'র প্রবর্তন করিলেন (১৮৯৭)। ইতিপূর্বে 'গোরক্ষা-আন্দোলন' ও 'গণপতি-উৎসবে'র প্রবর্তন করিয়া তিনি অনুরূপভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উন্মাদনাকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতির কাজে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার ফলে যে কী ধরনের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব প্ররোচিত হইয়াছিল, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

ইতিমধ্যে বোম্বাইতে ভয়ঙ্কর প্লেগ দেখা দিল। ইংরাজ সরকার কিছু ইংরাজ সৈন্যকে প্লেগ-নিবারণ অভিযানে মোতায়েন করিলেন। প্লেগ নিবারণের নামে এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী এমনসব উৎপাত-অত্যাচার আরম্ভ করিল, যাহার ফলে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। তিলক ও নাটু-ভ্রাতৃদ্বয় ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনই ফল হইল না—অত্যাচার সমানে বাড়িয়া

চলিল। কিছুদিন পর অকস্মাৎ 'প্লেগ-কমিটির' প্রেসিডেণ্ট W. C. Rand' পুনার প্রকাশ্য রাজপথে দুইজন মহারাষ্ট্রীয় যুবকের আক্রমণে নিহত হইলেন (২২শে জুন, ১৮৯৭)। সেদিন 'মহারানী' ভিক্টোরিয়ার 'হীরক জুবিলি উৎসব'। সমগ্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ আতঙ্কে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে তাহারা এ-দেশীয় সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করিবার জন্য সরকারকে চাপ দিতে লাগিল। কয়েকদিন পরই নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারেই নির্বাসিত করা হইল। প্রায় সাথে সাথেই র‍্যান্ড্ হত্যা মামলায় তিলককে গ্রেপ্তার করা হইল। এই মামলায় জজ্ ও জুরিরা সকলেই ইংরাজ ছিলেন। বিচারে তিলকের দেড় বৎসরের কারাদণ্ড হইল। ফলে সারা দেশে উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। ইংরাজ সরকার সর্বপ্রথম এদেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে দমন করিবার জন্য 'সিডিশন বিল' লইয়া আগাইয়া আসিলেন। দেশের চারিদিকে এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হইল। কংগ্রেস হইতেও ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অমরাবতী-কংগ্রেসে সভাপতির মঞ্চ হইতে শঙ্করণ নায়ার বলিলেন,

"......Ostensibly to discover the murderer, by acting on the theory that the murders were the result of a conspiracy for which the Vernacular Press was responsible, the Government arrested the Natu brothers under the provisions of an old law intended for lawless times to secure the peace of the country. Mr. Tilak and the editors of Vernacular papers were prosecuted; and a Punitive force was imposed on the Poona Municipality. The arrest of Natu brothers was and must remain a great blunder. It recalls the worst days of irresponsible despotism. Liberty of person and property is a farce if you are liable to be arrested, imprisioned, and your property sequestered at the will and pleasure of Government without being brought to trial. We shall...express our emphatic protest against this proceeding."

তখনও সিডিশন বিল আইনে পরিণত হয় নাই। এই প্রস্তাবিত বিলটির সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

"It has brought into disagreeable prominence the unsatisfactory nature of the law of Sedition...We trust the Government will bear in mind that in the circums-

tances of this country, anything which checks freedom of public discussion is most deplorable...".

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. pp. 334-36]

দেশের এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। সিডিশন বিল পাস হইবার পূর্বদিন কলিকাতা টাউন হলে এক জনসভায় তিনি 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন (সাধনা, ১৩০৫ বৈশাখ)। কবি বলিলেন,

"...অল্পদিনের মধ্যে উপর্যুপরি কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনায় আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছি যে, বিনা চেষ্টায়, বিনা কারণে আমরা ভয় উৎপাদন করিতেছি।...

"ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম, গবর্মেণ্ট অত্যন্ত সচকিতভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন।...

"একদিন শুনিলাম, অপরাধিবিশেষকে সন্ধানপূর্বক গ্রেফ্‌তার করিতে অক্ষম হইয়া রোষরক্ত গবর্মেণ্ট সাক্ষীসাবুদ বিচার-বিবেচনার বিলম্বমাত্র না করিয়া একেবারে সমস্ত পুনা শহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন। আমরা ভাবিলাম, পুনা বড়ো ভয়ংকর শহর! ভিতরে ভিতরে না জানি কী ভয়ানক কাণ্ডই করিয়াছে!

"আজ পর্যন্ত সে ভয়ানক কাণ্ডের কোনো অন্ধিসন্ধি পাওয়া গেল না।

"...এমন সময় তারের খবব আসিল, রাজপ্রাসাদের গুপ্তচূড়া হইতে কোন্-এক অজ্ঞাত অপরিচিত বীভৎস আইন বিদ্যুতের মতো পড়িয়া নাটুভ্রাতৃযুগলকে ছোঁ মারিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আকস্মিক গুরুবর্ষার মতো সমস্ত বোম্বাই প্রদেশের মাথার উপরে কালো মেঘ নিবিড় হইয়া উঠিল,...।

"একদিকে পুরাতন আইনশৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল, আবার অন্য দিকে রাজ-কারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল-নির্মাণের ভীষণ হাতুড়িধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।"

সিডিশন বিল সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

"...যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরও পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন। যে একমাত্র উপায়ে আমরা আত্মপ্রকাশ করিতে পারি, তোমাদের নিকট আপনাকে পরিচিত করিতে পারি, তাহা রোধ করিয়া ফল কী।

"সিপাহিবিদ্রোহের পূর্বে হাতে হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি

অক্ষরও লেখা ছিল না—সেই নির্বাক নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ংকর নহে।
…সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না। যদি কখনও কোনো ঘনান্ধকার অমাবস্যারাত্রে আমাদের অবলা ভারতভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবাভিসারে যাত্রা করে তবে সিংহদ্বারের কুক্কুর না ডাকিতেও পারে, রাজার প্রহরী না জাগিতেও পারে, পুররক্ষক কোতোয়াল তাহাকে না চিনিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গের কঙ্কণকিঙ্কিণীনূপুরকেয়ূর, তাহার বিচিত্র ভাষার বিচিত্র সংবাদপত্রগুলি কিছু-না-কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না।…

"রহস্যই অনিশ্চিত ভয়ের প্রধান আশ্রয়স্থান,…রুদ্ধবাক সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়োই ভয়ংকর অবস্থা।…আঘাত করিলে আমরা বেদনা পাইব; ইংরেজ হাজার চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেও এ নিয়মটাকে দেশান্তরিত করিতে পারিবেন না।

"আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি, দুর্বলের কোনো অধিকার নাই। আমরা যাহা মনুষ্যমাত্রেরই প্রাপ্য মনে করিয়াছিলাম তাহা দুর্বলের প্রতি প্রবলের স্বেচ্ছাধীন অনুগ্রহ মাত্র।…

"আজ যদি অকস্মাৎ আমরা সেই ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হই, রাজকার্য চালনার সহিত আমাদের সমালোচনার ক্ষুদ্র সম্বন্ধটুকুও এক আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং হয় আমরা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকি, নয় কপটতা ও মিথ্যা বাক্যের দ্বারা প্রবলতার রাজপদতলে আপন মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ বলিদান করি, তবে পরাধীনতার সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাক্যহীন ব্যর্থ বেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের দুর্দশা পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইবে; যে সম্বন্ধের মধ্যে আদানপ্রদানের একটি সংকীর্ণ পথ খোলা ছিল, ভয় আসিয়া সে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে; রাজার প্রতি প্রজার সে ভয় গৌরবের নহে; এবং প্রজার প্রতি রাজার সে ভয় ততোধিক শোচনীয়।

"এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল এক মুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে।…দুইশত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানবসম্বন্ধের এই কি অবশেষ!"

[কণ্ঠরোধ—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড।। পৃঃ ৪২৫-৩১]

তীব্র আবেগময়ী ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সিডিশন বিল ও সরকারী দমন-নীতির সমালোচনা করিলেন। কিন্তু লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণে বিদ্রোহ বা

প্রতিরোধ-আন্দোলনের কোনো স্থান নাই, যদিও তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজে ভাষণটি গভীর উদ্দীপনা ও প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল।

এমন সময় কলিকাতাতেও ভয়ঙ্কর প্লেগ দেখা দিল। কিন্তু বোম্বাইয়ের মত প্লেগ নিবারক বাহিনীর তেমন উৎপাত অত্যাচার কলিকাতায় হইল না। বাংলার তদানীন্তন লেফটেনান্ট গভর্নর স্যর জন উড্‌বার্ন দেশবাসীকে এই ব্যাপারে আশ্বাস জানাইয়া বিবৃতি দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাহাতে খুশি। তিনি তখন 'ভারতী'র সম্পাদক। ভারতীর 'প্রসঙ্গ-কথা'য় (১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ) তিনি বলিলেন,

"এইরূপ দুর্যোগেই বিদেশী রাজার পক্ষে প্রজাদের হৃদয়জয়ের দুর্লভ অবকাশ। এই সময়েই রাজা প্রমাণ করিতে পারেন যে, আমরা পর হইয়াও পর নহি।···

"পরন্তু এই সময়ে পতিতের উপর পদপ্রহার, ব্যথিতের উপর জবরদস্তি ভয়ের নিষ্ঠুরতা মাত্র।···এবার প্যুনিটিভ পুলিস, নাটু-নিগ্রহ, সিডিশন-বিলের দ্বারা গবর্মেণ্ট উচৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা স্বল্পসংখ্যক বিদেশী, আমরা ক্ষমা করিতে সাহস করি না।

"দেখিলাম, গবর্মেন্টের উত্তরোত্তর রাগ ও জেদ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। যেখানে যত বেদনা শাসনকর্তা সেখানে তত আঘাত করিতে কৃতসংকল্প। ভারতবর্ষের আদ্যন্তমধ্যে অশান্তির আক্ষেপ কোথাও প্রকাশ্যে ফুটিবার উপক্রম করিল, কোথাও গোপনে গুমরিয়া উঠিল।···এ দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে এরূপ ক্ষুব্ধ অবস্থা আর কখনও দেখা যায় নাই।

"···আমাদের মন বিগড়াইয়া গেলে আমরা কাগজে দু-চার কথা বলিতে পারি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের মন বিগড়াইয়া গেলে তাঁহারা আমাদের কাগজের গলা চাপিয়া ধরিতে পারেন। আমরা ক্ষুব্ধ হইলে তাহা রাজবিদ্রোহ। কিন্তু রাজারা রুখিয়া থাকিলে তাহা কি প্রজাবিদ্রোহ নহে।···"

এই কথা বলিবার পর তিনি এদেশীয় রাজপুরুষ ও গোরা সৈন্যদের অত্যাচার নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। বহুকালের সঞ্চিত এই অত্যাচার ও অপমানের জ্বালা কিভাবে দেশবাসীর মনে পুঞ্জীভূত আক্রোশ ও বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাহারই উল্লেখ করিয়া ইংরাজকে যেন সময় থাকিতেই সতর্ক করিয়া দিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন,

"যাহা হউক, এইরূপ সংগঠন এবং সংঘর্ষে প্রজাদের আন্তরিক সন্তাপ যে কিরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা পরিমাণ করিবার উপায় নাই। যে-সকল ইংরেজ কথায় কথায় ঘুষা লাথি চড়, এবং শুয়র নিগর সম্ভাষণ প্রয়োগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত তাঁহারা প্রত্যহই ভারতবর্ষে কি প্রকার বিপৎপাতের ভিত্তি রচনা করিতেছেন তাহা

তাঁহারা জানেন না, এবং যে ইংরেজসমাজ এইরূপ রূঢ়তা ও অবজ্ঞাপরতার বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার নৈতিক বাধা প্রদান করেন না তাঁহারা যে শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা ছেদনে প্রবৃত্ত।

"আমাদের প্রতি সাধারণ ইংরেজের এইপ্রকার ভাবই প্রজাবিদ্রোহের ভাব। তাঁহারা আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভঙ্গিতে সর্বদাই আমাদের মর্মস্থানকে ক্ষুব্ধ করিতেছেন। এমনকি, তাঁহাদের মধ্যে এমন মূঢ়চেতারও অভাব নাই যাহারা অসহ্য অবজ্ঞার আঘাতে প্রজাহৃদয়ে অপমানক্ষত সর্বদা জাগাইয়া রাখাই রাজনৈতিক হিসাবে কর্তব্য জ্ঞান করেন। তাঁহারা পথে চলিতে চাবুক তুলিয়া সেলাম শিখাইতে শিখাইতে অগ্রসর হন।

"ইহাকেই বলে প্রজাবিদ্রোহ এবং নিয়ত এই বিদ্রোহেই প্রজার হইয়া প্রজাপতির কালাগ্নি উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতে থাকে। ইংরেজ কি সেই চিরজাগ্রত প্রজাপালকের বিশ্বনিয়মের প্রতিও প্রভুত্বমদোদ্ধত ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিবেন। প্রজাদের সংবাদপত্র সভা-সমিতি এবং বাগ্মীবর্গ আছে; রুদ্রমূর্তি রাজা মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের বাগ্‌রোধ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু প্রজাপতির সভা নিঃশব্দ নীরব এবং তাঁহার বিচার সুচির কিন্তু সুনিশ্চিত।"

[প্রসঙ্গ-কথা — রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ॥ পৃঃ ৫৫০-৫৪]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে 'প্রজাবিদ্রোহে'র একটি নূতন সংজ্ঞা প্রয়োগ করিতেছেন। প্রজাবিদ্রোহ—সরকারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ নহে, প্রজাসাধারণের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষীয়দের অত্যাচার নির্যাতনকেই তিনি প্রজাবিদ্রোহ নামে অভিহিত করিতেছেন। যদিও ইংরাজ সরকারের এই প্রজা-বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রতিরোধ-সংগ্রামের কথা বলিতেছেন না। তখন সিডিশন আইন বলবৎ হইয়াছে। বোধহয়, এই সিডিশন এড়াইবার জন্যই ইংরাজ সরকারকে তিনি 'চিরজাগ্রত প্রজাপালক' ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিচারালয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। সব চাইতে বড়ো কথা, দেশবাসীর উপর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম প্রতিবাদ ও লেখনী ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবর্গের লজ্জাকর ইংরাজ-প্রশস্তির একটি নমুনা দিতেছি। ১৮৯৭ সালে শঙ্করণ নায়ার যে কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে নাটু-ভ্রাতৃদ্বয় ও তিলকের প্রতি অন্যায় বিচারের সমালোচনা করিলেন, সেই মঞ্চ হইতেই আবার তিনি বলিলেন,

"...We have witnessed and we have taken part in the cele-

bration of the Diamond Jubilee of the reign of our Empress. We rejoice with our fellow-subjects of this vast Empire in the prosperity of that reign....We bless Her Majesty for her message in 1858 of peace and freedom when the occasion invested it with a peculiar significance...Throughout our land her name is venerated ; in almost every language the story of her life has been written and sung, and in years to come her name will rightly find a place in the memory of our descendants along with those great persons whose virtues have placed them in the ranks of Avatars born into this world for the benefit of this our holy land."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. pp. 318-19]

শুধু তাহাই নহে, পুনার ঐ-সব ঘটনা এবং সিডিশন বিলের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ সমালোচকদের তীব্র ইংরাজ সরকারবিরোধী কণ্ঠস্বরকেও তাঁহারা নিন্দা করিলেন। সেই একই মঞ্চ হইতে শঙ্করণ নায়ার বলিলেন,

"We deprecate most strongly any intemperate language in criticizing Government measures. We are bound to assume that any objectionable measure must have been due either to ignorance or to error of judgement. We have also to remember that after all our salvation lies in bringing home to the majority of the people of England our real wishes and feelings and that the persons whose actions are criticised are their own kith and kin, that the system of Government we attack was framed by men for whom they feel just respect and esteem. Any violence therefore will do us infinite harm, it may possibly prevent us from securing a hearing...." [Ibid. p. 337]

আশ্চর্যের ব্যাপার—দেশে যখন পুনার ঘটনা ও সিডিশন বিল লইয়া ভয়ঙ্কর চাপা অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছে, তখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ঐসব মৌলিক অধিকার রক্ষার দাবিতে কোনো প্রবল আন্দোলন বা 'এ্যাজিটেশন' করিতে দেখা গেল না। তাঁহাদের এই নীরবতা বা মৃদু নমনীয় কণ্ঠস্বরের মূল কারণ শঙ্করণ নায়ারের উক্তিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; ভয়—পাছে ইংরাজ চটিয়া যান। রবীন্দ্রনাথ কৌতুকের সহিত ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাই ঐ প্রবন্ধের শুরুতেই কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র শ্লেষ করিতে ছাড়িলেন না,

"অ্যাজিটেশন্‌কারীগণও ভিতরে ভিতরে তাহার আভাস পাইয়াছেন, তাহাদের

ব্যবহারে এরূপ অনুমান করা যায়। কারণ, এবারে যে নিদারুণ আইনের দ্বারা নাটু-হরণ-ব্যাপার ঘটিল সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের বাগ্মীসভাসমূহ অভূতপূর্ব বিজ্ঞতা-সহকারে সুদীর্ঘকাল নিস্তব্ধ ছিলেন। আমরা গোল করিতে বসিলেই পাছে গবর্মেণ্টের মন আরও বিগড়াইয়া যায় হয়তো এ আশঙ্কা তাঁহাদের ছিল।"

[প্রসঙ্গ-কথা—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫৪৯]

রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই এমন একটা আঁচ বা আভাস পাইয়াছিলেন যে, কার্যকালে এই বাক্যবীরদের অনেককেই পাওয়া যাইবে না। তাই 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধে তিনি ইঁহাদের লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিয়াছিলেন,

"আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নির্বোধও নহি। উদ্যত রাজদণ্ড-পাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুর ইচ্ছাও আমার নাই।···এমনস্থলে সর্বতোভাবে মূক হইয়া থাকাই সুবুদ্ধির কাজ, এবং আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে অনেকেই কর্তব্যক্ষেত্র হইতে যথেষ্ট দূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেই নিরাপদ সদ্‌বুদ্ধি অবলম্বন করিবেন তাহারও দুই-একটা লক্ষণ এখন হইতে দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশের বিক্রমশালী বাগ্মী, যাঁহারা বিলাতি সিংহনাদে শ্বেতদ্বৈপায়নগণের চিত্তেও সহসা বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারেন তাঁহাদের অনেকে বিবর আশ্রয় করিয়া বাগ্‌রোধ অভ্যাস করিতে বসিবেন, দেশের এমন একটা দুঃসময় আসন্ন। সে সময় দুর্ভাগ্য দেশের নির্বাক বেদনা নিবেদন করিতে রাজদ্বারে অগ্রসর হইবে এমন দুঃসাহসিক দেশবন্ধু দুর্লভ হইয়া পড়িবে। যদিচ শাস্ত্রে আছে 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ', তথাপি শ্মশান যখন রাজদ্বারের এত অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছে তখন ভীত বন্ধুদিগকে কথঞ্চিৎ মার্জনা করিতে হইবে।"

[কণ্ঠরোধ—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪২৪-২৫]

কবি ও কল্পনাবিলাসী বলিয়া, 'ধনীর ঘরের আদরের দুলাল' বলিয়া রবীন্দ্রনাথের একটা অপবাদ শুনা যাইত। কিন্তু সত্যটি হইল যে, জাতির বহু দুঃসময় ও দুযোগ-কালে দেশের বহু মহা-মহারথীরা যখন মূষিকবিবরে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এই কল্পনাবিলাসী আকাশচারী কবি মানুষটি বহু বিপৎপাত আসন্ন জানিয়াও জাতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে দেশের ধর্মসংস্কারক ও রাজনীতিবিদ্‌দের নিকট 'ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যে'র প্রশ্নটিই বড়ো হইয়া দেখা দেয়। এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথও জাতীয়তাবাদ, জাতিবিদ্বেষ ও ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য গঠনের বিভিন্ন সমস্যা লইয়া চিন্তা করিতে শুরু করেন। ১৩০৫ সালে ভারতী পত্রিকায় (প্রসঙ্গ-কথা—ভারতী, ১৩০৫ শ্রাবণ) তিনি লিখিলেন,

"ভারতবর্ষে হিন্দুগণ বিশেষ একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা তাহা লইয়া কেহ কেহ তর্ক উত্থাপন করেন। সে তর্ক অসংগত নহে।

"জগতে হিন্দুজাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ইহাকে বিশেষ জাতি রূপে গণ্য করা যায় এবং যায়ও না। জাতীয়ত্বের সংকীর্ণতা ইহার মধ্যে আছে জাতীয়ত্বের বল ইহার মধ্যে নাই। ইহা এক অথচ অনেক, ইহা বিপুল অথচ দুর্বল। ইহার বন্ধন যেমন কঠিন তেমনি শিথিল, ইহার সীমা যেমন দৃঢ় তেমনি অনির্দিষ্ট।

"য়ুরোপে জাতিগত উপাদানে রাজনৈতিক ঐক্যই সর্বপ্রধান। হিন্দুদের মধ্যে সেটা কোনোকালেই ছিল না বলিয়া যে হিন্দুরা জাতিবদ্ধ নহে, সে কথা ঠিক নহে।"

ইহার পর তিনি ভারতবর্ষে আর্য-অনার্যের সুদীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণের ফলে কিভাবে হিন্দুজাতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার বিবরণ দিয়া বলিলেন,

"···যদিচ আমরা বহুসংখ্যক আর্য-অনার্য এবং সংকর জাতি হিন্দুত্ব-নামক এক অপরূপ ঐক্য লাভ করিয়াছি, তথাপি আমরা বল পাই নাই। আমরা যেমন এক তেমনি বিচ্ছিন্ন।

"এই দুর্বলতার প্রধান কারণ, আমরা অভিভূতভাবে এক, আমরা সচেষ্টভাবে এক নহি।···"

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "এই বহু দেব-দেবী, বিচিত্র পুরাণ এবং অন্ধলোকাচার-সংকুল আধুনিক বৃহৎ বিকারের নাম হিন্দুত্ব।···কিন্তু এই বিকারের জন্য তত ক্ষোভ নাই বিচ্ছেদের জন্য যত। ··

"এক্ষণে যিনি জড়ীভূত হিন্দুজাতির মধ্যে আচারে ব্যবহারে সমাজে ধর্মে আর্য-ভাবের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ স্থাপন এবং কৃত্রিম ক্ষুদ্র নিরর্থক বিচ্ছেদগুলি দূর করিয়া সমগ্র লোকস্তূপের মধ্যে একটি সজীব ঐক্য সঞ্চার করিয়া দিবেন তিনিই ভারতবর্ষের বর্তমানকালের মহাপুরুষ।)

"পূর্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রতন্ত্রীয় একতা আমাদের ছিল না। শত্রুকে আক্রমণ, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা এবং, এক শাসনতন্ত্রের অধীনে পরস্পরের স্বার্থ ও শুভাশুভের একত্ব অনুভব আমরা কখনও দীর্ঘকাল করি নাই। আমরা চিরদিন খণ্ড খণ্ড দেশে খণ্ড খণ্ড সমাজে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাদ্বারা বিভক্ত।···আমরা প্রাদেশিক, আমরা পল্লীবাসী; বৃহৎ দেশ ও বৃহৎ সমাজের উপযোগী মতের উদারতা, প্রথার যুক্তি সংগতি এবং সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্যোগপরতা আমাদের মধ্যে নাই।···

"···এক্ষণে আমাদের প্রাদেশিক বিচ্ছেদগুলি ভাঙিয়া ফেলিবার সময়

হইয়াছে।···বর্তমান কালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে-একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে ওই অনৈক্যের ধুলা সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিই উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।···

"অতএব একদিকে আমাদের দেশীয়তা, অপরদিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাহেবি অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।"

এখানে 'জাতীয় ঐক্য' বলিতে রবীন্দ্রনাথ যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায়ের সম্মিলিত ঐক্যের কথা বলিতেছেন, তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় ঐক, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে নহে, পরন্তু তাহা হিন্দুধর্মের ধর্মগত ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়গুলিকেও এই ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে কিনা, এবং হইলে কিভাবে ও কিসের ভিত্তিতে এই ঐক্যগঠন সম্ভব হইবে—সেকথা রবীন্দ্রনাথ তখনও চিন্তা করিতে পারিতেছেন না। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত 'আর্যসমাজ' আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

"মহাত্মা দয়ানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ ক্ষুদ্র হিঁদুয়ানিকে আর্য-উদারতার দিকে প্রসারিত করিবার যে প্রয়াস পাইতেছেন এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাহা যেরূপ পরিব্যাপ্ত হইতেছে তাহাতে আমরা মহৎ আশার কারণ দেখিতেছি।

"উক্ত সমাজের, অন্তত সমাজস্থাপয়িতা দয়ানন্দ স্বামীর প্রচারিত মতের প্রধান গুণ এই যে, তাহা দেশীয়তাকেও লঙ্ঘন করে নাই, অথচ মনুষ্যত্বকেও খর্ব করে নাই। তাহা ভাবে ভারতবর্ষীয়, অথচ মতে সার্বভৌমিক।···

"এই সমাজের সমস্ত লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করিয়া আমরা আশা করিতেছি যে ইহা ভারতের আর একটি অভিনব সম্প্রদায়রূপে নূতন বিচ্ছেদ আনয়ন না করিয়া সমস্ত সম্প্রদায়কে ক্রমশ এক করিতে পারিবে।"

রবীন্দ্রনাথ 'হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি'র বিরুদ্ধে কথা বলিলেও সেই সময় তাঁহার ধর্মভাব তাঁহার দৃষ্টিকে এতখানি আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, 'আর্যসমাজে'র মত একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম-আন্দোলনের মধ্যেও তিনি মহৎ আশার লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। অথবা ইহাও হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সেই সময় আর্যসমাজ সম্পর্কে বড়ো একটা খবর রাখিতেন না। আর্যসমাজের 'বৈদিক যুগে ফিরিয়া যাইবার আহ্বান' তাঁহাকে কিছুটা বিভ্রান্ত করিয়াছিল। তাহা ছাড়া আর্যসমাজ-প্রবর্তিত শিক্ষাবিস্তার আন্দোলন এবং হিন্দুসমাজের নির্যাতিতদের সামাজিক মর্যাদাদান প্রভৃতি আন্দোলনও তাঁহাকে কিছুটা আকৃষ্ট করিয়াছিল, মনে হয়।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ জাতির ঘৃণ্য জাতিবিদ্বেষ ও মিথ্যা জাত্যহঙ্কার-বোধের তীব্র সমালোচনা করিয়া ঐ প্রবন্ধেই বলিলেন,

"ভিন্ন জাতির সহিত সংস্রব ইংরেজের যেমন ঘটিয়াছে এমন আর কোনো য়ুরোপীয় জাতির ঘটে নাই। কিন্তু ইংরেজের পরজাতিবিদ্বেষ সমান সুতীব্র রহিয়াছে। ইহা তাহাদের জাতীয়তার অত্যুগ্র বিকাশের পরিচয়স্থল।...

"আহারে বিহারে আচারে ও ভাবে দ্বীপবাসী ইংরেজের সহিত মহাদেশবাসী য়ুরোপীয়ের স্বল্পই প্রভেদ, কিন্তু সেই প্রভেদগুলিও সাধারণ ইংরেজের মনে অবজ্ঞা এবং প্রতিকূল ভাব আনয়ন করে। তাহাদের জাতিসংস্কার এত দৃঢ় এত সুকঠিন।

"ইহার উপরে যখন পরজাতির সহিত স্বার্থের সংঘর্ষ জন্মিবার লেশমাত্র সম্ভাবনা ঘটে তখন ইংরেজের অসহিষ্ণুতা যে অত্যন্ত বর্ধিত হইবে ইহা স্বাভাবিক।"

ইহার পর তিনি ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে ইংরাজ জাতির ঘৃণ্য জাতিবিদ্বেষ ও শোষণ-অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিলেন,

"অল্পদিন হইল ভূতপূর্ব ভারত-স্টেট-সেক্রেটারি সার হেন্‌রি ফাউলার পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন, 'ওআরেন হেস্টিংস এবং লর্ড ক্লাইভের কার্যবিধি যদি পার্লামেণ্টের বিচারাধীন হইত তবে সম্ভবত ভারতসাম্রাজ্য আমরা পাইতাম না।' তাঁহার এই বাক্যে পার্লামেণ্টে খুব-একটা উৎসাহসূচক করতালি পড়িয়াছিল।

"একথাটার কি এই অর্থ যে, যেখানে স্বার্থ স্বজাতির এবং দুঃখ পরজাতির সেখানে অত বিচার-আচার করিলে চলে না? পার্লামেণ্টের মতো প্রকাশ্য বৃহৎ সভায় একথার উচ্ছ্বসিত অনুমোদন কি ধর্মনীতির মূলসূত্রের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা-প্রদর্শন নহে।

"...যে অবজ্ঞা ফাউলার সাহেবকে প্রকাশ্য স্পর্ধার সহিত নির্লজ্জ নীতিবিরুদ্ধ বাক্য বলাইয়াছে সেই স্পর্ধা এবং সেই অবজ্ঞাই ভারতবর্ষীয় পাখাকুলিদের সম্বন্ধে কালস্বরূপ, সেই অবজ্ঞাই সমস্তিপুরে দরিদ্রদের বিবাহ উৎসবে হত্যাকাণ্ডের হাহাকার তুলিয়াছিল, সেই অবজ্ঞাই গোরা-বিভীষিকা-গ্রস্ত মারীপীড়িত দুর্ভাগাগণের অন্তিম অনুনয় হইতেও কর্তৃপুরুষদিগকে বধির করিয়া রাখিয়াছিল।"

ইংরাজের ঔপনিবেশিক বীভৎস রূপটির সম্পর্কে তিনি আরও বলিলেন,

"ইংরেজের এই পরবিদ্বেষ, বিশেষত, নেটাল অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে

কিরূপ নখদন্তবিকাশ করিয়া উঠিয়াছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। অথচ ইহাও দেখা যাইতেছে, ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সৈন্যকে আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যের মধ্যে রক্তপাত করাইতে কুণ্ঠিত নহেন। তখন, এক রাজ্ঞীর প্রজা, এক সাম্রাজ্যের অধিবাসী, এমনসকল সৌভ্রাত্র্য-মধু-মাখা কথা শুনা যায়। ইংরেজ-মহারানীর অধিকার-বিস্তারে প্রাণপাত করিতে ভারতবাসীর কোনো বাধা নাই, কিন্তু সেই অধিকারে স্থানলাভ করা তাহার পক্ষে নির্বাধ নহে। এইপ্রকার ব্যবস্থার মধ্যে যে-একটা ক্ষুদ্রতা হীনতা আছে তাহা ইংলণ্ড উপলব্ধি করেন না—তাঁহার সম্মুখভাগের মহত্ত্ব লাঙ্গুলবিভাগের খর্বতার কোনো খবরই রাখে না। অথচ ওই খর্ব দিকটাব লাঙ্গুল, আস্ফালন ব্যাপারে ন্যূন নহে। দমন-শাসন-তাড়ন-তর্জনে সর্বদাই সে চঞ্চলিত। তাহার চক্ষু নাই বলিয়া চক্ষুলজ্জাও নাই।

"চক্ষুলজ্জা যে নাই ভারতবর্ষীয় ইংরেজি খবরের কাগজে সর্বদাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্তিপুর-ব্যারাকপুরের হত্যাব্যাপার ইংরেজি কাগজে কোনোপ্রকার আখ্যা পাইল না, কিন্তু শালিমারের দুর্ঘটনা 'শালিমার ট্রেজেডি' নামে সমুচ্চস্বরে বারংবার ঘোষিত হইতে লাগিল।...দেখিতে দেখিতে ইংরেজকর্তৃক কতকগুলি দেশীয় লোকের বীভৎস হত্যা পরে পরে সংঘটিত হইল—ইংরেজ সম্পাদকগণ একেবারেই মৌন অবলম্বন করিলেন।"

[প্রসঙ্গ-কথা—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫৫৫-৬২]

এই সুদীর্ঘ লেখাটির প্রতিটি ছত্রে ছত্রে ইংরাজের জাতিবিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সুতীব্র ঘৃণা ও উষ্মা প্রকাশ পাইয়াছে, সমকালীন কোনো কবি, সাহিত্যিক বা রাজনীতিবিদের বক্তৃতা বা লেখায় তাহা দেখা যায় না। তখনও সিডিশন্ আইন বলবৎ রহিয়াছে। আইন বাঁচাইয়াও তিনি যে নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা এবং স্বাজাত্যবোধ ও মানবতার পরিচয় দিয়াছেন, সে-যুগে তাহা অতীব দুর্লভ। এবং এই প্রসঙ্গে আরো একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ভারতীয় সৈন্যকে ইংরাজ-সাম্রাজ্য-বিস্তারের কাজে আফ্রিকায় বা অন্যত্র ব্যবহার করা হইতেছে—রবীন্দ্রনাথ তাহা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিতেছেন। আফ্রিকার দেশগুলির প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও দরদ তিনি পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় 'চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক'দের (indentured labourers) যে সেখানে 'এক সাম্রাজ্যের অধিবাসী' হিসাবে ইউরোপীয়দের ন্যায় সমদৃষ্টিতে দেখা হয় না, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিতেছেন।

স্মরণ থাকিতে পারে, গান্ধীজী তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু তিনি তখন ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের উপর অসীম আস্থাশীল। ইংরাজের ঔপনিবেশিক শোষণরূপ তিনি তখনও দেখিতে পান নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজের সাম্রাজ্য-প্রসারী আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে গান্ধীজী তখনও কোনো কথা বলিতেছেন না।

এই সময় 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল' লইয়া বাংলাদেশে তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। 'লোকাল গভর্নমেণ্ট অ্যাক্ট' অনুযায়ী কলিকাতা-কর্পোরেশন এতদিন মোটামুটি ভালোভাবেই কাজ চালাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু কর্পোরেশনের মধ্যে ক্রমাগতই কংগ্রেসপন্থী স্বাধীনচেতা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অনুপ্রবেশ ঘটিতে থাকে। তাহার ফলে এদেশীয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ প্রমাদ গণিলেন। বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যর আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি অকস্মাৎ কর্পোরেশনের এদেশীয় সভ্যদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করিলেন। তিনিই কর্পোরেশনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকারগুলিকে খর্ব করিয়া উহাকে সরকারের তাঁবেদারিতে আনিবার জন্য 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল' উপস্থাপিত করিলেন। অবশ্য এপ্রিল মাসেই (১৮৯৮) তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার স্থলে আসিলেন স্যর জন উড্‌বার্ন। স্বায়ত্তশাসন-অধিকারের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কংগ্রেস হইতে অ্যাজিটেশন-আন্দোলন শুরু হইল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ-কংগ্রেসে সভাপতি আনন্দমোহন বসু এই বিলের প্রতিবাদে বলিলেন,

"...if the metropolis of India is deprived of the power of Local Self-Government which it has enjoyed so long with such marked success, a precedent will have been created, and a blow will have been struck at a cause on which rest all hopes of India's future progress....it is now proposed to make a radical and revolutionary change in the law, to deprive the Corporation of almost every real power and to vest it in a Chairman, who is an official and a nominee of the Government, and a Committee in which the ratepayers will be represented by a mere third of its members....We ask for no funds. We ask for no extension of Calcutta's Municipal rights. But we implore that the rights, circumscribed and safeguarded as they are, which have so long been enjoyed, may not be taken away...."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. pp. 352-53]

রবীন্দ্রনাথ দেশের এইসব নিয়মতান্ত্রিক শাসন-সংস্কারগুলির সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। বিশেষ করিয়া ভূতপূর্ব গভর্নর মেকেঞ্জি-

সাহেব যখন বিলাতে বাঙালি কমিশনারদের প্রতি বিষোদ্গার করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। ভারতী পত্রিকায় 'প্রসঙ্গ-কথা'য় (ভারতী, ১৩০৫ আশ্বিন) তিনি ইহার জবাবে লিখিলেন,

"আমাদের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা ম্যাকেঞ্জি-সাহেব তাঁহাদের স্বদেশের শীতল বায়ুতে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের গরম এখনও তাঁহাকে ছাড়ে নাই। ইতিমধ্যে এক ভোজ উপলক্ষে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটির বাঙালি কমিশনারদের প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে গণ্যব্যক্তির মধ্যে আমল দেন নাই।

"...ম্যাকেঞ্জি-সাহেব তাঁহার ভোজাবসানের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, কলিকাতার কর্তৃত্বভার অসাবধানে আমাদের হাত হইতে অনেকটা খসিয়া পড়িয়াছে। হায়! এইটুকুর প্রতিও লোভ!...

"...ম্যুনিসিপ্যাল-বিল পাস করা যদি কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত হয় তবে ভূতপূর্ব বঙ্গাধিপ এ সম্বন্ধে যতই চুপ করিয়া থাকেন ততই ভালো। তিনি বিলাতে বসিয়া খানার পরে অসংযত বক্তৃতা করিয়া উপদ্রব বাড়াইয়া তুলিতেছেন।

"গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আত্মবিস্মৃতি ও ধৈর্যচ্যুতি আমরা বর্তমান-কালের একটা কুলক্ষণ বলিয়া গণ্য করি।...সেই রকমের যেন একটা লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অবশ্য স্বজাতিপ্রেম সকল সময়েই স্বাভাবিক, কিন্তু আজকাল যেন ভারতবর্ষের সরকারি ও বে-সরকারি ইংরেজ ক্রমশই ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ইংরেজি খবরের কাগজের নাড়ীতেও যখন বেগ প্রকাশ পায় তখন গবর্মেণ্টেরও চক্ষু লাল এবং গাত্র উত্তপ্ত দেখিতে পাই। ইংরেজি খবরের কাগজে বাঙালিদের প্রতি যে সুতীব্র অসহিষ্ণুতা দেখা যায় গবর্মেণ্টের আচরণেও নানা আকারে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

"অন্তত ম্যাকেঞ্জি-সাহেব সে ভাবটি চাপিয়া রাখেন নাই। তিনি যদিচ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, ইংরেজি খবরের কাগজের সম্পাদক ছিলেন না, তথাপি ইংরেজ প্লাণ্টার প্রভৃতিকেও সুমিষ্ট স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন; অথচ যে নিরন্ন জাতি আজ পর্যন্ত তাঁহার মুখের অন্নজল জোগাইতেছে তাহাদের ভদ্রমণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহার মুখে একটি মিষ্টিবাক্য জুটিল না!

"কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি, নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির ন্যায় এক্ষণে তিনি বিশ্রাম-লাভ করুন; এখনও অন্তর্জ্বালার উত্তেজনায় তাঁহাকে যেন বাঙালিবিদ্বেষ উদ্গীর্ণ করিতে না হয়।" [প্রসঙ্গ কথা—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫৬২-৬৬]

এ দেশের ইংরাজ সম্প্রদায় সম্পর্কে পরের মাসে ভারতী পত্রিকার 'প্রসঙ্গ-কথা'য় (ভারতী, ১৩০৫ কার্তিক) তিনি লিখিলেন,

"রাজকর্মচারীগণ ব্যতীত অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় ইংরেজই বাণিজ্যজীবী। তুচ্ছতম উৎপাত উপলক্ষেই তাঁহারা গুরুতর আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক। কারণ ভারতশাসন কার্যকে নিজেদের স্বার্থ-সাধন-হিসাব ছাড়া আর কোনো হিসাবে দেখিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন। তাঁহাদের মুখ হইতে এমন কথা প্রায়ই শুনা যায় যে, এ ভারতবর্ষটা টুপিওআলারই ভারতবর্ষ। পাগড়িওআলা ও খালিমাথাগুলো কেবলমাত্র তাঁহাদের চা-বাগানের কুলি, নীলক্ষেত্রের চাষি, পাট-জোগানের পাইকর, এবং লাংকাশিয়রের খরিদদার।

"...ইংরেজ বণিকগণ ভারতবর্ষকে যেখান হইতে নিরীক্ষণ করেন সে জায়গাটা যতই উচ্চ হউক তাহার ভিত্তি সংকীর্ণ, তাহা ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত লাভক্ষতির উপর দাঁড়াইয়া; একটু নাড়া খাইলেই তাহা দুলিয়া উঠে।..."

ইহাদের অমূলক ভীতির কারণগুলির পরিণাম শেষ পর্যন্ত এদেশীয়দের পক্ষে যে কী মর্মান্তিক হইয়া উঠে, তাহার উদাহরণ দিতে গিয়া তিনি সাঁওতাল-বিদ্রোহ সম্পর্কে হাণ্টার সাহেবের মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলেন। এই শ্রেণীর ইংরাজের সহিত ইংরাজ রাজপুরুষশ্রেণী কিভাবে মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলিলেন,

"আসল কথা, ভারতবর্ষীয় ইংরেজসম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিকতার ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে।...এরূপ কুটুম্বিতা যখন স্বাভাবিক তখন ইহার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিবার জো নাই। আমরা কেবল সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজ কেমন করিয়া একাকার হইয়া আসিতেছে তাহাব কারণ নির্ণয় করিতেছি মাত্র।

"এখন যেকোনো বিধান বা রাজনীতি ভারতবর্ষীয় ইংরেজ-সাধারণের অপ্রিয় তাহাতে হাত দিতে গেলেই সামাজিক চক্ষুলজ্জাটা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে। টেনিস্-কোর্ট নৃত্যশালা শিকার-পার্টি রঙ্গমঞ্চ সংগীত সভায় স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চলা অসামান্য বলশালী লোকের কর্ম।...

"...আজকাল শাসনকর্তাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে ইংরেজ-সমাজের দ্বারা চালিত না হওয়া; তাহাই তাঁহাদের পক্ষে দুর্বলতা। পাছে এমন কথা উঠে যে কন্‌গ্রেসের দলবদ্ধ কাতরতায় ভুলিল সেই মনে করিয়া কোনো উদারনীতি-প্রবর্তনে দ্বিধা বোধ করা, ইহাই দুর্বলতা; ইংরেজ পত্রসম্পাদকের সহিত রাজসিংহাসন ভাগাভাগি করিয়া লওয়া, ইহাই দুর্বলতা। এখনকার ভারত শাসন-ব্যাপার

ভারতবর্ষীয় ইংরেজের সামাজিকতাজালে আপদমস্তক জড়িত এবং সেইজন্যই দুর্বল।…" [প্রসঙ্গ-কথা—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫৬৭-৭১]

এদেশীয় ইংরাজ ব্যুরোক্রাসি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ অবশ্য খুব নির্ভুল নহে। ইংরাজ ব্যুরোক্রাসির সহিত ইংরাজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর ঘনিষ্ঠতার আরও গূঢ় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ আছে, একথা আজ প্রায় সকলেই জানেন। তবুও মোটামুটি ভাবে রবীন্দ্রনাথ উহাদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও একাত্মতা লক্ষ্য করিতেছিলেন।

কংগ্রেসের একঘেয়ে আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই বিরক্ত ও অতিষ্ঠ বোধ করিতেছিলেন। এমন সময় বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের নিকট হইতে কংগ্রেস সম্পর্কে একটি সমালোচনা পত্র পাইলেন। ভারতী পত্রিকায় ঐ সমালোচনা পত্রের উল্লেখ করিয়া কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে তিনি কয়েকটি নূতন প্রস্তাব রাখিলেন, যাহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ (ভারতী, ১৩০৫ অগ্রহায়ণ)। তিনি বলিলেন,

"সমালোচ্য পত্রখানির এক জায়গায় আভাস আছে যে, নূতনত্বের হ্রাস হওয়াতে আমাদের উৎসাহ ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যেমন বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে জগতের রহস্য অধিকতর প্রসারিত হইয়া যায় তেমনি কাজ যত সম্পন্ন হয় উদ্যমের নূতনত্ব ততই বাড়িতে থাকে। কিন্তু যেখানে কাজ নাই, কেবলই আয়োজন, সেখানে উৎসাহের নবীনতা কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা অসাধ্য। ভিক্ষাচর্যা যতই নৈপুণ্যসহকারে নব নব কৌশলে নিষ্পন্ন হউক, তাহাকে কাজ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।

"প্রতি বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষ একত্র হইয়া অন্তত একটা-কিছু কাজ আমরা নিজেরা যদি করিতে পারি, তবে সেই কৃতকার্যতার উৎসাহে পরবৎসরের কন্‌গ্রেস আপনি সজীব হইয়া উঠিবে।

"দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা কাজের উল্লেখ করিতে পারি। বোম্বাইয়ের পার্শি মহাত্মা শ্রীযুক্ত টাটা ভারতবর্ষে যে বিজ্ঞানপরীক্ষাশালার জন্য প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন তাহার সহিত সমস্ত ভারতের যোগসাধন করা কেবল কন্‌গ্রেসের ন্যায় কোনো বিশ্বভারত-সম্মিলনী·সভার দ্বারাই সাধ্য।

"উক্ত পরীক্ষাশালা কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত টাটার অর্থসাহায্যদ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব প্রদেশ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া যদি টাটা-সাহেবের এই প্রস্তাবটিকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন তবে কন্‌গ্রেসের জন্ম সার্থক হয়।

"'এইরূপ শিল্প বাণিজ্য বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি সর্ব বিষয়েই আমাদের সুগভীর দৈন্য আমাদের দেশের লোকের মুখ তাকাইয়া আছে। সমস্ত ভারতবর্ষ একত্র হইয়া তিনটে দিনের একটা দিনও সেকথার কোনো উল্লেখ হয় না, এমন মহৎ সুযোগ কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির রুদ্ধ লৌহদ্বারের উপর মাথা কুটিয়াই ফাটিয়া যায়— ইহাতে আমাদের আশা ও উৎসাহের কারণ কী আছে জানি না।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইহার দুই বৎসর পূর্বে—পুনার ঐ হাঙ্গামার পর হইতেই ভারতীয় 'নেটিভ'দের 'রুরকী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে' পাঠ করিবার অধিকার হরণ করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর হইতেই কংগ্রেস ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে এই বিষয় লইয়া সরকারের নিকট বহু স্মারকলিপি, বহু আবেদন-নিবেদন করা হয়। কিন্তু তাহাতেও ইংরাজ সরকারের মন গলে নাই। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই ইহার বিরোধী ছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি আরও বলিলেন,

"ফ্রান্স জর্মানি ইটালি প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশসকল স্বরাজ্যের বাণিজ্য-উন্নতি সাধনের জন্য যে-সকল শিল্প-বিদ্যালয় বাণিজ্য-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতেছেন তাহা যদি সে সকল দেশের পক্ষেও অত্যাবশ্যক হয় তবে আমাদের দেশে তাহার যে কিরূপ প্রয়োজন, বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের এ অভাব কে পূরণ করিবে। রাজা যদি নাই করে তবে কি বসিয়া থাকিব এবং আবেদন করিব।

"আমাদের রাজা বিদেশী ; তাঁহারা যে রাজকর সংগ্রহ করেন তাহা মাহিনাপত্র পেন্‌শন্ কম্পেন্‌সেশন, যুদ্ধবিগ্রহ, শৈলবিহার প্রভৃতিতে অনেকটা শুষিয়া যায়। সে-সমস্ত বিস্তর বাজে-খরচ খাটো করিয়া দেশের ধন দেশের স্থায়ী হিতসাধনে ব্যয় করিবার জন্য কন্‌গ্রেস বহু বৎসর চীৎকার করিলেও রাজার কিরূপ মর্জি হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। সেই অনিশ্চিত আশ্বাসে সুদীর্ঘ কাল বক্তৃতাদি না করিয়া আমরা যদি সমস্ত ভারতের সমবেত চেষ্টায় একটা উপযুক্ত শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি তবে তাহাতেই কন্‌গ্রেসের গৌরব বাড়িবে। ...আমাদের রাজা যাহা পারে না বা করে না, কন্‌গ্রেস তাহাই নিজের সাধ্যমতো করিবে, ইহাই তাহার ব্রত হউক। বিদেশী তো আমাদের অনেক করিয়াছে, এখন স্বদেশী কী করিতে পারে তাহাই দেখাইবার সময় আসিয়াছে—বৎসর বৎসর এখন আর সেই অভ্যস্ত পুরাতন ভিক্ষার বুলি হতশ্বাস কণ্ঠে পরের ভাষায় পরের দ্বারে ঘোষণা করিয়া লেশমাত্র সুখ হয় না।"

সেদিনে একথা বলার যে কি অসীম তাৎপর্য, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাকে রবীন্দ্রনাথের 'বুর্জোয়া মনোবৃত্তি' বলিয়া অভিহিত করিয়া উহার তাৎপর্যকে লঘু করিয়া দেখিলে ঠিক হইবে না। আমাদের স্বাদেশিক প্রস্তুতির সেই প্রথম

যুগে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিবার কথা বলিতেছেন। আমাদের জাতীয় শিল্প (National Industry) তখনও ভালোভাবে গড়িয়া উঠে নাই। 'কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজ', 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির', বা 'যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ' তখনও বহু দূরে। রুরকি কলেজেও তখন ভারতীয় ছাত্রদের প্রবেশ নিষেধ। এমন দিনে তিনি ফ্রান্স-জার্মানির মত আধুনিক 'শিল্প-বিদ্যালয়', 'বাণিজ্য-বিদ্যালয়' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিতেছেন,—এবং সেই সকল বিদ্যালয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ও এদেশীয় শিল্পপতি ও ধনীদের অর্থে 'জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান' হিসাবে গড়িয়া তুলিবার কথা বলিতেছেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব তখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মনে তেমন সাড়া জাগাইতে পারে নাই। প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলা দরকার যে, 'বিদেশী তো আমাদের অনেক করিয়াছে' ইত্যাদি কথা শুনিয়া ধারণা হইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ বুঝি ইংরাজ রাজত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু আদৌ তাহা নহে। ঐ কথার পরক্ষণই তিনি ঐ-প্রবন্ধে বলিতেছেন,

"মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আমরা যখন অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলাম সেই সময় হঠাৎ আমাদের গবর্মেণ্টের যেরূপ চেহারা বাহির হইয়াছিল তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, আমরা তাঁহাদের আপনার নহি।···কিন্তু হঠাৎ যখন দেখিলাম তাহাও দ্বিধাবিদীর্ণ হইল, এবং তাহার মধ্যে দুই নাটু-ভ্রাতা কোথায় তলাইয়া গেলেন, তখন রাজবিধানের প্রতি আমাদের যে-একটা অটল শ্রদ্ধা ও নির্ভর এতদিন লালিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার অপঘাত মৃত্যু হইল। সেই সময়ে ভারতবর্ষের আদ্যোপান্তে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রের মনে একটা সুগভীর রাজনৈতিক বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, মোহ ছুটিয়াছিল; বুঝিয়াছিলাম, নিজের চেষ্টায় যতটুকু হয় তাহারই উপর যথার্থ স্থায়ী নির্ভর।

"···কিন্তু সেদিনের কঠিন শিক্ষা আমরা এই অল্পকালের মধ্যেই যেন ভুলিতে বসিয়াছি।···সেই শিক্ষা কন্‌গ্রেস্ ও কন্‌ফারেন্সকে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে এই ধিক্কৃত ভিক্ষাবৃত্তির অনন্ত লাঞ্ছনার পথ হইতে স্বচেষ্টায় স্বকার্য সাধনের দিকে নিঃসন্দেহে ফিরাইয়া আনিবে। তাহা যদি না আনিতে পারে তবে একদা এই কন্‌গ্রেসকে লজ্জা নৈরাশ্য ও অপমৃত্যুর হাত হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।" [প্রসঙ্গ-কথা—রবীন্দ্র-রচনাবলী: ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫৭৩-৭৫]

॥ কংগ্রেস বনাম জমিদার বিতণ্ডায় রবীন্দ্রনাথ ॥

রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করিলেও কংগ্রেসকে তিনি অন্তরের সহিত ভালোবাসিতেন। তিনি জানিতেন, কংগ্রেসই দেশের আশা-ভরসা। সেইজন্যই তিনি উহার সমালোচনা করিয়া উহার সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। এবং সেই কারণেই কেহ কংগ্রেসের অন্যায় সমালোচনা করিলে তিনি কংগ্রেসের পক্ষ লইয়া উহার তীব্র সমালোচনা করিতেন। ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন যে, এক শ্রেণীর জমিদার কংগ্রেসের শুরু হইতেই উহার বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিলেন। আমাদের আলোচ্য পর্বে একদা রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস-নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপলক্ষ করিয়া কংগ্রেসকে কুৎসিত-ভাবে আক্রমণ করিলেন। এমন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। ভারতী (১৩০৫ ভাদ্র) 'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে' প্রবন্ধে তিনি রাজা প্যারীমোহনকে উপলক্ষ করিয়া বাংলার ব্রিটিশ-পদলেহী জমিদারশ্রেণীর ঘৃণ্য দাস-মনোবৃত্তির তীব্র সমালোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন,

"রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি এক সম্প্রদায় জমিদারের মুখপাত্র হইয়া কন্‌গ্রেসপক্ষীয়ের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশপূর্বক আক্ষেপ করিয়াছেন যে, দেশের যাহারা 'ন্যাচারাল লীডার' বা স্বাভাবিক অধিনেতা বা প্রকৃত মোড়ল, নানা অস্বাভাবিক কারণে ক্ষমতা তাহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে।

"…মুখুজ্জেমহাশয় মনে মনে বেশ জানেন যে, বাঁড়ুজ্জেমহাশয় কম লোক নহেন, কিন্তু সরকারের কাছে সে কথা বলিয়া সুবিধা নাই। তাঁহাদের বলিতে হয়, হুজুরেরা যে কন্‌গ্রেসকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না আমাদেরও ঠিক সেই দশা।

"ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, গান্ধারী সেই আক্ষেপে নিজের চোখে কাপড় বাঁধিতেন, কারণ তিনি সাধ্বী ছিলেন। গবর্মেণ্ট যদি কাহারও প্রতি অন্ধ হন তবে মুখুজ্জে-মহাশয়ের কর্তব্য চোখে কাপড় বাঁধা, কারণ তাঁহারা খয়ের-খাঁ।

"কেবল রাজভক্তি নহে, ইহার মধ্যে একটু পাকা চালও আছে। উপরওআলা রাজপুরুষেরা আজকাল যখন স্পষ্টত নূতন জনসভাসকলের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন তখন একথা বলিবার সুযোগ হইয়াছে যে, সরকার যদি মুখুজ্জেমহাশয়-

দিগকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দেন তাহা হইলে বাঁড়ুজ্জেমহাশয়রা আর এত বাড়াবাড়ি করিতে পারেন না। আমরা স্বভাবতই বড়ো লোক, তোমরাও আমাদিগকে বড়ো করিয়া রাখো, কন্‌গ্রেস আপনি ছোট হইয়া যাইবে।...”

এই জমিদারশ্রেণীর চরিত্ররূপ সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

“...আমাদের দেশে জমিদার জমিদারমাত্র। তিনি জুলুম করিয়া খাজনা আদায় করিতে পারেন কিন্তু সমাজে তাঁহার অধিক অধিকার নাই। তাঁহারই একজন দীন প্রজা সমাজে হয়তো তাঁহা অপেক্ষা প্রতাপশালী।...আমাদের জমিদারবর্গ আপনাদিগকে ইংলণ্ডের সেই লর্ডশ্রেণীর সহিত তুলনীয় জ্ঞান করেন, এবং তাঁহাদের ভাবভঙ্গি অনুকরণেরও চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আমরা অ্যারিস্টক্র্যাট্‌স্।...

“..আমাদের দেশে রাজা-রায়বাহাদুরদের দেখিয়াও লোকে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে না। তাহার একটা কারণ এই যে, এই সকল পদবী দ্বারা উপাধীধারিগণ সমাজে এক ইঞ্চি উপরে উঠিতে পারেন না।...”

এই সব রাজা-রায়বাহাদুরদের ঘৃণ্য সাহেব-তোষণ-নীতির সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেন,

“সার আল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌ হয়তো ভালো লোক এবং বড়ো লোক, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁহা অপেক্ষা অনেক বেশি ভালো লোক এবং বড়ো লোক, এবং সকলের বেশি তিনি আমাদের স্বদেশী লোক। কিন্তু ক্রফ্‌ট্‌-সাহেব ভারত ছাড়িয়া স্বদেশে গিয়াছেন, সেই শোকে বিহ্বল হইয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ননির্মাণে ধনিগণ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন; আর বিদ্যাসাগর ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন, দেশের ধনশালীরা কোনোপ্রকার চেষ্টা করিলেন না! ইঁহারা দেশের ন্যাচারাল লীডর! আমাদের স্বাভাবিক চালক! ইঁহারা কোন্‌দিকে আমাদিগকে চালনা করিবেন?”

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য,

“সেকালের ধনী জমিদারগণ নবাব-সরকারে প্রতিপত্তি ও পদবী-লাভের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেন ও কোনো চেষ্টা করিতেন কিনা, তাহা আমরা ভালোরূপ জানি না।...কিন্তু তখনকার যাহা সাধারণ হিতকার্য—অর্থাৎ দিঘি খনন, মন্দির স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ, এই-সকলকেই তাঁহারা যথার্থ কীর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন, খেতাবলাভকে নহে।...”

“অতএব দেখা যাইতেছে, সেকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সর্বসাধারণের সহিত যে হিতানুষ্ঠানসূত্রে বদ্ধ ছিলেন, একালে তাহাও নাই।...ইঁহারা নিজ গৌরবেও উচ্চ নহেন, সর্বসাধারণের সহিত ঐক্য দ্বারাও বৃহৎ বলিষ্ঠ নহেন। ইঁহারা বিলাতের

লর্ডদের ন্যায় স্বতন্ত্র নহেন, বিলাতের জননায়কদের ন্যায়ও প্রবল নহেন। ইহারা বনস্পতির ন্যায় বিচ্ছিন্ন বৃহৎ নহেন, ওষধির মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃতও নহেন ; ইহারা কুষ্মাণ্ডলতার ন্যায় একমাত্র গবর্মেণ্টের আশ্রয়যষ্টি বাহিয়া উন্নতির পথে চড়িতে চাহেন—ভুলিয়া যান যে, সেই সংকীর্ণ রাজদণ্ডবাহী উচ্চতা অপেক্ষা গুল্মসমাজের খর্বতা শ্রেয় এবং তৃণসমাজের নম্রতা শোভন।"

উপসংহারে তিনি দেশের জমিদারদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

"বর্তমান জমিদারগণ যদি সেকালের দৃষ্টান্ত অনুসারে, কেবল রাজার মুখ না চাহিয়া, খেতাবের লক্ষ্য ছাড়িয়া, জনহিতসাধন ও দেশের শিল্প-সাহিত্য রক্ষণ-পালনে সহায়তা করেন তবেই তাঁহাদের ক্ষমতার সার্থকতা হয় এবং গৌরব বাড়িয়া উঠে।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫৭৬-৮২]

এই প্রবন্ধে যেমন তিনি কংগ্রেসের পক্ষ গ্রহণ করিয়া জমিদারশ্রেণীর তীব্র সমালোচনা করিলেন, পরমাসে ভারতীতে তেমনি তিনি কংগ্রেস-নেতৃত্বের সমালোচনা করিয়া 'অপরপক্ষের কথা' প্রবন্ধে বলিলেন (১৩০৫ আশ্বিন),

"…আমাদের দেশে যাঁহারা জননায়ক বলিয়া সর্বদা সভামঞ্চের উপর আরোহণ করেন তাঁহাদেরও ভাবগতিক দেখিয়া আমাদের মনে আশ্বাস হয় না। বরঞ্চ আমাদের জমিদারদিগকে দেখিতে শুনিতে ঠিক আমাদের দেশের লোকের মতো, কিন্তু আমাদের জননায়কদের অনেকেই যে দেশের মুরুব্বি বলিয়া আপনা-দিগকে প্রচার করেন সে দেশকে আচারে ব্যবহারে জীবনযাত্রায় অহরহ অপমানিত করেন।…

"জমিদারগণ দেশের জন্য যাহা করেন তাহা গবর্মেণ্টের মুখ তাকাইয়া, ইহারা যাহা করেন তাহাও ইংরেজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। তাহার ভাষা ইংরেজি, তাহার প্রণালী ইংরেজি তাহার প্রচার ইংরেজিতে। ইংরেজ-দৃষ্টির প্রবল আকর্ষণ হইতে ইহারা আপনাদিগকে প্রাণ ধরিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন না।")

কংগ্রেসের ইংরাজ-মোহ ও ইংরাজ-অনুকরণ রবীন্দ্রনাথ আদৌ সহ্য করিতে পারেন নাই। ইহারা ভারতে বসিয়া ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের স্বপ্ন দেখিতেন। দেশের মাটির সহিত, দেশের জনগণের সহিত ইহাদের কোনো সংযোগ বা পরিচয় ছিল না। দেশের ভাব-ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদের উপর ইহাদের অবজ্ঞায় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত। তিনি বলিলেন,

"…আমরা দেশের হিত করিব, কিন্তু দেশকে আমরা স্পর্শ করিব না!

"দেশকে কেমন করিয়া স্পর্শ করিতে হয়। দেশের ভাষা বলিয়া, দেশের বস্ত্র পরিয়া। ইংরেজের প্রবল আদর্শ যদি মাতার ভাষা এবং ভ্রাতার বস্ত্র হইতে

আমাদিগকে দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায় তবে জননায়কের পদ গ্রহণ করিতে যাওয়া নিতান্তই অসংগত।"

তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়া বলিলেন,

"কিন্তু ভিন্নভাষী ভারতকে এক করিবার জন্য কন্‌গ্রেসের ভাষা ইংরেজি হওয়া উচিত এমন তর্ক যাঁহারা এ স্থলে উত্থাপন করিবেন তাঁহারা আমার কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। যেখানে ইংরেজি বলা দরকার সেখানে অবশ্য ইংরেজি বলিবে। কিন্তু তোমার ভাষাটা কী।…জনসভার বাহিরে দেশের সহিত তুমি কিরূপ সংস্রব রাখিয়া চল।…

"কংগ্রেস যেমন সমস্ত ভারতবর্ষের মিলন-সভা, কন্‌ফারেন্স তেমনি সমস্ত বাংলার। সেই সমগ্র বাংলার মিলনক্ষেত্রে বাঙালির কী অভাব, বাঙালির কী কর্তব্য, সেও যদি আমরা ইংরেজি ভাষায় বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারি তবে তাহা হইতে কী প্রমাণ হয়। এই প্রমাণ হয় যে, দেশকে যাঁহারা চালনা করিতে চাহেন তাঁহারা, হয় দেশী ভাষা জানেন না, নয়, কর্তব্যের ক্ষতি করিয়াও ইংরেজি ভাষা ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের অভিমান চরিতার্থ হয় না।

"অতএব ভালো করিয়া দেখিলে দেখা যায়, জমিদারের চরিত্রে যে ঘুণ ঢুকিয়াছে আমাদের জননায়কদের চরিত্রেও সেই ঘুণ। ইংরেজের কৈশিকাকর্ষণ আমাদের দুই পক্ষেরই মস্তকের উপরে।"…

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"ইংরেজের সহিত সমান অধিকার ভিক্ষা করিয়া লইবার জন্য ইংরেজি ভাষা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশকে উচ্চতর অধিকারের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য দেশীয় ভাষা, দেশীয় সাহিত্য, দেশীয় সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজের উন্নতিসাধন একমাত্র উপায়। যাঁহারা স্বদেশ অপেক্ষা আপনাকে অনেক উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, যাঁহারা স্বদেশের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে লজ্জাবোধ করেন তাঁহারাও স্বদেশকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, স্বীকার করি। কিন্তু সেটুকু না করিয়া যদি তাঁহারা নিজের দেশকে নিজের উপযুক্ত জ্ঞান করেন এবং নিজেকে স্বদেশের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদের আত্মসম্মান থাকে এবং দেশকেও সম্মান করা হয়।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫৮৩-৮৭]

রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী মন্ত্রে' কংগ্রেসকে দীক্ষিত করিতে চাহিলেন। ১৯০৫ সালের 'স্বদেশী যুগের' ইহাই পূর্বাভাস। বলা বাহুল্য, ঠিক এই ধরনের চিন্তা

সমকালীন ভারতবর্ষে অন্য কাহাকেও করিতে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন স্বদেশী কৃষ্টির এবং মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রবর্তনের কথা চিন্তা করিতেছেন, অপরদিকে ইউরোপীয় সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইংরাজি ভাষার প্রতিও যথার্থ মর্যাদা দিবার জন্য ঐ প্রবন্ধের শুরুতে বলিতেছেন,

"জ্ঞানস্পৃহা ও রসবোধ, বুদ্ধি এবং কল্পনা, সাহস ও বাহুবল, অধ্যবসায় ও আত্মসম্মানে য়ুরোপীয় জাতির যে এক মহোচ্চ আদর্শ ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিতেছে তাহার যদি কোনো আকর্ষণ না থাকিবে তবে আমাদের শিক্ষাকে ধিক্।"

বুঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ একটি ভারসাম্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তবে এইসব বিষয় লইয়া তখনও পর্যন্ত তিনি খুব গভীরভাবে কিছু চিন্তা করিতে পারেন নাই।, পরবর্তীকালে ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের যুগেই তিনি স্বদেশী কৃষ্টি ও জাতীয় শিক্ষার সমস্যা লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

পরের মাসের ভারতী পত্রিকায় (১৩০৫ কার্তিক) 'আলট্রা-কন্সার্ভেটিভ' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি ব্যঙ্গ-প্রবন্ধ লক্ষ্য করা যায়। পাইওনিয়র পত্রিকায় 'আলট্রা-কন্সার্ভেটিভ' নামধারী জনৈক জমিদার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিয়া একটি পত্র লিখেন। এমন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথকেই লেখনী ধারণ করিতে হয়। এবং আলট্রা-কন্সার্ভেটিভ প্রবন্ধটি উহারই জবাব। ঐ প্রবন্ধের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,

"আমাদের আলট্রা-কন্সার্ভেটিভ যদিচ মহোচ্চ জমিদার সম্প্রদায়ভুক্ত তথাপি তাঁহার সংসারজ্ঞান যে একেবারেই নাই তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার একটা কথায় অত্যন্ত চতুরতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, কন্গ্রেস যে প্রচুর রাজভক্তি প্রকাশ করে, গোড়াতেই মহারানীর জয়কীর্তন করিয়া কার্য আরম্ভ করে—ইহার অপেক্ষা চালাকি তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।

"বাস্তবিক, চোরের কাছে চোর ধরা পড়ে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ'। সেই অতিভক্তি কন্গ্রেসই প্রকাশ করুন আর আমাদের আলট্রা-কন্সার্ভেটিভ-সম্প্রদায়েরাই করুন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য চুরি। যাঁহারা ডাফরিন-ফণ্ডে টাকা দেন, ভূতপূর্ব সাহেব-কর্মচারীদের অভূতপূর্ব পাষাণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশকে ভারাতুর করিয়া তোলেন, পায়োনিয়রকে গোপনে জিজ্ঞাসা করো দেখি তাঁহাদের অতিভক্তির মূল্য কি সাহেবেরা বোঝে না। ইহার মধ্যে ফাঁকি দিয়া কিছু কি আদায়ের চেষ্টা নাই। আলট্রাগণ না হয় নিজের জন্য উপাধি সন্ধান করেন, কন্গ্রেস না হয় দেশের জন্য একটা-কিছু সুযোগের চেষ্টায় থাকেন।··"

স্পষ্টতই, রবীন্দ্রনাথ এখানে আপেক্ষিকভাবে কংগ্রেসকে বড়ো করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। রাজা-মহারাজারা ক্ষুদ্র ব্যক্তি-স্বার্থে পদবী-লাভের ফিকিরে ঘুরিতেন। কংগ্রেসের স্বার্থ—বিরাট দেশের স্বার্থ। জমিদাররা যে নিছক সাহেব-তোষণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে। উপরন্তু, কংগ্রেস দেশ ও জাতির স্বার্থে যে সব দাবি লইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন, রাজা-মহারাজারা সেগুলি বিরোধিতা করিয়া ইংরাজের 'খয়ের-খাঁ-গিরি' করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি এইসব রাজা-মহারাজাদের নির্লজ্জ-মোসাহেবীগিরিকে তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া লিখিলেন,

"তবু অতিভক্তিতে তোমাদের কাছে কন্‌গ্রেসকে হার মানিতে হইবে। একবার ভাবিয়া দেখো, তুমি যে রাজভক্তির প্রচুর তৈল-লেপনে পায়োনিয়র পত্রটাকে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছ তাহার মধ্যে কত অভিসন্ধিই আছে। ওই-যে মুগ্ধচক্ষু সাহেবের মুখের উপর স্থাপন করিয়া অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিতেছ, সাহেব তোমারই জন্য দেশের লোকের কাছে গাল খাইলাম—(অতএব কিছু আশা রাখি!) ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর, পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর। (অতএব কিঞ্চিৎ সুবিধা চাই!) নাথ, তুমি বল কন্‌গ্রেস মন্দ, আমিও বলি তাই; (অতএব দেশের লোকের মাথার উপরে আমাকে চড়াইয়া দাও।) বঁধু, তুমি ম্যুনিসিপ্যালিটি হইতে দিশি জঞ্জাল বিদায় করিয়া বিলাতির আমদানি করিতে চাও সেই হচ্ছে 'জেনারেল সেন্টিমেণ্ট অফ দি ক্লাস টু হ্বিচ্ আই হ্যাভ দি অনার টু বিলঙ্।' (অতএব তোমার পাদপীঠপার্শ্বে আমাদিগকে স্থান দিয়ো!) ভারতবর্ষের মন্ত্রনাসভাই বল আর পৌরসভাই বল, সমস্ত আগাগোড়া নূতন নিয়মে পরিবর্তন করা আবশ্যক। (অর্থাৎ, সকল সভাতেই তুমি বস সিংহাসন জুড়িয়া, আর আমি বসি তোমার কোলে।) ইতি তোমার আদরের অতিভক্ত আলট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ।"

দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এইসব রাজা-মহারাজা, রায়বাহাদুর-রায়সাহেবদের' (অল্প কয়েকজন বাদে) কুখ্যাত দেশদ্রোহিতার ভূমিকাটি ভুলিবার নয়। ইহাদের জঘন্য মনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথকে এতখানি ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করিয়াছিল যে তাঁহার মতো শান্ত ও কঠোর-সংযমী কবির লেখনীও কী অসংযত হইয়া উঠিয়াছে, ঐ প্রবন্ধই তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অথচ অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা এই যে, কংগ্রেস হইতে ইহার কোনো প্রতিবাদও হয় নাই; কংগ্রেস জমিদারী ব্যবস্থার অবসানও চাহে নাই। বরঞ্চ তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের জন্য এক শ্রেণীর রাজা-জমিদারদের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা খুঁজিতেন। অবশ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন ও শিক্ষা-আন্দোলনে কয়েকটি জমিদার-পরিবারের বিশিষ্ট অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু বেশীর ভাগ

ক্ষেত্রেই জমিদাররা ছিলেন প্রবল অত্যাচারী ও উৎপীড়ক। স্বাধীনতা-আন্দোলনে দেশদ্রোহিতা করিয়া ইঁহারা ইংরাজের সাহায্য করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার হইয়াও এইসব প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারকে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন।

কিন্তু রাজা-মহারাজা ও জমিদার শ্রেণীর উপর রবীন্দ্রনাথের তখনও মোহ একেবারে যায় নাই। তাই অল্পকাল পরেই বাংলাদেশের কয়েকটি রাজপরিবারের (যাঁহাদের সহিত কবির পূর্ব-ঘনিষ্ঠতা ছিল) মধ্যে তিনি দেশের অপূর্ব সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের মাধ্যমেই তিনি প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখিলেন। যথাস্থানে আমরা এই আলোচনায় আসিব।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় যে কেবল রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলীই লিখিতেছিলেন, তাহা নহে। এই সময়েই তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধটি রচনা করেন। লোক-সংস্কৃতি, লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে দেশকে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই সচেতন করিয়াছেন। ইহার পনেরো বৎসর পূর্বে ভারতী পত্রিকায় (১২৯০ বৈশাখ) তিনিই সর্বপ্রথম গ্রাম্যগাথা ও প্রচলিত গীতসমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু আহ্বান জানাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। ১৩০১ সালে সাহাজাদপুরে থাকাকালে তিনি গ্রামাঞ্চলের বহু গাথা সংগ্রহ করিয়া 'মেয়েলি ছড়া' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (১৩০১ আশ্বিন)। ঐ বৎসরই কয়েক মাস পরে 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় তিনি কলিকাতা অঞ্চলের ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন (১৩০১ মাঘ)। আমাদের আলোচ্য পর্বে তিনি ভারতীতে লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিলেন। 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে ঐগুলি পরে সংকলিত হইয়াছে।

'লোক-সাহিত্য' সম্বন্ধে আলোচনার ইহা উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। তবুও একটি কথা এখানে বলা দরকার,—জনগণের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা না থাকিলে, জনতার রসবোধ, শিল্পবোধ ও সৃজনীশক্তির উপর অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা না থাকিলে লোক-সাহিত্য সংকলনে উৎসাহ ও প্রচেষ্টা সম্ভব হয় না।

॥ বর্ষশেষ ॥

ইহার কিছুদিন পরই কবি লিখিলেন তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বর্ষশেষ' (৩০শে চৈত্র, ১৩০৫)। এই কবিতাটি লইয়া বহু আলোচনা—বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাতে শেলীর 'Ode to the West Wind'-এর পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু কেহই তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকায় কবির বিক্ষুব্ধ মানসিক অবস্থাটির কথা চিন্তা করেন নাই। অথচ একটু ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই কবিতা রচনার পশ্চাতে অলক্ষিতে কবি-মনে রহিয়াছে,—পরাধীনতা ও দাসত্বের চাপে ন্যুব্জপৃষ্ঠ শান্তশিষ্ট ভীরু জাতীয় চরিত্রের আলেখ্যটি।

প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া তখন মুক্ত ও বলিষ্ঠ প্রাণের আহ্বান কোথাও শুনা যাইতেছে না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেই ঘৃণ্য তোষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া ইংরাজের দুয়ারে মাথা কুটিতেছেন। দেশের চারিদিকে ভীরু, ক্লীব, দাস-মনোবৃত্তি কবিকে অহরহ তীব্র পীড়ন করিতেছে। সাধনা ও ভারতীর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে এই ক্ষুব্ধ, অশান্ত কবি-মানুষটি যে কী দুঃসহ যন্ত্রণায় ছটফট করিয়াছেন, পূর্বেই তাহা আমরা দেখিয়াছি। মাঝে মাঝে তাঁহার নিজের মধ্যে সংগ্রামের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাধা, তাঁহার ভিতরকার শান্তশিষ্ট নির্বিরোধ কবি ও সাংসারিক মানুষটি—যে মানুষটি আর দশজন বাঙালী ছা-পোষা মানুষের মত প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। (স্মরণ থাকিতে পারে কবি তখন শিলাইদহে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ ঘোর সংসারী জীবন যাপন করিতেছেন। ওদিকে কুষ্টিয়ায় ঠাকুর-কোম্পানির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় এবং এইসব লইয়া কবিকেও চিন্তা করিতে হয়)।

কবি-জীবনের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পূর্ণ নূতন নহে। 'চিত্রা'র যুগে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল ; পূর্বেই তাহা আলোচনা করিয়াছি। কি ব্যক্তি-জীবনে, কি জাতীয় জীবনে দণ্ডে-দণ্ডে পলে-পলে জীবনের এই অবক্ষয়—প্রতি মুহূর্তের এই মৃত্যু ও পরাজয়ের বিরুদ্ধে কবি যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছেন। ১৩০৫ সালের ৩০শে চৈত্রের ভয়ঙ্কর কাল-বৈশাখীর ঝড়ে সহসা কবি-মনের এই বিদ্রোহ মুক্তি পাইয়া

যেন বজ্র-বিদ্যুতের মত আকাশে-আকাশে গর্জন করিয়া ফিরিতেছে। অশান্ত বিক্ষুব্ধ কবি আজ মহাপ্রাণের জয়গান গাহিয়া উঠিলেন,

"বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝংকারঝঞ্ঝনা,
তোলো উচ্চসুর।
হৃদয় নির্দয় ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝড়িয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
গাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্ধ্ববেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে।।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরি,
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান।।
চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার—
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।।
শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাংকিত কালি,
লাভক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।।
...

শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।”

লক্ষ্য করিবার বিষয়—কবি শুধু ‘আমি’র কথাই বলিতেছেন না, ‘আমাদের’ কথাও বলিতেছেন। ‘আমি’ এখানে উপলক্ষ মাত্র—‘আমরা’ (অর্থাৎ জাতি) লক্ষ্য। রোমান্টিক কবি, ঝড়ের রাত্রে আকাশের বুক হইতে বজ্র আহরণ করিয়া জাতির জন্য এক মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপ্রাণ সৃষ্টি করিতে চাহিলেন।

বহুকাল পরে কবি স্বয়ং ইহার একটা ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছিলেন, “১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি।···এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনিভাবে চিরনবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থামল। বললুম, অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই-যে এতদিন কাটালুম, এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হলো না। যে আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায় তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল; আমি বুঝলুম, বেরিয়ে আসতে হবে।”

[গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৭ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫৩৮]

।। রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা-রাজপরিবার ।।

১৩০৫-০৮ সাল—এই কালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বা জাতীয় সমস্যা লইয়া চিন্তা করিতে দেখা যায় না। কাব্য-সাহিত্যে এই কালের মধ্যে 'কণিকা', 'কথা', 'কাহিনী' ও 'ক্ষণিকা' কবির উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

ব্যক্তিগত খবরের মধ্যে, জগদীশচন্দ্রের বিলাতযাত্রা (তৃতীয় বারের জন্য) উপলক্ষে ত্রিপুরা-রাজপরিবারের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা, উল্লেখযোগ্য।

কয়েক বৎসর পূর্বেই জগদীশচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তুর উপর রবীন্দ্রনাথের অসীম আগ্রহ ছিল। ১৩০৭ সালে জগদীশচন্দ্র তাঁহার গবেষণা প্রমাণ করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। রবীন্দ্রজীবনীর পাঠক মাত্রেই জানেন যে, জগদীশচন্দ্রের বিলাতের ব্যয়ভার সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যক্তিগত কত লাঞ্ছনা ও হীনতা স্বীকার করিয়াও কবিকে ত্রিপুরা-রাজপরিবারের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিয়াছিলেন (১৯০১),

"কেবল জগদীশবাবুর কার্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না—লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব—ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য নহে, স্বদেশের কার্য। সুতরাং ভিক্ষুভাবে আমি এবার অসংকোচে মহারাজের দ্বারে দাঁড়াইব।"

এই সময় অপর একটি পত্রে ত্রিপুরার মহারাজকে লিখিতেছেন,

"মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি—যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনা দোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না-থাকিতাম, তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না।...জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক—এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত।

"মহারাজের পরিবারবর্গ নানা কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সংকুচিত করিবে, আমি তাহা শিরোধার্য করিব।"

[বিশ্বভারতী পত্রিকা—জগদীশচন্দ্র-বিপিনচন্দ্র সংখ্যা ।। পৃঃ ১৩৭-৩৮]

নাটোরের রাজপরিবারের সহিত পূর্ব হইতেই কবির ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু ত্রিপুরা-রাজপরিবারের সহিত কবির পূর্ব হইতে আলাপ-পরিচয় থাকিলেও এইসময় হইতেই উহা নানা কারণে ও উপলক্ষে ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ দেশের জমিদার শ্রেণী বা রাজা-মহারাজাদের সম্পর্কে যে খুব ভালো ধারণা রাখিতেন, তাহা নহে। কিছুকাল পূর্বেই 'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে', 'আলট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ' প্রবন্ধগুলি আলোচনাকালে আমরা উহা দেখিয়াছি। তবুও বিশেষ কয়েকটি রাজপরিবার এবং দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই সময় যেন বেশ কিছুটা আশাবাদী মত পোষণ করিতেছিলেন। কবি এমন কথাও ভাবিতেছিলেন যে, আমাদের জাতীয় ও স্বাদেশিক আন্দোলনে এক শ্রেণীর উচ্চ রাজপরিবার বিশেষ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। 'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে' প্রবন্ধটিতে তিনি এই 'আদর্শ জমিদারে'র চিত্র আঁকিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন,

"পুরাকালের বড়ো জমিদারগণ রাস্তাঘাট করিয়া সাধারণের অভাবমোচন, যাত্রাগান প্রভৃতি উৎসবের দ্বারা সাধারণের আমোদবিধান, এবং গুণী পণ্ডিত ও কবিদের প্রতিপালন দ্বারা দেশের শিল্প-সাহিত্যের রক্ষণ ও পালন করিতেন। তাঁহারাই আমাদের দেশে দানশীলতার ও সমাজহিতৈষণার উচ্চ আদর্শ জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিলেন।···

"বর্তমান জমিদারগণ যদি সেকালের দৃষ্টান্ত অনুসারে, কেবল রাজার মুখ না চাহিয়া, খেতাবের লক্ষ্য ছাড়িয়া, জনহিতসাধন ও দেশের শিল্প সাহিত্যের রক্ষণ-পালনে সহায়তা করেন তবেই তাঁহাদের ক্ষমতার সার্থকতা হয় এবং গৌরব বাড়িয়া উঠে।"

নাটোর ও ত্রিপুরা-রাজপরিবারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনকালের সেই আদর্শ জমিদারের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এই দুইটি পরিবারই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের গুণগ্রাহী ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের জন্য অর্থসাহায্য এবং 'বঙ্গদর্শন' ও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের জন্য ত্রিপুরারাজের আনুকূল্য লাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ কিছুটা যেন আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বিশ্ব জুড়িয়া সাম্রাজ্যবাদের উলঙ্গ আত্মপ্রকাশ পূর্ব হইতেই কবির মনে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করিয়াছিল। তাহারই ফলে আধুনিক রাজনীতির প্রতি

কবির এই সন্দেহ ও বিমুখতা ; তাহারই ফলে কবি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তখন প্রাচীন ভারতের পুনরভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, ত্রিপুরার রাজা হইবেন সেই প্রাচীন ভারতের আদর্শ নৃপতি। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন,

"কবির মনে এই স্বপ্ন জাগিতেছিল যে ত্রিপুরা রাজদরবারের মধ্য দিয়া একটি আদর্শ রাজ্যশাসন তন্ত্র গড়িয়া তুলিবেন, যাহার পটভূমে থাকিবে হিন্দু নৃপতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সাহিত্যে, শিক্ষায়, শাসন-পরিকল্পনায় তিনি মহারাজকে নানাভাবে সদুপদেশ ও সহায়তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। ত্রিপুরার মহারাজকে বর্ণাশ্রমের মহিমা ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের গৌরব ব্যাখ্যা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।···বঙ্গদর্শনের জন্য যে সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাহা ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রচারের জন্য, তপোবনের পরিকল্পনা ও ভারতের হিন্দু-বর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ মহারাজকে যেসব পত্র লেখেন তাহার অধিকাংশের মধ্যে ভারতীয় হিন্দু আদর্শবাদের আলোচনা থাকিত ; তাঁহার চিত্তকে নানা মঙ্গলকর্মে উদ্‌বুদ্ধ করিবার সকল প্রকার সাধু চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ সাধ্যমত করেন। কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকেও যেসব পত্র লেখেন তাহাও ক্ষত্রিয়ধর্মের গৌরব ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ। মোট কথা ত্রিপুরা-রাজদরবারের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার কথা আলোচনা করিলে গ্যেটের সহিত Weimer রাজদরবারের সম্বন্ধের কথা স্মরণ হয়।"

[রবীন্দ্রজীবনী : ১ম খণ্ড ।। পৃঃ ৩৮১-৮২]

নৈবেদ্য

১৩০৭ সাল। রবীন্দ্রনাথ তখন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের লইয়া শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বাস করিতেছেন। মাঝে মাঝে কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিতে হয়। এই সময় তিনি 'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলি রচনা করেন (১৩০৭ অগ্রহায়ণ—ফাল্গুন)। ১৩০৮ সালের প্রথমভাগে উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

নৈবেদ্যের আলোচনার স্থান অন্যত্র হইলেও ইহাতে কবির আধ্যাত্মিক ধর্মভাবের সহিত তাঁহার স্বাদেশিকতাবোধের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। এইজন্যই ইহার মূল কথাটা আমাদের আলোচনার আওতার মধ্যে আসিয়া যায়।

প্রথমেই দেখা দরকার, মানসিক কোন্ অবস্থায় এবং কিসের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ নৈবেদ্য রচনা করিলেন।

রবীন্দ্রজীবনী ও রচনাবলী ভালো করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাঁহার মানস-প্রকৃতিতে দুইটি পরস্পরবিরোধী ধারার দ্বন্দ্ব-সংঘাত অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। একদিকে তাঁহার বিশেষ কবি-প্রকৃতি, অপরদিকে সমাজচেতনা ও স্বদেশের সেবা করিবার বাসনা—একদিকে ভাববিলাস ও কল্পনাপ্রিয়তা, অপরদিকে বাস্তবতাবোধ—একদিকে সংগ্রামবিমুখতা, অপরদিকে সংগ্রামশীলতা। 'চিত্রা'র যুগে 'এবার ফিরাও মোরে' এবং পরে 'বর্ষশেষ' কবিতাটির মধ্যে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। পূর্বেই তাহা আলোচনা করিয়াছি। ইহার পর হইতেই তাঁহার এই মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বেশ কিছুকাল তাঁহার মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

উনিশ শতকের শেষভাগে পর পর দুইটি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ (১৮৯৭ ও ৯৯), প্লেগ-কলেরা-মহামারী এবং একটি বড়ো রকমের ভূমিকম্পের ফলে দেশবাসীর দুঃখকষ্ট অবর্ণনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কবির সংবেদনশীল ও স্পর্শচেতন মনে ইহার তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। ফলে কবির মনে সংগ্রামশীলতা ও দেশসেবা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। নৈবেদ্যই হইতেছে কবির সেই মানসিক প্রস্তুতি। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত অধ্যাত্মবাদী ও অতীন্দ্রীয় রহস্যবাদী কবি। তাই স্বভাবতই কবি তাঁহার 'ঈশ্বর ও জীবনদেবতা'র নিকট সংগ্রামের উদ্দীপনা প্রেরণা ও শক্তি ভিক্ষা করিতেছেন।

এই সংগ্রামের জন্য কবির মানসিক প্রস্তুতির স্বরূপটি কী, দেখা যাক্। ৪৭ সংখ্যক কবিতায় তিনি লিখিলেন,

"আঘাতসংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয়তূণ। অস্ত্র দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
... .
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।"

৫৩ সংখ্যক কবিতায় বলিলেন :

"রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র? তুমি যার বিরাজ অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়, স্বাধীন সে বন্দীশালে।
মৃত্যুভয় কী লাগিয়া হে অমৃত?...

৫৪ সংখ্যক কবিতায়,

"মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর।
সেথায় যে পদক্ষেপ করে,
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে,
হোক-না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে
সর্বশক্তি লয়ে মোর।..."

৭০ সংখ্যক কবিতায় কবি বলিলেন,

"...ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম

তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

৮৪ সংখ্যক কবিতায়,

"মুক্ত করো, মুক্ত করো নিন্দা-প্রশংসার
দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হতে। সে কঠিন ভার
যদি খসে যায় তবে মানুষের মাঝে
সহজে ফিরিব আমি সংসারের কাজে—
তোমারি আদেশ শুধু জয়ী হবে নাথ।

৯৯ সংখ্যক কবিতায় কবি লিখিলেন,

"তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর।···
···বীর্য দেহো ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীন জ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে।···"

এইভাবে কবি তাঁহার জীবনদেবতার নিকট শক্তি-ভিক্ষা করিয়া, মহত্তর মানবতা ও ন্যায়নীতিতে আপনাকে দীক্ষিত করিয়া সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন। কবি যেন তাঁহার নির্বিরোধ সংগ্রামবিমুখ কবি-প্রকৃতিটিকে তর্জনী তুলিয়া শাসন করিতেছেন—সকল কবিতাতেই অলক্ষ্য এই ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উনিশ শতকের শেষভাগে সাম্রাজ্যবাদ তাহার উলঙ্গ বর্বর মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্রান্সভালে বোয়ার প্রজাতন্ত্র এলাকায় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইলে দলে দলে ইংরাজ ঔপনিবেশিকরা বোয়ার অঞ্চলে গিয়া ভিড় করিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী সেসিল্ রোডস্ কায়রো হইতে কেপ্ পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজ্য সম্প্রসারণে উদ্গ্রীব হইয়া উঠিলেন। সামান্যতম অজুহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার প্রবল সামরিক শক্তি লইয়া বোয়ার প্রজাতন্ত্রের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইহাই বোয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত (১৮৯৯—১৯০২)। হীনবল বুয়ার কৃষকদের হাতে সুশিক্ষিত ও প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজশক্তিকে প্রথম দিকে বারবার পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু অবশেষে বোয়ারদের পরাজয় ঘটে। অপরদিকে

প্রাচ্য ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি মহাচীনকে ভাগাভাগি করিয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী চীনের 'কিয়াচো' অংশটি দখল করিয়া লইল। দেখাদেখি রাশিয়াও চীনের কাছে পোর্টআর্থার দাবি করিয়া বসিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পুনরায় দক্ষিণ ও মধ্যচীনে আরও খানিকটা আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইল। আমেরিকা ইতিমধ্যে ফিলিপাইন গ্রাস করিয়া চীনের কাছে 'বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিবার' (Open door Policy) দাবি লইয়া উপস্থিত হইল। সাম্রাজ্যবাদীদের এই উন্মত্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে চীনে এক ভীষণ বিদ্রোহ দেখা দিল। ইহাই 'বক্সার-বিদ্রোহ' (১৮৯৯—১৯০১) নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহকে দমন করিতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানী, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি শক্তিগুলি একজোটে চীন আক্রমণ করিল।

শতাব্দীর অন্তে সাম্রাজ্যবাদীদের উন্মত্ত দানবিকতা ও দস্যুবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের মনে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে এক গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। তাঁহার মন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। দেশের চারিদিকে তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মআন্দোলনও নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় কবি জাতীয় আদর্শের প্রশ্ন ধর্মগতভাবেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার ধারণা হইল, পাশ্চাত্যের আদর্শ কখনও ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না। ভারতের প্রাচীন ধর্মাদর্শ ও তপোবন সভ্যতার যুগেই আবার ভারতকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিলেন না; অন্তরের সমস্ত ঘৃণাটুকু দিয়া তিনি (৬৪ সংখ্যক কবিতায়) ইহার প্রতি বিনিপাত জানাইলেন

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী।…
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।"

এই সময় কিপলিং প্রভৃতি একদল কবি এম্পায়ার ও ইংরাজ জাতির মহিমা প্রচার করিয়া বর্ণ ও জাতি বিদ্বেষ প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহাদের নির্লজ্জ বক্তব্যের পিছনে সাম্রাজ্যবাদী লালসা যে উৎকট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহাকে তীব্র ঘৃণাভরে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িলেন না। বাংলার কাব্যে সাহিত্যে এ ভাব সম্পূর্ণ অভিনব ও অনাস্বাদিত। শুধু এদেশেই নয়—বিশ্বের তৎকালীন কবিকুলের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক কবিই সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রতি বিনিপাত জানাইয়া সেই সময়ে কিছু লিখিয়াছেন।

অপর একটি কবিতায় কবি লিখিলেন,

"একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।
স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে—বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ—
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।"

'জাতীয়তাবাদে'র বিরুদ্ধে ইহাই বোধহয় তাঁহার প্রথম কবিতা। জাতীয়তার নামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ কিভাবে দুনিয়াকে আপনাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে স্বার্থ-সংঘাতে লিপ্ত হইয়াছে, কবি তাহা গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। কবি ইহাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করিলেন বটে, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ-সংগ্রামেরও ডাক দিতে পারিলেন না। কবির ধারণা, 'ঈশ্বরের রাজত্বে' কোনো অন্যায়, কোনো পাপাচারই বরদাস্ত হয় না, কঠিন শাস্তি একদিন অন্যায়কারীর মাথার উপর নামিয়া আসিবে। সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দরবারেই এই অন্যায় ও পাপাচারের বিরুদ্ধে তিনি নালিশ জানাইয়া তাঁহার মানসিক যাতনা ও বেদনার ভার কিছুটা লাঘব করিতে চাহিলেন।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই পাশ্চাত্য জাতিগুলির সাম্রাজ্যবাদী লালসার বহ্ন্যুৎসব দেখিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে তাঁহার মোহ ভঙ্গ হইতেছে। তাঁহার ধারণা ভারতবর্ষই একদিন পৃথিবীর পরিত্রাণ আনিবে—

"এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিমসমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ, স্বার্থদীপ্ত লুপ্ত সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।
তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয়তো লুকায়ে আছে পূর্বসিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল, ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতীক্ষায়।"

অপর একটি কবিতায় কবি বলিলেন,

"কোরো না কোরো না লজ্জা হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধন দৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্য মুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।
···স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যেরে সিংহাসনে করো প্রতিষ্ঠিত
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত।"

নৈবেদ্যের আরো কয়েকটি কবিতায় এই মূল ভাবটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

লক্ষ্য করা যায়—পাশ্চাত্যকে বর্জনের নামে আধুনিক সভ্যতার সম্পদগুলিকেও তিনি বর্জন করিতে চাহিলেন এবং উপকরণহীন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে পুনরুদ্ধার করিবার আহ্বান জানাইলেন। 'নৈবেদ্যে'র যুগ হইতেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে, ইহা লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না এবং তাহা হইতেছে 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ'।

॥ বঙ্গদর্শনে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ॥

১৮৯৭ ও ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশে পরপর দুইটি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের পর কংগ্রেস নেতৃবর্গ দেশের কৃষি ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কিছুটা সজাগ হইয়া উঠিলেন। ইঁহারা যে কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান কিংবা কোনো গণতান্ত্রিক ভূমি-সংস্কার আইনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা নহে। তৎকালীন প্রচলিত চিন্তাধারা অনুযায়ী কৃষকের দুঃখকষ্টের লাঘব হয় এমন কিছু কিছু আইন সংস্কারের কথা ইঁহারা চিন্তা করিতেছিলেন। দুর্ভিক্ষের কারণ ও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্তও তাঁহারা দাবি করিলেন। দেশের দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ইঁহারা কি ধরনের চিন্তা ভাবনা করিতেন, তাহা নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে কিছুটা পরিষ্কার হইবে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লাহোর-কংগ্রেস অধিবেশনে, সভাপতি চন্দভারকর (N. G. Chandavarkar) বলিলেন,

"...That famines occur because the monsoon fails no one denies. In a sense they are inevitable in India; but no more inevitable, for instance, than in Ireland or Egypt. If the latter country was able to tide over this year of the lowest Nile in the century without a famine, why should not India be able to do the same when the rainfall fails ?...The question which has been forcing itself on the attention of all serious thinkers and responsible Administrators is not—Why do famines occur ? but—Why do they occur in *increasing* severity, and why is the *staying power* of the people growing down ? I do not think that anybody seriously believes in the *population* theory which is so often profounded in certain quarters as an answer to the question...."

এই দুর্ভিক্ষের ও আর্থিক দারিদ্র্যের সুযোগে মহাজনশ্রেণীর হাতে রায়তের জমি হস্তান্তরিত হইতেছে, এ কথারও তিনি উল্লেখ করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'Deccan Agriculturist's Relief Act' এবং 'Punjab Alienation Bill'-এর সমালোচনা করিয়া তিনি বলিলেন যে, উহার কোনো ক্ষেত্রেই মূল উদ্দেশ্য সাধিত

হইতেছে না, এক মহাজনের পরিবর্তে অন্য মহাজন আসিতেছে—রায়তের দুঃখ কষ্ট বা ঋণের বোঝা লাঘব হইতেছে না। তিনি ভূমির রাজস্বও কিছুটা কমাইবার দাবি করিলেন। এবং এই উপলক্ষে তিনি দেশে কলকারখানা ও শিল্প-বিস্তারের (industrial development) দাবি জানাইতেও ছাড়িলেন না। চন্দভারকর তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন,

"...The first Famine Commission declared that 'the multiplication of industries was the only complete remedy for famine.' That was twenty years ago. But since that report was made, very little has been done to advance the suggestion into the region of practice. On the contrary, some things have been done, unconciously perhaps, which have had the effect of reducing the number of our industries. Is it any wonder that, under the circumstances, with millions of people coming on the land, millions of them should go out of it, and that Sir James Lyall and his colleagues on the second Famine Commission should find that numbers of the preasantry have been, and are being, reduced to landless day-labourers ? These are the people whom a famine first touches, and who flock to relief-works the moment they are opened..."

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত হইতে জাতীয় শিল্পগুলি সংরক্ষণের দাবি জানাইয়া তিনি বলিলেন,

"...The excise duty levied on the Bombay mill industry clearly shows that under the present policy, no Indian industry will be allowed to outgrow European competition" [Congress Presidential Addresses : Vol. I. pp. 433-44]

অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, দেশের এই দুর্ভিক্ষ ও আর্থিক বিপর্যয়ের দিনে রবীন্দ্রনাথকে এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কোনো কথা বলিতে দেখা গেল না। কংগ্রেসের এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর তাঁহা'র কোনো আস্থা ছিল না—সত্য কথা, কিন্তু কৃষক ও গ্রামজীবনের দুরবস্থার ব্যাপারে তাঁহার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও আগ্রহ ছিল। অথচ এই সময় কৃষকের দুরবস্থার কথা লইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে কিছু বলিতে বা মন্তব্য করিতে দেখা গেল না।

তাহার প্রধান কারণ, তখন রবীন্দ্রনাথের মনে আদর্শগত (ideological) প্রশ্নে বিরাট দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলিতেছিল,। ভারতবর্ষে শিল্প-বিপ্লব হইবে কিনা,

কিংবা ইউরোপের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসন-সংস্কার হইবে কি হইবে না—এই সব প্রশ্ন তাঁহাকে বিচলিত করে নাই। ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ কী হইবে, ইহাই তাঁহার কাছে তখন প্রধান প্রশ্ন। জাতীয় আদর্শের প্রশ্নে ভারতবর্ষ কি ইউরোপীয় 'ন্যাশনালইজ্‌ম্' ও সভ্যতাসংস্কৃতিকে অনুকরণ করিবে, না—ভারতের প্রাচীন ধর্ম-সমাজ-সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবে?

১৩০৮ সালের প্রথমভাগেই রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' নবপর্যায়ে বাহির হইল। জাতীয় আদর্শ নির্ণয়ের প্রশ্নটি তখন সবার উপর বড়ো হইয়া দেখা দিয়াছে। বলা বাহুল্য, আমাদের জাতীয় চেতনার এই পর্যায়টি অত্যন্ত বিচ্যুতির যুগ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনায় যখন নাকি বস্তুবাদী ভাবধারার একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমরা নূতন করিয়া ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছি। ফলে, ভারতবর্ষের ন্যায় বহু জাতি, বহু ধর্ম ও বহু সম্প্রদায়ের দেশে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করিবার প্রশ্নে যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের ব্যাপক প্রসার হওয়া উচিত ছিল, সেখানে নূতন করিয়া 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ' (Hindu Revivalism) দেখা দিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্বিরোধ ও অসঙ্গতি-গুলির নজির দেখাইয়া পাশ্চাত্যের সবকিছু বর্জনেরও একটা ঝোঁক দেখা গেল। স্বভাবতই বঙ্গদর্শনে এইসব ভাবধারার প্রতিফলন দেখা দিল।

বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাভার গ্রহণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে ফরাসী ঐতিহাসিক গিজোর (Guigot) দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের সহিত পূর্বেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তাহারই সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গদর্শনে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' নামে প্রবন্ধটি লিখিলেন (বঙ্গদর্শন, ১২০৮ জৈষ্ঠ)।

এই প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি গিজোর মত উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে অন্যান্য সভ্যতার সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল পার্থক্য এই যে, "অন্যান্য সভ্যতায় এক ভাব—এক আদর্শের একাধিপত্যে অধীনতা-বন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু য়ুরোপে কোনো এক সামাজিক শক্তি অপর শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে না পারায়, এবং ঘাত প্রতিঘাতে পরস্পরকে সচেতন অথচ সংযত করিয়া রাখায়, য়ুরোপীয় সভ্যতায় স্বাধীনতার জন্ম হইয়াছে। ক্রমাগত বিবাদে এই সকল বিরোধী শক্তি আপসে একটা বোঝাপড়া করিয়া সমাজে আপন আপন অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে; এইজন্য ইহারা পরস্পরকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে না, এবং নানা প্রতিকূলপক্ষ আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে।

"ইহাই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলপ্রকৃতি, ইহাই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব।"

রবীন্দ্রনাথ গিজোর মতকে অস্বীকার করিলেন না। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার আসল রহস্য উদঘাটন করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন,

"য়ুরোপীয় সভ্যতাকে দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে, অন্য সকল বিষয়েই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

"ইংলণ্ডে বল, ফ্রান্সে বল, আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মত-বিশ্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেইখানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ এক মূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। জাতিরক্ষা আমাদের যেমন একটা গভীর সংস্কারের মতো হইয়া গেছে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষা য়ুরোপের সর্বসাধারণের তেমনি একটি অন্তর্নিহিত সংস্কার।"

এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রকৃতিটি কি ? তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের।···

"য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতি লাভ করে যে ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।

"স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্বসূচনা দেখা যাইতেছে।

"ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'জোর যার মুলুক তার' এ-নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জা বোধ করিতেছে না।

"···রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা, এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে-সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্যাদা রাখে, ন্যায়াচরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেইজন্য ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান, রুশ, ইহারা পরস্পরকে কপট, ভণ্ড, প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চস্বরে গালি দিতেছে।

"ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পর্ধিত হইয়া ধ্রুবধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে

উন্মত্ত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র য়ুরোপের মুখে পরিহাস বাক্য হইয়া উঠিয়াছে।"

কবির ধারণা, পাশ্চাত্য দেশের নেশন ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থভিত্তিক সভ্যতাই হইল যত নষ্টের ও সর্বনাশের কারণ। কখনও বা তিনি উহাকে 'রিপুর প্রবল তাড়না' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। কিন্তু তিনি এই সত্য দেখিতে পাইলেন না যে, পাশ্চাত্য নেশন ও রাষ্ট্রগুলি সেখানকার পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পুঁজিবাদের বিকাশ ও স্বার্থের কারণেই নেশন এবং রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত কারণের মধ্যে রহিয়াছে তাহার সাম্রাজ্যবাদী লালসা অর্থাৎ লোভ, কামনা ও রিপুর তাড়না, যাহা অনায়াসেই মানবতা, ধর্মাধর্মবোধ ও ন্যায়নীতিকে পদদলিত করে। তখনও এদেশে বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন হয় নাই। ফলে তাঁহার চিন্তা ও দৃষ্টি অতীত এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে ঝুঁকিল। তাঁহার ধারণা হইল, ভারতের প্রাচীন সমাজ ও ধর্মের আদর্শে জাতিকে গড়িয়া তোলাই শ্রেয়স্কর; পাশ্চাত্যের ছাঁদে নেশন গড়িয়া তুলিলে তাহা আমাদের মৃত্যুর কারণ হইবে। তিনি বলিলেন,

" 'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই।…রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন—তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজা-মহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদ লাভ করি।…আমরা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।… এই আদর্শ যথাযথভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল কর্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর।"…

বলা বাহুল্য, সে যুগে এই ধরনের চিন্তা-ভাবনারই রেওয়াজ ছিল। উপসংহারে তিনি বলিলেন,

"আমাদের হিন্দু-সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।")

[প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা—স্বদেশ ॥ পৃঃ ৫৫-৬১]

তখন বোয়ার-যুদ্ধ চলিতেছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও সম্মিলিতভাবে চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ গভীর আগ্রহের সহিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এইসব সংবাদ পাঠ করিতেছিলেন। এইসব ঘটনাবলীতে ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব আরও বিরূপ হইয়া উঠিতে থাকে। বঙ্গ-দর্শনে 'সমাজভেদ' (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ আষাঢ়) নামক একটি প্রবন্ধে তাঁহার এই সময়ের মানসিক প্রতিক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যায়। কোন্ প্রসঙ্গে তিনি এই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, কবি নিজেই প্রবন্ধের শুরুতে তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন,

"গত জানুয়ারি মাসের 'কণ্টেম্পোরারি রিভিয়ু' পত্রে ডাক্তার ডিলন 'ব্যাঘ্র চীন এবং মেষশাবক য়ুরোপ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে যুদ্ধ উপলক্ষে চীনবাসীদের প্রতি য়ুরোপের অকথ্য অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। জঙ্গিস্ খাঁ, তৈমুরলং প্রভৃতি লোকশক্রদিগের ইতিহাসবিখ্যাত নিদারুণ কীর্তি সভ্য য়ুরোপের উন্মত্ত বর্বরতার নিকট নতশির হইল।

"আমরা যখন য়ুরোপের শিক্ষা প্রথম পাইলাম, তখন, মানুষে মানুষে অভেদ, এই ধুয়াটাই সে শিক্ষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেইজন্য আমাদের নূতন শিক্ষকটির সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রভেদ যাহাতে ঘুচিয়া যায়, আমরা সেইভাবে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিলাম। এমন সময় মাস্টার মশায় তাঁহার ধর্মশাস্ত্র বন্ধ করিয়া বলিলেন, পূর্ব-পশ্চিমে এমন প্রভেদ যে, সে আব লঙ্ঘন করিবার জো নাই।

"এখন তো দেখিতেছি, গালাগালি গোলাগুলির আদান-প্রদান চলিতেছে। নূতন খ্রীষ্টান শতাব্দী এমনি করিয়া আরম্ভ হইল।

"ভেদ আছে স্বীকার করিয়া লইয়া বুদ্ধির সহিত, প্রীতির সহিত, সহৃদয় বিনয়ের সহিত, তাহার অভ্যন্তরে যদি প্রবেশ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবেই খ্রীষ্টীয় শিক্ষায় উনিশ শত বৎসর কী কাজ করিল? কামানের গোলায় প্রাচ্য দুর্গের দেয়াল ভাঙিয়া একাকার করিবে, না চাবি দিয়া তার সিংহদ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে?"

চীনবাসীরা ইউরোপীয় কলোনীগুলি ও ইউরোপীয় মিশনারীদের উপর আক্রমণ করিয়াছে—এই অজুহাতে সামাজ্যবাদী শক্তিগুলি সম্মিলিতভাবে চীনকে আক্রমণ করে। রবীন্দ্রনাথ এই যুক্তি খণ্ডন করিতে গিয়া বলিলেন,

"য়ুরোপ এ-কথা সহজেই মনে করিতে পারে যে, ধর্মপ্রচার বা শিক্ষাবিস্তার লইয়া অধৈর্য ও অনৌদার্য চীনের বর্বরতা সপ্রমাণ করিতেছে। মিশনারী তো চীন রাজত্ব জয় করিতে যায় নাই।

"এই খানেই পূর্ব পশ্চিমের ভেদ আছে এবং সেই ভেদ য়ুরোপ শ্রদ্ধার সহিত, সহিষ্ণুতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা করে না—কারণ, তাহার গায়ের জোর আছে।

"...বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্ত প্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরেজ বৌদ্ধসম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না, কারণ য়ুরোপের গা রাষ্ট্রতন্ত্র। জিব্রল্টরের পাহাড়টুকু সমস্ত ইংলণ্ড প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবে, কিন্তু খ্রীস্টান ধর্ম সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া সে আবশ্যক বোধ করে না।

"পূর্বদেশে তাহার বিপরীত। প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন্ নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র,—তাহার মধ্যে যথাযোগ্য ভাবে রিলিজন্ পলিটিকস সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনী-শক্তির অন্য কোনো আশ্রয় নাই।...সেই ধর্মে আঘাত লাগিলে চীন মৃত্যুবেদনা পায় এবং আত্মরক্ষার জন্য নিষ্ঠুর হইয়া উঠে।...তখন রাজাই বা কে, রাজার সৈন্যই বা কে, তখন চীন সাম্রাজ্য নহে, চীন জাতি জাগ্রত হইয়া উঠে।"

কিন্তু চীনের ব্যাপারটি অন্যরূপ ছিল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অহিফেন যুদ্ধের পর হইতেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একে একে একটু একটু করিয়া সমগ্র চীনকে গ্রাস করিতে বসিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-বিস্তার ও ধর্ম-প্রচারের নামে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ ও ধর্মপ্রচারকগণ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের পক্ষে দালাল ও অনুচরের কাজ করিতেছিলেন। এইসব ঘটনার পরে সারা চীনে ইউরোপীয়দের উপর দারুণ সন্দেহ, ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব দেখা দিল। দীর্ঘ-দিন ধরিয়া পুঞ্জীভূত এই বিক্ষোভ একদিন বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পাইল। তাহারই ফলে বক্সার-বিদ্রোহ। বিদ্রোহের নেতৃবর্গের সম্মুখে কোনো সুস্পষ্ট আদর্শ ও সুষ্ঠু কর্মপন্থা ছিল না। প্রচণ্ড উত্তেজনা ও উন্মাদনার মুখে তাহারা ইউরোপীয় কলোনীগুলি আক্রমণ করিল এবং বহু ইউরোপীয় হত্যা করিল।

যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে কিছুতেই ক্ষমা করিলেন না। এই প্রবন্ধে তিনি অবশ্য নির্বিচারে য়ুরোপীয় সবকিছুকেই নিন্দা করিলেন না।—ইউরোপীয় স্বাধীন প্রেমের সৌন্দর্য এবং ইউরোপীয় বহু মহাত্মা লোকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। কিন্তু তিনি যে তত্ত্বটি দাঁড় করাইতে চাহিলেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে তিনি সাম্রাজ্যবাদী প্রবক্তাদের যুক্তির কবলেই জড়াইয়া পড়িলেন। কারণ তাঁহার বক্তব্য হইতে এই কথাটিই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে, চীনের ধর্মীয় আবেগই বক্সার বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ। অবশ্য তিনি কিছুটা ভারসাম্য রাখিয়া উপসংহারে বলিলেন,

"বস্তুত সভ্যতার ভিন্নতা আছে—সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সহৃদয়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে, তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে শিক্ষা ও অভ্যাসে এই প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহা বর্বরতার সোপান। তাহাতেই অন্যায় অবিচার নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি করিতে থাকে। প্রকৃত সভ্যতার লক্ষণ কি? সেই সভ্যতা যাহাকে অধিকার করিয়াছে—স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিশ—তিনি সকলকে জানেন ও সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। যাহা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সর্বদাই উপহাস করে ও ধিক্কার দেয়, তাহা হিঁদুয়ানী, কিন্তু হিন্দু সভ্যতা নহে। তেমনি যাহা প্রাচ্য সভ্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, তাহা সাহেবিয়ানা, কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা নহে। যে-আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহা আদর্শ ই নহে।

"সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধবিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে।...সেইজন্যই বোয়ার পল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।" [সমাজভেদ—স্বদেশ ।। পৃঃ ৭৭-৮৩]

রবীন্দ্রনাথের প্রধান অভিযোগ ইউরোপের ধনতান্ত্রিক কৃষ্টি—ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে। কিছুকাল পরে বঙ্গদর্শনে (১৩০৯ আষাঢ়) 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে ইউরোপের ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী কৃষ্টি সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিলেন,

"ইংলণ্ডকে যখন আমরা ধনী বলি, তখন অগণ্য দরিদ্রকে হিসাবের মধ্যে আনি না। য়ুরোপকে যখন আমরা স্বাধীন বলি, তখন তাহার বিপুল জনসাধারণের দুঃসহ অধীনতাকে গণ্য করি না। সেখানে উপরের কয়েকজন লোকই ধনী, উপরের কয়েকজন লোকই স্বাধীন, উপরের কয়েকজন লোকই পাশবতা হইতে মুক্ত।...

"যেখানে প্রতিযোগিতার তাড়নায় পাশের লোককে ছাড়াইয়া উঠিবার অত্যাকাঙ্ক্ষায় প্রত্যেককে প্রতিমুহূর্তেই লড়াই করিতে হইতেছে, সেখানে কর্তব্যের আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখা কঠিন।...

"য়ুরোপে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যগুলি পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, এ অবস্থায় এমন কথা কাহারো মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না যে, বরঞ্চ পিছাইয়া প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িব, তবু অন্যায় করিব না। এমন কথাও কাহারো মনে আসে না যে, বরঞ্চ জলে স্থলে সৈন্যসজ্জা কম করিয়া রাজকীয় ক্ষমতায় প্রতিবেশীর কাছে লাঘব স্বীকার করিব, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সুখসন্তোষ ও জ্ঞানধর্মের বিস্তার করিতে হইবে।"

তিনি আরও বলিলেন,

"য়ুরোপেও অবিশ্রাম কর্মালোড়নের মাঝে মাঝে এক-একজন মনীষী উঠিয়া ঘূর্ণাগতির উন্মত্ত নেশার মধ্যে স্থিতির আদর্শ, লক্ষ্যের আদর্শ, পরিণতির আদর্শ ধরিয়া থাকেন। কিন্তু দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া শুনিবে কে? সম্মিলিত প্রকাণ্ড স্বার্থের প্রচণ্ড বেগকে এই প্রকারের দুই-একজন লোক তর্জনী উঠাইয়া রুখিবেন কী করিয়া? বাণিজ্য-জাহাজে উনপঞ্চাশ পালে হাওয়া লাগিয়াছে, য়ুরোপের প্রান্তরে উন্মত্ত দর্শকবৃন্দের মাঝখানে সারি সারি যুদ্ধঘোড়ার ঘোরদৌড় চলিতেছে, এখন ক্ষণকালের জন্য থামিবে কে?...বর্তমানকালে সাম্রাজ্যলোলুপতা সকলকে গ্রাস করিয়াছে এবং জগৎ জুড়িয়া লঙ্কাভাগ চলিতেছে।..."

[ব্রাহ্মণ—স্বদেশ ।। পৃঃ ৬৫-৬৭]

রবীন্দ্রনাথ অর্থনীতি ও রাজনীতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া এ-সব কথা বলিতেছেন না। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, মার্কস, এঙ্গেলস তিনি পাঠ করেন নাই। তিনি মূলত কবি। তাঁহার স্বাভাবিক মানবতাবোধ, ন্যায়-নীতি ও বিচারবুদ্ধি হইতে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির বিচার করিতেছিলেন। এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন ও নিপীড়িত জাতিগুলির প্রতি ছিল তাঁহার অপরিসীম দরদ ও গভীর আন্তরিক সহানুভূতি। বয়স যখন অত্যন্ত অল্প তখনই তিনি 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধে ইংরাজ ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য অপকৌশলকে কী তীব্র ও কঠোর ভাষায় নিন্দা ও তিরস্কার করিয়াছিলেন, সে-কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তখন হইতেই সাম্রাজ্যবাদীদের একটি অপকর্ম—একটি লুণ্ঠনকার্যও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সাম্রাজ্যবাদীদের এই পৈশাচিক উন্মাদনায় তিনি যেন অদূর ভবিষ্যতের প্রলয়ঙ্করী ছবিটি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—'পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্বসূচনা দেখা যাইতেছে।'

অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, ভারতবর্ষে সমকালীন কোনো রাজনীতিবিদ বা জাতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সচেতন হইতে দেখা গেল না। এমনকি ভারতবর্ষের তথা সমগ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ স্বয়ং গান্ধীজীকেও তখন আমরা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সচেতন দেখিতে পাই নাই।

গান্ধীজী তখন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে তিনি নিগৃহীত ভারতীয়দের পক্ষ গ্রহণ করিয়া আন্দোলন করিলেও, তখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (সত্যাগ্রহ) শুরু করেন নাই। এমন সময় বুয়র বা 'বোয়ার-যুদ্ধ' দেখা দিল। ট্রান্সভাল প্রজাতন্ত্রে বোয়াররা ভারতীয়দের কোনো নাগরিক সত্ব বা নাগরিক অধিকার দিতে রাজী হয়

নাই। ইংরাজ উপনিবেশিকরা এই অজুহাত লইয়া বোয়ারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং এই অজুহাত দেখাইয়া তাহারা আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে ভারতীয়দের সমর্থন ও সহযোগিতা আদায় করিতে চাহিল। অবশ্য এই অজুহাত যে কতখানি মিথ্যা ও ভণ্ডামী, তাহা বোয়ার-যুদ্ধের অনতিকাল পরেই ভারতীয়দের মর্মেমর্মে অনুভব করিতে হয়। আর তাছাড়া—ফ্রী স্টেট (Free State), কেপ্ কলোনী (Cape Cylony), ট্রান্সভাল ও নাটাল,—কোথাও ভারতীয়দের অবস্থা ও সুযোগ-সুবিধার বিশেষ কোনো তারতম্য ছিল না। আসল কথা—ট্রান্সভালের নবাবিষ্কৃত স্বর্ণখনির উপর সাম্রাজ্যবাদী লালসা ছাড়া ইংরাজদের অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। স্বয়ং গান্ধীজী পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেন—"It must be largely conceded that justice is on the side of the Boers."

কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের লইয়া একটি সেবা-বাহিনী (ambulance corps) সংগঠিত করিয়া এই যুদ্ধে গান্ধীজী ইংরেজদের প্রভূত সাহায্য ও উপকার করিলেন। British Empire-এর উপর তখন তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ও আস্থা। যুদ্ধে ইংরেজপক্ষ সমর্থনের যুক্তিতে গান্ধীজী বলিলেন,

"If we desire to win our freedom and achieve our welfare as members of the British Empire, here is a golden opportunity for us to do so by helping the British in the war by all the means at our disposal...The anthorities may not always be right, but so long as the subjects owe allegiance to a state, it is their clear duty generally to accommodate themselves, and accord their support, to acts of the state."

অবশ্য এই যুক্তি গান্ধীজীর সহগামী ও অনুগামীদের পক্ষে মানিয়া লওয়া সহজ হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন কথাও বলিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা নিজেরাই একটি দাস-গোষ্ঠী,—এক্ষেত্রে বোয়ারদের ন্যায় একটি দুর্বল জাতির স্বাধীনতা-রক্ষার সংগ্রামে ভারতীয়দের সাহায্য করা উচিত। গান্ধীজী অবশ্য প্রধানত এই যুক্তিতে অটল রহিলেন যে,

"...The Indian's existence in South Africa is only in our capacity of British subjects...what little rights we still retain, we retain because we are British subjects."

[Hiren Mukherjee—Gandhiji : A Study. p. 22]

'গান্ধীবাদে'র ভাষ্যকারগণ গান্ধীজীর এই সময়কার নীতির তাৎপর্য তাঁহার

'ন্যায়নীতি'র প্রতি নিষ্ঠা ও তাঁহার জীবনদর্শনের মধ্যে খুঁজিতে বলিবেন। সে যাহাই হউক, গান্ধীজী তখনও সাম্রাজ্যবাদকে বুঝিতে পারেন নাই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যখন চীন, কিংবা এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের শক্তি-সম্পদকে আত্মসাৎ করিবার জন্য ঐ দেশগুলিকে লইয়া শৃগাল-কুকুরের ন্যায় 'টানা-ছেঁড়া' করিতেছে, তখন সেইসব হতভাগ্য দেশগুলির পক্ষ লইয়া গান্ধীজীকে কোনো কথা বলিতে শোনা যায় নাই।

১৯০৬ সালে বোম্বাটা-বিদ্রোহ (Bombata rebellion) দেখা দিল; সেবারও তিনি একটি ambulance corps গঠন করিয়া ইংরাজদের সাহায্য করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর জীবনীকার লিখিতেছেন, "Gandhi had doubts about the 'rebellion', itself but he believed that the British Empire existed for the welfare of the world....'

[Tendulkar—Mahatma : Vol. I]

টেণ্ডুলকর আরও লিখিয়াছেন যে, 'এই বিদ্রোহের ফলে গান্ধীজীর চোখ খুলিয়া যায়। তাহার ফলে তিনি দুইটি বিষয়ের উপর গভীরভাবে চিন্তা করিতে থাকেন। প্রথমত ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয়ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দরিদ্র জীবন-যাপন।' কিন্তু বিস্ময়ের কথা,—সাম্রাজ্যবাদকে তিনি চিনিতে পারিলেন না।

তৎকালীন কংগ্রেস-নেতৃবর্গ সাম্রাজ্যবাদকে কী চোখে দেখিতেছিলেন দেখা যাক্। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অমরাবতী কংগ্রেস-অধিবেশনে শঙ্করণ নায়ার তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে তৎকালীন ইংরাজ সরকারের বৈদেশিক নীতি ও Indian Finance-এর সমালোচনা করিতে গিয়া বলিলেন,

"...The biggest item of expenditure is the Military expenditure. Our true policy is a peaceful policy. We have little if anything to expect from conquests. With such capacity for internal development as our country possesses, with such crying need to carry out the reforms absolutely necessary for our well-being, we want a period of prolonged peace. We have no complaint against our neighbours, either on our north-west or our north-east frontier. If ever our country is involved in war, it will be due to the policy of aggrandizement of the English Government at London or Calcutta. An Army is maintained at our cost far in excess of what is required for us. As England directs our foreign policy and as wars are undertaken to maintain

English Rule, the English Treasury ought to pay the entire cost, claiming contribution from India to the extent of India's interest in the struggle...."

[Congress Presedential Addresses : Vol. I. pp. 327-28]

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ-অধিবেশনে সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত বলিলেন,

"...There is the question of the enormous Military Expenditure, and the maintenance of a vast army out of the resources of India, not for the requirements of India, but for the requirements of the British Empire in Asia, Africa, and even in Europe...." [Ibid. p. 413]

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে ডি. ই. ওয়াচ্চা তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলিলেন,

"...the increased Military expenditure which has steadily grown since the seizure of Upper Burma and Penjdeh scare, there might have arisen no necessity for additional taxation; and the pretext of low exchange was utterly unfounded...The question is wheather there is any necessity for the large increase in the Army which has been witnessed since 1886...."

ইহার পর তিনি এই প্রসঙ্গে রয়েল কমিশনের একটি রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃতি দিয়া বলিলেন,

"It is clear from the above extract that it is owing to the maintenance of British supremacy in the East that this Army is maintained. Equity, therefore, demands that the British Treasury should bear all the expenses. What we have to incessantly urge on the Government and Parliament is the injustice of making India pay the piper while the British nation calls for the tune." [Ibid. pp. 518-19.]

এই বক্তব্যগুলির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি রাখিয়া বিচার করিলে উহার পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক রূপটি দেখিতে পাইতেছেন; অদূর ভবিষ্যতে উহারা যে পৃথিবীব্যাপী মহাসমর বাধাইয়া তুলিবে, তাহাও যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন। এবং তখনই তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, ভারতবর্ষ যেন এই ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকে অনুসরণ না করে। কংগ্রেস নেতৃবর্গ ইংরাজ সরকারের বৈদেশিক নীতির প্রতি

কোথাও বিনিপাত জানাইলেন না ; তাঁহাদের আপত্তির, ভারতবর্ষকে বিপুল সামরিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে বলিয়া। একদিক দিয়া কংগ্রেসের এই আন্দোলনের তাৎপর্য ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে তাঁহারা কোথাও ধিক্কৃত করেন নাই। সীমান্তের দেশগুলিতে কিংবা এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদির জঘন্য আক্রমণগুলিকে নিন্দা করিয়া কংগ্রেসে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

নেশন কী, ন্যাশনালইজ্‌ম্ কী, ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য বিধানে কি ইউরোপীয় 'ন্যাশনালিজম্' (Nationalism)-এর আদর্শ ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী হইবে না—এইসব প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকে ক্রমাগতই আরো গভীরভাবে বিচলিত করিতে লাগিল। এই সম্পর্কে তিনি ইউরোপীয় লেখকদের পুস্তক হাতের কাছে যাহা মিলিল তাহাই পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। এই সম্পর্কে তিনি বঙ্গদর্শনে 'নেশন কী' এবং 'হিন্দুত্ব' (বঙ্গদর্শন ১৩০৮ শ্রাবণ) নামে দুইটি প্রবন্ধ লিখিলেন।

এই প্রবন্ধে তিনি ফরাসী চিন্তাবিদ্ রেনাঁর 'নেশন-তত্ত্ব' লইয়া আলোচনা করিয়া নেশনের মূল সংজ্ঞাটি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন নেশনের মৌলিক উপাদানগুলির পর্যালোচনা করিতে গিয়া তিনি দেখাইলেন "...জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান নেশন-নামক মানস পদার্থ-সৃজনের মূল উপাদান নহে। তবে তাহার মূল উপাদান কী ?" ইহার উত্তরে তিনি রেনাঁর মতই উল্লেখ করিয়া বলিলেন,

"নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে।

..."অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ-স্বীকার এবং পুনর্বার সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে তাহাই নেশন।...তাহা আর কিছু নহে—সাধারণ সম্মতি, সকলে মিলিয়া একত্রে এক জীবন বহন করিবার সুস্পষ্টপরিব্যক্ত ইচ্ছা।" [নেশন কী—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৩য় খণ্ড ।। পৃঃ ৫১৮-১৯]

রবীন্দ্রনাথ এই ঐক্যবোধকে স্বাগত জানাইতেছেন, কিন্তু তাহা ইউরোপের আধুনিক 'রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ন্যাশনাল ঐক্য' নহে। তিনি বলিলেন,

"সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য—বিচিত্রকে এক করিয়া তোলা—হিন্দু তাহার কী করিয়াছে দেখিতে হইবে। এই এক করিবার শক্তি ও কার্যকে ন্যাশনাল নাম

দাও বা যে-কোনো নাম দাও, তাহাতে কিছু আসে যায় না, মানুষ-বাঁধা লইয়াই বিষয়।"

ইউরোপের ন্যাশনাল ঐক্যের সহিত ভারতের সামাজিক ঐক্যের প্রভেদ নির্ণয়ে তিনি কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য খাড়া করিতে চাহিলেন,

"আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ায় কী ঘটিয়াছে? য়ুরোপীয়গণ যখন সেখানে পদার্পণ করিল, তখন তাহারা খ্রীস্টান, শত্রুর প্রতি প্রীতি করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগকে দেশ হইতে একেবারে উন্মূলিত না করিয়া তাহারা ছাড়ে নাই—তাহাদিগকে পশুর মতো হত্যা করিয়াছে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় যে নেশন বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে আদিম অধিবাসীরা মিশিয়া যাইতে পারে নাই।

"হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শকজাতীয় জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী; দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার—সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দুসভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তবু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই—উচ্চ-নীচ, সবর্ণ-অসবর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।

"পরিধি যত বৃহৎ, তাহার কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়া ততই শক্ত। হিন্দুসমাজের ঐক্যের ক্ষেত্র নিরতিশয় বৃহৎ, সেইজন্য এত বিশালত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহার মূল আশ্রয়টি বাহির করা সহজ নহে।"

রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে। সেই জাতীয় উন্মাদনার যুগে তাঁহার ধর্মীয় আবেগ-উচ্ছ্বাস যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ছাপাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, যে-সব পাশ্চাত্য জাতি তাহাদের জাতীয়তাবাদের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া এত দম্ভ ও বড়াই করে, উপনিবেশগুলিতে তাহারা সেখানকার জাতি ও গোষ্ঠীগুলির প্রতি যে অমানুষিক নির্যাতন অপমান লাঞ্ছনা ও ঘৃণার ভাব পোষণ করে, রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দরভাবে তাহা উদ্ঘাটন করিয়াছেন। যদিও হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজ-সভ্যতার ইতিহাসে ধর্ম বা জাতি-বিদ্বেষ নাই, হিন্দু বর্ণসমাজে বর্ণবিদ্বেষ, সামাজিক লাঞ্ছনা, পীড়ন ও শোষণ-নির্যাতন ছিল না বা নাই, একথা

ঐতিহাসিক মানিয়া লইবেন না। কল্পনায় তিনি এমন একটি আদর্শ হিন্দুসমাজের চিত্র দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করিলেন যেখানে শোষণ, অত্যাচার, ঘৃণা, জাতি-বিদ্বেষ নাই, যেখানে সকলে পারস্পরিক গভীর সম্প্রীতি, প্রেম ও ভালোবাসার নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ এবং মহৎ উচ্চ আদর্শে বিশ্বাসী।

লক্ষ্য করিবার বিষয়—রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক দিক হইতে জাতীয় ঐক্য-চেতনার তাৎপর্য ও ভূমিকাটিও অস্বীকার করিতেছেন না। প্রশ্নটি তিনি স্বয়ং এইভাবে উত্থাপন করিয়া নিজেই উহার জবাব দিতেছেন,

"এ-স্থলে আমাদের প্রশ্ন এই, আমরা প্রধানত কোন্ দিকে মন দিব? ঐক্যের কোন্ আদর্শকে প্রাধান্য দিব।

"রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কারণ, মিলন যত প্রকারে হয় ততই ভালো। কংগ্রেসের সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা অনুভব করিয়াছেন যে, সমস্তই যদি ব্যর্থ হয়, তথাপি মিলনই কংগ্রেসের চরম ফল।···

"কিন্তু এ-কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহুদুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ি পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরী নিজে আধমরা হইয়া ছোটো ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে—সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড়ো করিয়া জানায় নাই—সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।"

প্রাচীনের মোহ তাঁহাকে এতখানি পাইয়া বসিয়াছিল যে, হিন্দুধর্ম বা হিন্দু বর্ণ-সমাজের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-অত্যাচারকে তিনি একেবারেই দেখিতে পাইলেন না, পরন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে কেবল তিনি মহৎ মানবতাবোধ ও সমাজবোধকেই

আবিষ্কার করিলেন। এই মানবতাবোধ ও সমাজবোধকে তিনি 'ব্রহ্মচেতনা' বলিয়াও অনেক সময় অভিহিত করিয়াছেন। যাহাই হউক, 'কী করিতে হইবে' এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিলেন,

"...আমাদের পূর্বপুরুষের সেই নিয়ত-জাগ্রত মঙ্গলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবৎরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল হিন্দুসভ্যতাকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইব। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম; ইহাতেই আমাদের মঙ্গল...স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা ইহাই হিন্দুত্ব। সমাজের নিচে হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড়ো চেষ্টার বিষয়। এই ঐক্যসূত্রেই হিন্দুসম্প্রদায়ের একের সহিত অন্যের এবং বর্তমানের সহিত অতীতের ধর্মযোগ সাধন করিতে হইবে।"

[হিন্দুত্ব (ভারতবর্ষীয় সমাজ)—রবীন্দ্র-রচনাবলী : তৃতীয় খণ্ড ।। পৃঃ ৫১৫-২৫]

এই প্রবন্ধের প্রায় দুই মাস পরে বঙ্গদর্শনে 'বিরোধমূলক আদর্শ' নামক প্রবন্ধটি লিখিলেন (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ আশ্বিন)। এই প্রবন্ধটির মধ্যে তিনি ইউরোপীয় 'ন্যাশনালিজম্' ও 'প্যাট্রিয়টিজম্'কে খুব গভীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, লক্ষ্য করা যায়। 'কন্‌টেম্পোরারি রিভিয়ু' পত্রিকায় জনৈক ওগৃস্‌ৎ ব্রেয়াল, ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে আজন্ম শত্রুতা ও জাতিবিদ্বেষের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া গভীর আক্ষেপ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'য়ুরোপ কি ইচ্ছা করিয়া বিধিমতে বর্বরতায় ফিরিয়া যাইবে।'

রবীন্দ্রনাথ এই সময় বিভিন্ন ইউরোপীয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পরজাতিবিদ্বেষের খবরাখবর রাখিতেছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি তাহার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া বলিলেন,

"য়ুরোপের বিদ্যালয়ে যে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে অন্য দেশের প্রতি বিরোধ প্রকাশ করিয়া নিজেদের দেশের গৌরব ঘোষণা করা হয়। প্যাট্রিয়টিক ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছেলেদিগকে অন্য দেশের সহিত স্বদেশের সাবেক কালের ঝগড়ার কথা স্মরণ করাইয়া ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সেই বিরোধ টানিয়া রাখা হয়।...

"আজকাল দুই পয়সা দিলেই খবরের কাগজে পড়িতে পাওয়া যায় যে, ধাতুগত বিরোধের ভাব, অনিবার্য পার্থক্য এবং জাতিগত বিদ্বেষে পরস্পরের বংশানুক্রমিক শত্রুজাতির সহিত, আজ হউক বা কাল হউক, একটা সংঘর্ষ হইবেই। তাহাদের

মতে মানুষের প্রবলতম প্রবৃত্তি এবং ন্যায়ধর্মের উচ্চতম নীতিসকল দুই জাতিকে দুই বিপরীত দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেছে। তাহারা বলে, নেশনদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের আশা বাতুলের খেয়ালমাত্র। ইত্যাদি।

"এই-সকল বিরোধ-বিদ্বেষের বাক্য লক্ষ লক্ষ খণ্ড ছাপা হইয়া দেশে-বিদেশে বিতরিত হইতেছে। এই প্রাত্যহিক বিষের মাত্রা নিয়মমতো পান করিয়া দেশের ক্ষতি হইতেছে সন্দেহ নাই।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয়দের তথা প্রাচ্যদেশীয়দের প্রতি ইংরাজদের জাতিবিদ্বেষ ও নির্যাতনের কথাও পুনরুল্লেখ করিতে ছাড়িলেন না। এইসব তথ্য ও ঘটনাবলী হইতে ন্যাশানালিজম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে,

"...মিথ্যার দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে. ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিয়টিজমের প্রধান অবলম্বন। গায়ের জোর, ঠেলাঠেলি, অন্যায় ও সর্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশনতন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে, এমন সভ্যতার নিদর্শন তো আমরা এখনো য়ুরোপে দেখিতে পাই না।

"...স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং স্বার্থের সংঘাতে মানুষকে অন্ধ করিবেই। ইংরেজ যদি সুদূর এশিয়ায় কোনো প্রকার সুযোগ ঘটাইতে পারে ফ্রান্স তখনই সচকিত হইয়া ভাবিতে থাকিবে, ইংরেজের বলবৃদ্ধি হইতেছে। প্রত্যক্ষ সংঘাত না হইলেও পরস্পরের সমৃদ্ধিতেও পরস্পরের চিত্তকে বিষাক্ত করে। এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশঙ্কাজনক। এস্থলে বিরোধ বিদ্বেষ অন্ধতা মিথ্যাপবাদ সত্যগোপন, এ-সমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।"

স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাইতেছে,—ন্যাশনালিজম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সচেতন হইতেছেন। 'ন্যাশনাল স্বার্থ' ও 'রাষ্ট্রীয় স্বার্থ' যে এশিয়া-আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নহে, এবং এই স্বার্থের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে বিরোধ-সংঘর্ষ, ইহাও তিনি লক্ষ্য করিতেছেন। এই 'ন্যাশনাল স্বার্থ' যে সভ্যতা, ধর্মবোধ ও ন্যায়নীতিকে চক্ষের নিমেষে পদদলিত করিতে এতটুকু সংকোচ বা দ্বিধা বোধ করে না, রবীন্দ্রনাথ তাহাও লক্ষ্য করিতেছেন। এহেন ন্যাশনালিজম কখনই ভারতবর্ষের জাতি-গঠনের আদর্শ হইতে পারে না, ইহাই কবির মত। তাই তিনি দেশবাসীকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন,

"...নেশন অনেক সময় ধর্মকে উপেক্ষা ও উপহাস করা আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করে, বাহুবলকে ন্যায়ধর্মের অপেক্ষা বড়ো বলিয়া স্পষ্টতই ঘোষণা করে।...

"আমরা যদি বাঁধিবোলে না ভুলি, যদি 'প্যাট্রিয়ট'কেই সর্বোচ্চ বলিয়া না মনে করি, যদি সত্যকে ন্যায়কে ধর্মকে ন্যাশনালত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে। আমরা নিকৃষ্ট আদর্শের আকর্ষণে কপটতা প্রবঞ্চনা ও অসত্যের পথে পা বাড়াইয়াছি কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। এবং ধর্মের দিকে না তাকাইলেও সুবুদ্ধির হিসাব হইতে একথা পর্যালোচনা করিতে হইবে যে, ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে খাড়া করিলেই বিরোধের আদর্শকে খাড়া করা হয়—সেই আদর্শ লইয়া আমরা কি কোনো কালে য়ুরোপের মহাকায় স্বার্থদানবের সহিত লড়াই করিয়া উঠিতে পারিব ?

"আমরা লড়াই করিতে পারি জ্ঞানে, ধর্মে। সেখানে আমাদের পৈতৃক মূলধন আছে। সেখানে কেহ আমাদিগকে ঠেকাইবে না···সেখানে যে মহত্ত্বের উপাদান আছে, তাহা সকল মহত্ত্বের উচ্চে।"

আমাদের জাতীয় সাধনার সেই প্রথম পর্বে ইউরোপীয় ন্যাশনালিজম সম্পর্কে এইরূপ সতর্কবাণী আর কাহাকেও করিতে দেখা গেল না। যদিও রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে ধর্ম ও ন্যায়নীতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তবু সেইসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, 'ধর্ম' বলিতে তিনি এখানে সভ্যসমাজসমূহের প্রচলিত ন্যায়-নীতিগুলির কথাই বুঝাইতেছেন। সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে, এই ধর্মবোধের সহিত তিনি তখন হইতেই 'বিশ্ব নেশনত্বে'র কথাটিও অস্পষ্টভাবে চিন্তা করিতেছেন,

"···স্বার্থের আদর্শ, বিরোধের আদর্শ যতই দৃঢ়, যতই উচ্চ, যতই রন্ধ্রহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বাধা দিতে থাকে, ততই তাহার বিনাশ আসন্ন হইয়া আসে। য়ুরোপের নেশনতন্ত্রে এই স্বার্থ. বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে! নেশনের মূল প্রবাহকে অতি-নেশনত্বের দিকে যাইতে না দিয়া, নিজের মধ্যেই তাহাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রত্যহ প্রবল হইতেছে। আগে আমরা নেশন, তারপরে বাকি আর-সমস্ত কিছু, এই স্পর্ধা সমস্ত বিশ্ব-বিধানের প্রতি ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার প্রলয়পরিণাম যদি-বা বিলম্বে আসে, তথাপি তাহা যে কিরূপ নিঃসন্দেহ, কিরূপ সুনিশ্চিত, তাহা আর্যঋষি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

"এই ধর্মবাণী সকল দেশের সকল কালের চিরন্তন সত্য, ন্যাশনালত্বের মূলমন্ত্র ইহার নিকট ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক। নেশন শব্দের অর্থ যখন লোকে ভুলিয়া যাইবে

তখনও এ সত্য অম্লান রহিবে এবং ঋষি-উচ্চারিত এই বাক্য স্পর্ধামদমত্ত মানবসমাজের ঊর্ধ্বে বজ্রমন্ত্রে আপন অনুশাসন প্রচার করিতে থাকিবে।"

[বিরোধমূলক আদর্শ—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ॥ পৃঃ ৫৯২-৯৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহজ ধর্ম-ও নীতি-নিষ্ঠা হইতে ন্যাশনালিজমের প্রতি বিনিপাত জানাইতেছেন। আবার সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ এই সময় আধুনিক যুগসমস্যার সমাধানে প্রাচীন আর্য ঋষিদের নীতিকথা ও ধর্মোপদেশগুলির এক নূতন তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিলেন।

সেই সময় প্রায় এই একই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইউরোপের ন্যাশনালিজমের তীব্র নিন্দাবাদ করিতেছিলেন একজন প্রবলপ্রাণ ধর্মীয় নেতা। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলিলেন,

"তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভালো করেছ? অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎপাটন করেছ, তাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিকা?

"কোথা সে সকল বুনো জাত আজ? একবারে নিপাত, বন্য পশুবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ।···

"আর ভারতবর্ষ তা কস্মিন্‌কালেও করেন নি। আর্যরা অতি দয়াল ছিলেন। তাঁদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদয়ে, অমানব-প্রতিভাসম্পন্ন মাথায়, ওসব আপাত-রমণীয় পাশবপ্রণালী কোনও কালেও স্থান পায় নি। স্বদেশী আহাম্মক! যদি আর্যরা বুনোদের মেরে ধরে বাস করত, তাহলে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি কি হত?

"ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ কোরে, আমরা বেঁচে থাকবো। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করবো, আমাদের চেয়ে বড়ো করবো। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার; আর্যের উপায় বর্ণ-বিভাগ। শিক্ষা, সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান বর্ণ-বিভাগ।···"

[প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ॥ পৃঃ ১১০-১১]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েরই একটি মূলগত ঐক্য রহিয়াছে। উভয়েই পাশ্চাত্য সভ্যতার সাম্রাজ্যলোলুপতা ও পরজাতিবিদ্বেষকে নিন্দাবাদ করিতেছেন, উভয়েই হিন্দুসমাজের বর্ণাশ্রমধর্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অবশ্য

অল্পকালের মধ্যেই বর্ণসমাজ সম্পর্কে বিবেকানন্দের মোহ দূর হয়, শেষ-জীবনে তিনি সারা পৃথিবীব্যাপী 'শূদ্ররাজত্বে'র পদধ্বনি শুনিতেছেন দেখিতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লিখিবার অল্পকাল পূর্বেই বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। শুনা যায়, বিবেকানন্দের এই প্রবন্ধটি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার Swami Vivekananda—Patriot & Prophet পুস্তিকায় কুমুদবন্ধু সেনের একটি লেখার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,

"The first who gave proper appreciation to it (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য – লেখক) was another person with manifold talents. He was poet Rabindranath Tagore himself. Regarding it, Sri Kumudbandhu Sen says the following in the Udbodhan Golden Jubilee number :

'A little after the publication of '*Bangadarsan*' in new second series (edited by Rabindranath Tagore), the late Rai Bahadur Dinesh Chandra Sen came one evening at 8 o'clock to the writer and asked for the book *Prachya O Paschatya*...'

"...Sen answered, 'I am just coming from Rabibabu to you. Today, Rabibabu was praising this book unstintingly. He was surprised to hear that I did not read it.' He said, 'you go at once and read this book of Vivekananda. How colloquial Bengalee can apear as a living and forceful language that you will realize after reading it... Such ideas, such language, similarly such penetrating liberal vision, and the ideal of synthesis between the East and the West that this book contains is surprising to one. Besides this he began to praise the book hundred-fold.' Dineshbabu taking the book went away'. "

[Swami Vivekananda. pp. 293-94.]

॥ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় ॥

১৩০৮ সালের আশ্বিন মাস নাগাদ রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আসিলেন। ঐ বৎসরই 'পৌষ-উৎসবে'র সময় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্বোধন হয় (১৩০৮ ৮ই পৌষ ॥ ১৯০১ ২২শে ডিসেম্বর)।

রবীন্দ্রনাথ তখন প্রাচীন বৈদিক ভারতের পুনরভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ইতিপূর্বে 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্বাপর প্রবন্ধগুলির আলোচনাকালে আমরা কবির এই সময়কার চিন্তাধারার একটি বিস্তারিত পরিচয় পাইয়াছি। পশ্চাত্য দেশগুলির জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উপর তীব্র সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ফলে কবি ক্রমশই ধর্ম ও ন্যায়নীতিকে প্রবলভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিলেন। সেইসঙ্গে স্বাদেশিকতাকে তিনি ধর্ম ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্য দিয়া তিনি কিছু নিঃস্বার্থ আদর্শ চরিত্রের মানুষ সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। কবি সেই সময় তাঁহার পরিকল্পনার কথা জানাইয়া বিলাতে জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন,

"তুমি এখানে কখনো আস নাই। জায়গাটি বড়ো রমণীয়···কলিকাতায় আবর্তের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না। · পূর্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং-বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ-মাস হইতে খোলা হইবে। গুটিদশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।" [প্রবাসী, ১৩৪৫ বৈশাখ]

কিছুকাল পূর্বেই তিনি আর একটি চিঠিতে জগদীশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন,

"শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহ বাসের মতো সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না—ধনী-দরিদ্র সকলেই কঠিন ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রকৃতি ও বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে—দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে।" [প্রবাসী, ১৩৩৩ চৈত্র]

১৩০৮ সালের পৌস-উৎসবের সময় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন

হইল। উহার কয়েকমাস পরে (১৩০৮ ২৮শে চৈত্র) ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যকে লিখিতেছেন,

"আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই--তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধ মোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাহিরে না হউক, অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর। মনে দৃঢ়রূপে জান যে, দারিদ্র্যে অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি আসবাবের অভাবে লেশমাত্র অসভ্যতা নাই। যাহারা ধনসম্পদ বাণিজ্য ব্যবসায় আসবাব আয়োজনের প্রাচুর্য সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে তাহারা বর্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্ধা করে। শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে পরমতম বন্ধনমুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও।...বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়ো। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্মো ভয়াবহ।" [প্রবাসী, ১৩৪৮ আশ্বিন]

উহার দিন দশ পরে (১৩০৯ ৭ই বৈশাখ) অপর একখানি পত্রে তিনি লিখিতেছেন,

"ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি।...আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো। ব্রাহ্মণের শান্ত সমাহিত সাত্ত্বিক ভাবকে তোমার বরণ করিলে চলিবে না। ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায়! সমাজে ধর্মের উচ্চতম আদর্শকে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও বিঘ্ন হইতে সুরক্ষিত করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যই ক্ষাত্রতেজের মাহাত্ম্য।..."

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা প্রবল হইয়া উঠিলেও—হাজার হউক তিনি কবি। প্রাচীন যুগকে তিনি যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে না দেখিয়া কালিদাস-ভবভূতি-প্রমুখ সংস্কৃত কবিদের কল্পনার দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন। শান্তিনিকেতন

ব্রহ্মচর্যাশ্রমকেও তিনি একটি আদর্শ তপোবনে রূপায়ণের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। 'তপোবন' কবিতাটির মধ্যে কল্পনায় যে তপোবনের চিত্র আঁকিয়াছিলেন (১৯শে চৈত্র ১৩০২),

"মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন—
পুরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি—স্রোতস্বিনীতীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাত বায়ে, ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা, পক্ক কেশজালে,
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।"

সেইরূপ তপোবনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির স্বাদেশিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্য কতখানি সাধিত হইবে কবি তাহা চিন্তা করেন নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয়,—কবিতাটিতে ধর্ম-সাধন অপেক্ষা কবি-কল্পনাই মুখ্যভাব গ্রহণ করিয়াছে। বিদ্যালয় পরিচালন ব্যাপারেও কবির কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও তখন আদর্শ হিন্দুভারত গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনিও ছিলেন হিন্দু-বর্ণাশ্রম ধর্মের একজন উগ্র পৃষ্ঠপোষক।

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মাধ্যমে দেশে কিছু আদর্শ চরিত্রের মানুষ সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনা করিতেছিলেন, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা স্বামী বিবেকানন্দ তখন পদচারী সন্ন্যাসীদের সংঘবদ্ধ করিয়া ব্যাপক জনশিক্ষার কাজে তাহাদের নিয়োজিত করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তপোবন নহে। তিনি বলিলেন—"What I now want is a band of fiery missionaries."

তাহার ফলে 'বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে'র সৃষ্টি। পরবর্তী কালে পুনরায় ইউরোপ ভ্রমণের ফলে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশই প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সারা ভারত পরিভ্রমণের সময় দেশের জনগণের দুঃখকষ্ট দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ও বর্ণ-হিন্দুদের নির্যাতনের ফলে দেশের 'শূদ্র' সম্প্রদায়গুলি অহরহ কিভাবে অত্যাচারিত হইতেছে। ফলে বর্ণাশ্রম ধর্মের সকল মোহ তাঁহার ভাঙিয়া যায়। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি এই নির্যাতিত জনগণের কথাই কেবল চিন্তা করিতেন। তাঁহার পরিকল্পনাটি ছিল,

"My plan for India, as it has been developed and centralised, is this : I have told you of our lives as monks there, how we go from door to door, so that religion is brought to everybody without charge, except perhaps, a broken piece of bread. That is why you see the lowest of the low in India holding the most exalted religious ideas.... It is a practical want of intellectual education about life on this earth they suffer from....They must have a better piece of bread and a better piece of rag on their bodies. The great question is, how to get that better bread and better rag for these sunken millions...

Their instinct, however, is to plough...They never interfere with the religion of others...But that is not the case in India, where the poor fellows work hard from morning to sunset, and some-body else takes the bread out of their hands, and their children go hungry...He lives upon the poorest corn, which he would not feed to your canary birds.

"Now there is no reason why they should suffer such distress...Well then, my plans are, therefore, to reach these masses of India. Suppose you start schools all over India for the poor, stll you cannot educate them. How can you ? The boys of four years would better go to the plough or to work, than to your school....Why should not education go from door to door, say I. If a ploughman's boy cannot come to education, why not meet him at the plough, at the factory, just wherever he is ? Go along with him, like his shadow. But there are these

hundreds and thousands of monks, educating the people on the spiritual plane; why not let these men do the same work on the intellectual plane? Why should they not talk to the masses a little about history—about many things...

"Well, I must tell you that I am not a very great believer in monastic systems. They have great merits, and also great defects···What I mean to say is this, that it represents a tremendous power. What we can do is just to transform it, give it another form. This tremendous power in the hands of the roving Sannyasins of India has got to be transformed, and it will raise the masses up."

[Works : Vol. VIII. pp. 85-90]

ইহাও এক ধরনের স্বপ্ন—বিক্ষুব্ধ, অশান্ত এক সন্ন্যাসীর মহান স্বপ্ন ও পরিকল্পনা ; বাস্তব অবস্থায় ইহা কার্যকরী হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। তবুও বিবেকানন্দ ভারতের অগণিত ক্ষুধার্ত নিপীড়িত জনগণকে দেখিতে পাইতেছিলেন। তিনি ভারতের জনগণের মধ্যে এক "Sleeping Leviathan" দেখিতে পাইলেন, ইহাদের জন্যই ব্যাপক জন-শিক্ষার কথা বলিলেন।

তিনি এমন কথাও ঘোষণা করিলেন,

"...Material civilization, nay, even luxury, is necessary to create work for the poor. Bread! Bread! I do not believe in a God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven! Pooh! India is to be raised, the poor are to be fed, education is to spread, and the evil of priestcraft is to be removed. No priestcraft, no social tyranny! More bread, more opportunity for everybody!" [Works: Vol. IV. p. 313]

এই চিন্তাধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার যে বিরাট একটি পার্থক্য আছে—তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথও ব্যাপক জনশিক্ষার কথা চিন্তা করিয়াছেন। তিনিও বলিয়া আসিতেছেন,

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।"

সাধনা ও ভারতীতে কবি দেশের জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে যে সব রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা

করিয়াছি। সেই সকল প্রবন্ধে কবির যে চিন্তাধারা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পাশাপাশি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনাকালে কবির এই ধর্মভাব ও উগ্র হিন্দুয়ানি উৎকটভাবে চোখে লাগে।

১৩০৯ সালে নববর্ষের দিন শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত 'নববর্ষ' প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে তিনি পুনরায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া দেশকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে ফিরিয়া যাইবার আহ্বান জানাইলেন। তিনি বলিলেন,

"আজি নববর্ষে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের আর একটি ভাব আমরা হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব। তাহা ভারতের একাকিত্ব। এই একাকিত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার।···পিতামহগণ এই একাকিত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।"

ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে গিয়া বলিলেন,

"য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী। য়ুরোপের ধন-সম্পদ, আরাম-সুখ নিজের—কিন্তু তাহার দান-ধ্যান, স্কুল-কলেজ, ধর্মচর্চা, বাণিজ্য-ব্যবসায়, সমস্ত দল বাঁধিয়া। আমাদের সুখ সম্পত্তি একলার নহে,—আমাদের দান ধ্যান অধ্যাপন, আমাদের কর্তব্য একলার।

"এই ভাবটাকে চেষ্টা করিয়া নষ্ট করিতে হইবে, এমন প্রতিজ্ঞা করা কিছু নহে,—করিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই, হইবে না। এমন কি বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রকাণ্ড মূলধন এক জায়গায় মস্ত করিয়া উঠাইয়া তাহার আওতায় ছোটো ছোটো সামর্থ্যগুলিকে বলপূর্বক নিষ্ফল করিয়া তোলা শ্রেয়স্কর বোধ করি না। যন্ত্রতন্ত্রকে অত্যন্ত সরল ও সহজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা, অন্নকে সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ। একথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।"

তিনি আরও বলিলেন,

"···বাহির হইতে সভ্যতার বৃহৎ আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হই—তাহার তলদেশে যে নিদারুণ নরমেধযজ্ঞ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা গোপনে থাকে।··· মাঝে মাঝে সামাজিক ভূমিকম্পে তাহার পরিণামের সংবাদ পাওয়া যায়। য়ুরোপের বড়ো দল ছোটো দলকে পিষিয়া ফেলে, বড়ো টাকা ছোটো টাকাকে উপবাসে ক্ষীণ করিয়া আনিয়া শেষকালে বটিকার মতো চোখ বুজিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে।

"···আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলার ভিতরে, বাহিরে, চারিদিকে মানুষগুলাকে যে-ভাবে তাল

পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জনত্বের সহজ অধিকার—একাকিত্বের আব্রুটুকু, থাকে না।…কাজের একটু ফাঁক পাইলেই মদ খাইয়া প্রমোদে মাতিয়া বলপূর্বক নিজের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করে।…

"যাহারা শ্রমজীবী, তাহাদের এই দশা। যাহারা ভোগী, তাহারা ভোগের নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত। নিমন্ত্রণ, খেলা, নৃত্য, ঘোড়দৌড়, শিকার, ভ্রমণের ঝড়ের মুখে শুষ্ক পত্রের মতো দিনরাত্রি তাহারা নিজেকে আবর্তিত করিয়া বেড়ায়।… যদি এক মুহূর্তের জন্য তাহার প্রমোদচক্র থামিয়া যায়, তবে সেই ক্ষণকালের জন্য নিজের সহিত সাক্ষাৎকার, বৃহৎ জগতের সহিত মিলনলাভ, তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।"

পুঁজিবাদী কৃষ্টি জীবনের এত সুন্দর ও নিখুঁত বর্ণনা সে-যুগে বড়ো একটা দেখা যায় না। কিন্তু ইহা ত একদেশদর্শী সমালোচনা—সর্বোপরি ইহা নেতিমূলক ও বর্জনমূলক সমালোচনা। পুঁজিবাদী সংস্কৃতিকে বর্জন করিবার নামে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞান ও শিল্প-সভ্যতাকেই বর্জন করিয়া ভারতের সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইবার আহ্বান জানাইলেন,

"ভারতবর্ষের এই একাকী থাকিয়া কাজ করিবার ব্রতকে যদি আমরা প্রত্যেকে গ্রহণ করি, তবে এবারকার নববর্ষ আশিসবর্ষণে ও কল্যাণ-শস্যে পরিপূর্ণ হইবে। অপেক্ষা না করিয়া যে যেখানে, আপনার গ্রামে, প্রান্তরে, পল্লীতে, গৃহে, স্থিরশান্ত-চিত্তে ধৈর্যের সহিত—সন্তোষের সহিত পুণ্যকর্ম—মঙ্গলকর্ম সাধন করিতে আরম্ভ করি; আড়ম্বরের অভাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া, দরিদ্র আয়োজনে কুণ্ঠিত না হইয়া, দেশীয় ভাবে লজ্জিত না হইয়া, কুটীরে থাকিয়া, মাটিতে বসিয়া, উত্তরীয় পরিয়া সহজভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হই; ধর্মের সহিত কর্মকে, কর্মের সহিত শান্তিকে জড়িত করিয়া রাখি; চাতক পক্ষীর ন্যায় বিদেশীর করতালিবর্ষণের দিকে ঊর্ধ্বমুখে তাকাইয়া না থাকি; তবে ভারতবর্ষের ভিতরকার যথার্থ বলে আমরা বলী হইব।…

"আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড় পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন, এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষাকালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্মের বাসনা, জনসংঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন, শোকহীন, মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে।"

[নববর্ষ—স্বদেশ ।। পৃঃ ২৫-৩২]

তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ভাবাবেগে কবি যাহা বলিলেন,-তাহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে—স্থিতিশীল, জড়বৎ গতিহীন 'এশিয়াটিকসমাজব্যবস্থা'য় দৃঢ়-আবদ্ধ হইয়া থাকা। গতিশীল বৈচিত্র্যপূর্ণ ইউরোপীয় সমাজসভ্যতার দুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মচাঞ্চল্যকে কবি সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশ্য তাহার জন্য ইউরোপীয় পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতাই অধিক দায়ী। দ্বিতীয়ত, কবির বিশেষ মানসপ্রকৃতিও যে কিছু পরিমাণে দায়ী নয়—একথা বলা যায় না। বিলাত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জীবনস্মৃতির খসড়ায় এই বিশেষ কবি-প্রকৃতিটির তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন—পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

বিবেকানন্দ তখন 'Dynamic Religion' ও 'Dynamic Society'-র স্বপ্ন দেখিতেছেন। ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরিয়া আসিবার পর তাঁহার স্বাদেশিক সংকীর্ণতা অনেকখানি কাটিয়া যাইতেছে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে "The problem of India and its solution"—এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন,

"Would the sky of India again appear clouded over by waving masses of smoke springing from the Vedic Sacrificial fire ?...Or is the deluge of a Buddhistic propaganda again going to turn the whole of India into a big monastery ?...Or is the discrimination of food,...going to have its all-powerful domination over the length and breadth of the country ? Is the caste-system, to remain.. ...Are the marriages of the different '*Varnas*' to take place ?... To give a conclusive answer to all the questions, is extremely difficult....Then what is to be done ?

"What we should have is, what we have not, perhaps what our fore-fathers—even had not ; that which the Yavanas had ;—that, impelled by the life-vibration of which is issuing forth in rapid succession from the great dynamo of Europe, the electric flow of that tremendous power, vivifying the whole world......we want that energy, that love of independence, that spirit of self-reliance, that immovable fortitude, that dexterify in action, that bond of unity of purpose, that thirst for improvement. Checking a little the constant looking back to the past, we want that expansive vision infinitely projected forward ; and we want—that intense spirit of activity (Rajas) which will flow through our every vein, from head to foot." [Works : Vol. IV. pp. 336-37]

আবার অন্যত্র তিনি বলিলেন,

"Give and take is the law, and if India wants to raise herself once more, it is absolutely necessary that she brings out her treasures and throw them broadcast among the nations of the earth, and in return be ready to receive what others have to give her. Expansion is life contraction is death." [Works : Vol. VI. pp. 310-11]

পাঠক এই দুই ভাববাদী মহান চিন্তানায়কের ভাবধারার পার্থক্যটি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন।

বিবেকানন্দ ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল, এই দুইটি দিকই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি হিন্দুধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে চিন্তা করিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তাধারার মধ্যে এক তীব্র স্ববিরোধিতা লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না।

বিবেকানন্দ হিন্দু বর্ণ-সমাজের পীড়ন-অত্যাচারকে দেখিতে পাইলেন—অগণিত দরিদ্র নিরন্ন জনগণকে দেখিতে পাইলেন—এমনকি ইউরোপের প্রগতিশীল সমাজ-তান্ত্রিক ভাবধারার প্রতিও আকৃষ্ট হইলেন, কিন্তু তবুও ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না। পরবর্তীকালে তিনি বেলুড় মঠে নূতন করিয়া মূর্তিপূজার উৎসবও প্রচলন করিলেন। এই প্রসঙ্গে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিতেছেন,

"১৯০১। অক্টোবর মাসে স্বামীজী বেলুড়মঠে দুর্গাপূজা করিলেন। ক্রমে লক্ষ্মীপূজা ও শ্যামাপূজাও হইল। এ তিনটি পূজাতেই কুমারটুলি হইতে মূর্তি আনা হইল। যিনি মায়াবতী আশ্রমে পরমহংসদেবের ছবিপূজা এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে—অদ্বৈতবাদীর পক্ষে নরপূজা নিষ্প্রয়োজন, তিনি বেলুড়মঠে মূর্তি আনিয়া লৌকিক বাহ্যপূজা কেন প্রবর্তন করিলেন? বিশেষত সন্ন্যাসীর নামে সংকল্প করিয়া কোনো পূজা চলে না—অশাস্ত্রীয়। ইহার এই এক তাৎপর্য আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে—এই সকল পূজানুষ্ঠান দেখিয়া চলতি নৌকার গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসমান আরোহিগণ আশ্বস্ত হইবেন যে বেলুড়মঠ হিন্দুমঠ এবং স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু।···রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজা প্রচলিত। অতএব বেলুড়মঠ বাংলার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত।"

[শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশী যুগ ।। পৃঃ ২৫৩]

যাহাই হউক, বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে স্বামী বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ—কেহই ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণভাবে কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না।

ভারতের বিশাল মুসলিম জনগণ সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত এই দুই মহাপুরুষ গভীরভাবে কিছু চিন্তা করিতেও পারেন নাই।

কিন্তু তবুও বিবেকানন্দের রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে আমরা অধিকতর প্রগতিশীল ভাবধারার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। ইহার কারণ, আধুনিক ইউরোপের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে পারিয়াছিল। যদিও তিনি বাস্তবক্ষেত্রে সেই সব মতাদর্শের জন্য কোথাও সংগ্রাম শুরু করিতে পারেন নাই। বার বার আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণের ফলে বিবেকানন্দের পক্ষে ইউরোপের বিভিন্ন প্রগতিশীল মহলের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা তখনও সম্ভব হয় নাই। এই কারণেই তখনও ইউরোপের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সহিত তাঁহার সম্যক পরিচয়ও হইতে পারে নাই। অথচ পরবর্তীকালে তাঁহার চিন্তাধারায় কী বিস্ময়কর পরিবর্তনই না আসিয়াছে!

রবীন্দ্রনাথ তখন প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য হইতে শক্তি-ভিক্ষা করিতেছেন। কবি এই সময়েই 'নববর্ষের গান'টি রচনা করেন। এই নববর্ষের গানে কবি জাতির জন্য শক্তি-ভিক্ষা করিয়া বলিলেন,

"দাও আমাদের অভয়মন্ত্র
অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।" [বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ জ্যৈষ্ঠ]

পর মাসেই 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ আষাঢ়) ব্রাহ্মণ্যধর্মের আধুনিক ব্যাখ্যা করিয়া কবি জাতিকে সত্যিকারের 'ব্রাহ্মণ' হইবার আহ্বান জানাইলেন। কী উপলক্ষে তিনি এই প্রবন্ধ লিখেন, সূচনাতেই কবি, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন,

"সকলেই জানেন, সম্প্রতি কোনো মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রভু পাদুকাঘাত করিয়াছিল—তাহার বিচার উচ্চতম বিচারালয় পর্যন্ত গড়াইয়াছিল—শেষ বিচারক ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।"

এই প্রবন্ধটি লইয়া পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। আমাদের বর্ণ-সমাজে ব্রাহ্মণের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে কবির ধারণা,

"আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র একটি সুবৃহৎ ব্যাপার। ইহাই সমস্ত দেশকে নিয়মিত ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই বিশাল লোক-সম্প্রদায়কে অপরাধ হইতে, স্খলন হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে।...

"সেই বৃহৎ সমাজের আদর্শ রক্ষা করিবার ও বিধিবিধান স্মরণ করাইয়া দিবার ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। ব্রাহ্মণ এই সমাজের চালক ও ব্যবস্থাপক।"

এই 'ব্রাহ্মণে'র ভূমিকা প্রতিটি দেশের সমাজ-জীবনে বিভিন্ন রূপে আছে। কবি দুঃখ করিতেছেন, এই ব্রাহ্মণকে আজ কোনো দেশেই দেখা যাইতেছে না — না এদেশে, না ইউরোপে। তাহার জন্য জাতীয় ও সমাজ-জীবনে এই মহাপাপাচার স্খলন ও বিচ্যুতি দেখা দিয়াছে।

ইউরোপের ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী লালসার ফলে মানব সভ্যতার ভাগ্যাকাশে যে বিপদ ও মহাবিপর্যয়ের কালো মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, তাহারও কারণ, তাঁহার মতে সে দেশে প্রকৃত 'ব্রাহ্মণের' অভাব। জগতের এই সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা,

"...কাজের একটা বেগ আছেই। সেই বেগে সে আপনার পরিণাম ভুলিয়া যায়। কাজ তখন নিজেই লক্ষ্য হইয়া উঠে। সুদ্ধমাত্র কর্মের বেগের মুখে নিজেকে ছাড়িয়া দেওয়াতে সুখ আছে। কর্মের ভূত কর্মী লোককে পাইয়া বসে।

"সুদ্ধ তাহাই নহে। কার্যসাধনই যখন অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে তখন উপায়ের বিচার ক্রমেই চলিয়া যায়। সংসারের সহিত, উপস্থিত আবশ্যকের সহিত কর্মীকে নানাপ্রকার রফা করিয়া চলিতেই হয়।

"অতএব যে সমাজে কর্ম আছে সেই সমাজেই কর্মকে সংযত রাখিবার বিধান থাকা চাই—অন্ধ কর্মই যাহাতে মনুষ্যত্বের উপর কর্তৃত্ব লাভ না করে এমন সতর্ক পাহারা থাকা চাই। কর্মীদলকে বারবার ঠিক পথটি দেখাইবার জন্য, কর্মকোলাহলের মধ্যে বিশুদ্ধ সুরটি বরাবর অবিচলিতভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য, এমন একদলের আবশ্যক, যাহারা যথাসম্ভব কর্ম ও স্বার্থ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন। তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণেরাই যথার্থ স্বাধীন।...

"ধর্ম ও কর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং মানুষের চিত্ত হইতে কর্মের নাগপাশ শিথিল করিয়া তাহাকে একদিকে সংসারব্রতপরায়ণ, অন্যদিকে মুক্তির অধিকারী করিবার অন্য কোনো উপায় তো দেখি না।"

রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্যটি বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় না। কর্ম ও ধর্ম

বলিতে তিনি যাহা বলিতে চাহিতেছেন, আধুনিক দর্শনের ভাষায় তাহাকে বলা যায় 'Material life' ও 'Spiritual life'। অবশ্য এই কর্ম ও ধর্মের সামঞ্জস্য-রক্ষার নামে তিনি প্রকৃতপক্ষে বর্ণ-সমাজকেই সমর্থন করিলেন।

"এই জন্যই কর্মকে সীমাবদ্ধ করা, কর্মকে ধর্মের সহিত যুক্ত করা, কর্মকে প্রবৃত্তির হাতে, উত্তেজনার হাতে, কর্মজনিত বিপুল বেগের হাতে ছাড়িয়া না দেওয়া; এবং এইজন্যই ভারতবর্ষে কর্মভেদ বিশেষ বিশেষ জনশ্রেণীতে নির্দিষ্ট করা।" [ব্রাহ্মণ—স্বদেশ ।। পৃঃ ৬১-৭৪]

এইসাথে 'প্রকৃত ও যথার্থ ব্রাহ্মণ' হওয়ার যে সব গুণাবলী ও শর্ত তিনি আরোপ করেন, বাস্তবে এ-যুগে তাহা অসম্ভব। তিনি বলেন,

"যদি প্রাচ্যভাবেই আমাদের দেশে সমাজ রক্ষা করিতে হয়, যদি য়ুরোপীয় প্রণালীতে এই বহুদিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্বপ্রকার আশ্রম-ধর্মেব আদর্শ ও আশ্রয়-স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ প্রতিক্রিয়াশীল কিনা, সেই বিতর্কে না গিয়াও অন্তত একথা বলা যায় যে, উহা প্রগতিশীল আদর্শ ও চিন্তাধারা নহে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বর্ণ-সমাজ ও প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদর্শে জাতীয় পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করিতেছেন, বিবেকানন্দ তখন পৃথিবীব্যাপী 'শূদ্ররাজত্ব' (নিপীড়িতদের রাজত্ব) ও 'সমাজতন্ত্রে'র পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন। এমন কি, তখন তিনি নিজেকে 'স্যোসালিস্ট' বলিয়া দাবি করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝেও তিনি 'শূদ্ররাজত্ব'কে অভ্যর্থনা জানাইলেন। তিনি বলিলেন,

"Last will come the labourer (Sudra) rule. Its advantages will be the distribution of physical comforts—its disadvantages, (perhaps) the lowering of culture. There will be a great distribution of ordinary education, but extraordinary geniuses will be less and less.

"Yet, the first three have had their day. Now is the time for the last—they must have it—none can resist it. I do not know all the difficulties about the gold or silver standards (nobody seems to know much as to that), but this much I see that the gold standard has been making the poor poorer, and the rich richer....I am a

'Socialist' not because I think it is a perfect system, 'but half a loaf is better than no bread.'

"The other systems have been tried and found wanting. Let this one be tried—if for nothing else, for the novelty of the thing. A redistribution of pain and pleasure is better than always the same persons having pious and pleasures."

[Works : Vol. VI. p. 343]

বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দের এই 'শ্রমিকরাজ' ও 'সমাজতন্ত্রে'র সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক নাই। ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও তত্ত্বের গভীরেও তিনি প্রবেশ করেন নাই। তাছাড়া খাস ইউরোপেও তখন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নানা তাত্ত্বিক গোলমাল ও বিতর্ক চলিতেছিল। ভারতবর্ষের 'Upper class'-গুলি সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলিলেন,

"The only hope of India is from the masses. The upper classes are physically and morally dead.···"

[Works : Vol. V. p. 81]

আবেগ-আপ্লুতকণ্ঠে তিনি ভারতের মহান জনগণকে অভিবাদন জানাইলেন,

"Ye, ever-trampled labouring masses of India ! I bow to you."

[Works : Vol. VII. p. 241.]

দেশের অভিজাত সম্প্রদায় ও আত্মম্ভরী উচ্চবর্ণের প্রতি তিনি বলিলেন,

"...You are but mummies ten thousand years old ! ... Fleshless and bloodless skeletons of the dead body of Past India that you are—why do you not quickly reduce yourselves into dust and disappear in the air ?......you merge yourselves in the void and disappear, and let New India arise in your place. Let her arise—out of the peasant's cottage, grasping the plough out of the huts of the fisherman, the cobbler and the sweeper. Let her spring from the grocer's shop, from beside the oven of the fritter-seller. Let her emanate from the factory, from marts and from markets.···Living on a handful of grain they can convulse the world ;···Skeletons of the Past, there before you, are your successors, the India that is to be. ...you—vanish into air, and be seen no more—only keep your ears open. No sooner will you disappear than you will hear the inaugural shout of Renaissant India ringing

with the voice of million thunders and reverberating throughout the universe." [Works : Vol. VII. pp. 308-10]

বিবেকানন্দ ভারতের নিপীড়িত জনগণের মধ্যে এক নূতন রেনাসাঁস, এক নূতন ভারতবর্ষকে দেখিতে পাইলেন। ঠিক এই কথা সেদিন আর কাহাকেও বলিতে শোনা গেল না—এমন কি রবীন্দ্রনাথকেও নয়।

এই সময় জগদীশচন্দ্র বিলাত হইতে 'Letters of John Chinaman' নামে একটি পুস্তক রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দেন। Lowes Dickinson নামে জনৈক ইংরাজ ছদ্মনামে এই বই লিখিয়াছিলেন। পরে ১৯১২ সালে বিলাত-ভ্রমণকালে কবির সহিত ইঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে এই পুস্তিকাটির উপর 'চীনেম্যানের চিঠি' নামে একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন (বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ আষাঢ়)।

ডিকিনসনের এই পুস্তকখানি রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে এক নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত করিল। লেখক এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি মূলগত-ঐক্য প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গভীর আগ্রহের সহিত এই তত্ত্বটি অনুধাবন করিতে চাহিয়াছিলেন। সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,

"প্রথমত ভারতবর্ষের সভ্যতা এশিয়ার সভ্যতার মধ্যে ঐক্য পাইয়াছে,—ইহাতেও আমাদের বল ; দ্বিতীয়ত এশিয়ার সভ্যতার এমন একটি গৌরব আছে, যাহা সত্য বলিয়াই প্রাচীন হইয়াছে, যাহা সত্য বলিয়াই চিরন্তন হইবার অধিকারী, ইহাতেও আমাদের বল।"

অবশ্য এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কাছে সম্পূর্ণ নূতন নহে। স্মরণ থাকিতে পারে, ইহার প্রায় এক বৎসর আগে চীনের বক্সার-বিদ্রোহ উপলক্ষে বঙ্গদর্শনে 'সমাজ-ভেদ' নামক প্রবন্ধে তিনি এইরকমই একটি কথা চিন্তা করিতেছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রাচ্য-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলিয়াছেন,

"রাষ্ট্রতন্ত্রই য়ুরোপীয় সভ্যতার কলেবর,—এই কলেবরটি আঘাত হইতে রক্ষা না করিলে তাহার প্রাণ বাঁচে না।···পূর্বদেশে তাহার বিপরীত। প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম।···বিপুল চীনদেশ শস্ত্রশাসনে সংযত হইয়া নাই, ধর্ম শাসনেই সে নিয়মিত।···সেই ধর্মে আঘাত লাগিলে চীন মৃত্যু-বেদনা পায়।"··· ঐ প্রবন্ধে তিনি চীন ও ভারতের একটি প্রকৃতিগত ও মূলগত ঐক্য (অস্পষ্টভাবে) প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ চীনেম্যানের চিঠি প্রবন্ধে চীনাম্যানের মূল বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করিয়া চীন ও ভারতবর্ষের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন,

"ভারতবর্ষ সমাজকে সংযত সরল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সমাজের মধ্যে আবদ্ধ হইবার জন্য নহে।···সে আপন সংহত শক্তিকে অনন্তের অভিমুখে একাগ্র করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক বাহ্যবিষয়ে সংকীর্ণতা আশ্রয় করিয়াছিল।···কেবলমাত্র পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সুব্যবস্থার দ্বারা আমি অমর হইব না, তাহাতে আমার আত্মার বিকাশ হইবে না। সমাজ যদি আমাকে সম্পূর্ণ সার্থকতা না দেয়, তবে সমাজ আমার কে? সমাজকে রাখিবার জন্য যে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে, এ-কথা স্বীকার করা যায় না—য়ুরোপও বলে, 'ইনডিভিজুয়াল'-কে যে-সমাজ পঙ্গু ও প্রতিহত করে, যে-সমাজেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিলে হীনতা স্বীকার করা হয়। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অসংকোচে নির্ভয়ে বলিয়াছে, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ। সমাজকে মুখ্য করিলে উপায়কে উদ্দেশ্য করা হয়। ভারতবর্ষ তাহা করিতে চাহে নাই, সেইজন্য তাহার বন্ধন যেমন দৃঢ়, তাহার ত্যাগও সেইরূপ সম্পূর্ণ।" [চীনেম্যানের চিঠি—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৪র্থ খণ্ড ।। পৃঃ ৪০৩-১৫]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে একটি আধ্যাত্মিকতা আরোপ করিতে চাহিতেছেন।

স্মরণ থাকিতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দও তখন প্রাচ্য সভ্যতার একটি ঐক্য আবিষ্কার করিতেছেন। জাপানী শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরা তখন বিবেকানন্দকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য এদেশে আসিয়াছেন। বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। ওকাকুরার 'The Ideals of the East'-এর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দেরই চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাহার প্রথম কথাই ছিল 'Asia is one'। নিবেদিতা এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে গিয়া বলিলেন,

"···Asia is a united living organism, each part dependent on all the others, the whole breathing a single complex life that Asia, the Great Mother, is forever one."

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'Swami Vivekananda' পুস্তকে লিখিতেছেন,

"When Swamiji returned from the West for the second time, he introduced a Japanese Professor of Art named Kakasu Okakura to India. Miss MacLeod told the writer in the U. S. A. in 1911, that it was she who was responsible for the introduction of Okakura, the Japanese artist. Perhaps it was she who found him

out in Japan. Okakura, accompanied by another Japanese youngman named Hori, came to India and stayed at the Belur Math. Hori came as a student of Indian religion and later on transferred himself to Shanti-Niketan, Bolpur, where he died.

"Okakura did not know much of English but it seems that he had written a manuscript dealing with Pan-Asiatic cultural connections. It was re-written by the Sister as she told the writer. It contained the stamp of Swamiji's ideology on Asia. The book was named 'The Ideals of the East." With the publication of the book, a *furore* went amongst the intellectuals of India. It was also alleged that he was the bearer of a Pan-Asiatic mission to unite the Asian countries against Occidental Imperialism. It is said that he met B. G. Tilak and others and talked over the same proposals. As a result, a batch of intellectuals of advanced views formed a loose group talking about politics. Some of Calcutta's notables and rich men were in it...."

[Swami Vivekananda—Patriot Prophet. pp. 116-17]

যাহাই হউক, ইহা ছাড়াও বাংলাদেশে আর্টের নব-উদ্বোধনে ওকাকুরা ও নিবেদিতার অবদান কম নহে, এ-কথা শিল্পশাস্ত্রীরা অনেকেই স্বীকার করেন। অনেকের মতে ওকাকুরাই সর্বপ্রথম এদেশে প্রাচ্য দেশগুলির ধর্ম ও শিল্প-সংস্কৃতির ঐক্য-তত্ত্ব উত্থাপন করেন। কিছুকাল পরে তিনি জাপানী শিল্পী টাইকন্ ও হিসিদাকে অবনীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস-বিচারে রবীন্দ্রনাথ

১৩০৯ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে 'আলোচনা সমিতি' (মজুমদার লাইব্রেরির সহিত সংশ্লিষ্ট)-তে রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র একটি দীর্ঘ সমালোচনা পাঠ করিলেন। কিছুদিন পর ঐ সমিতিতেই তিনি 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন-কাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি-মারামারি পড়িয়া গেল, বাপছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায়, কোথা হইতে আর-একদল উঠিয়া পড়ে—পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজ, সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

"কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে, যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়,—এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই—কেবল যাহারা কাটাকাটি-খুনোখুনি করিয়াছে, তাহারাই আছে।

"নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলে, কোথা হইতে আমরা প্রাণ আকর্ষণ করিব? এইরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না—ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না এবং এখন আমাদিগকে অশন-বসন আচার-ব্যবহার, সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।"

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নের ব্যাপারে ইংরাজ ঐতিহাসিকদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়া লইতে রাজী নহেন। রবীন্দ্রনাথের মতে—কেবল বৈদেশিক শক্তিগুলির ক্রমান্বয় অভিযান কিংবা বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতনের সাল, তারিখ এবং কাহিনীই ভারতবর্ষের ইতিহাস নহে। "সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মররচিত, কারুখচিত কবরচূড়া,...অশ্বের খুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহতি, অস্ত্রের ঝঞ্চনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা,

কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, খোজাপ্রহরী-রক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন…”—ইহাও ভারতবর্ষের ইতিহাস নহে।

ইতিহাস-জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন—দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁহার স্বতন্ত্র। তিনি ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী ও বৈশিষ্ট্যেরই অনুসন্ধান করিলেন। তিনি বলিলেন,

“ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ-কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা নানা পথকেই একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

“…য়ুরোপীয় সভ্যতা যে-ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধ-মূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে-ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলন-মূলক।…

“বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন।…ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।…য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়; আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কেপ-কলনিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্যন্ত পাইতেছি।…হয় পরকে কাটিয়া-মারিয়া-খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সু-বিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।”

[ভারতবর্ষের ইতিহাস—স্বদেশ ।। পৃঃ ৩৫-৪২]

রবীন্দ্রনাথ এখানে ভারত-ইতিহাসের মর্মবাণীটি যেমন তুলিয়া ধরিলেন, তেমনি সেইসাথে ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রণেতা—সেই ইউরোপীয়দের সাম্রাজ্য-

লোলুপতা, মিথ্যা স্বাজাত্য-অহমিকা ও পরজাতি-বিদ্বেষকে তিনি মানবতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ড হইতে তীব্র আক্রমণ করিলেন।

বলা বাহুল্য, ইতিহাস-বিচারে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি বিজ্ঞানসম্মত, সে-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। অবশ্য সেইসঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, সত্যকারের বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন ভারতবর্ষে আশা করা যাইতে পারে না।

সেটা স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বমুহূর্ত। স্মরণ থাকিতে পারে—তাহার পূর্বে, জাতীয় জাগরণের সেই প্রত্যূষে, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটিয়া জাতীয় শৌর্য ও বীরত্বের কাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় হইতেই একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচার ও প্রণয়নের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই দৃষ্টিভঙ্গিও গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে শুরু করিয়া মধ্যযুগীয় সাধু-সন্তগণ পর্যন্ত—ভারতবর্ষের এই দীর্ঘ ঐতিহ্যধারায় ঐক্য ও মিলনমূলক ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনাই কেবল অন্বেষণ করিলেন,

"পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।" [ঐ—স্বদেশ ।। পৃঃ ৪৩-৪৪]

॥ বঙ্গদর্শনে রাজনৈতিক প্রবন্ধ ॥

কবি বঙ্গদর্শনে কেবল যে জাতীয় আদর্শমূলক প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন তাহা নহে, সেই সময় তিনি উহাতে পর পর এমন কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধও লিখিলেন, তৎকালীন পটভূমিকায় যেগুলির তাৎপর্য কম নহে। 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে (১৩০৯ কার্তিক) তিনি নির্ভীক মৃত্যুবরণের আহ্বান জানাইয়া জাতিকে 'মা ভৈঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন,

"মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

"তুমি দেশকে যথার্থ ভালোবাস, তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কি না। তুমি আপনাকে যথার্থ ভালোবাস, তাহারও চরম পরীক্ষা আপনার উন্নতির জন্য প্রাণ বিসর্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর কি না।

"এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন ভয় পৃথিবীর মাথার উপরে যদি না ঝুলিত, তবে সত্য-মিথ্যাকে. ছোটো-বড়ো-মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে তুলা করিয়া দেখিবার কোনো উপায় থাকিত না।

"এই মৃত্যুর তুলায় যে-সব জাতির তৌল হইয়া গেছে, তাহারা পাস-মার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারাই তাহাদের জীবন পরীক্ষিত হইয়া গেছে।...যাহার প্রাণ আছে তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয় সে-ই মরিতে কৃপণতা করে।"

কিন্তু হঠাৎ প্রাণ দিবার কথা কবির মনে কেন উদয় হইল? রবীন্দ্রনাথ কি বাংলার আসন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন?

"...আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া পোলিটিক্যাল সুখস্বপ্নে যখন কল্পনা করি 'সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া মিশিয়া যাইতেছে', তখন মাঝখানে এই একটা দুশ্চিন্তা উঠে যে, বাঙালির সঙ্গে শিখ আপন ভাইয়ের মতো মিশিবে কেন? বাঙালি বি.এ. এবং এম.এ. পরীক্ষায় পাস হইয়াছে বলিয়া? কিন্তু যখন তাহার চেয়ে কড়া পরীক্ষার কথা উঠিবে তখন সার্টিফিকেট বাহির করিবে

কোথা হইতে ? শুদ্ধমাত্র কথায় অনেক কাজ হয়, কিন্তু সকলেই জানেন চিঁড়ে ভিজাইবার সময় কথা দধির স্থান অধিকার করিতে পারে না ; তেমনি যেখানে রক্তের প্রয়োজন সেখানে বিশুদ্ধ কথা তাহার অভাব পূরণ করিতে অশক্ত।"

[মা ভৈঃ — রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৫ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪৪১-৪৩]

বুঝিতে কষ্ট হয় না, তৎকালীন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা বাগাড়ম্বরে কবি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন।

ভারতবর্ষে সেটা 'কার্জনী যুগ'। ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিক বড়লাট কার্জনের ভারত-বিদ্বেষ এদেশে একটি প্রবাদের মত হইয়া আছে। অল্পকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন-উৎসবে ভাষণ-দান প্রসঙ্গে (১৯০২, ১৫ই ফেব্রুয়ারির কন্‌ভোকেশন বক্তৃতা) তিনি ভারতবাসীকে 'অত্যুক্তিবাদী' ও 'অতিরঞ্জনপ্রিয়' বলিয়া নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় কলিকাতা টাউন হলে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পর, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে, লর্ড কার্জন দিল্লী নগরীতে এক বিরাট বাদশাহী দরবারের আয়োজন করিলেন (আগস্ট ১৯০৩)।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ কার্তিক) রচনা করেন। পর পর কয়েকটি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূমিকম্পের ফলে দেশবাসীর দুঃখ কষ্ট তখন অবর্ণনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন দিনে দিল্লীর দরবারের ঐ নয়নান্ধকারী ঐশ্বর্য-বিলাসকে তিনি অত্যুক্তি, অতিরঞ্জন ও আতিশয্য বলিয়া অভিহিত করিয়া কার্জন-সাহেবের কথারই যেন প্রত্যুত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন,

"...এদিকে আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস ইংরেজের মনের মধ্যে নাই ; এত বড়ো দেশটা সমস্ত নিঃশেষে নিরস্ত্র ;...অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বলপ্রমাণ উপলক্ষে আমাদের অটলভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি।...

"তাই বলিতেছিলাম, আগামী দিল্লির দরবার পাশ্চাত্য অত্যুক্তি, তাহা মেকি অত্যুক্তি। এদিকে হিসাবকিতাব এবং দোকানদারিটুকু আছে—ওদিকে প্রাচ্য-সম্রাটের নকলটুকু না করিলে নয়। আমরা দেশব্যাপী অনশনের দিনে এই নিতান্ত ভুয়া দরবারের আড়ম্বর দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম বলিয়া কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—খরচ খুব বেশি হইবে না...। কিন্তু সেদিন উৎসব করা চলে না, যেদিন খরচপত্র সামলাইয়া চলিতে হয়।...

"...তপ্ত বালুকা সূর্যের মতো তাপ দেয়, কিন্তু আলোক দেয় না। সেইজন্য

তপ্ত বালুকার তাপকে আমাদের দেশে অসহ্য আতিশয্যের উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করে। আগামী দিল্লিদরবারও সেইরূপ প্রতাপ বিকিরণ করিবে, কিন্তু আশা ও আনন্দ দিবে না। শুষ্কমাত্র দম্ভপ্রকাশ সম্রাটকেও শোভা পায় না—ঔদার্যের দ্বারা, দয়াদাক্ষিণ্যের দ্বারা দুঃসহ দম্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যথার্থ রাজোচিত।…"

[অত্যুক্তি—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৪র্থ খণ্ড ।। পৃঃ ৪৪৩-৪৭]

বহুকাল পরে, এই রচনাটির পটভূমি ও তাৎপর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন (ডঃ শচীন সেনের Political Philosophy of Rabindranath পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে)। তিনি বলিয়াছিলেন,

"ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লীর দরবারের উদ্‌যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। সেই প্রবন্ধ যদি হাল আমলের পাঠকেরা পড়ে দেখেন তবে দেখবেন, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের বেদনা ও অপমানটা যে কোথায় আমার সেই লেখায় কতকটা প্রকাশ করেছি। আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য ; পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার কবেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে। সে হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ স্বীকার করা। তরবারির জোরে প্রতাপের যে সম্বন্ধ সে হল বিরুদ্ধসম্বন্ধ, আর প্রভূত দাক্ষিণ্যের দ্বারা যে-সম্বন্ধ সেইটেই নিকটের। দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য প্রকাশ করার উপলক্ষ পেতেন—সেদিন তাঁর দ্বার অবারিত, তাঁর দান অপরিমিত। পাশ্চাত্য নকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন কৃপণতা, সেখানে জনসাধারণের স্থান সংকীর্ণ, পাহারাওয়ালার অস্ত্রেশস্ত্রে রাজপুরুষদের সংশয়বুদ্ধি কণ্টকিত, তার উপরে এই দরবারের ব্যয়বহনের ভার দরবারের অতিথিদেরই পরে। কেবলমাত্র নত মস্তকে রাজার প্রতাপকে স্বীকার করবার জন্যেই এই দরবার।…

"বরঞ্চ এই রকম কৃত্রিম উৎসবে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেওয়া হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ খুব কঠিন হয়ে আছে কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের মানবসম্বন্ধ নেই, যান্ত্রিক সম্বন্ধ। এ দেশের সঙ্গে তার লাভের যোগ আছে, ব্যবহারের যোগ আছে, হৃদয়ের যোগ নেই।…"

[রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত—কালান্তর ।। পৃঃ ৩৪৬-৪৭]

এই দিল্লীদরবার সম্পর্কে তৎকালীন কংগ্রেস-সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি একবার এই সঙ্গে লক্ষণীয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের আমেদাবাদ-অধিবেশনে তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন,

"...He (Congressman) loves his Sovereign, because he loves his country, and because his Sovereign is the Head of the State...Inspired by this feeling of love and reverence for the Head of the British Constitution, our august Sovereign, we heard of his Majesty's illness with profound sorrow...and we rejoiced beyond measure on His Majesty's recovery... The Coronation postponed by His Majesty's illness took place in August last. It was an event of Imperial, of world-wide significance....To the people of India, the Coronation was an event of unique importance. For the first time in the history of our relations with Britain, a king of England was crowned Emperor of Hindusthan....It is proposed to celebrate the Coronation by a great Durbar to be held at Delhi in the course of the next few days. The Durbar has been the subject of animated controversy both here and in England...One of them has described it as "an act of uncalled for extravagance", specially out of place at a time when the country is just emerging from the throes of a great famine···."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I p.p. 537-38]

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে দরবারের বাদশাহী জাঁকজমক ও অপব্যয়ের খুবই মৃদু আপত্তি তুলিলেন। বরঞ্চ অজস্র ইংরাজ-প্রশস্তিবাদ গাহিয়া বলিলেন, প্রতিটি দরবার-অধিবেশনেই ভারতবর্ষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার লাভ করিয়াছে, আগামী দরবারেও বড়লাট কার্জন যেন তাঁহার পূর্বসূরীদের গৌরবময় ঐতিহ্য অনুসরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও তৎকালীন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, মেজাজ ও কণ্ঠস্বরের কী পরিমাণ পার্থক্য—আশা করি, পাঠক নিশ্চয়ই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন।

কিছুকাল পূর্বে সোমেশ্বর দাস নামে 'এলাহাবাদের কোনো দেশীয় ধনী ব্যাঙ্কর স্বত্বরক্ষা উপলক্ষে তাঁহার কোনো ইংরাজ ভাড়াটিয়াকে ফুল গাছের টব লইতে বাধা দেন—সেই স্পর্ধায় তাঁহার কারাদণ্ড হয়।' এই ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' নামক প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ কার্তিক) লিখেন। এদেশে ইংরাজ-শাসনের এবং সামগ্রিকভাবে ইউরোপের সাম্রাজ্যনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলিলেন যে, এই রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি তাহার পোলিটিকাল স্বার্থের প্রয়োজনে মানুষের প্রচলিত ন্যায়নীতি ও ধর্মাধর্মবোধকে মুহূর্তে জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তিনি বলিলেন,

"···বিচারের নিক্তিতে সক্ষম-অক্ষম এবং কালো-সাদায় ওজনের কমবেশি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল প্রয়োজন বলিয়া একটা ভারী জিনিস আছে, সেটা যেদিকে ভর করে, সেদিকে নিক্তি হেলে। এ দেশে ইংরেজের প্রতি দেশী লোকের অন্ধ সম্ভ্রম একটা পোলিটিকাল প্রয়োজন, অতএব সেরূপ স্থলে সূক্ষ্মবিচার অসম্ভব। ন্যায় বিচারের মতে একথা ঠিক বটে যে, ইংরেজের প্রতি দেশী লোক যে-ব্যবহার করিয়া যে-দণ্ড পায়, দেশী লোকের প্রতিও ইংরেজ সেই ব্যবহার করিয়া সেই দণ্ডই পাইবে। আইনের বহিতেও এসম্বন্ধে কোনো বিশেষ বিধি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল প্রয়োজন ন্যায়বিচারের চেয়েও নিজেকে বড়ো বলিয়া জানে।

"একথা ঠিক বটে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক ধর্মশাস্ত্রে পলিটিক্স্ সর্বোচ্চে, ধর্ম তাহার নীচে।···পোলিটিকাল প্রয়োজনে ন্যায়বিচারকেও বিকারপ্রাপ্ত হইতে হয়, পায়োনিয়র তাহা একপ্রকারে স্বীকার করিয়াছেন। জজ বার্কিট সোমেশ্বরের ব্যবহারকে audacity অর্থাৎ দুঃসাহস বলিয়াছেন। স্বত্বরক্ষা উপলক্ষে ইংরেজকে বাধা দেওয়া যে দুঃসাহস, বিচারক তাহাই দেখাইয়াছেন, এবং এই সাহসিকতার অপরাধে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়া বিচারক যে মানসিক গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাকে আমরা কোনোমতেই সাহসের কোটায় ফেলিতে পারি না।··· এস্থলে দণ্ডিত যদি audacious হয়, তবে দণ্ডদাতার প্রতি ইংরেজি কোন্ বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে!"

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"ভয়ের কারণ এই যে, আমাদের মন হইতে ধ্রুবধর্মে বিশ্বাস শিথিল, সত্যের আদর্শ বিকৃত হইয়া যাইতেছে। আমরাও প্রয়োজনকে সকলের উচ্চে স্থান দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরাও বুঝিতেছি, পোলিটিকাল উদ্দেশ্যসাধনে ধর্মবুদ্ধিতে দ্বিধা অনুভব করা অনাবশ্যক। অপমানের দ্বারা যে-শিক্ষা অস্থিমজ্জায় মধ্যে প্রবেশ করে, সে-শিক্ষার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব কী করিয়া? ধর্মকে যদি অকর্মণ্য বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে আরম্ভ করি তবে কিসের উপর নির্ভর করিব। বিলাতি সভ্যতার আদর্শের উপর? বিশ্বজগতের মধ্যে এই সভ্যতাটাই কি সর্বাপেক্ষা স্থায়ী?" [রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ॥ পৃঃ ৫৯৮-৯৯]

অল্পকাল পরেই কবির পারিবারিক জীবনে এক দারুণ বিপর্যয় আসিল—অগ্রহায়ণের প্রথম ভাগেই কবিপ্রিয়া মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হইল (৭ই অগ্রহায়ণ; ১৩০৯)। পরম আত্মীয়ের এই বিয়োগ-ব্যথা ও দুঃখ বাহ্যত কবিকে খুব বিচলিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি বঙ্গদর্শনে দেশের-সমস্যা লইয়া পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিলেন।

বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় New India পত্রিকা তখন খুব উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনিই উগ্রপন্থী ও বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন। ১২ই মার্চের New India পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র 'ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ক্রিমিন্যাল' নামক একটি প্রবন্ধে ইংরাজের ঘুষির পরিবর্তে পাল্টা ঘুষি ফিরাইয়া দিবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইহারই সমালোচনা প্রসঙ্গে 'রাজকুটুম্ব' ও 'ঘুষাঘুষি' (বঙ্গদর্শন, ১৩১০ বৈশাখ ও ভাদ্র) নামক দুইটি প্রবন্ধ লিখিলেন। উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"সম্পাদক মহাশয় বলেন, আমরা যদি ঘুষির পরিবর্তে ঘুষি ফিরাইতে পারি, তবে রাস্তায় ঘাটে ইংরেজকে অনেক অন্যায় হইতে নিরস্ত রাখিতে পারি। কথাটা সত্য—মুষ্টিযোগের মতো চিকিৎসা নাই—কিন্তু সম্পাদকের উপদেশ সহসা কেহ মানিতে রাজি হইবে না। তাহার গুটিকতক কারণ আছে।

"একটি কারণ এই যে, আমরা একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হইয়াছি—পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবার যত-কিছু আদেশ-উপদেশ-অনুশাসন সমস্তই শিশুকাল হইতে আমাদিগকে প্রত্যহ পালন করিতে হইয়াছে। ঘুষাঘুষি করা, বিবাদ করা, পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ও নিজের অধিকার লড়াই করিয়া রাখা, একান্নবর্তী পরিবারে কিছুতেই চলে না। আমাদের পরিবার ভালোমানুষ হইবার, পরস্পরের অনুকূলকারী হইবার, একটি কারখানা বিশেষ। অতএব ঘুষিশিক্ষা করিলেও মানুষের নাসিকাগ্রে ও চক্ষুতারকায় তাহা নির্বিচারে প্রয়োগ করিবার ক্ষিপ্রকারিতা আমাদের অভ্যাস হয় না।" [রাজকুটুম্ব—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৬০২]

অর্থাৎ ঘুষির পরিবর্তে ঘুষি ফিরাইয়া দিতে পারিলে ভালোই হয়, তবে উহা বাঙালী শিক্ষা-দীক্ষা ও কালচারের বাহিরে—বাস্তবত উহা সম্ভব নহে। তাছাড়া এই নীতির একটা বিপদও আছে। 'ঘুষাঘুষিতে' সেই সম্পর্কে বলিলেন,

"আমি এ কথা ভয় হইতে বলিতেছি না। দাঁতভাঙা, নাক থ্যাবড়ানো, জেলে যাওয়া অত্যন্ত গুরুতর অশুভ বলিয়া গন্য না-ই হইল। কিন্তু যে গরলকে পরিপাক করিতে আমরা স্বাভাবিক কারণেই অক্ষম, সেই গরলকে উদ্রিক্ত করিয়া তোলা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না, জানি না।"

"কিন্তু একটা অবস্থা আছে, যখন ফলাফল বিচার অসংগত এবং অন্যায়। ইংরেজ যখন অন্যায় করিয়া আমাকে অপমান করে, তখন যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিয়া জেলে যাওয়া এবং মরাও উচিত। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, হয়তো ঘুষায় পারিব না এবং হয়তো বিচারশালাতেও

সাব্যস্ত হইবে; তথাপি অন্যায় দমন করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষের যে স্বর্গীয় অধিকার আছে, যথাসময়ে তাহা যদি না খাটাইতে পারি, তবে মনুষ্যের নিকট হেয় এবং ধর্মের নিকট পতিত হইব।..."

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "...ভয়ের বিষয় এই যে, ধর্মকে বিস্মৃত হইয়া প্রবৃত্তির হাতে পাছে আত্মসমর্পণ করি, পরকে দণ্ড দিতে গিয়া পাছে আপনাকে কলুষিত করি, বিচারক হইতে গিয়া পাছে গুণ্ডা হইয়া উঠি।...প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যে সামঞ্জস্যপথ আছে তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইলেও, তাহাই আমাদিগকে নিয়ত যত্নে অনুসন্ধান ও অবলম্বন করিতে হইবে—নতুবা বিনাশপ্রাপ্ত হইতেই হইবে। ধর্মের এই অমোঘ নিয়ম হইতে য়ুরোপ বা এশিয়া কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

"অতএব ঘুষাঘুষি-মারামারির কথা যখন ওঠে, তখন সাবধান হইতে বলি। দেবতার তূণেও অস্ত্র আছে, দানবের তূণও শূন্য নহে—অপ্রমত্ত হইয়া অস্ত্র নির্বাচন যদি করিতে পারি তবেই যুদ্ধের অধিকার জন্মে।..."

[ঘুষাঘুষি—রবীন্দ্র-রচনাবলী: ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৬১১-১২]

স্মরণ থাকিতে পারে, কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইংরাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ অবলম্বনের কথা বলিয়াছিলেন (সাধনার প্রবন্ধাবলী)। এখন কিন্তু এই সম্পর্কে তাঁহার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। তাহার কারণ, তাঁহার অতিরিক্ত ন্যায়বোধ ও ধর্মভীরুতা। ইংরাজ এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকে তিনি এই বলিয়া অভিযোগ করিয়া আসিতেছিলেন যে, উহা পলিটিক্যাল স্বার্থ-প্রয়োজনে ন্যায়নীতি ও ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। অন্যায়ের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের নামে পাছে আমরাই ন্যায়-নীতি ও ধর্ম-নীতির সুক্ষ্ম গণ্ডিগুলি অতিক্রম করিয়া ফেলি—ইহাই রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা। গান্ধীজীর মতো 'Means' ও 'End'-এর প্রশ্নটি এই সময় হইতেই তাঁহাকে যেন ভাবিত করিয়া তুলিয়াছে। পরবর্তীকালে, ঠিক এই কারণেই বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। যথাসময়ে আমরা সেই আলোচনায় অসিব।

পরের মাসে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' প্রবন্ধটি লিখিলেন (বঙ্গদর্শন, ১৩১০ আশ্বিন)। একদা র‍্যাভেন শ কলেজের ইংরাজ-অধ্যাপক, এ-দেশীয়রা 'প্রাণের মাহাত্ম্য' (sanctity of life) বোঝে না, এই বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে 'গ্লোব', 'ডেলি নিউজ' প্রভৃতি বিদেশী পত্র-পত্রিকা হইতে ইংরাজ ও ইউরোপীয়দের পরজাতি-বিদ্বেষ ও উপনিবেশগুলিতে তাহাদের অমানুষিক পীড়ন-নির্যাতনের বহু তথ্য সংকলন করিয়া ইউরোপীয়দের 'প্রাণের

মাহাত্ম্যবোধ' ও 'ধর্মবোধে'র দৃষ্টান্ত দিলেন। হেন্‌রি স্থাভেজ ল্যাণ্ডর নামক জনৈক ইংরাজ পর্যটক গোপনে তিব্বত ভ্রমণ করিবার কালে তাঁহার পাহাড়ী অনুচর ও বাহকদলের উপর কী অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন, তিব্বতী 'ভীরু' রক্ষী-বাহিনীকে তাঁহার আট শ'-গজী রাইফেল দ্বারা কিভাবে 'উচিতশিক্ষা' দিয়াছিলেন —রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার মর্ম উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া বলিলেন,

"...ধর্মবোধ পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরিক নহে—স্বার্থরক্ষার প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা বাহির হইতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য য়ুরোপীয় গণ্ডির বাহিরে তাহা বিকৃত হইয়া থাকে। দয়াধর্ম রক্ষা করার চেষ্টাকে য়ুরোপ দুর্বলতা বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধের সময় বিরুদ্ধপক্ষের সর্বস্ব জ্বালাইয়া দেওয়া, তাহাদের অনাথ শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিবার বিরুদ্ধে কথা কহা 'সেন্টিমেন্টালিটি'। য়ুরোপে সাধারণত অসত্যপরতা দূষণীয়, কিন্তু পলিটিক্সে একপক্ষ অপর পক্ষকে অসত্যের অপবাদ সর্বদাই দিতেছে। গ্লাড্‌স্টোনও এই অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এই কারণেই চীনযুদ্ধে য়ুরোপীয় সৈন্যের উপদ্রব বর্বরতারও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল এবং কংগো-প্রদেশে স্বার্থোন্মত্ত বেলজিয়ামের ব্যবহার পৈশাচিকতায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

"দক্ষিণ আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি কিরূপ আচরণ চলিতেছে, তাহা নিউইয়র্কে প্রকাশিত 'পোস্ট' সংবাদপত্র হইতে গত ২রা তারিখের বিলাতী ডেলি নিউজে সংকলিত হইয়াছে। তুচ্ছ অপরাধের অছিলায় নিগ্রো স্ত্রী-পুরুষকে পুলিস-কোর্টে হাজির করা হয়—সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে জরিমানা করে, সেই জরিমানা আদালতে উপস্থিত শ্বেতাঙ্গেরা শুধিয়া দেয় এবং এই সামান্য টাকার পরিবর্তে তাহারা সেই নিগ্রোদিগকে দাসত্বে ব্রতী করে। তাহার পর হইতে চাবুক, লৌহশৃঙ্খল এবং অন্যান্য সকল প্রকার উপায়েই তাহাদিগকেই অবাধ্যতা ও পলায়ন হইতে রক্ষা করা হয়। একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে তো চাবুক মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে দ্বৈধব্য (**bigamy**)-অপরাধে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। হাজতে থাকার সময় একজন ব্যারিস্টার তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকার করে।...ব্যারিস্টার ফী-এর দাবি করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকার পরিবর্তে এই নিগ্রো স্ত্রীলোকটিকে ম্যাক্রি-ক্যাম্পে চৌদ্দমাস কাজ করিবার জন্য পাঠায়। সেখানে তাহাকে নয়মাস চাবিতালা দিয়া বন্ধ করিয়া খাটানো হইয়াছে, জোর করিয়া আর-এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ দিয়া বলা হইয়াছে...পলায়নের আশঙ্কা করিয়া তাহার পশ্চাতে কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে,

তাহার প্রভু ম্যাক্রিয়া তাহাকে নিজের হাতে চাবুক মারিয়াছে, এবং তাহাকে শপথ করাইয়া লইয়াছে যে, খালাস পাইলে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সে মাসে পাঁচ ডলার করিয়া বেতন পাইত। [ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত—স্বদেশ ।। পৃঃ ৮৯-৯১]

"ডেলি নিউজ বলিতেছেন, রাশিয়ায় ইহুদী হত্যা, কংগোয় বেলজিয়ামের অত্যাচার প্রভৃতি লইয়া প্রতিবেশীদের প্রতি দোষারোপ করা দুরূহ হইয়াছে।

"After all no great power is entirely innocent of the charge of treating with barbarous harshness the alien races which are subject to its rule."

[ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত—স্বদেশ ।। পৃঃ ৮৯-৯০]

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালেই রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের এই বিশ্বজোড়া নৃশংস দানবীয় তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। 'প্রাণের মাহাত্ম্যবোধ', 'মানবতা', 'ন্যায়নীতি', 'গণতন্ত্র', 'সাম্য-মৈত্রী-সৌভ্রাত্র' প্রভৃতি বড়ো-বড়ো কথা বলিয়া যে-সব সাম্রাজ্যবাদী প্রবক্তারা বড়াই করে, রবীন্দ্রনাথ সর্বসমক্ষে তাহাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে, প্রবন্ধটির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে নিখিল বিশ্বের নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানবের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ দরদ ও সহানুভূতি।

কবির মনে তখন হইতেই ভিতরে ভিতরে বিশ্বমানবতা ও আন্তর্জাতিকতা-বোধের ক্রিয়া চলিতেছে ; সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকট কবিকে তখন হইতেই ভাবিত করিয়া তুলিতেছে। এতখানি বিশাল দৃষ্টি, এইরূপ বিশ্ববোধ ও সংস্কৃতি-সচেতনতা রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ছাড়া সমকালীন ভারতবর্ষে আর কাহারও মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনে শোক-দুঃখ লাগিয়াই রহিল। মধ্যমা কন্যা রেণুকাও দীর্ঘকাল রোগভোগের পর মারা যান। কবি এই সময়েই তাঁহার 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন। উৎসর্গের মধ্যে কয়েকটি স্বদেশমূলক গান ও কবিতা আছে। পরবর্তীকালে ঐগুলি 'সংকল্প ও স্বদেশ' গ্রন্থে সংকলিত হয়। ইহাদের মধ্যে 'স্বদেশ', 'নববর্ষের গান', 'নববর্ষের দীক্ষা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বদেশ কবিতায় কবি বলিলেন (উৎসর্গ : ১৬ সংখ্যক কবিতা),

"হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজি কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।…

"হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা,
মোর সনাতন স্বদেশে।..."

কবির দৃষ্টিতে স্বদেশ ও বিশ্বদেবতা যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেইসঙ্গে অতীত ভারতের তপোমূর্তি কবিকে তখনও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তিনি লিখিলেন,

"শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে—
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।...
তখন ভারতে শুনি চারি ভিতে
মিলি কাননের বিহঙ্গগীতে
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
উঠে গায়ত্রী গাথা।
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে
শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে হে দেব,
তব গান মোর স্বদেশে।..."

নববর্ষের দীক্ষায় কবি দেশবাসীকে এই পণ লইতে আহ্বান জানাইলেন,

"নব বৎসরে করিলাম পণ—
লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে তোমার চরণে
হে ভারত, লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন ;
যদি হই দীন, না হইব হীন
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।..."

এই গান গাহিয়াই যেন স্বদেশী আন্দোলনের উদ্বোধন হইল।

।। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের স্থান ।।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাম্রাজ্যবাদ বীভৎস নগ্নমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। চীন, পারস্য, কঙ্গো, ট্রান্সভাল, তিব্বত—সর্বত্র তখন সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র থাবার নৃশংস নখরাঘাত। তথাপি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে প্রবীন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের তখনও মোহভঙ্গ হইল না। British Empire-এর 'মঙ্গলকারী শক্তি'র উপর তখনও তাঁহাদের অবিচল আস্থা। আবেদন-এ্যাজিটেশন করিতে পারিলে একদিন-না-একদিন ইংরাজ তাঁহাদের কানাডার মত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি মানিয়া লইবে—তৎকালীন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের এই জাতীয় মনোবৃত্তিতে দেশের যুব-শক্তি লজ্জায়, ক্ষোভে ও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেছিল। সেই অশান্ত যুবশক্তির পক্ষ হইতে বিপিনচন্দ্র তীব্র ভাষায় বলিলেন,

"We have always been begging and begging. The Congress here and its British committee in London, are both begging institutions. We have given a new name to begging : we call it agitation." [New India, 1902]

এদিকে পূর্বদিগন্তে তখন জাপানের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সমগ্র এসিয়ায় প্রবল বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া ও ফরমোজা অধিকার করিয়া লইল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মত প্রবল পরাক্রমশালী দেশও জাপানের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে সন্ধি স্থাপন করিল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে তখন বাংলার যুবশক্তি এই দৃশ্য দেখিয়াছে। দেখিয়াছে, ইহার পূর্বে প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ সৈন্য কিভাবে অশিক্ষিত বোয়ার কৃষকদের হাতে বারে বারে লাঞ্ছিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্‌-আন্দোলন ও রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বহু রোমাঞ্চকর খবরও আসিয়া পৌছিল। বাংলার যুবশক্তি এইসব সংবাদে উৎসাহিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় কার্জনের 'বঙ্গচ্ছেদ' যেন দেশের জন-জাগরণে একটি আশীর্বাদের মত আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৯০৫ সালে ৭ই আগস্ট বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অল্প কিছুদিন আগে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনে আমেরিকার পণ্যদ্রব্য-বয়কট আন্দোলন অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে (১৯০৪)। অপরদিকে 'রুশ-জাপান যুদ্ধে'ও (১৯০৪ ফেব্রুয়ারী-১৯০৫ অক্টোবর)

ক্ষুদ্র জাপানের হাতে প্রবল পরাক্রান্ত রুশ সৈন্য-বাহিনী বার বার পর্যুদস্ত হইতে থাকে। এই সকল সংবাদে বাংলার যুবশক্তি উত্তেজিত ও উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। বাংলাদেশে বয়কট আন্দোলনে ইহার সুস্পষ্ট প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,

"...boycott of British goods was publicly started—by whom I cannot say—by several, I think, at once and the same time. It first found expression at public meeting in the district of Pabna, and it was repeated at public meetings held in other mofussil towns ; and the successful boycott of American goods by the Chinese was proclaimed throughout Asia and reproduced by the Indian newspapers."

[S. N. Banerjee—Nation In Making]

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হইলেও উহার নেতৃবর্গ তখনও ইউরোপের জড়বাদী দর্শন কিংবা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে উহা প্রধানত হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রায় সমগ্র দেশের শিক্ষিত সমাজে এক সুতীব্র স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যাভিমানের প্লাবন আনিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশে একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শুরু করিয়া দীর্ঘ দিন যাবৎ বাংলায় যে আন্দোলনের ধারা চলিয়া আসিতেছিল, তাহাই এই স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ কিভাবে জাতীয় আদর্শ নির্ণয়ের প্রশ্নে চিন্তার আলোড়ন তুলিয়াছিলেন, পূর্বেই তাহা আলোচনা করিয়াছি।

ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনায় বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান আছে।

রাজনৈতিক : আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাংলাদেশে এই সময় পাশাপাশি তিনটি রাজনৈতিক ধারা চলিতে থাকে।

(ক) সুরেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ মডারেটপন্থীগণ, যাঁহারা কংগ্রেসের চিরাচরিত আবেদন-নিবেদনের নীতিতে বিশ্বাস রাখিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চাহিতেছিলেন।

(খ) বিপিনচন্দ্রের বয়কট ও নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ (passive resistance)

আন্দোলন। বিপিনচন্দ্র দাবি করিলেন বিদেশী প্রভাবমুক্ত স্বাধীনতা। ১৯০৬ সালে তিনি 'Bandemataram' পত্রিকায় পরিষ্কার ঘোষণা করিলেন,

"Our ideal is freedom, which means absence of all foreign control. Our method is passive resistance, which means organised determination to refuse, to render any voluntary or honourary service to the Government."

(গ) অরবিন্দ নিবেদিতা বারীন ঘোষ প্রমুখ সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলন। প্রকাশ্যে ইঁহারা সকলেই passive resistance নীতির পক্ষে থাকিয়া বিপিনচন্দ্রের সহিত একই সাথে কাজ করিতেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রবর্তিত রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের সূত্রপাত করিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, অরবিন্দ প্রবর্তিত বিপ্লব আন্দোলন মহারাষ্ট্রের চরমপন্থী আন্দোলন হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। সর্বশেষ একটি অভিনব আন্দোলনের ধারা রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উহা জনসংযোগ ও পল্লীসমাজ গঠনমূলক আন্দোলন। যথাসময়ে আমরা ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিব।

অর্থনৈতিক: অর্থনৈতিক দিক হইতে বাংলাদেশের বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের একটি বিশেষ অবদান আছে। এই আন্দোলন সারা ভারতের দেশীয় শিল্প ও কলকারখানাগুলিতে অভূতপূর্ব উন্নতির গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়াছে। বস্তুতপক্ষে স্বদেশী আন্দোলন দেশীয় শিল্পকে (indigenous industry) আপেক্ষিকভাবে অধিকতর দৃঢ় ও সংগঠিত করিয়াছে। স্বয়ং গোখ্‌লে বেনারস-কংগ্রেসে বলিলেন (1905),

"Gentlemen, the true *Swadeshi* movement is both a patriotic and an economic movement. The idea of *Swadeshi* or 'one's own country' is one of the noblest conceptions that have ever stirred the heart of humanity... But the movement on its material side is an economic one; and though self-denying ordinances, extensively entered into, must serve a valuable economic purpose, namely, to ensure a ready consumption of such articles as are produced in the country and to furnish a perpetual stimulus to production by keeping the demand for indigenous things largely in excess of the supply, the difficulties that surround the question economically are so great that they require the

co-operation of every available agency to surmount them.... Whoever can help in any one of these fields is, therefore, a worker in the *Swadeshi* cause and should be welcomed as such." [Congress Presidential Addresses : Vol. I. pp. 698-99]

শিক্ষা : শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলন ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও আলোচনার সূত্রপাত করিল। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কলিকাতাতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশের সর্বপ্রথম জাতীয় কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল টেকনিকেল স্কুলও এই সময় কলিকাতায় স্থাপিত হয়।

সাহিত্য-শিল্প ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন : বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল হইতেই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, ওকাকুরা, হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি চিন্তানায়ক ও শিল্পশাস্ত্রীগণ স্বদেশী সংস্কৃতিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভারতের প্রাচীন চারুশিল্প ও কারুশিল্পকে ইঁহারা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনরুজ্জীবিত করিবার আন্দোলন শুরু করিলেন। স্বদেশীযুগে বাংলাদেশেই ভারতীয় চিত্রশিল্প ও ললিতকলার প্রকৃত রেনাসাঁস হইল। এ-ব্যাপারে বাংলাদেশ সারা ভারতের দীক্ষা-গুরু। এই আন্দোলনের ফলে সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নাটক, অভিনয়, পোশাক-পরিচ্ছদ—এক কথায় জাতির সমগ্র সংস্কৃতি-জীবনে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধের এক প্রবল জোয়ার আসিল।

॥ বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ও য়ুনিভার্সিটি বিল ॥

১৯০১-০২ সালে লর্ড কার্জন শিক্ষা সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। এই উদ্দেশ্যে ১৯০২ সালে 'বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠিত হয় (২৭শে জানুয়ারী)। মোট ছয়জন সদস্যের এই কমিশনে একজন মুসলিম সদস্য ছাড়া প্রায় সকলেই ইউরোপীয় ছিলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই লইয়া আন্দোলন শুরু করিলে প্রায় মাসখানেক পরে হিন্দুদের পক্ষ হইতে বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কমিশনে গ্রহণ করা হয়। কমিশন প্রায় চার মাস পরে তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেন (১৯০২, ৯ই জুন)। এই রিপোর্ট অনুসারেই লর্ড কার্জন তাঁহার 'য়ুনিভার্সিটি বিল' আনয়ন করিলেন। স্যর গুরুদাস এই কমিশনের সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

লর্ড কার্জনের এই বিল একদিকে য়ুনিভার্সিটিগুলিকে সরকারের তাঁবেদারিতে পরিণত করিতে এবং অপরদিকে ভারতীয়দের উচ্চশিক্ষার সকল পথ বন্ধ করিতে উদ্যত হইল। কার্জনের কূট অভিসন্ধি কাহারও নিকট অবিদিত রহিল না। কার্জনের ধারণা হইয়াছিল যে, উচ্চশিক্ষার ফলে এদেশীয়দের মধ্যে ক্রমেই রাজনৈতিক-চেতনা ও স্বাধীনতা-স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিতেছে; বিশেষ করিয়া বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় বেশী রাজনৈতিক আন্দোলন ও 'হৈ-চৈ' করে। তাছাড়া তখন বেকার সমস্যাও বৃদ্ধি পাইতেছিল। নূতন আইনে শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হইবে, ফলে দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনাও কমিয়া আসিবে। এই সকল কারণে সারা দেশে য়ুনিভার্সিটি বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন শুরু হইল।

য়ুনিভার্সিটি বিল লইয়া যখন দেশময় আন্দোলন চলিতেছে, প্রায় সেই সময় লর্ড কার্জন 'বঙ্গবিভাগ' বিল উপস্থাপিত করিলেন (১৯০৩, ৩রা ডিসেম্বর ক্যালক্যাটা গেজেটে প্রকাশিত)। বঙ্গদেশ বলিতে তখন—বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা—এই তিনটি মিশ্রিত প্রদেশ বুঝাইত। একজন ছোটোলাট বা লেফটেনাণ্ট গভর্ণর এই প্রদেশ শাসন করিতেন। বঙ্গবিভাগের স্বপক্ষে কার্জনের একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে, এতবড়ো প্রদেশের প্রশাসনিক কাজে বহু সমস্যা ও অসুবিধা, সুতরাং বঙ্গদেশকে প্রশাসনিক সুবিধা অনুযায়ী পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত বিলে

আসাম প্রদেশের সহিত রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগকে সংযুক্ত করিয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নূতন প্রদেশ এবং অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও বিহার লইয়া বঙ্গদেশ গঠনের পরিকল্পনা হয়।

এই বঙ্গবিভাগের পশ্চাতেও কার্জনের যে কূট রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল, সকলের নিকট তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। যতকিছু রাজনৈতিক উত্তেজনা ও আন্দোলনের উৎপত্তিস্থান এই বাংলাদেশ। সুতরাং বঙ্গবিভাগের ফলে বাঙালী জাতির শক্তি খর্ব ও খণ্ডিত হইবে। তাছাড়া 'বঙ্গবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গে মুসলিমদের আধিপত্য সুনিশ্চিত হইবে'—এই প্রলোভন দিয়া কার্জন গোপনে গোপনে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়কে বঙ্গবিভাগের পক্ষে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। কার্জনের এই হীন অপকৌশলে সারা বাংলাদেশ ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় বহিতে শুরু করিল।

য়ুনিভার্সিটি বিল ও বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবকে উপলক্ষ করিয়া সারা বাংলাদেশে যে প্রচণ্ড উদ্দীপনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি হইল, এবং তাহার ফলে যে অভূতপূর্ব স্বাদেশিকতা-বোধ ও প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের সূচনা হইল, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে দুইহাত বাড়াইয়া অভ্যর্থনা জানাইলেন। বাংলাদেশের স্বদেশী সংগ্রামে তিনি যেন একটি অশ্রুতপূর্ব স্বর শুনিতে পাইলেন। বঙ্গদর্শনে 'বঙ্গবিভাগ' প্রবন্ধের (বঙ্গদর্শন, ১৩১১, জ্যৈষ্ঠ) সূচনাতেই কবি বলিলেন,

"বঙ্গবিভাগ ও শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে।···কংগ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমরা বার বার দুইকূল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি।···এবার কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই—প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা সোজা কথা কহিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ এই স্বরকে স্বাগত জানাইলেন। কিন্তু সেই সাথে তিনি কংগ্রেসের যে সকল প্রবীণ নেতার মধ্যে তখনও দো-মনা ভাব রহিয়াছে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন,

"যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশকে খণ্ডিত করা হইতেছে,—যদি সত্যই তোমার

বিশ্বাস যে, য়ুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক য়ুনিভার্সিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা হইতেছে, তবে সেকথার উল্লেখ করিয়া তুমি কাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।...

"...আর, মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছ কেন—অমন চড়া সুরে কথা কহিতেছ কেন—কেন বলিতেছ, 'তোমাদের মতলব আমরা বুঝিয়াছি, তোমরা আমাদিগকে নষ্ট করিতে চাও।' এবং তাহার পরক্ষণই কাঁদিয়া বলিতেছ,—'তোমরা যাহা সংকল্প করিয়াছ তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও।' বলিহারি এই 'অতএব'!"

রবীন্দ্রনাথ যে ন্যায্য স্বাধিকার অর্জনের জন্য বিদ্রোহ করিবার কথা কল্পনা করিতেছিলেন তাহা নহে। তাঁহার ধারণা ও বক্তব্য,—

"পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতন্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সংঘাত ব্যতীত বড়ো কোনো জিনিস গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

"দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না। কেন এই রুদ্ধদ্বারে মাথা-খোঁড়াখুড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন।..."

তিনি বলিলেন,

"আমরা নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ কথা আমরা কোনো মতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ।"

ইংরাজ সরকারকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিলেন,

"হে রাজন্, আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জন করিতে দাও। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্‌বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রায় সহায়তা করিও না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র

উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।" [বঙ্গবিভাগ—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৬১৩-১৯]

ইংরাজের নিকট হইতে আঘাত ও সংঘাতই আমাদের পথ দেখাইবে—অর্থাৎ তিনি শত্রুকে শত্রু হিসাবেই—বিরোধকে বিরোধ হিসাবেই দেখিবার আহ্বান জানাইলেন। অবশ্য সংগ্রামের বিষয়, লক্ষ্য ও পন্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কয়েকটি ধারণা ও মত ছিল,—যথাসময়ে আমরা এই প্রসঙ্গে আসিব।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কার্জন সাহেব সমস্ত দেশের জনমতকে উপেক্ষা ও পদদলিত করিয়া য়ুনিভার্সিটি বিল পাস করাইয়া লইলেন। বিলটি উত্থাপন-কালে যে এ্যাজিটেশন ও প্রতিবাদ আন্দোলন দেখা গিয়াছিল ক্রমশই তাহা নিস্তেজ হইয়া আসিল। দেশবাসীর এই নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্টতা ও নৈরাশ্যবোধ কবিকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করিল। বঙ্গদর্শনে 'য়ুনিভার্সিটি বিল' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১৩১১, আষাঢ়) ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ ইহারই উল্লেখ করিয়া বলিলেন,

"য়ুনিভার্সিটি বিল পাস হইয়া গেছে, আমরাও নিস্তব্ধ হইয়াছি। যতক্ষণ পাস হয় নাই, ততক্ষণ আমরা এমন ভাব ধারণ করিয়াছিলাম, যেন আমাদের মহা অনর্থপাত ঘটিয়াছে। যদি বস্তুতই আমাদের সেইরূপ বিশ্বাসই হয়, তবে বিল পাস হইয়া গেল বলিয়াই অমনি সুনিদ্রার আয়োজন করিতে হইবে, ইহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

"দেশের সত্যই যদি কোনো দারুণ অনিষ্ট ঘটিবার কারণ থাকে, তবে গবর্মেণ্ট আমাদের দোহাই মানিলেন না বলিয়াই আমরা নিজেরাও যথাসাধ্য প্রতিকার-চেষ্টা করিব না, ইহার অর্থ কী। আন্দোলন সভায় আমরা যে পরিমাণে স্বর চড়াইয়া কাঁদিয়াছিলাম, রং ফলাইয়া ভাবী সর্বনাশের ছবি আঁকিয়াছিলাম, আমাদের বর্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সেই পরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে ?···"

[গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৩য় খণ্ড ।। পৃঃ ৬৪৭]

বিলটির সমালোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে, দেশের বিচার দুর্মূল্য, অন্ন দুর্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্মূল্য হয়, তবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে।

"·· বিলাতি লাট আজকাল বলিতেছেন, যাহার টাকা নাই, ক্ষমতা নাই, তাহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত লোভ করিবার দরকার কী ? আমাদের কানে এই কথাটা অত্যন্ত বিদেশী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া ঠেকে।" তিনি আরও বলিলেন,

"…তাই বলিয়া বসিয়া বসিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবে না। আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি তাহারই জন্য আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে সমাজের ব্যবস্থা ছিল—রাজার উপরে, বাহিরের সাহায্যের উপরে ইহার নির্ভর ছিল না—সমাজ ইহাকে রক্ষা করিয়াছে এবং সমাজকে ইহা রক্ষা করিয়াছে।

"সর্বাপেক্ষা এই জন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে—নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যামন্দিরে কেম্‌ব্রিজ-অক্‌স-ফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজ সরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে, ধনীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও লক্ষিত হইবে, কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন,…দূর হইতে ভিক্ষুক বিদায় করিবেন না।

"…এ স্থলে আমাদের একমাত্র কর্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া; আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মতো যে-সকল প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশের ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ দেওয়া।…"

[য়ুনিভার্সিটি বিল—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৩য় খণ্ড ।। পৃঃ ৫৯৬-৯৯]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ সরকারের সহিত সংস্রবহীন স্বাধীন জাতীয় বিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষার কথা উত্থাপন করিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবর্গ তখনও স্বাধীন জাতীয় শিক্ষার কথা ভাবিতেছেন না ; তাঁহারা বিলটিরই কেবল সংশোধনের দাবি জানাইলেন। যদিও ১৯০৩ সালে (ডিসেম্বর) মাদ্রাজ-কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে লালমোহন ঘোষ য়ুনিভার্সিটি বিলের সমালোচনা করিয়া উহার সংস্কার দাবি করেন, তাহাতে অন্য সুরও শুনা যায়। তিনি বলেন,

"…With his Lordship's Tory and aristocratic ideas, he wanted to make our educational institutions approach as nearly as possible the standard of Eton and Oxford. It was naturally difficult for him to understand why poor men (such as the majority of our middle classes happen to be) should be anxious to receive a sort of education which poor people's children in England do not aspire to receive."

তিনি আরও বলিলেন,

"…Subject to your approval, I desire to lay down the following principles : Firstly, the education of the people should be as much as possible in the hands of the people ;

secondly, the popular control over our educational institutions should not be lightly interfered with until it has been plainly shewn that popular control has been found altogether a failure.…

"…We want as little Government control as possible. We do not want difficulties to be put in the way of our poorer students.…We do not want our indigenous colleges to be harassed by undue interference.…we do not want aristocratic standard of Eton and Oxford to be established in this poor country."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. pp. 649-52]

এই সময় দীনেশচন্দ্র সেন সখারাম দেউস্করের 'দেশের কথা' পুস্তকের সমালোচনা করিয়া বঙ্গদর্শনের জন্য উহা রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তক এবং উহার সমালোচনা পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে প্যাট্রিয়টিজম্ ও দেশের রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি গভীর প্রশ্ন দেখা দেয়। বঙ্গদর্শনে 'দেশের কথা' নামক একটি প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১৩১১, শ্রাবণ) তিনি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া বলিলেন,

"…প্যাট্রিয়টিজমের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে। জিনিসটা বিদেশী, নামটাও বিদেশী থাকিলে ক্ষতি নাই। যদি কোনো বাংলা শব্দই চালাইতে হয়, তবে 'স্বাদেশিকতা' কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

"স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের ঊর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না সেইখানেই ধর্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয় তাহাই প্যাট্রিয়টিজম্ শব্দের বাচ্য হইয়াছে।"

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের ন্যাশনালিজম্ ও প্যাট্রিয়টিজমের প্রকৃত তাৎপর্যটি রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে যেভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিলেন, সমকালীন ভারতবর্ষে এমনটি আর কাহাকেও করিতে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এখানে নূতন কথা কিছু বলিতেছেন না; এইরূপ কথা তিনি অনেক দিন আগে হইতেই 'বিরোধমূলক আদর্শ', 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং সাধনা, ভারতী ও বঙ্গদর্শনের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে বলিয়া আসিতেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সেই তীব্র স্বাদেশিক উন্মাদনায় পাছে আমরা ইউরোপের এই ন্যাশনালিজম ও প্যাট্রিয়টিজমের আদর্শ পূজা করি,—ইহাই রবীন্দ্রনাথের

উদ্বেগ ও আশঙ্কা। বারবার তিনি দেশকে নানাভাবে নানা তত্ত্ব ও তথ্যাদি দ্বারা এবং বহু পত্র-পত্রিকা ও মনীষীর রচনা উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতে চাহিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি আরও বলিলেন,

"...এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য প্রয়োজনে যাহা আমাকে লইতেই হইবে, তাহার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মুগ্ধভাব থাকা কিছু নয়। একথা যেন মনে না করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে—মনুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব সুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার প্রমাণ, বোয়ার যুদ্ধে ইংরেজের তরফের রসদের মধ্যে রাশিরাশি ভেজাল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও সেইরূপ দেখা গেছে। মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না।..."

লক্ষ্য করিবার বিষয়, তখনও পর্যন্ত তিনি 'ধর্ম' ও 'মনুষ্যত্ব'কে ন্যাশনালত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বড়ো করিয়া দেখিবার আহ্বান জানাইতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মত পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদেরও একটি প্রগতিশীল এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে,—বিশেষ করিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না সে-দেশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নাগপাশ-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাতীয় ঐক্যকে সংহত ও দৃঢ়তর করে। রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিজম, প্যাট্রিয়টিজম্ বা স্বাদেশিকতার এই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করিতেছেন না; পরন্তু তিনি উহাকে একান্তই ভারতীয় ঐতিহ্য-সাধনায় গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইতেছেন। তাই ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলিলেন,

"যাহা হউক, আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্যপদার্থটি, যে প্রাণপদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে, আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। এ কার্যে স্বদেশের দিকে আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই—যাহা শিক্ষা ও অবস্থার গুণে অন্যদিকে ধাবিত হইয়াছে তাহাকে ঘরের দিকে ফিরাইতে হইবে।..."

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই যথার্থ স্বাদেশিক সাধনায় ইউরোপের গণতন্ত্র ও পার্লামেণ্টারী রাজনীতির কোন স্থান নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—রবীন্দ্রনাথ সেই সময় বিখ্যাত ভ্রমণকারী Sven Hedin-এর একটা রচনা পড়িয়া ইংরাজদের তিব্বত অভিযান সম্পর্কে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য জানিতে পারেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি তাহা উদ্ধৃত করিয়া ইংরাজ-সাম্রাজ্যনীতি সম্পর্কে দেশকে আরো সচেতন করিয়া দিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন,

"ইংরেজ কখনোই একথা ভাবে না যে, পৃথিবীতে ফরাসী সভ্যতার একটা উপকারিতা আছে, অতএব সে সভ্যতায় আঘাত করিলে সমস্ত মানবের সুতরাং আমাদেরও ক্ষতি। নিজের পেট ভরাইবার জন্য আবশ্যক হইলে ফরাসীকে সে বটিকার মত গিলিয়া ফেলিতে পারে।...এস্থলে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এশিয়া-আফ্রিকার ডালপালা সমস্ত মুড়াইয়া খাইলে কোন দোষ দেখি না। অতএব তিব্বতে শান্তিদূত প্রেরণের ব্যবস্থাকালে কপোলযুগল রক্তিম বর্ণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।...

"বিখ্যাত ভ্রমণকারী Sven Hedin-এর নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইংরেজের তিব্বত-আক্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন:

"The English campaign in Tibet is a fresh proof of the Imperialist brutality which seems to characterise the political tendencies of our times, and in face of which the position of the smaller states appears precarious. A small state which does not possess the power to defend itself is doomed to decay, whether it is Christian or not. If our priests taught the people the meaning of the words 'Love thy neighbours as thyself,' 'Thou shalt not steal,' 'Thou shalt do no murder,' 'Peace on earth and good will towards men', instead of losing themselves and their hearers in unfathomable and completely useless dogmas, such an injustice as the present one would be impossible. But probably such really Christian feelings are nonsense in modern policy. And the same Christians send our missionaries to Japan. In the name of truth one ought to protect the Asiatics from such Christianity."

[দেশের কথা—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৬১৯-২৩]

অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' মিনার্ভা

রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করিলেন (৭ই শ্রাবণ, ১৩১১)। সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। সভায় এমন ভীষণ ভিড় হয় যে শেষ পর্যন্ত ঘোড়সওয়ার পুলিসকে ভিড় সামলাইতে হয়। পরে, ঐ প্রবন্ধটি পরিবর্ধিত আকারে ১৬ই শ্রাবণ কার্জন রঙ্গমঞ্চে পুনঃ পঠিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়ে বাংলাদেশে জলকষ্ট দেখা দেয়, তাহার নিবারণ সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

দেশের লোক জলকষ্ট নিবারণের জন্য বা অন্যান্য গ্রাম-সংস্কার ও লোকহিতকর কার্যের জন্য অসহায়ভাবে ইংরাজ সরকারের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন বা আবেদন-নিবেদন ও 'অ্যাজিটেশন্' করিবেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা আদৌ সহ্য বা সমর্থন করিতে পারেন নাই।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তব্যই হইতেছে যে, পূর্বে এই সব লোকহিতকর কায আমাদের সমাজই গ্রহণ করিয়া আসিত তাহা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী ছিল না। তিনি বলিলেন,

"...ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আসিবার পূর্বে আমাদের জলপিপাসা ছিল এবং এতকাল তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালোরূপেই হইয়া আসিয়াছে...।

"আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিয়া দিতে পারে নাই...।

"দেশে এই সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহতভাবে সমস্ত ধনিদরিদ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে...।

"ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার।...বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।...

"বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন—তাহারা কর্তব্যভারে আক্রান্ত নহে—তাহাদের সমস্ত বড়ো বড়ো কর্তব্যভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্যদ্বারা আবদ্ধ।...

"...বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত

হয়।…আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়।…

"আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভুক্ত স্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি।…ইহাই বিপদ, জলকষ্ট বিপদ নহে।"

লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক 'রাষ্ট্রে'র ভূমিকাটি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক এশিয়াটিক সমাজের সহিত আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের তুলনা করিবার প্রশ্নে যে বৈজ্ঞানিক সমাজচেতনার আবশ্যক হয় রবীন্দ্রনাথের (বা সমকালীন ভারতবর্ষে) তাহা ছিল না। অবশ্য ইংরাজ সরকারের 'রাষ্ট্র' হইতে বিশেষ কিছু আশা করাই ভুল। কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে দেশবাসীকে ক্রমশই এই রাষ্ট্রের ভূমিকাটি সম্পর্কে সচেতন করিতেছিলেন। সেই হিসাবে কংগ্রেসের একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। কিন্তু ইংরাজ-শাসিত রাষ্ট্র সম্পর্কে অতিমাত্রায় আশা পোষণ করাই ছিল কংগ্রেসী নেতৃত্বের প্রধান বিচ্যুতি। রবীন্দ্রনাথ তাহার পরিবর্তে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি 'স্বদেশী সমাজে'র মাধ্যমে দেশবাসীর স্বাদেশিকতা ও সমাজবোধকে জাগ্রত কবিবার আহ্বান জানাইলেন। সেই সমাজে জনহিতকর ও সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজগুলি দেশবাসীকেই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য। তিনি জাতির আত্মশক্তি ও জনশক্তির উপর বারবার গুরুত্ব আরোপ করিলেন।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের তৎকালীন সভা-সম্মেলনগুলির কর্মসূচীর উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তৎপরিবর্তে তিনি দেশের মেলাগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করিবার আহ্বান জানাইলেন,

"পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া কেবল বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

"…প্রোভিনশ্যাল কনফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কি করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরনের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূরদূরান্ত হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন-গায়ক ও

যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিকলণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।"

ইহার স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়া তিনি বলিলেন,

"আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়।···

"এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়া আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে।···

"বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানা স্থানে বৎসরে নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে—প্রথমত, মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। তাহার পরে এই মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথাযথভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ আমরা যেন অবলম্বন করি।

"প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।"

সে-যুগের কংগ্রেস ও তাহার সভাসম্মেলনগুলির সহিত বিন্দুমাত্র জন-সংযোগ ছিল না। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, উচ্চপদস্থ কিংবা অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ানগণ, উকিল-ব্যারিস্টার-ডাক্তার—ইহারাই তখন কংগ্রেসে ভিড় করিতেন, এমন কি নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও তখনও পর্যন্ত কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। দেশের গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট প্রভৃতি সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবর্গ ছিলেন উদাসীন। কংগ্রেসের এই জনসংযোগহীনতা—গ্রাম-সমস্যা ও লোকসংস্কৃতি

সম্পর্কে তাঁহাদের এই ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত পীড়িত ও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিল। সম্ভবত সেই কারণেই তাঁহার এই 'রাজনীতি'-বিমুখতা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক রাজনৈতিক দল আমাদের দেশে পূর্বে ছিল না—কংগ্রেসের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম সারা ভারত-ভিত্তিতে এই রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। প্রথম যুগে কংগ্রেস বা এই জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচী যতই ত্রুটিপূর্ণ হউক, তা সত্ত্বেও তৎকালীন দেশের অবস্থায় সেই সকল দলের যে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল রবীন্দ্রনাথ তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাও স্মরণীয় যে, তিনিই সর্বপ্রথম দেশের মেলাগুলির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য সম্পর্কে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। দেশের অবলুপ্তপ্রায় লোক-সংস্কৃতিগুলির সম্পর্কে তিনিই সর্বপ্রথম দেশবাসীকে অবহিত করিতে চাহিলেন, উহাদের সংরক্ষণের দাবি জানাইলেন। আমাদের স্বাদেশিক সাধনার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, লক্ষণীয়, এই প্রবন্ধে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নে তিনি কল-কারখানার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন,

"...একটা ছোট পল্লীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি—কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়—দেশকে আমরা কখনই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না—এইজন্য অব্যবহিতভাবে দেশের কাজ করা যায় না, কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল-জিনিসটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানা-ঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইনকানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

"কথাটা অসংগত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশী হউক না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ-কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না—যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না।..."

যন্ত্র-সভ্যতা মানুষের মধ্যে হৃদয়হীন যান্ত্রিক-সম্পর্ক সৃষ্টি করিতেছে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভয়। এবং সেই কারণেই আধুনিক কলকারখানা বা শিল্প-সভ্যতাকে গ্রহণ করিবার প্রশ্নে তখনও তাঁহার মনে কিছুটা দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলিতেছে।

চতুর্থত, রবীন্দ্রনাথ দেশে আদর্শ সমাজপতি বা নেতার আহ্বান জানাইলেন,

"এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনিই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।...

"আমাদের প্রথম কাজ হইবে—যেমন করিয়া হউক, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারিদিকে একটা ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা।…"

[স্বদেশী সমাজ—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৩য় খণ্ড ।। পৃঃ ৫২৬-৪৩]

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি চারিদিক হইতে নানা সংশয় ও বিতর্ক তুলিল। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় বলাইচাঁদ গোস্বামী হিন্দু-সমাজের পক্ষ হইতে ঐ প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। রবীন্দ্রনাথ উহার জবাবে 'স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' নামক প্রবন্ধটি লিখিলেন (বঙ্গদর্শন, ১৩১১ আশ্বিন)। ঐ প্রবন্ধে তিনি তাঁহার বক্তব্যকে আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিলেন,

"…আমি এ-কথা বলিতেছি না যে, আমার মতেই সমাজ গঠন করিতে হইবে। আমি বলিতেছি, আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে-কোনো উপায়ে সেই কর্তৃত্বলাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার সেই স্বকৃত মীমাংসা কখন কিরূপ হইবে আমি তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারি না। অতএব প্রসঙ্গক্রমে আমি দু-চারিটা কথা যাহা বলিয়াছি, অতিশয় সূক্ষ্মভাবে তাহার বিচার করিতে বসা মিথ্যা।…" [রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৩য় খণ্ড ।। পৃঃ ৫৫-৫৮]

রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনায় তাঁহার ছেলেবেলাকার হিন্দুমেলার স্মৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যাহা হউক, এই স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ব্রিটিশ রাজত্বের অভ্যন্তরেই আর একটি 'পাল্টা সরকার' না হইলেও, একটি 'স্বয়ংসম্পূর্ণ পাল্টা সমাজনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা'র পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন,

"রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, নিজ জমিদারীতে পর্যন্ত ইহার পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের কাজ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত খসড়া তালিকা এই সময় মুদ্রিত হয়।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ১১৪]

স্বদেশী সমাজের সদস্যদের জন্য প্রতিজ্ঞাপত্রের ভূমিকাটি এইরূপ ছিল :

" স্বদেশী সমাজ

[পাঠক দয়া করিয়া নিজের অভিপ্রায়মত এই নিয়মাবলীর পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করিয়া জোড়াসাঁকোয় ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ইহা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ্য

নহে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁহারা এই কার্যে যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা এই সঙ্গে পাঠাইলে বাধিত হইব।]

আমরা স্থির করিয়াছি আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব।

আমাদের নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাব মোচন ও কর্তব্যসাধন আমরা নিজেরা করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দণ্ড স্বীকার করিব।

সমাজের অধিনায়ক ও তাঁহার সহায়কারী সচিবগণকে তাঁহাদের সমাজ-নির্দিষ্ট অধিকার অনুসারে নির্বিচারে যথাযোগ্য সম্মান করিব।

বাঙালি মাত্রেই এ সমাজে যোগ দিতে পারিবেন।

সাধারণত ২১ বৎসর বয়সের নীচে কাহাকেও গ্রহণ করা হইবে না।

এ সভার সভ্যগণের নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মতি থাকা আবশ্যক :

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনো প্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গবর্মেণ্টের শরণাপন্ন হইব না।

২। ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিব না।

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালিকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না।

৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজি খানা, ইংরেজি সাজ, ইংরেজি বাদ্য, মদ্যসেবন, এবং আড়ম্বরের উদ্দেশ্যে ইংরেজ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ নিমন্ত্রণ করি তবে তাহাকে বাংলা রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশ-চালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনো প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজ-নির্দিষ্ট বিচারব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশীয় দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

৮। পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজের বা সামাজিকের নিন্দাজনক কোনো কথা বলিব না।"

[পরিশিষ্ট—রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ॥ পৃঃ ৪৮২-৮৪]

ইহার পর উক্ত প্রচার-পুস্তিকায় স্বদেশী সমাজের সামাজিক ব্যবহার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কলাবিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছিল।

পরবর্তীকালে ১৯২০ সালে গান্ধীজী পরিকল্পিত অসহযোগ-আন্দোলনের মূল চরিত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অথচ রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মৌলিকত্ব সম্পর্কে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে কোথাও অকপট স্বীকৃতি দিতে দেখি না। চিরদিনই তিনি শুধু কবি ও কল্পনাবিলাসী হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়া আসিয়াছেন।

স্বাদেশিকতাবোধকে তীব্র করিবার জন্য এই সময় কলিকাতায় 'বীরপূজা' ও 'শিবাজী উৎসবে'র প্রবর্তন হয়। প্রায় সাত বৎসব পূর্বে মহারাষ্ট্রে তিলকের নেতৃত্বে এই শিবাজী উৎসব প্রচলিত হয়—পূর্বেই সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতায় শিবাজী উৎসবের প্রচলন সম্পর্কে প্রফুল্লকুমার সরকার লিখিতেছেন,

"১৯০৪ সালের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা কলিকাতায় 'শিবাজী উৎসব'। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নব জাতীয়তাবাদীদের উদ্যোগে এই শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্র-নেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য পুনা হইতে কলিকাতায় আসেন। এই শিবাজী উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল শক্তিরূপিণী ভবানীর পূজা।···এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী উৎসব' পাঠ করেন।···"

[জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ।। পৃঃ ৪৪]

বাংলাদেশে শিবাজী উৎসবের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। এই সময় তিনি 'শিবাজী দীক্ষা' নামে একটি পুস্তক লিখেন; রবীন্দ্রনাথ উহার ভূমিকা-স্বরূপ 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং উহাই তিনি টাউন হলের উৎসবে পাঠ করিয়াছিলেন। এই কবিতায় তিনি শিবাজীকে শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর অধিনায়করূপেই দেখেন নাই, তিনি দেখিয়াছেন,

"তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
'এক ধর্মরাজ্য'-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

'এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি' এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছে। নতুবা শিবাজী উৎসবের অন্য কোনো তাৎপর্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত বলিয়া মনে হয় না।

ভারতের জাতীয় ঐক্য বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিবে, ইহাই কবির তৎকালীন ধারণা। এই এক ধর্মরাজ্যে যে, মুসলমান ও ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের গৌরববোধ করিবার কিংবা মিলিত হইবার কোনোই সম্ভাবনা নাই—রবীন্দ্রনাথ সেকথা তখনও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের যুগ হইতে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আস্তে আস্তে আমাদের দেশে পরিপুষ্ট হইতেছিল, ক্রমশই তাহা উগ্রপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথও সে প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। তবে একথাও ঠিক, রবীন্দ্রনাথের হিন্দু-জাতীয়তাবাদ উহা হইতে ভিন্ন ধরনের। তাঁহার হিন্দু-জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল এক মহান মানবতা ও ন্যায়নীতির উপর। লক্ষ্য করিবার বিষয়, উগ্রপন্থীদের মত অশ্বপৃষ্ঠারোহী উদ্যত তরবারি হস্তে শৌর্য-বীর্যের প্রতীক কোনো শিবাজীর মূর্তি তিনি পূজা করিলেন না। তিনি বলিলেন,

"সেদিন শুনি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন—
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারত' এ মহাবচন
করিব সম্বল ॥"

শিবাজী উৎসবে ইহাই রবীন্দ্রনাথের মূল আকর্ষণ। তাই দেখিতে পাই, ইহার কিছুকাল পরে শিবাজী উৎসবের সহিত যখন 'ভবানীপূজা' সংযুক্ত হয়, তখন সেই ভবানীপূজার সহিত তাঁহার কোনো সংস্রব ছিল না।

সফলতার সদুপায়

য়ুনিভার্সিটি আইন পাস হইয়া গিয়াছে, বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব লইয়া দেশে তখন তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এমন সময় কার্জন-সরকার ভাষা-বিচ্ছেদ পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইলেন—ভারত সরকার বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন (১১ই মার্চ, ১৯০৪)।

তখন গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা যে ভাষার মাধ্যমে প্রচলিত ছিল, তাহা ছিল অত্যন্ত দুরূহ সংস্কৃতায়িত। সেই কারণে উহার সংস্কারের প্রশ্ন উঠে। সরকার এই উদ্দেশ্যে একটি তদন্ত-কমিটি বসাইলেন। কমিটিতে ছিলেন চারজন ইংরাজ এবং ভারতীয়দের পক্ষ হইতে কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত। এই তদন্ত-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে বাংলাদেশে তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল। কলিকাতায় জেনারেল এ্যাসেমব্লি হলে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে প্রতিবাদ-সভা হয় (১৩১১, ফাল্গুন ২৭) তাহাতে রবীন্দ্রনাথ 'সুফলতার সদুপায়' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। কমিটির প্রস্তাবের সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিলেন,

"দশম প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন—বাংলা নিম্ন প্রাইমারী স্কুলের প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলির অধিকাংশ ন্যূনাধিক সংস্কৃতায়িত (Sanscritized) ভাষায় লেখা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে এমন সকল পরিভাষা থাকে যাহা পল্লীবাসীরা বোঝে না। অতএব, এই-স্কুলের উপযুক্ত আদর্শপাঠ্যগ্রন্থ তৈরি করিবার জন্য কয়েকটি বিচক্ষণ কর্মচারী লইয়া একটি বিশেষ সমিতি স্থাপিত হউক। বইগুলি প্রথমে ইংরেজিতে লেখা হইবে, তাহার পরে সরকার মঞ্জুর করিলে কমিশনার-সাহেব ও স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বইগুলিকে স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় (local vernaculars) তর্জমা করিবার জন্য লোক নির্বাচিত করিবেন।...

"একাদশ প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন—ইংরেজি আদর্শপাঠ্যপুস্তকগুলি যথেষ্ট পরিমাণ স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় তর্জমা হওয়াটাকে কমিটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। যথা, তাঁহাদের বিবেচনায় বেহারে অন্তত তিন উপভাষায় তর্জমা হওয়া চাই, ত্রিহুতি, ভোজপুরি এবং মৈথিলি; এবং বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে উত্তর, পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিম ভাষায় তর্জমা হওয়া উচিত হইবে।..."

এই আপাতসুন্দর কথাগুলির পিছনে মূল ভাষাগুলিকে দুর্বল করিবার যে অভিসন্ধি ছিল, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"বোঝা যাইতেছে, কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে আমাদের দেশটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াটা একটা matter of great importance হইয়া উঠিয়াছে।...

"কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, আমরা নিতান্তই চাষীদের উপকার করিতে চাই। হয়তো চান...সে কথাটা বিশ্বাস করা সহজ হইত, যদি দেখিতাম কর্তৃপক্ষের স্বদেশেও তাঁহাদের স্বজাতীয় চাষীদের এই প্রণালীতে উপকার করা হইয়া থাকে।

"ইংরেজের দেশেও চাষা যথেষ্ট আছে এবং সেখানে যে ভাষায় পাঠ্যগ্রন্থ লেখা হয়, তাহা সকল চাষার মধ্যে প্রচলিত নহে।...ল্যাংকাশিয়রের উপভাষায় ল্যাংকাশিয়রের চাষীদের বিশেষ উপকারের জন্য পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়ন হইতেছে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডে চাষীদের শিক্ষা সুগম করা যদিও নিশ্চয়ই matter of great importance, তথাপি ইংলণ্ডের সর্বত্র ইংরেজিভাষার ঐক্য রক্ষা করা matter of great importance। কিন্তু সে দেশে চাষীদের উপকার ও ভাষার অখণ্ডতা রক্ষা উভয়ই এক স্বার্থের অন্তর্গত, এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষভেদ নাই—সুতরাং সেখানে ভাষাকে চার টুকরা করিয়া চাষীদের কিঞ্চিৎ ক্লেশলাঘব করার কল্পনামাত্রও কোনো পাচজন বুদ্ধিমানের একত্রসম্মিলিত মাথার মধ্যে উদয় হইতে পারে না।...জনসাধারণের শিক্ষার উপসর্গ লইয়াই হউক বা যে উপলক্ষেই হউক, দেশের উপভাষার অনৈক্যকে প্রণালীবদ্ধ উপায়ে ক্রমশ পাকা করিয়া তুলিলে তাতে দেশের সাধারণ মঙ্গলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা নিশ্চয়ই আমাদের পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষেরা, এমন-কি, তাঁহাদের বিশ্বস্ত বাঙালী সদস্য, আমাদের চেয়ে বরঞ্চ ভালোই বোঝেন।"

বাংলা সাহিত্যের ভাষা বড়ই বেশী সংস্কৃতায়িত, এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষ উহাকে গ্রামাঞ্চল হইতে নির্বাসিত করিবার মতলব করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই যুক্তি খণ্ডন করিতে গিয়া বলিলেন,

"...পুরাণপাঠ, কীর্তন, পৌরাণিক যাত্রা, কথকতা, তরজা, কবির লড়াই প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের সাধারণ লোকের উপদেশ ও আমোদের উপকরণ, সমস্তই স্বভাবতই সংস্কৃতকথাকে দেশের সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত দেশের সাধারণের এই জ্ঞানসম্বন্ধের ভাবসম্বন্ধের পথ চিরদিন অবারিত আছে।...সেই ভাষার সহিত নিম্ন-সাধারণের চিত্তের যোগ কৃত্রিম বাধার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, এ কথা বলিলে অবশ্য আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে—কিন্তু চাষাদের মঙ্গলের পক্ষেও

ইহা প্রয়োজনীয়, এ কথা স্বয়ং কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় বলিলেও বিশ্বাস করিব না।”

ভাষার প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল, বিশেষ করিয়া আসামের ক্ষেত্রে এবং বাংলা-বিহারের উপজাতি-এলাকাগুলির ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সে-যুগে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ দেশের অন্যান্য নেতৃবর্গের মত জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নটিই বড়ো করিয়া দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন, বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার ভাষাকে উপলক্ষ করিয়া কর্তৃপক্ষ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের একটি বিচ্ছেদ ও ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া করিবার অভিসন্ধি করিতেছেন!

কিছুদিন আগে লর্ড কার্জন ভারতবাসীকে নিঃশঙ্কচিত্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জবাবে কার্জনকে এবং সাম্রাজ্যবাদকে তীব্র বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,

“…সর্বনাশ! আমাদের প্রতি এ কিরূপ ব্যবহার! এ যে একেবারে প্রণয়-সম্ভাষণের মত শুনাইতেছে!…আমরা অস্ট্রেলিয়ায় তাড়িত, নাটালে লাঞ্ছিত, স্বদেশেও কর্তৃত্ব-অধিকার হইতে কতদিকেই বঞ্চিত, এমন স্থলে ইম্পীরিয়ল বাসর-ঘরে আমাদিগকে কোন্ কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইতেছে!”

রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বলির ছাগশিশুর সহিত তুলনা করিয়া বলিলেন,

“হায়, অন্যের যোগ দেওয়া এবং তাহার যোগ দেওয়াতে যে কত প্রভেদ, তাহা যে সে এক মুহূর্তও ভুলিতে পারিতেছে না। যজ্ঞে আত্মবিসর্জন দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকারই যে তাহার নাই।…ইম্পীরিয়লতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ জোগানো; সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর জোগান দেওয়া। বড়োয়-ছোটোয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।”

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, ইহার কারণ—আমরা সত্যই দুর্বল, আমরা পরনির্ভরশীল, আমরা আত্মশক্তিহীন। য়ুনিভার্সিটি আইন, বঙ্গ-বিভাগ, ভাষা-বিচ্ছেদ—ইংরাজ সরকারের প্রত্যেকটি আঘাত বারবার অঙ্গুলি-সংকেত করিয়া আমাদের এই দুর্বলতার দিকটি পরিষ্কারভাবে দেখাইয়া দিতেছে। তাই তিনি বলিলেন,

“আমি পুনরায় বলিতেছি, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।·অতএব সর্বপ্রযত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্মক্ষেত্র গড়িয়া

তুলিতে হইবে যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্তকার্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গলকর্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন।···

"···দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরী, যথার্থ প্রীতির চিহ্ন নহে; তাহাকে যথার্থ বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না, কারণ এরূপ চেষ্টা কোনো মতেই সফল হইবার নহে।

"এমন একটা স্থান করিতে হইবে যেখানে দেশ জিনিসটা যে কী তাহা ভূরি-পরিমাণে মুখের কথায় বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে হইবে না—যেখানে সেবাসূত্রে দেশের ছোটো-বড়ো, দেশের পণ্ডিত-মূর্খ সকলের মিলন ঘটিবে।

"দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একস্থানে সংহত করিবার জন্য, কর্তব্যবুদ্ধি এক-স্থানে আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি যে একটি স্বদেশী সংসদ গঠিত করিবার প্রস্তাব করিতেছি তাহা যে একদিনেই হইবে, কথাটা পাড়িবামাত্রই অমনি যে দেশের চারিদিক হইতে সকলে সমাজের এক পতাকার তলে সমবেত হইবে, এমন আমি আশা করি না। · কিন্তু এক জায়গায় এক হইবার চেষ্টা, যত ক্ষুদ্র আকারে হউক, আরম্ভ করিতে হইবে।··"

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে আরো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা কবিলেন। উপসংহারে তিনি দেশের যুবকদের আহ্বান করিয়া বলিলেন,

"···এই দুর্ভাগ্য দেশের বিনা পুরস্কারের কর্মে দুর্গম পথে যাত্রা আরম্ভ কবিতে কে কে প্রস্তুত আছ, আমি সেই বীর যুবকদিগকে অদ্য আহ্বান করিতেছি—রাজদ্বারের অভিমুখে নয়, পুরাতন যুগের তপঃসঞ্চিত ভারতের স্বকীয় শক্তি যে খনির মধ্যে নিহিত আছে, সেই খনির সন্ধানে। কিন্তু খনি আমাদের দেশের মর্মস্থানেই আছে—যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি তাহাদেরই নির্বাক হৃদয়ের গোপন স্তরের মধ্যে আছে।"

[সফলতার সদুপায়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৩য় খণ্ড ।। পৃঃ ৬৪৪-৪৭ ও ৫৭-৬৮]

এই ধরনের চিন্তা সে যুগের কোনো কংগ্রেস নেতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সে যুগের রাজনৈতিক সংগ্রামগুলির—বিশেষ করিয়া বঙ্গবিভাগ-আন্দোলনের মত প্রতিরোধ সংগ্রামগুলির যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কবি তাহা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ যে এই সকল আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তাহা নহে। বরঞ্চ বহু আন্দোলন তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসল কথাটা হইতেছে—এইসব আন্দোলনের কোনো স্থায়ী

ফলপ্রসূ ক্ষমতা বা কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না। এইজন্যই তিনি স্থায়ী গঠনমূলক কাজে আত্মশক্তি অর্জন করিবার আহ্বান জানাইলেন। এবং তাহাই হইতেছে 'স্বদেশী সমাজ'। এই স্বদেশী সমাজ পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণ কল্পনাবিলাস বা Utopian, এমন মনে করিবার কোনো কারণ নাই। বহু দেশে এইরূপ গঠনমূলক আদর্শ সমাজ মুক্তি-সংগ্রামের সাথে সাথেই অগ্রসর হইয়াছে। ইতিহাসে তাহার নজির আছে। চীনের 'আঞ্চলিক সরকার' তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গান্ধীজী যে পরবর্তীকালে আদর্শ গ্রামগুলি সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাহার মূলকথা রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত স্বদেশী সমাজের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু আসল কথা হইল, রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামকে বাদ দিয়া যে এইসব আদর্শ স্বদেশী সমাজের স্বতন্ত্র কোনো ক্ষমতা বা ভূমিকা নাই এবং বাস্তবত উহা সম্ভবও নহে, ইহা রবীন্দ্রনাথ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এবং জনগণের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করিলেও, জনসাধারণের শক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিলেও তিনি ঠিক গণসংগ্রামে (mass struggle) বিশ্বাস করিতেন না। যথাসময়েই আমরা এই আলোচনায় আসিব।

এই প্রবন্ধ পাঠের কিছুদিন পর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে এণ্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষার্থী ছাত্রদের অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য একটি ছাত্র-সভা আহ্বান করা হয় (১৭ চৈত্র, ১৩১১)। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের গবেষণামূলক কার্যে ছাত্রসমাজকে সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা করিবার আহ্বান জানাইলেন। ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,

"পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে—সেইজন্যই বঙ্গ-বাণীর হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

"কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে।

"অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ···।

"এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কী করিলে বিদেশী-চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষা কার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুঁথির গণ্ডির বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।"

দেশের শিক্ষাবিধির মারাত্মক ত্রুটিগুলি সম্পর্কে এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এ সম্পর্কে জাতীয় নেতৃবৃন্দের তখনও কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না এবং এইরূপ সতর্ক-সজাগ দৃষ্টিও তাঁহাদের কাহারও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-পরিষৎকে আবেদন জানাইয়া বলিলেন,

"বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা সাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার আবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চার অঙ্গ।"

পরিশেষে আবেগরুদ্ধকণ্ঠে তিনি ছাত্রসমাজকে আহ্বান জানাইলেন,

"···তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এপর্যন্ত কেহ তো সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই ;···আর আজ সাহিত্য-পরিষৎ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে···সাহিত্য-পরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি—দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষি-কুটিরে পরিষৎ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোকে কোনো দিন বিস্ময় দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহনখ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই—কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিসমাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার তবে মাতার নিভৃত-অন্তঃপুরচারী এই-সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে খ্যাতি-বিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো।···"

[ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৩য় খণ্ড ।। পৃঃ ৫৮৩-৯২]

ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্

ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত 'ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্' প্রবন্ধটি (ভারতী, ১৩১২, বৈশাখ) লিখিলেন। কিছুদিন পূর্বে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষীয়দের 'ব্রিটিশ এম্পায়ারে'র মধ্যে একাত্ম হইয়া মিশিয়া যাইবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্ প্রবন্ধে তিনি সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপটি ভালো করিয়া উদ্‌ঘাটন করিয়া দেশবাসীকে এই সম্পর্কে আর একবার সতর্ক করিয়া দিলেন। তিনি প্রবন্ধের শুরুতেই বলিলেন,

"বিলাতে ইম্পীরিয়লিজ্‌মের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীন দেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সেদেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন।···দেখা যাইতেছে, এইরূপ বড়ো বড়ো মতলব পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক লোকে মনে মনে আঁটিয়াছে। এ-সকল মতলব টেঁকে না ; কিন্তু নষ্ট হইবার পূর্বে পৃথিবীতে কিছু অমঙ্গল না সাধিয়া যায় না।

"তাঁহাদের দেশের এই খেয়ালের ঢেউ লর্ড কার্জনের মনের মধ্যেও যে তোলপাড় করিতেছে সেদিনকার এক অলক্ষণে বক্তৃতায় তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন। দেখিয়াছি, আমাদের দেশের কোনো কোনো খবরের কাগজ কখনও কখনও এই বিষয়টাতে একটু উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বেশ কথা, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ 'এম্পায়ারে' একাত্ম হইবার অধিকার দাও না।"

ব্রিটিশ ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্ বা ইংরাজ-সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে দেশের কোনো কোনো মহলের এই ধরনের মারাত্মক অসতর্ক মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ শংকিত হইয়া উঠিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি সাম্রাজ্যবাদের জগৎ-জোড়া রূপটি আর একবার পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন,

"যাঁহারা ইম্পীরিয়লিজ্‌মের খেয়ালে আছেন তাঁহারা দুর্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর নানা দিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।

"রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড-পোল্যাণ্ডকে নিজের বিপুল কলেবরের সহিত একেবারে বেমালুম মিশাইয়া লইবার জন্য যে কী পর্যন্ত চাপ দিতেছে তাহা সকলেই জানেন।

এতদূর পর্যন্ত কখনোই সম্ভব হইত না যদি-না রাশিয়া মনে করিত, তাহার অধীন দেশের স্বাভাবিক বৈষম্যগুলি জবরদস্তির সহিত দূর করিয়া দেওয়াই ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌-নামক একটা সর্বাঙ্গীণ বৃহৎ স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থকে রাশিয়া পোল্যাণ্ড-ফিনল্যাণ্ডেরও স্বার্থ বলিয়া গণ্য করে।

"লর্ড কার্জনও সেইভাবেই বলিতেছেন, জাতীয়তার কথা ভুলিয়া এম্পায়ারের স্বার্থকে তোমাদের নিজের স্বার্থ করিয়া তোলো।

"কোনো শক্তিমানের কানে এ কথা বলিলে তাহার ভয় পাইবার কারণ নাই; কেননা, শুধু কথায় সে ভুলিবে না। বস্তুতই তাঁহার স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় সপ্রমাণ হওয়া চাই।···

'ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজ ক্রমাগতই তাহাদের কানে মন্ত্র আওড়াইতেছে, 'যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'; কিন্তু তাহারা শুধু মন্ত্রে ভুলিবার নয়—পণের টাকা গণিয়া দেখিতেছে। হতভাগ্য আমাদের বেলায় মন্ত্রেরও কোনো প্রয়োজন নাই, পণের কড়ি তো দূরে থাক।"

ভারতবর্ষের পক্ষে এই ব্রিটিশ এম্পায়ারে আত্মসমর্পণের প্রকৃত তাৎপর্যটি কী হইবে, সেই সম্পর্কে তিনি ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বলিলেন,

"···ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থ লাভ তখন সেই মহদুদ্দেশ্যে ইহাকে জাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই 'হিয়ুম্যানিটি'।

"ভারতবর্ষের কোনো স্থানে তাহার স্বাধীন শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া ইংরেজ-সভ্যনীতি অনুসারে নিশ্চয়ই লজ্জাকর; কিন্তু যদি মন্ত্র বলা যায় 'ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌'—তবে যাহা মনুষ্যত্বের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্রনীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গৌরব হইয়া উঠিতে পারে।

"নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কত বড়ো অধর্ম, কী প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই অধর্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড়ো বুলির ছায়া লইতে হয়।

"সেসিল রোড্‌স্‌ একজন ইম্পীরিয়ল্‌বায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন; সেইজন্য দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বোয়ারদের স্বাতন্ত্র্য লোপ করিবার জন্য তাঁহাদের দলের লোকের কিরূপ আগ্রহ ছিল তাহা সকলেই জানেন।"

ইম্পীরিয়লিজ্‌মের মূল বা সারকথা কি, এই প্রশ্নে তিনি বলিলেন,

"ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে-সকল কাজকে চৌর্য মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল খুন ডাকাতি নাম দেয়, একটা ইজ্‌ম্-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দে তাহাকে শোধন করিয়া কতদূর গৌরবের বিষয় করিয়া তোলে, বিলাতি ইতিহাসের মান্যব্যক্তিদের চরিত্র হইতে তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

"এইজন্য আমাদের কর্তাদের মুখ হইতে ইম্পীরিয়লিজ্‌মের আভাস পাইলে আমরা সুস্থির হইতে পারি না। এতবড়ো রথের চাকার তলে যদি আমাদের মর্মস্থান পিষ্ট হয় তবে ধর্মের দোহাই দিলে কাহারও কর্ণগোচর হইবে না।..."

[ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪৩১-৩৪]

রবীন্দ্রনাথের ভাষা—রাজনীতির ভাষা নহে। চিন্তা করিবার পদ্ধতিটিও (methodology) বৈজ্ঞানিক নহে। তবুও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁহার বিচারটি মূলত মোটামুটি যথার্থ হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্ সম্পর্কে, বিশেষত ব্রিটিশ এম্পায়ার সম্পর্কে, তখনও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের কোনো স্বচ্ছ বিচার-বিশ্লেষণ দেখিতে পাই না। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুরেন্দ্রনাথই ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯০২ সালে আমেদাবাদ-কংগ্রেসে 'The New Imperialism' সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

"Imperialism blocks the way. Imperialism is now the prevailing creed...British Imperialism does not, indeed, imply the extinction of British democracy. It means Self-Government for Great Britain and her colonies, autocracy for the rest of the British Empire...Let us not however speculate about the future. British Imperialism implies the closer union—the more intimate federation between the English-speaking subjects of His Majesty. We stand outside the pale of this federation. ...We are not permitted to enter the threshold of the Holy of Holies. We are privileged only to serve and to admire from a distance. As a part of the Empire, we sent out troops to South Africa, and they saved Natal. As a part of the Empire, we sent out troops to China, and our Indian soldiery planted imperial standard on the walls of Pekin. Our loyalty is admittedly so genuine, so deep and so intensely realistic that even the Secretary of State had no conception of it. All the same, we are not the children of the empire, entitled to its great constitutional privileges. We are Utilanders in the land of our birth, worse than helots in the British Colonies...

I would welcome an Imperialism which would draw us nearer to Britain by the ties of a common citizenship and which would enhance our self-respect, by making us feel that we are participators in the priceless heritage of British freedom.

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. pp. 612-13]

অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভারতবর্ষে যে মূর্তিতে ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌ আমাদের কাছে দেখা দিতেছে ইহাকে আমরা অভ্যর্থনা জানাইতে পারিব না, বরঞ্চ ইহা অপেক্ষা গ্লাডস্টোনের 'লিবারেলজিম' অনেক বেশী কাম্য।"

বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের মধ্যে কোথাও সাম্রাজ্যবাদের মূল চরিত্ররূপ সম্পর্কে সচেতনতার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। ভারতবর্ষ কমনওয়েলথভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রগুলির অনুরূপ কিছু সুযোগ-সুবিধা পাইলে বিনিময়ে তিনি ইংরাজের সাম্রাজ্যলুণ্ঠন-যুদ্ধে সৈন্যসংগ্রহ ও অন্যান্যভাবে ইংরাজকে সক্রিয় সমর্থন করিতেও প্রস্তুত আছেন। ইহারই প্রমাণ পাওয়া যায় অনতিকাল পরেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে কংগ্রেসের রাজনীতিতে। এই ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ কোথাও ঔপনিবেশিক শোষণকে, ইংরাজের সাম্রাজ্যলালসাকে ধিক্‌কৃত করিলেন না, পরাধীন দেশগুলির জন্য মুক্তি ও স্বাধীনতার দাবী জানাইলেন না। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সহিত কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরাট পার্থক্য।

।। দেশীয় রাজ্য এবং অবস্থা ও ব্যবস্থা ।।

এই বৎসরই আষাঢ় মাসে ত্রিপুরারাজ্যে আঞ্চলিক সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত হয়। এই উপলক্ষে আগরতলায় সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় পৌছিলে ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর দেব-মাণিক্য সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ হইতে কবিকে সভাপতিরূপে বরণ করিয়া লইলেন (১৭ আষাঢ় ১৩১২)। এই সাহিত্য-সম্মেলনেই কবি তাঁহার দেশীয়-রাজ্য প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন, ১৩১২) পাঠ করিলেন।

এই প্রবন্ধে কবি দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি একটি বিশেষ মর্যাদা ও তাৎপর্য আরোপ করিতে গিয়া বলিলেন,

"দেশীয় রাজ্যের ভুলত্রুটি-মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরারাজ্যের প্রতি উৎসুকদৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না।···

"আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া-পড়িয়া থাকুন, আর যাহাই হউক এই-খানেই স্বদেশের যথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখিতে চাই। বিকৃতি-অনুকৃতির মহামারী এখানে প্রবেশলাভ করিতে না পারুক, এই আমাদের একান্ত আশা।···"

রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলিতেছেন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য থাকিলেও, সমাজের মূল বনিয়াদ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে মানব সভ্যতা যে মূলত কতকগুলি বিশেষ নিয়ম মানিয়া চলিতেছে, তৎকালে সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেশে ছিল না। তিনি আরও বলিলেন,

"ইহার কারণ এই নয় যে, ভারতের সভ্যতাই সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপে সভ্যতা মানব জাতিকে যে সম্পত্তি দিতেছে, তাহা যে মহামূল্য, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা ধৃষ্টতা।

"অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্জন করিতে হইবে, এ-কথা আমার

বক্তব্য নহে—তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই, অসাধ্য বলিয়াই স্বদেশী আদর্শের প্রতি আমাদের মন দিতে হইবে।...”

কিন্তু স্বদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে দেশীয় রাজ্যগুলিতে আদর্শায়িত করিতে গেলে তৎকালীন বাস্তব অবস্থায় সেখানকার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, এইসব জটিল প্রশ্ন ও তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ ভাবিতেও পারেন নাই। আসল কথা তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রশ্নটি প্রধানত শিল্প-সংস্কৃতির দিক হইতেই বিচার করিতেছেন। তখন তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয়গুলি হইতেছে,

“আর্টস্কুলে ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পকলার আদর্শ যে কী, তাহা আমরা জানিই না। এ আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে—একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে, থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে, ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে নানা-অঙ্গপ্রত্যঙ্গপরিপূর্ণ একটি সমগ্রমূর্তিরূপে দেখিতে পাইতাম, ইহার প্রতি আমাদের সচেষ্ট চিত্তকে প্রয়োগ করিতে পারিতাম—পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহাকে ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিতাম।

“...বিলাতী সামগ্রীকে যথার্থভাবে চিনিতে শেখা বিলাতেই সম্ভব।... আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া কেবল টাকার থলি লইয়া মূর্খ দোকানদারের সাহায্যে অন্ধভাবে কতকগুলা খাপছাড়া জিনিসপত্র লইয়া ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলি—তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।”

লক্ষ্য করিবার বিষয়, জাতীয় শিল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যে যে খুব একটা উৎকেন্দ্রিক স্বাদেশিকতার গোঁড়ামি আছে, তাহা নহে। সেই স্বদেশী যুগের আবেগ-উত্তেজনার প্লাবনে তিনি আমাদের জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতির একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, ওকাকুরা, হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্প-রসিক ও শিল্পশাস্ত্রীরা প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তবুও রবীন্দ্রনাথের মত তাঁহারা এতখানি ভারসাম্য রাখিয়া চলিতে পারেন নাই। উপসংহারে কবি বলিলেন,

“যেমন শিল্পে, তেমনই সকল বিষয়ে আমরা বিদেশী প্রণালীকেই একমাত্র প্রণালী বলিয়া বুঝিতেছি। কেবল বাহিরের সামগ্রীতে নহে, আমাদের মনে, এমন কি, হৃদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করিতেছে। দেশের পক্ষে এমন বিপদ আর হইতে পারে না।

“এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য একমাত্র দেশীয় রাজ্যের প্রতি আমরা

তাকাইয়া আছি। একথা আমরা বলি না যে, বিদেশী সামগ্রী আমরা গ্রহণ করিব না। গ্রহণ করিতেই হইবে, কিন্তু দেশীয় আধারে গ্রহণ করিব।…"

[দেশীয় রাজ্য—স্বদেশ ।। পৃঃ ৪৫-৫০]

এই সময় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি জাপানী কবিতার অনুবাদ করেন (ভাণ্ডার, ১৩১২ আষাঢ়)। তখন রুশ-জাপান যুদ্ধ চলিতেছে। রাশিয়ার বিখ্যাত বাল্টিক নৌবাহিনী দুর্ধর্ষ জাপানী শক্তির নিকট সম্পূর্ণ ধ্বংস হইল। জাপানের এই জয়লাভে ভারতবর্ষে বিপুল আনন্দ ও হর্ষোচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইয়াছিল। জাপানের এই জয় মূলত প্রাচ্য ও এশিয়ারই জয়—এমন একটা ভাব সমগ্র দেশবাসীকে উদ্দীপিত করিয়াছিল, এবং আমাদের জাতীয় আন্দোলনে ইহার একটা পরোক্ষ প্রভাব যে কাজ করিয়াছিল, একথাও অস্বীকার করা যায় না। এমন কি রবীন্দ্রনাথও তখন জাপান সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী হইয়া উঠেন। ইতিমধ্যে ওকাকুরা ও হোরিসানের মাধ্যমে তিনি জাপানের জাতীয় অভ্যুদয় সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল হইয়াছিলেন। কিন্তু জাপানের সাম্রাজ্যবাদী লালসার কোন পরিচয় তখনও পর্যন্ত তিনি পান নাই। তাই তাঁহার এই সময়কার প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধে (স্বদেশী সমাজ, সফলতার সদুপায়, ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, য়ুনিভার্সিটি বিল) নবজাগ্রত জাপানের মহিমা কীর্তন শুনিতে পাওয়া যায়।

এদিকে ইংরাজ সরকার বঙ্গব্যবচ্ছেদে দৃঢ়সংকল্প। অপর দিকে, বাঙালীও উহাকে চ্যালেঞ্জস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশ বয়কট-আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল। ১৯০৫ সালে ৭ই আগস্ট (১৩১২ শ্রাবণ ২২) বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধকল্পে সমগ্র ব্রিটিশ পণ্য বর্জন (বয়কট) করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। নগরে-শহরে-বন্দরে, বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে লোকে মুদ্রিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিল—যতদিন না বঙ্গচ্ছেদ রহিত হয়, ততদিন তাহারা ব্রিটিশ পণ্য ব্যবহার করিবে না।

রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে কলিকাতা টাউন হলে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন (৯ই ভাদ্র ১৩১২)। কবি স্বদেশী সমাজ ও সফলতার সদুপায় প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আরো তথ্য দ্বারা এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বয়কট আন্দোলনের নীতিমূলক দিকটি কেবল সমর্থন করিতে পারিলেন না—যথার্থ স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশীসমাজের যথার্থ গঠনমূলক কার্যপদ্ধতির উপর তিনি উহাতে জোর দিলেন। তিনি বলিলেন,

"দেশের প্রতি আমাদের যে-সকল কর্তব্য আজ আমরা স্থির করিয়াছি, সে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই তাহার গৌরব এবং স্থায়িত্ব,

ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয় তবে তাহার উপরে ভরসা রাখা বড়ো কঠিন।…

"এখন তবে কথা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য যে সংকল্প করিয়াছি সেই সংকল্পটিকে স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে, স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্তমান উদ্‌যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি তবে তাহার কারণ এ নয় যে তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে, তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে,…। আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিকটা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিসটা দেশী নহে তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশী জিনিস ব্যবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি সেজন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে।…"

এইসাথে তিনি জাতীয় ঐক্য ও হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত যুগ্ম-নেতৃত্বের উপরও বিশেষ জোর দিলেন। তিনি বলিলেন,

"…এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, শহরবাসী ও পল্লীবাসী, পূর্ব ও পশ্চিম, পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে থাকিব।…"

মিলন কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? একত্রে মিলিয়া কাজ করিলেই মিলন ঘটে, তাহা ছাড়া যথার্থ মিলনের আর-কোনো উপায় নাই।

"এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব; তাঁহাদিগকে কর দান করিব; তাঁহাদের আদেশ পালন করিব; নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব; তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।"

কিছুদিন পূর্বে তিনি একজন অধিনায়ক খুঁজিয়া বাহির করিবার কথা বলিয়াছিলেন; এখন তিনি হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম-নেতৃত্বের কথা বলিতেছেন।

তাঁহার দ্বিতীয় ও প্রধান বক্তব্য—ইংরাজ-শাসনের অভ্যন্তরেই স্বতন্ত্রভাবে আমাদের জনসাধারণের 'স্বদেশী সমাজ' গঠন করিতে হইবে। ইহার যুক্তির স্বপক্ষে তিনি 'স্টেটস্‌ম্যান্‌' পত্রিকা হইতে জার-শাসিত রাশিয়ার জর্জীয়গণ ও

আর্মানিগণ কিভাবে তাহাদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিচার-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা চালাইয়া যাইতেছে তাহার নজির দিলেন,

"The peasants aver that these secret courts work with much greater expedition, accuracy and fairness than the Crown Courts, and that the Judges have the invaluable characteristic of incorruptibility. The Drozhakisti, or Armenian Nationalist Party, had previously established a similar system of justice in the rural districts of the province of Erwan and more than that, they had practically supplanted the whole of the government system of rural administration and were employing agricultural experts, teachers and physicians of their own choosing. It has long been a matter of notoriety that ever since the suppression of Armenian schools by the Russian minister of Education, Delyanoff, who by the way, was himself an Armenian, the Armenian population of the Caucasus has maintained clandestine national schools of its own."

অকাট্য যুক্তি ও নজির! রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"আমি কেবল এই বৃত্তান্তটি উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি—অর্থাৎ ইহার মধ্যে এইটুকু দ্রষ্টব্য যে, স্বদেশের কর্মভার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগলামি নহে।···

"···আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরি নহে, পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করিতে হইবে। যাহাতে আমাদের ডাক্তার, আমাদের শিক্ষক, আমাদের এঞ্জিনিয়ারগণ দেশের অধীন থাকিয়া দেশের কাজেই আপনার যোগ্যতার স্ফূর্তিসাধন করিতে পারেন আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।···

"জর্জীয়গণ, আর্মানিগণ প্রবল জাতি নহে—ইহারা যে-সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে আমরা কি সেই-সকল কাজেরই জন্য দরবার করিতে দৌড়াই না?···"

এই প্রসঙ্গে তিনি পল্লীর প্রচলিত পঞ্চায়েতগুলি কিভাবে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ইংরাজের তাঁবেদারী শাসনযন্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন,

"ভারতবর্ষের যে-সকল গ্রামে এখনো গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্তমান আছে, যে পঞ্চায়েত কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার পরিবর্তন-অনুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত, যে গ্রামে পঞ্চায়েতগণ একদিন

স্বদেশের সাধারণ কার্যে পরস্পরের মধ্যে যোগ বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এমন আশা করা যাইত—সেই-সকল গ্রামের পঞ্চায়েতগণের মধ্যে একবার যদি গবর্মেণ্টের বেনো জল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েতত্ব চিরদিনের মতো ঘুচিল। দেশের জিনিস হইয়া তাহারা যে-কাজ করিত গবর্মেণ্টের জিনিস হইয়া তাহার সম্পূর্ণ উল্টা রকম কাজ করিবে।"

অর্থাৎ তিনি দেশের অবস্থা ও কালের প্রয়োজনে পঞ্চায়েতগুলিকে স্বদেশী পঞ্চায়েতে পরিণত করিবার আহ্বান জানাইলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—গান্ধীজী বা অন্য কেহ তখনও পঞ্চায়েতগুলি সম্পর্কে এই ধরনের চিন্তা করিতে পারেন নাই।

উপসংহারে তিনি বলিলেন,

"অতএব আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

"…এখন আর বাদবিবাদ তর্কবিতর্ক না করিয়া আমরা যে-কয়জনেই উৎসাহ অনুভব করি,…সেই পাঁচদশজনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্বাচন করিব, তাঁহার নিয়োগক্রমে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব, কর্তব্য পালন করিব, এবং সাধ্যমতে আপনার পরিবার প্রতিবেশী ও পল্লীকে লইয়া সুখ-স্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে একটি স্বকীয় শাসনজাল বিস্তার করিব। এই প্রত্যেক দলের নিজের পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বিক্রয়ভাণ্ডার (কো-অপারেটিভ স্টোর), ঔষধালয়, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক, সালিস নিষ্পত্তির সভা ও নির্দোষ আমোদের মিলনগৃহ থাকিবে।

"এমনি করিয়া যদি আপাতত খণ্ড খণ্ড ভাবে দেশের নানা স্থানে এইরূপ এক একটি কর্তৃসভা স্থাপিত হইতে থাকে, তবে ক্রমে একদিন এই সমস্ত খণ্ড সভা-গুলিকে যোগসূত্রে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ববঙ্গ প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৩য় খণ্ড ।। পৃঃ ৬০৭-১৭]

এই প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখা-সভা স্থাপন করিবার আহ্বান জানাইলেন।

ইহার অনতিকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ গিরিডি চলিয়া যান। বয়কট-আন্দোলন তখন প্রবল বেগে চলিতেছে; সারা দেশে স্বাদেশিক উত্তেজনা ও উন্মাদনার জোয়ার আসিয়াছে। এমনদিনে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি সাড়া না-দিয়া পারে না। এই গিরিডিতে বসিয়াই তিনি তাঁহার অধিকাংশ স্বদেশী কবিতা ও গান রচনা করেন। সেগুলি ভাণ্ডার (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২) ও বঙ্গদর্শনে (আশ্বিন) প্রকাশিত হইয়াছিল। অল্পকাল পরে ঐগুলি একত্র সংকলন করিয়া 'বাউল' নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

সে-যুগের রাজনীতিই ছিল ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসে ভরা। দেশকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিয়া, আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া ও গান গাহিয়া দেশবাসীকে উদ্বোধিত করা হইত। বিশেষ করিয়া, বাংলাদেশ কবিতা ও গানের দেশ। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশে যেন স্বদেশী গানের জোয়ার আসিল। এবং বলিতে কি—বাংলার জাতীয় সংগীত ও স্বদেশী সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথেরই অবদান সর্বাপেক্ষা বেশী। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলার সর্বত্র শত শত জনসভায় হাটে, মাঠে, ঘাটে রবীন্দ্রনাথের এই সব গান গাওয়া হইত। তাঁহার স্বদেশ সংগীত সম্পর্কে এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ কম। তাঁহার এই যুগের শ্রেষ্ঠ গানগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত গানগুলি বিখ্যাত :

১ ॥ "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে ॥..."

২ ॥ "বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান্ ॥..."

৩ ॥ "অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী
অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননীজননী ॥..."

৪ ॥ "ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥..."

৫ ॥ "আজি বাঙলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে, জননী।..."

৬ ॥ "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥…"

৭ ॥ "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে।
সার্থক জনম মা গো তোমায় ভালোবেসে ॥…"

৮ ॥ "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।…"

৯ ॥ "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী ॥…"

১০ ॥ "আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না ॥…"

১১ ॥ "যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না, মা।…"

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই গানগুলি দেশবাসীর স্বাদেশিকতাবোধকে জাগরিত করিতে যেরূপ সহায়তা করিয়াছে, ঐতিহাসিক দিক হইতে তাহার মূল্য বা অবদান কম নহে। অথচ এই স্বদেশপ্রেমের মধ্যে কোন উগ্র জাতীয়তাবাদ কিংবা জাতিবিদ্বেষ কিংবা স্বদেশ বা স্বজাতি শ্রেষ্ঠত্ববোধের লেশমাত্র নাই, উগ্র-সাম্প্রদায়িকতাও নাই। অবশ্য 'ভারতলক্ষ্মী' গানটির মধ্যে বিশেষভাবে প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতির মহিমা-কীর্তন করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে এই গানটির সম্পর্কে তিনি পুলিন সেন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন,

"একদিন আমার পরলোকগত বন্ধু হেমচন্দ্র মল্লিক বিপিন পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে, বিশেষভাবে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিশিয়ে দিয়ে তাঁরা শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠানকে নূতনভাবে দেশে প্রবর্তিত করতে চান, তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনা মিশ্রিত স্তবের গান রচনা করবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের ছিল বিশেষ অনুরোধ। আমি অস্বীকার করে বলেছিলুম, এ ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না, সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। বিষয়টা যদি কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রের অধিকারগত হোতো তাহলে আমার ধর্মবিশ্বাস যাই হোক আমার পক্ষে তাতে সংকোচের কারণ থাকত না; কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে, পূজার ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ গর্হণীয়। আমার বন্ধুরা সন্তুষ্ট হন নি। আমি রচনা করেছিলুম 'ভুবনমনোমোহিনী'।…এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্রসভায় গাবার উপযুক্ত নয় কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দুসংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিত ভাবে মর্মঙ্গম হবে না।"

[রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ॥ পৃঃ ১২৪]



স্বদেশী যুগে : ১৯০৫



জাপানে : ১৯১৬

স্বদেশী যুগে ও তৎপরবর্তী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের যুগে স্বাদেশিকতাবোধকে তীব্র করিবার জন্য কালীপূজা, দুর্গাপূজা ও ভবানীপূজার প্লাবন আসিয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এই 'শক্তি-পূজা'য় একেবারে সায় দিতে পারেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বযুগে তিনি প্রাচীন বৈদিক ভারতের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা-কালে (১৯০৪) তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে জাতীয় ঐক্যকে রক্ষা ও দৃঢ় করিবার কথা চিন্তা করিতে শুরু করেন। এইজন্যই তিনি 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও উহাদের যুগ্ম-নেতৃত্বের প্রস্তাব রাখিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে, স্বদেশী যুগের দেশাত্মবোধক গানগুলির সুর-সংযোজনের ব্যাপারে তিনি কোন বিদেশী সুর সংযোজন বা মিশ্রণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তখন লোক-সংস্কৃতি ও লোক-সংগীতের পুনরুদ্ধারের উপর পুনঃপুনঃ গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন। বিশেষ করিয়া বাংলার বাউল-সংগীতের উপর তাঁহার ছিল বিশেষ আকর্ষণ। এইজন্য তিনি অধিকাংশ স্বদেশী গানে বাউল ও সারিগানের সুর সংযোজন করিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগ হইতেই দেশীয় সুরের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রণালীবদ্ধভাবে এই যুগের স্বদেশমূলক গানগুলির একটি তালিকা দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য স্বদেশী আন্দোলনের সময়ই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার বিখ্যাত 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি (১৩১৩ আশ্বিন) রচনা করিয়াছিলেন। এই যুগেই দ্বিজেন্দ্রলাল পর পর তাঁহার জাতীয়তাবাদমূলক নাটকগুলি রচনা করেন [প্রতাপসিংহ' (১৩১২), 'দুর্গাদাস', 'নূরজাহান' (১৩১৩), 'মেবারপতন' ও 'সাজাহান' (১৩১৫)]। বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশমূলক গানগুলিও সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' গানটিও এই যুগে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনে ও জাতীয় শিক্ষার প্রশ্নে ॥

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (১৩১২ আশ্বিন ৩০) বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হইল। এই আঘাত বাংলার বুকে যেন একটা আশীর্বাদের মত নামিয়া আসিল।—বাংলাদেশের স্বাদেশিক আন্দোলন যেন এমনই একটি আঘাতের অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া ছিল। বাংলার অভিজাত ও উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সহিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মিলন ঘটিল। এই সম্মিলিত জনশক্তি বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক অভিনব রণনীতির প্রবর্তন করিল এবং তাহাই হইতেছে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' (direct action)। যদিও নিম্নশ্রেণীর কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন নাই, তবুও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, এতখানি ব্যাপক গণবিক্ষোভ ও গণআন্দোলন ইতিপূর্বে সারা দেশে আর কোথাও দেখা যায় নাই। রণকৌশলের দিক হইতে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-আন্দোলনের (passive resistance) ইহাই সূত্রপাত। সংগ্রামের বিশেষ 'প্রকৃতি' বা রূপটির (form of struggle) দিক হইতে বিচার করিলে ইহাকে গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলনের পূর্ব-প্রস্তুতি বলিলে ভুল হইবে না। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে সারা ভারতের জাতীয়-চেতনাকে প্রবলভাবে উদ্বেলিত করিয়াছে। ১৯০৫ সালে বেনারস-কংগ্রেসে সভাপতি গোখলে বাংলার এই অবদানকে স্বীকৃতি দিয়া বলিলেন,

"...The tremendous upheaval of popular feeling, which has taken place in Bengal in consequence of the partition, will constitute a landmark in the history of our national progress. For the first time since British rule began, all sections of the Indian community, without distinction of caste or creed, have been moved by a common impulse and without the stimulus of external pressure to act together in offering resistance to a common wrong. A wave of true national consciousness has swept over the Province....Bengal's heroic stand against the oppression of a harsh and uncontrolled bureaucracy has astonished and gratified all India, and her sufferings have not been endured in vain, when they have helped to draw closer

all parts of the country in sympathy and in aspiration....The most outstanding fact of the situation is that the public life of this country has received an accession of strength of great importance, and for this all India owes a deep debt of gratitude to Bengal." [Congress Presidential Addresses : Vol. I. p. 696]

১৬ই অক্টোবর (আশ্বিন ৩০) বঙ্গচ্ছেদের দ্বারা বাঙালীর শক্তিকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বাঙালী তাহার জবাবে ঐ দিনটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য 'রাখীবন্ধন' উৎসবের মাধ্যমে বাঙালীর জাতীয় ঐক্যকে আরও দৃঢ়তর করিতে চাহিল। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই উৎসবের পরিকল্পনা করেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে লিখিলেন,

"আগামী ৩০শে আশ্বিন (১৩১২) বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখীবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখীবন্ধনের মন্ত্রটি এই 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'।"

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রস্তাবানুক্রমে ঐ দিনটি সমগ্র বাংলায় 'অরন্ধনের দিন' ধার্য হয়। বিশেষ করিয়া এই রাখী-উৎসবের জন্যই রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি রচনা করিলেন। রাখী-উৎসবের দিন এই গান গাহিতে গাহিতে লোকে পরস্পরের হাতে রাখী-সূত্র বাঁধিয়া দিতেন।

৩০শে আশ্বিন কলিকাতার রাখী-উৎসবের অনুষ্ঠানে সকলের সহিত রবীন্দ্রনাথও অংশ গ্রহণ করিলেন এবং শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া শহর পরিভ্রমণ করিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরোয়া' গ্রন্থে এই অবিস্মরণীয় দিনটির একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন,

"ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গাস্নান করে সবার হাতে রাখী পরাবে। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব। রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি ঘোড়া নয়।...রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি তো কিছু শুনবেন না।...রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল—

বাঙলার মাটি, বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান্।

"এ গানটি সে-সময়েই তৈরী হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য। রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারিদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাদা রাখী, সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখী পরানো হল। হাতের কাছে ছেলে-মেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পরালো—এইবার একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চীৎপুরের বড় মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হল, চলো সব। এইবারে বেগতিক—আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা, মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমানদের রাখী পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না।···

"···আমরা সব বসে ভাবছি—এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কী কী হল সব তোমাদের।···বললে, কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতরে, মৌলবী-টৌলবী যাদের পেলুম, হাতে রাখী পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম, আর মারামারি! সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে—ওরা একটু হাসলে মাত্র।···"

[ঘরোয়া ।। পৃঃ ১১-১২]

ঐদিন অপরাহ্নে অপার সার্কুলার রোডের পার্শ্বস্থিত ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন হইল। সভাপতি ছিলেন আনন্দমোহন বসু। এই সম্পর্কে প্রফুল্লকুমার সরকার লিখিতেছেন,

"··আনন্দমোহনবাবু তখন বৃদ্ধ—রোগে শয্যাশায়ী। তৎসত্ত্বেও সেই জাতীয় সংকটের দিনে তিনি দেশমাতৃকার আহ্বানে রোগশয্যা হইতেই উঠিয়া আসিলেন। আমার বেশ মনে পড়িতেছে, তাঁহাকে 'ইনভ্যালিড চেয়ারে' করিয়া সভাস্থলে আনা হইল।···ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড বাঙলার প্রতীকস্বরূপ ফেডারেশন হল বা 'মিলন মন্দির'-এর ভিত্তিও ঐদিন আনন্দমোহন স্থাপন করিলেন। আনন্দমোহন নিজে তাঁহার লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিতে পারিলেন না, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পক্ষ হইতে ঐ বক্তৃতা জলদগম্ভীর স্বরে পাঠ করিলেন।

"রবীন্দ্রনাথ সেই বিরাট সভায় যোগ দিয়াছিলেন এবং তিনিই আনন্দমোহনের বক্তৃতা বাঙলায় অনুবাদ করিয়া পাঠ করেন।..."

[জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ।। পৃঃ ৬৩-৬৪]

এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর বাংলার মহিলা সমাজকেও স্বদেশীব্রত গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'ব্রতধারণ' প্রবন্ধটি লিখিলেন। উহা "কোনো 'স্ত্রীসমাজে' জনৈক মহিলা কর্তৃক পঠিত" হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের মহিলা সমাজকে আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

"আজ আমাদের বঙ্গদেশ রাজশক্তির নির্দয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রত গ্রহণ করিব। আজ আমরা কোনো ক্লেশকে ডরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ্য করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।

"...আমরা যেন পরের অনুকরণে আরাম এবং পরের বাজারে কেনা জিনিসে গৌরববোধ না করি। বিলাতি আসবাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যদি কিছু কষ্ট হয়, তবে সে কষ্টই আমাদের মন্ত্রকে ভুলিতে দিবে না।...আমাদের দেশের নারীগণ আত্মীয়স্বজনের আরোগ্য কামনা করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। নারীদের সেই তপঃসাধন বাঙালির সংসারে যে নিষ্ফল হইয়াছে তাহা আমি মনে করি না। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্য যদি সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করি, যদি বিদেশের বিলাস দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের এই তপস্যায় দেশের মঙ্গল হইবে—তবে এই স্বস্ত্যয়নে আমরা পুণ্যলাভ করিব এবং আমাদের পুরুষগণ শক্তিলাভ করিবেন।"

[ব্রতধারণ—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৩য় খণ্ড ।। পৃঃ ৬২৩-২৫]

আন্দোলন সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল ছাত্রসমাজের মধ্যে। এবং স্কুল-কলেজের ছাত্ররাই এই আন্দোলনকে দ্রুত সংগঠিত ও প্রসারিত করিতে লাগিলেন। ৭ই আগস্ট হইতেই এই ছাত্র বাহিনীই সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা করিয়া বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী পণ্য ক্রয়-অভিযানকে গ্রামে গ্রামে প্রসারিত করিতে লাগিলেন। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি এই আন্দোলনের প্রধান ধ্বনি (slogan) এবং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতগুলি প্রধান জাতীয় সংগীতে পরিণত হইল। ছাত্রগণ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিয়া রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত গাহিতে গাহিতে গ্রামে গ্রামে স্বদেশী পণ্য ফেরি করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। ভারতের ছাত্র-আন্দোলনের ইহাই সূত্রপাত। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই ছাত্রসমাজ সর্বপ্রথম জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিলেন।

সন্ত্রস্ত ইংরাজ সরকার ছাত্রদের এই আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি কতকগুলি নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্তন করিলেন এবং পরে একটি আইন পাস করিয়া লইলেন (২২শে অক্টোবর, ১৯০৫)। এই আইনটিই হইল কুখ্যাত 'কার্লাইল সার্কুলার'। এই প্রসঙ্গে প্রফুল্লকুমার সরকার লিখিতেছেন,

"…শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ নবীন জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে 'বন্দে মাতরম্' শব্দটি 'জাতীয় মন্ত্র' হইয়া উঠে। ঠিক এই কারণেই পুলিস ও সিভিলিয়ান—সংক্ষেপে আমলাতন্ত্রের পক্ষে 'বন্দে মাতরম্' শব্দটি বিষবৎ মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা উহাকে 'বিদ্রোহ-ধ্বনি' বলিয়াই গণ্য করিতে লাগিলেন। বাঙলা সরকারের শিক্ষা-বিভাগ এক সার্কুলার জারি করিয়া বসিলেন যে, কোন ছাত্র স্বদেশী সভায় যোগদান করিলে অথবা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করিলে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করা হইবে। ইহাই কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলার। এই সার্কুলারের ফলে বাঙলার ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইল। উহার প্রতিবাদ করিয়া বাঙলার সর্বত্র জনসভা হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা অঞ্চলে এইরূপ কয়েকটি সভায় সরকারী স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন।…যুবক ও ছাত্রেরা ভীত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহারা আরও দ্বিগুণ উৎসাহে স্বদেশী সভায় যোগ দিতে লাগিল এবং 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে লাগিল। ফলে পুলিসের লাঠি তাহাদের মাথায় পড়িল, বহু ছাত্র বিদ্যালয় হইতেও বিতাড়িত হইল। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করাই রাজদ্রোহের তুল্য একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিল।…" [জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ।। পৃঃ ৬৫-৬৬]

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাকালেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ দেশের শিক্ষাকে জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন ; কিন্তু কার্লাইল সার্কুলার জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের প্রশ্নটি তাঁহাদের নিকট আশু প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

"কার্লাইল সার্কুলার ঘোষিত হইবার দুইদিন পরে ৭ই কার্তিক (২৪শে অক্টোবর) ফীল্ড্ এনড একাডেমির ভবনে কলিকাতার নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোকদের এক সভা হয়। সভাপতি ছিলেন আবদুল রসুল, কলিকাতা হাইকোর্টের তরুণ ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকেই তাহাতে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে কথা উঠিল, গবর্মেণ্ট স্বদেশী আন্দোলন নষ্ট করিবার জন্য ছাত্রগণকে যোগদান করিতে নিষেধ করিতেছে, ইহার প্রতিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করা।

"সেইদিনই (লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতা মেজর নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের সভাপতিত্বে কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এণ্ড সার্জনস্ গৃহে যে সভার অধিবেশন হয়, সেখানেও এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, 'গবর্মেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবর্মেণ্টের চাকরি দুইই পরিত্যাগ করিতে হইবে।' অর্থাৎ নন-কো-অপারেশন।"

[রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ১২৮]

রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি সভায় উপস্থিত ছিলেন না। ইহার দুই-তিন দিন পর পটলডাঙার মল্লিক বাড়িতে সহস্রাধিক ছাত্রের একটি সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ উহার সভাপতি ছিলেন। এই সভায় কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে দেশের বিদ্যা-শিক্ষার ভার দেশবাসীকে স্বহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য পুনরায় আহ্বান জানাইলেন।

ঐ বৎসরই দুর্গাপূজার কয়েকদিন ধরিয়া কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে পর পর কয়েকটি জনসভায় জাতীয় শিক্ষা-সমস্যা লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এইসব সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এই সভাগুলিতে যোগদান করিয়া দেশের স্বাধীন জাতীয় শিক্ষার উপর জোর দিয়া বক্তৃতা করেন।

ছাত্র-আন্দোলন মফঃস্বলেও কয়েক জায়গায় তীব্র আকার ধারণ করে—বিশেষ করিয়া বরিশালে ও রংপুরে। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য রংপুর স্কুলের কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ছাত্রকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। প্রতিবাদে সমস্ত ছাত্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসেন। কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ও ব্রজসুন্দর রায় নামক দুইজন তরুণ অধ্যাপক ইঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারাই রংপুরে প্রথম 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করিলেন (২৩শে কার্তিক ১৩১২)।

ঐদিনই কলিকাতায় 'পান্তির মাঠে' (বর্তমানে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে যেখানে বিদ্যাসাগর কলেজের হোস্টেল অবস্থিত) এক বিরাট জনসভায় 'জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একলক্ষ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

এইসময় তরুণ ছাত্রনেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু 'কার্লাইল ও রিসলী সার্কুলার'-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-আন্দোলনের জন্য 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন।

উহার কয়েকদিন পরে (৩০শে কার্তিক ১৩১২) 'বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েশন'-এর গৃহে "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে কমিটি গঠন ও কর্তব্য

নির্ধারণের জন্য যে মন্ত্রণাসভা হয় তাহাতে বাংলাদেশের ধনী মানী জ্ঞানী গুণী লোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের নাম দেওয়া হইল Bengal Council of Education. তারকনাথ পালিত, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, কালীনাথ মিত্র, সুবোধচন্দ্র বসু-মল্লিক হইলেন ট্রাস্টি।" রবীন্দ্রজীবনী: ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ১৩০]। প্রায় দিন পঁচিশেক পর পরিষদের সদস্যগণের এক সভায় উহার গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন হয় (২৪শে অগ্রহায়ণ)। ডাঃ নীলরতন সরকার শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হন। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু এই সকল কার্যে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা থাকিলেও প্রথম হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের নীতি ও কর্মপন্থা লইয়া নেতৃবর্গের সহিত তাঁহার মতভেদ ছিল। সেই কারণে ইহার পরেই (সম্ভবত পরদিনই) রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন। স্বদেশী আন্দোলন মূলত তখন স্লোগান ও রাজনৈতিক উত্তেজনাকেই ব্যাপকতর করিতেছিল, স্বদেশী শিল্পের উন্নতি, জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী নির্ণয়, গ্রাম-সংগঠন প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে জাতীয় নেতৃবর্গের কোনো উৎসাহ বা বাস্তব কার্যকরী প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল না। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও কোনো মৌলিক চিন্তাধারা বা কর্মসূচী গ্রহণেও তাঁহাদের প্রচেষ্টা ছিল না। তাঁহাদের পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কোনো শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায়। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উহা সমর্থন করা সম্ভব হইল না। তিনি শান্তিনিকেতনে ও শিলাইদহে তাঁহার পরিকল্পনামত গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। শান্তিনিকেতন হইতে তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা ও ক্ষোভের কথা জানাইয়া রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিলেন (২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১২),

"দেশে যদি বর্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদের প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মতো লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা।···উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয়, এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।" [বঙ্গবাসী, ১৩২৬ ফাল্গুন]

অত্যধিক উত্তেজনার অবশ্যই একটা প্রতিক্রিয়া আছে, অবসাদ আছে—বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মতো কবি ও শিল্পীর পক্ষে। তবুও কলিকাতার স্বদেশী আন্দোলনে তিনি যোগদান না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নহে, কলিকাতার আন্দোলনে তিনি অন্যতম পুরোধাস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার মনে একটি অবসাদ ও ক্লান্তি আসে। এই মানসিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি 'খেয়া'র অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন (১৩১২ আষাঢ় —১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ)।

'খেয়া'র কবিতাগুচ্ছের মধ্যে 'শেষখেয়া', 'বিদায়', 'প্রতীক্ষা', 'প্রচ্ছন্ন' প্রভৃতি কবিতায় খেয়াকাব্যের মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। 'নৈবেদ্যে'র যুগে, স্বদেশী সংগীতের যুগে যে বীণায় বলিষ্ঠ সংগ্রামের সুর শুনা গিয়াছিল সেই বীণাতেই কেন এই অবসাদ ও বৈরাগ্যের ক্লান্ত-করুণ সুর বাজিয়া উঠিল ?

এই প্রশ্নের জবাব আমাদিগকে কবির মানস-প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। 'এবার ফিরাও মোরে', 'বর্ষশেষ' হইতে শুরু করিয়া মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত কবির এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বেদনার অন্ত ছিল না। কবি যে নির্যাতন ও পীড়নকে ভয় করিতেন এমন নহে। জীবনে বহুবার বহু ক্ষেত্রে দেশের চরম দুর্যোগ-মুহূর্তে তিনি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

স্বদেশীযুগের রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে রবীন্দ্রনাথের সরিয়া আসিবার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নেতৃবর্গের সহিত তাঁহার মৌলিক আদর্শগত মত-পার্থক্য —এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ বয়কট-আন্দোলনকে নিছক বিদেশী পণ্য বয়কট হিসাবে, কিংবা ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদকে 'চাপ দিবার নীতি' (pressure tactics) হিসাবে দেখেন নাই। প্রকৃত স্বাধীনতা-লাভ কিংবা ক্ষমতা-লাভের পূর্বেই ইংরাজ-শাসনের অভ্যন্তরেই স্বদেশী সমাজ, স্বদেশী শিক্ষা, স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী অর্থনীতি ও স্বদেশী সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা। এসব কথা তিনি তাঁহার পূর্বাপর প্রবন্ধগুলিতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই 'স্বদেশী সমাজ' একেবারেই কাল্পনিক (utopian)

ছিল না। অথচ এই 'স্বদেশী সমাজ' পরিকল্পনাকে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

অপর দিকে, রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' বা 'আদর্শ স্বদেশী পঞ্চায়েত' পরিকল্পনারও মূলগত ত্রুটি ছিল, এবং তাহা হইল স্বাধীনতা-আন্দোলন ও ক্ষমতাদখলের সংগ্রামের সহিত তিনি উহাদের যোগসাধন করিতে পারেন নাই বা করিতে চাহেন নাই। কিন্তু কংগ্রেস যদি যথার্থই গণ-সংগ্রাম চাহিত, তবে ঐ ধরনের স্বদেশী সমাজ বা স্বদেশী পঞ্চায়েত পরিকল্পনাকে সে যথার্থ কাজে লাগাইতে পারিত।

বঙ্গবিচ্ছেদকে উপলক্ষ করিয়া দেশে যে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইল, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাহার মাধ্যমে এই সর্বপ্রথম জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন তরুণ ও যুবক। এই যুবশক্তিকে নেতৃত্ব দিতেছিলেন বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ ঘোষ। কিন্তু বাংলাদেশে কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন ছিল প্রাচীন সংস্কারপন্থীদের হাতে। সুরেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী ঘোষ, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবর্গ সেই প্রাচীনপন্থীদের নেতৃত্ব করিতেছিলেন। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চাপ দিবার অস্ত্র হিসাবেই দেখিতেছিলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, স্বদেশী সমাজ, স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী অর্থনীতি প্রভৃতি সংগঠিত করিবার কোনো আন্তরিক ইচ্ছা যেমন তাঁহাদের ছিল না, তেমনি এই সকল সম্পর্কে তাঁহারা বিস্তারিত কোনো কর্মসূচীও গ্রহণ করেন নাই। অপর দিকে বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং ডন সোসাইটি ও অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির উদীয়মান নেতৃবর্গ পরিচালিত আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ রহিল। ফলে স্বদেশী আন্দোলন গ্রামাঞ্চলের বিপুল কৃষক-জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারিল না। অথচ এই স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিলেন বোম্বাই ও আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের মালিকেরা। এই সুযোগে তাঁহারা তাঁহাদের ব্যবসাকে স্ফীত ও সম্প্রসারিত করিয়া তুলিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, প্রায় একই সময়ে চীনে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে আমেরিকার পণ্যদ্রব্য বয়কট-আন্দোলন বিপুল জনসমর্থন লাভ করে (১৯০৪)। এই আন্দোলন ক্রমশ গণবিপ্লবের প্রস্তুতিকে জোরদার করিয়াছে। ১৯০৬ সালে চীনে কৃষক ও কয়লাখনির শ্রমিকেরা একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। হাঙ্কাওতে সৈন্যবিদ্রোহ দেখা দিল। কোয়াণ্টুং প্রদেশে কৃষকেরা ট্যাক্স বন্ধ

আন্দোলন আরম্ভ করিল। ১৯০৯ সালে এই বিদ্রোহ দক্ষিণাঞ্চল হইতে প্রায় সমগ্র চীন দেশে ছড়াইয়া পড়িল এবং অবশেষে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল (১লা জানুয়ারী, ১৯১২)। এই চীনবিপ্লবের সাফল্যের পশ্চাতে রহিয়াছে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিখ্যাত 'তিন-নীতি' (Three Principles)—(১) চীনকে বিদেশীর কবল হইতে মুক্ত করিতে হইবে, (২) চীন হইতে 'মাঞ্চুরাজা'দের বিতাড়িত করিয়া চীনে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং (৩) চীনের জনগণের জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে।

এই আন্দোলনের সহিত আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের পার্থক্য কতখানি, সে-সম্পর্কে নিশ্চয়ই আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও শিলাইদহের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ এলাকায় তাঁহার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় কুষ্টিয়াতে বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। অবশ্য এই কার্যে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায় ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অল্প কিছুদিন পরে তিনি পতিসরে একটি সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

"রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজে গ্রামের সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি কার্য স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; প্রজাদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, সংঘকর্ম ও সঞ্চয় অভ্যাস শিক্ষা দিবার জন্য জমিদারিতে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন, সেই সঞ্চয় ব্যাঙ্ক পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত হয়। এ ছাড়া কৃষক প্রজাদের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মশক্তি উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য লোকসভা স্থাপন করা হইল।…তখন বাংলাদেশে সরকারী কো-অপারেটিভ্ আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ১৩৩]

এই সময় যুবরাজ পঞ্চম জর্জ ভারত পরিদর্শনে আসেন (ডিসেম্বর ১৯০৫)। অবশ্য ইহার পশ্চাতে কার্জনের অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। যুবরাজের ভারত সফরের ফলে বিক্ষুব্ধ ভারতবাসী কিছুটা শান্ত হইবে—ইহাই ছিল কার্জনের ধারণা।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'রাজভক্তি' নামক একটি প্রবন্ধে (ভাণ্ডার, ১৩১২ মাঘ) যুবরাজের ভারত সফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিলেন। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বলিলেন,

"রাজপুত্র আসিলেন। রাজ্যের যত পাত্রের পুত্র তাঁহাকে গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া বসিল—তাহার মধ্যে একটু ফাঁক পায় এমন সাধ্য কাহারও রহিল না। এই ফাঁক যতদূর সম্ভব সংকীর্ণ করিবার জন্য কোটালের পুত্র পাহারা দিতে লাগিল—সেজন্য

সে শিরোপা পাইল। তাহার পর? তাহার পর বিস্তর বাজি পুড়াইয়া রাজপুত্র জাহাজে চড়িয়া গেলেন—এবং আমার কথাটি ফুরাল, নটেশাকটি মুড়াল।

"ব্যাপারখানা কী।…অবশ্যই রাজপুরুষেরা ইহার মধ্যে একটা কিছু পলিসি, কিছু-একটা প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন; নহিলে এত বাজে খরচ করিবেন কেন।… "

এইরূপ বিদ্রূপ-ব্যঙ্গোক্তির পর তিনি যুবরাজের ভারতসফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধিটি দেশবাসীর সমক্ষে উদ্ঘাটন করিলেন।

"এবারে রাজপুত্রকে ভারতবর্ষে আনা হইল। রাজনীতির তরফ হইতে পরামর্শ উত্তম হইয়াছে। কারণ, সাধারণত রাজবংশীয়ের প্রতি ভারতবর্ষীয় হৃদয়ের অভিমুখিতা বহুকালের প্রকৃতিগত।…

"যাই হোক, ভারতবর্ষের রাজভক্তিকে নাড়া দিবার জন্য রাজপুত্রকে সমস্ত দেশের উপর দিয়া বুলাইয়া লওয়া উচিত—বোধ করি এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইংরেজ-হৃদয়ের কারবার কোনোদিন করে নাই। তাহারা এদেশকে হৃদয় দেয়ও নাই, এ দেশের হৃদয় চায়ও নাই, দেশের হৃদয়টা কোথায় আছে তাহার খবরও রাখে না।…"

ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান এবং পুরাতন অভিযোগ। 'রাজভক্তি ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত'—ইহাও মানিয়া লইতে তিনি রাজী। কিন্তু ঐশ্বর্যলোলুপ ও ক্ষমতালোভী এদেশের ইংরাজ শাসকদের হৃদয়হীনতা তাঁহার নিকট অসহ্য। তিনি বলিলেন,

"…রাজভক্তিতে দীক্ষিত ভারতবর্ষের অন্তঃকরণ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে, হে ভারতের প্রতি বিমুখ ভগবান, আমি এই-সকল ক্ষুদ্র রাজা, ক্ষণিক রাজা, অনেক রাজা আর সহিতে পারি না, আমাকে এক রাজা দাও। এমন রাজা দাও যিনি বলিতে পারিবেন, ভারতবর্ষ আমারই রাজ্য—বণিকের নয়, খনিকের নয়, চা-করের নয়, ল্যাংকাশিয়রের নয়। ভারতবর্ষ যাঁহাকে অন্তরের সহিত বলিতে পারিবে, আমারই রাজা; হ্যালিডে রাজা নয়, ফুলর রাজা নয়, পায়োনিয়র-সম্পাদক রাজা নয়। [রাজভক্তি—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪৩৫-৪০]

ইহার অল্প কিছুকাল পূর্বে লিখিত কবির 'বহুরাজকতা' (ভাণ্ডার, ১৩১২ আষাঢ়) প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঐ প্রবন্ধে তিনি মোটামুটিভাবে এই একই কথা বলিয়াছিলেন,

"…একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে, ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই। অত্যন্ত ভালো রাজা হইলেও এ রকম অবস্থায় রাজার বোঝা বহন করা দেশের পক্ষে বড়ো কঠিন।…

"অতএব কংগ্রেসের যদি কোনো সংগত প্রার্থনা থাকে তবে তাহা এই যে, সম্রাট এডোআর্ডের পুত্রই হউন, স্বয়ং লর্ড কার্জন বা কিচেনারই হউন, অথবা ইংলিশম্যান-পায়োনিয়রের সম্পাদকই হউন, ভালো মন্দ বা মাঝারি যে-কোনো একজন ইংরেজ বাছিয়া পার্লামেন্ট আমাদের রাজা করিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসাইয়া দিন। একটা দেশ যতই রসালো হউক-না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশসুদ্ধ রাজাকে পারে না।"

[বহুরাজকতা—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪৪৪]

বাংলাদেশের আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য ইংরাজ সরকার কী উলঙ্গ বীভৎস মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাও যেন রবীন্দ্রনাথ মুহূর্তের জন্য ভুলিতে পারিতেছেন না। তাই যুবরাজের ভারত সফরে তিনি হর্ষধ্বনি না করিয়া এই মদোদ্ধত অত্যাচারী শাসকসম্প্রদায়কে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিবার আহ্বান জানাইয়া রাজভক্তি প্রবন্ধের উপসংহার করিলেন,

"...আমাদের হৃদয় বশ করা ফুলর, প্যুনিটিভ পুলিস এবং জোর-জুলুমের কর্ম নহে।

"দেবই হউন আর মানবই হউন, লাটই হউন আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা, আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই-সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্ধ্বে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখো, এই সমস্ত বড়ো বড়ো নামধারী মিথ্যাকে তোমার সর্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার করো; ইহারা যেন বিভীষিকার মুখোশ পরিয়া অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সংকুচিত করিতে না পারে।..."

[রাজভক্তি—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪৪১]

ঠিক সেই সময় বেনারস-কংগ্রেসে যুবরাজের ভারত-সফর উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া প্রথম প্রস্তাবটি পাস হইয়া গেল। সভাপতি গোখ্‌লে তাঁহার অভিভাষণের শুরুতেই বলিলেন,

"Gentlemen, our first duty to-day is to offer our most loyal and dutiful welcome to Their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales on the occasion of this their first visit to India. The Throne in England is above all parties—beyond all controversies. It is the permanent seat of the majesty, the honour and the beneficence of the British Empire. And in offering our homage to its illustrious

occupants and their heirs and representatives, we not only perform a loyal duty, but also express the gratitude of our hearts for all that is noble and high minded in England's connection with India..."

[Congress Presidential Addresses : Vol I. p. 686]

রবীন্দ্রনাথ গোখ্‌লের মত সর্বভারতীয় কোনো কংগ্রেস-নেতা ছিলেন না। কিন্তু ব্রিটিশ সম্রাট বা সিংহাসনের এই ধরনের স্তুতিবাদ কখনও তাঁহার নিকট হইতে শুনা যায় নাই।

স্বদেশী আন্দোলনকারীদের উপর তখন ইংরাজের দমননীতি প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। এমন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। 'স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন' নামক প্রবন্ধে (ভাণ্ডার, ১৩১২ ফাল্গুন) তিনি লিখিলেন,

"বাংলাদেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা আজ যখন সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে।...যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অদ্য কঠিনব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ যেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার স্বর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে। বন্দে মাতরম্।" [গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৬৬৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আপন জমিদারিতে পল্লী-উন্নয়ন ও পল্লীর অর্থ নৈতিক ভিত্তিকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করিতেছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। চিরাচরিত মান্ধাতা-আমলের কৃষি-পদ্ধতিতে যে গ্রামের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির কোনোই সম্ভাবনা নাই, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। আধুনিক উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও গোপালন-ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত না করিলে গ্রামের অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব নহে—এমন কথাও তিনি তখন চিন্তা করিতেছিলেন। এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকায় বিজ্ঞান ও কৃষি-বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য প্রেরণ করেন (২০শে চৈত্র ১৩১২)। ঐ সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া তাঁহারা এদেশের গ্রামোন্নয়ন কার্যে তাঁহাদের শিক্ষা প্রয়োগ করিবেন, ইহাই ছিল কবির আশা ও কামনা।

॥ বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন ॥

সকলেই জানেন বরিশালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন কী তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। ফলে তখন কুখ্যাত অত্যাচারী দাম্ভিক ফুলারের নির্দেশে সারা বরিশাল শহরে গুর্খাসৈন্যদের অত্যাচার চরমে উঠে, বয়কটকে উপলক্ষ করিয়া হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা হয়; এবং আন্দোলনকারীদের উপর পিউনিটিভ পুলিসের অত্যাচার সীমা ছাড়াইয়া যায়।—এমন অবস্থায় নেতৃবর্গ বরিশাল শহরেই প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করিয়া বসিলেন। এই প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হন আবদুল রসুল। সেই সাথে প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলনেরও আয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি মনোনীত হন।

কিন্তু সম্মেলনের উদ্বোধনের দিন (১লা বৈশাখ ১৩১৩) যখন সুরেন্দ্রনাথ, আবদুল রসুল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মিছিলটি সভা-মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন অকস্মাৎ পুলিসবাহিনী সেই শোভাযাত্রার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লাঠি ও বেটন চালাইয়া শোভাযাত্রাটিকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। এইসময় সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবর্গের অনেকে এবং বহু শোভাযাত্রাকারী পুলিসের লাঠিতে আহত হন। অতঃপর ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে প্রাদেশিক সম্মেলন নিষিদ্ধ হইল। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারিবে না, এই অপমানজনক শর্তে নেতৃবৃন্দ রাজী না হওয়ায় প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলনও স্থগিত রহিল। নিদারুণ অপমান, লাঞ্ছনা পরাজয়ের গ্লানি লইয়া নেতারা ফিরিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথও বোলপুরে ফিরিলেন।

বরিশালের পরাজয়ের পরই বাংলা-কংগ্রেসে আদর্শ ও নীতিগত বিরোধ দেখা দিল। যে যুবশক্তি এই আন্দোলনের প্রধান প্রাণশক্তিস্বরূপ ছিলেন, বরিশালে ও দেশের সর্বত্র তাঁহাদের উপরই নির্যাতনের ঝড় বহিয়া গেল। কংগ্রেসের চিরাচরিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর ক্রমশই তাঁহাদের প্রবল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। প্রথমেই নেতৃত্ব লইয়া বিরোধের প্রকাশ দেখা গেল। প্রাচীনপন্থীদের নেতৃত্ব করিতেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং নব্যপন্থী 'এক্সট্রিমিস্টস্' বা 'চরমপন্থী'দের নেতৃত্ব করিতেছিলেন বিপিনচন্দ্র। সুরেন্দ্রনাথ তখনও বাংলাদেশের একছত্র নেতা।

কিন্তু নবীনদের মধ্যে এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিপিনচন্দ্রের প্রভাবও কম ছিল না। বিশেষত বিপিনচন্দ্রের তেজোদৃপ্ত বাগ্মীতা ও লেখা বাংলার তরুণ ও যুবসমাজের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিল। তাহা ছাড়া, বয়কট ও নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধের মূল পরিকল্পনা ছিল বিপিনচন্দ্রের। বিপিনচন্দ্রের জয়লাভের অর্থ—তাঁহার বয়কট ও অসহযোগনীতির জয়লাভ। সুতরাং নেতৃত্বের জয়পরাজয়ের সহিত আদর্শ ও নীতিগত প্রশ্নটি জড়িত ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের এই সংকট-মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি হইতে একেবারে দূরে থাকিতে পারিলেন না। তাই অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি এ সম্পর্কে লিখিলেন 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ এবং তাহা কলিকাতায় পশুপতিনাথ বসুর সৌধপ্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভায় পাঠ করিলেন (১৫ই বৈশাখ ১৩১৩)।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি বরিশালের ঘটনার উল্লেখ করিতে গিয়া বলিলেন,

"এবারে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে বাঙালি খুব একটা আঘাত পাইয়াছে, সে কথা সকলেই জানেন।...আইন কলের রোলারের মতো নির্মমভাবে আমাদের অনেক আশা দলন করিতে পারে, কিন্তু পুলিসের সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ বলিতে কী বুঝায়, সশরীরে তাহার অভিজ্ঞতালাভ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের সদাসর্বদা ঘটে না। এবারে অকস্মাৎ তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া দেশের মান্যগণ্য লোকের চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।...

"সেদিনকার উপদ্রবে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের ছাত্রদলের, যুবকগণের ও নায়কবর্গের অবিচলিত স্থৈর্য দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন।..."

বরিশালের ঘটনার পর সারা দেশের যুবশক্তি তখন নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসিতেছে। রবীন্দ্রনাথ এমতাবস্থায় ধৈর্য ধরিয়া আপন লক্ষ্য ও কর্তব্যপথে অবিচল থাকিবার জন্য দেশের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। তিনি বলিলেন,

"দেশের হিতসাধন একটা বৃহৎ মঙ্গলের ব্যাপার, নিজের প্রবৃত্তির উপস্থিত চরিতার্থসাধন তাহার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। যদি এই বৃহৎ লক্ষ্যটাকে আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে যথার্থভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি, তবে ক্ষণিক উত্তেজনা, ক্ষুদ্র অন্তর্দাহ আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না।"

তারপর তিনি বয়কট আন্দোলনের আদর্শ ও নীতিগত প্রশ্নটি পুনর্বিচার করিতে গিয়া বলিলেন,

"আপনাদের কাছে আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি, বাঙালির মুখে 'বয়কট' শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন

সংকোচজনক কথা আর নাই। বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষে নিজের ভালো করিলাম না, আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভালো করিতে বসিয়াছি, একথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে। আমি অনেক বক্তাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে শুনিয়াছি—'আমরা য়ুনিভার্সিটিকে বয়কট করিব।' কেন করিব। য়ুনিভার্সিটি যদি ভালো জিনিস হয়, তবে তাহার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আড়ি করিয়া দেশের অহিত করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই।…কচ দৈত্যগুরুর আশ্রমে আসিয়া দৈত্যদের উৎপীড়ন ও গুরুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধৈর্য ও কৌশল অবলম্বনপূর্বক বিদ্যালাভ করিয়া দেবগণকে জয়ী করিয়াছেন। জাপানও য়ুরোপের আশ্রম হইতে এইরূপ কচের মতোই বিদ্যালাভ করিয়া আজ জয়যুক্ত হইয়াছেন। দেশের যাহাতে ইষ্ট, তাহা যেমন করিয়াই হউক সংগ্রহ করিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত সহ্য করা পৌরুষেরই লক্ষণ—তাহার পর সংগ্রহকার্য শেষ হইলে স্বাতন্ত্র্যপ্রকাশ করিবার দিন আসিতে পারে।…

"আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, দেশে স্বদেশী উদ্‌যোগ আজ যে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বয়কট তাহার প্রাণ নহে। একটা তুচ্ছ কলহের ভাব কখনোই দেশের অন্তঃকরণকে এমন করিয়া টানিতে পারিত না। এই যে স্বদেশী উদ্‌যোগের আহ্বান-মাত্রে দেশ এক মুহূর্তে সাড়া দিয়াছে, কার্জনের সঙ্গে আড়ি তাহার কারণ হইতেই পারে না…আজ আমরা স্বায়ত্তভাবে দেশের শিক্ষার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, রাগারাগিই যদি তাহার ভিত্তিভূমি হয়, তবে এই বিদ্যালয়ে আমরা জাতীয় অগৌরবের স্মরণস্তম্ভ রচনা করিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে বয়কটের বিরুদ্ধে কথা বলিলেও তিনি যে বয়কট আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে, তাহা নহে। তিনি পূর্বেই বারবার যথাসম্ভব বিলাতী পণ্য (বিশেষ করিয়া বিলাসিতার দ্রব্য) বর্জন করিয়া স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আবেদন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু নরমপন্থী ও চরমপন্থী—উভয়পক্ষই বয়কট আন্দোলনকে ইংরাজের বিরুদ্ধে একটা বিশেষ চাপ দিবার অস্ত্র ও কৌশল হিসাবেই দেখিতেছিলেন। স্বদেশী শিল্প, জাতীয় শিক্ষা-পুনর্গঠন তাঁহাদের কাছে অনেকটা গৌণ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল; তাছাড়া পল্লীসমস্যা ও পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কে ইঁহাদের কাহারও কোনো আন্তরিক আগ্রহ ছিল না। এবং ইহাই ছিল নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান অভিযোগ। রবীন্দ্রনাথ বয়কটকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে না দেখিয়া উহার মাধ্যমে স্বদেশীয়ানা ও পল্লীসমাজ পুনর্গঠনকেই মুখ্য করিতে চাহিলেন। বয়কট আন্দোলন ও উহার নেতৃত্বের দুর্বলতা সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক

আন্দোলনে এই বয়কট আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও অবদান আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উহার তৎপর্যটি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক আদর্শ-নীতির বিরোধের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ যে কিছুটা বিভ্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি নীতিগত বিরোধের প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়া নেতৃত্বের প্রশ্নটিই বড়ো করিয়া তুলিয়া ধরিলেন,

"দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে—কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা।...ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই।..."

নেতৃত্বের সেই বিরোধের দিনে তিনি সুরেন্দ্রনাথকেই নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

"আপনাদের যদি অভিমত হয়, তবে আর কালবিলম্বমাত্র না করিয়া বঙ্গদেশের এই মঙ্গলমহাসনে সুরেন্দ্রনাথকে অভিষেক করি। জানি, এরূপ কোনো প্রস্তাব কখনোই সর্ববাদিসম্মত হইতে পারে না, কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চিরদিন কেবল অপেক্ষা করিয়াই থাকা হইবে। ..."

সুরেন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করিলেও তিনি যে সুরেন্দ্রনাথের বা মডারেটদের রাজনীতিকে সমর্থন করিলেন, তাহা নহে। তাই, সাথে সাথে তিনি বলিলেন,

"যাঁহারা পিটিশন্ বা প্রোটেস্ট্, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ির বাঁধা রাস্তাটাতেই ঘন ঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন আমি সে দলের লোক নই, সে কথা পুনশ্চ বলা বাহুল্য।..."

তারপর কবি বলিলেন,

"তবে নায়ক হইবার সার্থকতা কী, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। নায়কের কর্তব্য চালনা করা—ভ্রমের পথেই হউক, আর ভ্রম-সংশোধনের পথেই হউক। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে; কারণ, চলা স্বাস্থ্যকর, বলকর।...ভুল করাকে আমি ভয় করি না, ভুলের আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট থাকাকেই আমি ভয় করি। দেশের বিধাতা দেশকে বারংবার অপথে ফেলিয়াই তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন—গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া তাহাকে পথ চিনাইতে পারেন না।...

"অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে।..."

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৬৫৭-৬০ ও ৬৫৫ (গ্রন্থপরিচয়) এবং পৃঃ ৪৯২-৯৫]

পূর্বলিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধের ন্যায় এই প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়ন ও পল্লী-সংস্কারের দিকে দেশকর্মিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ 'ডন্ সোসাইটির ছাত্রসমাজে পর পর দুইটি বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি বার বার পল্লী সংগঠনের উপর জোর দেন। একটি বক্তৃতায় তিনি বলিলেন,

"এখন আমাদের ছোটো ছোটো জায়গায় **organisation** তৈরি করা উচিত। কিছুদিন হইতে আমি 'পল্লী-সমিতি' স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সেটা সফল হয় নাই।…আমাদিগকে এখন পল্লীর **patriotism** জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা যদি পল্লীর সকল অভাবমোচনের ভার নিজেরা গ্রহণ করি, তাহা হইলে পল্লীকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারি।…আত্মশক্তি চালনা করিয়া কর্তৃত্বের প্রকৃত অধিকারী হওয়ার জন্য এইরূপ 'পল্লী-সমিতি'তে আমাদের এখন হাতে খড়ি করিতে হইবে।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ১৪১]

রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' ও অন্যান্য প্রবন্ধে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে যে সব কথা বলিয়াছিলেন, 'পল্লী-সমিতি'র খসড়ায় উহা আরও পরিষ্কার ও সংবদ্ধভাবে উপস্থাপন করিলেন। এই খসড়াটি পাঠ করিলে দেখা যায়, পল্লীর যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কী গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। পল্লীর শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সব কথা চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। আজও সেগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুব কম নহে। রবীন্দ্রনাথ যে এই পল্লী-সমিতিগুলিকে নিছক পল্লী-উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন তাহা নহে। ঐ খসড়ায় ১৫নং অনুচ্ছেদে পরিষ্কার উল্লেখ করিয়াছিলেন, "জেলা সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যে [কন্‌গ্রেস] ও কার্যের সহায়তা করা" এই সমিতিগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য।

কিন্তু তবুও একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ গ্রামদেশের প্রধানতম সমস্যা, সেই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থাকে যেন কোথাও দেখিতে পাইলেন না। জমিদার-মহাজনের শোষণ-অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবার হাতিয়ার বা অস্ত্রহিসাবে ঐ পল্লী-সমিতিগুলিকে ব্যবহার করিবার কথা তিনি চিন্তা করিতে পারিলেন না।

॥ শিক্ষা-সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ ॥

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলার জাতীয় চিত্তের যে সামগ্রিক উন্মেষ দেখা দেয়, তাহার ফলেই জাতীয় শিক্ষার প্রশ্নটি বড়ো হইয়া দেখা দিল। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের মুখে নেতৃবৃন্দ কিভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষা-সমস্যা লইয়া চিন্তা-ভাবনা শুরু করিতে বাধ্য হইলেন, পূর্বেই তাহা আলোচিত হইয়াছে। সেই সময়েই 'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ' গঠিত এবং কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য 'বেঙ্গল টেক্‌নিকেল ইনস্টিটিউট' নামে একটি টেক্‌নিকেল স্কুলও এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন প্রধান প্রশ্ন দেখা দিল—জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষানীতি কী হইবে? জাতীয় শিক্ষায়তনগুলি কি তৎকালীন ইংরাজ-শাসিত য়ুনিভার্সিটিগুলির হুবহু নকল হইবে, না কি স্বকীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যে গড়িয়া উঠিবে ?

জাতীয় নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ নিজেদের স্বাধীন পরিচালনায় সরকারী প্রভাবমুক্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহারা ছিলেন বিলাতের শিক্ষা-বিধি ও শিক্ষাদর্শ এদেশে প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। জাতীয় নেতৃবৃন্দের অপর এক অংশ আমাদের জাতীয় শিক্ষার মধ্যে হিন্দু ধর্মীয় চিন্তা ও হিন্দু জাতীয়তার ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

এমন দিনে জাতীয় শিক্ষা-সমস্যা লইয়া রবীন্দ্রনাথও যে বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বারবার তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন, 'দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।'

'দেশনায়ক' প্রবন্ধটি পাঠ করিবার পর রবীন্দ্রনাথ দেশের শিক্ষা-সমস্যা লইয়া পর পর চারিটি প্রবন্ধ লিখিলেন। ইহার মধ্যে 'শিক্ষা-সংস্কার' প্রবন্ধটি ভাণ্ডার পত্রিকায় (১৩১৩ আষাঢ়) এবং 'শিক্ষা-সমস্যা', 'জাতীয় বিদ্যালয়' ও 'আবরণ' নামক প্রবন্ধ তিনটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১৩১৩ আষাঢ় ও ভাদ্র) প্রকাশিত হয়।

ইংরাজরা কিভাবে আয়র্লণ্ডের জাতীয় ভাষা ও শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিয়া আইরিশদের জোর করিয়া 'ইংরাজ' বানাইবার চেষ্টা করিতেছে, শিক্ষাসংস্কার প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহার বিস্তারিত ইতিহাস তুলিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন যে,

ঠিক অনুরূপ মনোবৃত্তি ও অভিসন্ধি লইয়া ইংরাজরা আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ঢালিয়া সাজিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি আরও বলিলেন,

"কর্তৃপক্ষ আজকাল আমাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিক্যাল মতলবকে সাঁধ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বুঝা কঠিন নহে। সেইজন্য তাঁহারা শিক্ষা-ব্যাপারে দেশীয় লোকের স্বাধীনতা নানা দিক হইতে খর্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শিক্ষাকে তাঁহারা শাসনবিভাগের আপিসভুক্ত করিয়া লইতে চান। এখন হইতে অনভিজ্ঞ ডাইরেক্টরের পরীক্ষিত, অনভিজ্ঞ ম্যাকমিলান কোম্পানির রচিত, অতি সংকীর্ণ, অতি দরিদ্র এবং বিকৃত বাংলার পাঠ্যগ্রন্থ পড়িয়া বাঙালির ছেলেকে মানুষ হইতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের বইগুলি এমনভাবে প্রস্তুত ও নির্বাচিত হইবে যাহাতে নিরপেক্ষ উদার জ্ঞানচর্চা পোলিটিক্যাল প্রয়োজনসিদ্ধির কাছে খণ্ডিত হইয়া যায়।

"শুধু তাই নয়। ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাকে যে পরিমাণে পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, ইহাতে তাহাদিগকে নিঃসত্ব করা হইবে।..."

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য,

"আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এদেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তিপত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।

"...চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।..." [শিক্ষাসংস্কার—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১২শ খণ্ড ।। পৃঃ ২৯৩-৯৪]

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার স্বেচ্ছাচারী জারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মনীষী টলস্টয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিলেন।

শিক্ষাসমস্যা প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ওভারটুন হলের এক বিরাট জনসভায় পাঠ করেন (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩)। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও নীতি কী হওয়া উচিত, সেই সম্পর্কে তাঁহার মতামত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কয়েকজন সভ্য এই পরিষদের স্কুল-বিভাগের একটি গঠন-পত্রিকা রচনা করিবার ভার রবীন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। এই কার্যে অগ্রসর হইতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যে সব বাধাবিপত্তি অনুভব করেন, শিক্ষা সম্বন্ধে তৎকালীন প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সহিত যে-সব ক্ষেত্রে তাঁহার মতাদর্শগত মৌলিক বিরোধ দেখা দেয়, এই প্রবন্ধে সেইগুলিই তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিলেন।

সর্বপ্রথম তিনি দেশের তৎকালীন প্রচলিত স্কুলগুলির যান্ত্রিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিলেন,

"ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাতা কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।...

"য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে।

"এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

"কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপর চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা নির্জীব। তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে-বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে ঘরের সঙ্গে, তাহার মিল দেখিতে পাই না।...এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে—তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

"বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিংইস্কুল আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিংইস্কুল বলিতে যে-ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়—তারা বারিক, পাগলাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠীভুক্ত।"

ইংরাজী স্কুলগুলির শিক্ষাবিধির ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে এমন সুন্দর বিশ্লেষণ সেদিন অন্তত এদেশে আর কাহারও মুখ হইতে শুনা যায় নাই।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন তপোবনের আদর্শে জাতীয় শিক্ষা ও বিদ্যানিকেতনগুলি পুনর্গঠিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। অবশ্য তিনি যে প্রাচীন তপোবনের হুবহু অনুকরণের বা সেই যুগে প্রত্যাবর্তনের কথা বলিলেন, এমন নহে। তাই তিনি সতর্ক করিয়া দিলেন, 'ঠিক সেই দিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র।' অর্থাৎ প্রাচীন তপোবন বা আশ্রম শিক্ষার মূল ভাবটি আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া উহার প্রয়োগ করিতে হইবে। এইসব আশ্রম-বিদ্যানিকেতনে ছেলেরা 'ব্রহ্মচর্যে'র দ্বারা জীবনকে ও প্রবৃত্তিগুলিকে

সংযত করিতে শিক্ষা করিবে। ব্রহ্মচর্য বলিতে নীতিকথা শুনানো নয়; এবং সেইজন্যই তিনি নীতি উপদেশের তীব্র সমালোচনা করিতে গিয়া বলিলেন,

"ব্রহ্মচর্য পালনের পরিবর্তে আজকাল নীতিপাঠের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।…ইহাও ঐ কলের ব্যাপার। নিয়মিত প্রত্যহ খানিকটা করিয়া সালসা খাওয়ানোর মতো খানিকটা নীতি-উপদেশ—ইহা একটা বরাদ্দ; শিশুকে ভালো করিয়া তুলিবার এই একটা বাঁধা উপায়। নীতি-উপদেশ জিনিসটা একটা বিরোধ। ইহা কোনো-মতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়।…"

দ্বিতীয়ত আশ্রম-শিক্ষার মধ্যে তিনি বাল্যকাল হইতেই ছেলেদের সহিত বিশ্বপ্রকৃতির একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়া শিক্ষাকে আনন্দজনক ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার প্রস্তাব জানাইলেন,

"শুধু এই ব্রহ্মচর্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই।…

"…গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য, ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

"যে জলস্থলআকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছে, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদারমন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব।…

"…আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতাবশত জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি তবু চেষ্টা করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই।… হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলো—মাতৃগর্ভের দশমাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিয়ো না, তাহাদিগকে দয়া করো।"

শিক্ষাশাস্ত্রীদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য থাকিলেও তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের এই মূল বক্তব্যটির সহিত প্রায় সকলেই একমত হইবেন।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রমবিদ্যালয়ের পরিকল্পনার আর একটু বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন। যথা—বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা জমি থাকিবে, ছাত্রেরা তাহাতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় কিছু আহার্য উৎপন্ন করিবে, কৃষি ও গোপালনে ছাত্রেরা যোগ দিবে, স্বহস্তে ফুলের বাগান করিবে এবং অযথা টেবিল চেয়ার ও ইমারতের হাঙ্গামা না করিয়া অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে; এবং সেই সব বিদ্যানিকেতনে শিক্ষকগণও আদর্শ-জীবন যাপন করিয়া ছাত্রদেরও আদর্শ চরিত্রগঠনে উদ্বুদ্ধ করিবেন। তিনি বলিলেন,

"…যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত; ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক…।"

[শিক্ষাসমস্যা—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১২শ খণ্ড ।। পৃঃ ২৯৭-৩১৩]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এই পরিকল্পনাটিকে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্যে বাস্তবে রূপায়ণের সাধনায় আপনাকে নিয়োজিত রখিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের এই আশ্রম-বিদ্যালয় পরিকল্পনাটি মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদের উপর ছিল প্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন,

"…রবীন্দ্রনাথ যাহাকে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ বলিয়া প্রচার করিলেন, তাহা যথার্থত হিন্দুদের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ, তাঁহার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ। বলা বাহুল্য, তখন পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের আদর্শে হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের লোকের স্থান নির্দিষ্ট হয় নাই; এমন কি হরিজনদেরও স্থান পাওয়া কঠিন ছিল; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শকে সর্বদেশ, সর্বজাতি গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া উহাকেও 'জাতীয়' বলা যায় না।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ১৫০]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসমস্যা প্রবন্ধটি লইয়া তখনই এই ধরনের কিছু কিছু সমালোচনা উঠিয়াছিল। ঐ সময় চট্টগ্রামের কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিলেন,

"আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবানুযায়ী শিক্ষাদানপ্রণালী পরিবর্তন করিলে তেমন সার্বজনীন সাম্যভাব সর্বথা রক্ষিত হইতে পারিবে কিনা, তদ্বিষয়ে সংশয় আছে। আশা ছিল তাঁহার প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান বালকবৃন্দের শিক্ষার একটা সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। দুঃখের বিষয়, আমাদের সে আশা তেমনভাবে পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার অভীপ্সিত ব্যবস্থা কেবলমাত্র হিন্দুসন্তানগণেরই সর্বাংশে উপযোগী ও কল্যাণকর হইলেও হইতে পারে।" [ভাণ্ডার, ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের এই হিন্দুজাতীয়তাবাদের মোহ-আবরণ কিভাবে ভাঙিয়া যায়, কিভাবে তাঁহার শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম একদিন নিখিলমানবের ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়, যথাসময়ে আমরা সে ইতিহাস আলোচনা করিব।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধের প্রায় মাস দেড়েক পর জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের উদ্বোধন সভায়

রবীন্দ্রনাথ জাতীয় বিদ্যালয় প্রবন্ধটি পাঠ করেন (২৯শে শ্রাবণ, ১৩১৩)। ডঃ রাসবিহারী ঘোষ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় বিদ্যালয় বা শিক্ষানীতি লইয়া বিশেষ কিছু আলোচনা করিলেন না। তিনি শুধু আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্যটি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন,

"আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম, আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশ-দেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে—জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল। এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না;—সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তিতে নূতন ব্যাপ্তিলাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে।··"

এই প্রবন্ধে তিনি আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষা ও ভীরু প্রকৃতিটিকে আঘাত করিয়া বলিলেন,

"···হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভালো করিয়া দেখি, পরের বচন দিয়া না দেখি।···পাঠ্যপুস্তকটির সহিত আমাদের যে কথাটি না মিলিবে তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমনকি, আমরা ভুল করিতেও সংকোচ বোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই, সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শত শত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক ভালো।···"

[জাতীয় বিদ্যালয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১২শ খণ্ড ।। পৃঃ ৩২০-২১]

॥ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও গণসংযোগের প্রশ্নে

এই বৎসরই (১৯০৬) ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বাবিংশতম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের শুরুতেই কংগ্রেসের 'নরমপন্থী' ও 'চরমপন্থী'দের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু সভাপতি, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা, দাদাভাই নৌরজীর মধ্যস্থতায় এই বিরোধ সাময়িকভাবে চাপা রহিল। লালা লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থীদের এই তিনজন নেতাই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনেই বিপিনচন্দ্র বয়কট-প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তাঁহার বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক ভাষণ 'Boycott of Association with Government' পাঠ করিলেন। দাদাভাই নৌরজী বিরোধ এড়াইবার জন্য এই অধিবেশনেই স্বরাজ বা Self-Government-এর লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করিলেন। সংক্ষেপে তিনি ঔপনিবেশিক স্বরাজের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,

"...Instead of going into any further divisions or details of our rights as British citizens, the whole matter can be compromised in one word—'Self-Government' or *Swaraj* like that of the United Kingdom or the Colonies".

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. p. 724]

অবশ্য দেশ যে তখনো সেই স্বরাজের জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত হইতে পারে নাই, সাথে সাথে তিনি সে কথারও উল্লেখ করিলেন। তাহার জন্য তিনি দেশকে নিয়মতান্ত্রিক পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবার আহ্বান জানাইলেন। মুশকিল বাধিল সংগ্রামের নীতি-কৌশল লইয়া। বিপিনচন্দ্রের বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গৃহীত হইল না বটে, তবে বঙ্গবিচ্ছেদ প্রতিরোধ করিবার ক্ষেত্রে উহার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নীতি হইল—সমগ্র দেশব্যাপী এ্যাজিটেশন আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও তীব্রতর করিয়া তোলা। নৌরজী বলিলেন,

"...Agitate, agitate over the whole length and breadth of India in every nook and corner—peacefully of course—if we really mean to get justice from John Bull....The Bengalees, I am glad, have learnt the lesson and have led the march....

"Agitate; agitate means inform. Inform, inform the Indian people what their rights are...and inform the British people of the rights of the Indian people and why they should grant them. If we do not speak, they say we are satisfied."

[Ibid. pp. 739-40]

যাহাই হউক, বাংলা দেশের ক্ষেত্রে 'স্বরাজ', 'স্বদেশী', 'বয়কট' ও 'জাতীয় শিক্ষা'—এই চারিটি প্রস্তাবই সমর্থিত হইল। সামগ্রিকভাবে বাংলার চরমপন্থীরা ইহাতে অনেকটা আশ্বস্তবোধ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন সত্য, তবে কোন বিতর্কে যোগ দেন নাই বা কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই ; যদিও তিনি বয়কট আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং কিছুদিন আগে সুরেন্দ্রনাথকেই দেশের নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। এই অধিবেশনে একটি শিল্প-প্রদর্শনী ও সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রধান আকর্ষণ ছিল এই সাহিত্য-সম্মেলনের উপর। এই সম্মেলনেই তিনি 'স্বদেশী বিবরণ সংগ্রহ' করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট আহ্বান জানাইলেন।

ইতিমধ্যে বয়কট আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া পূর্ববঙ্গে হিন্দুমুসলমান-বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দিল। বলা বাহুল্য, এইসব সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পিছনে ইংরাজের অদৃশ হস্ত অনেকখানি কাজ করিয়াছে। বয়কট আন্দোলনের নামে হিন্দুরা বিদেশী সস্তা ও উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্যগুলির পরিবর্তে অধিকতর মূল্যবান দেশী পণ্যগুলি গরীব মুসলমানদের ক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছে—ইহাই দাঙ্গার প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া সরকারী মহল হইতে প্রচার করা হইল। কিন্তু বস্তুতপক্ষে বয়কট আন্দোলনে এক শ্রেণীর মুসলমান তন্তুবায় ও জোলা সম্প্রদায়ই অনেকখানি লাভবান হইয়াছিল। আসলকথা, বয়কট একটি তুচ্ছ অছিলা মাত্র—পূর্ববঙ্গের একশ্রেণীর অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায় যে তখন কোন গোপন শক্তির ইঙ্গিতে গরীব মুসলমানগণকে দাঙ্গা ও লুটতরাজের উসকানি দিতেছিল, তাহা দিবালোকের মত সকলের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

স্যর সৈয়দ আহমদ, বদরুদ্দীন তয়াবজী, মুন্সী কেরামত আলি, নাজির আহমদ, মৌলানা শিবালি নোমানি প্রভৃতি নেতৃস্থানীয়দের প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজের মধ্যে আস্তে আস্তে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ঘটিতে থাকে। প্রথম হইতেই মুসলিম সমাজের এই নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে দুইটি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। একটি অংশ জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া ইংরাজের আনুকূল্যলাভের চেষ্টা শুরু করেন। সৈয়দ আহমদ ছিলেন ইঁহাদের নেতৃস্থানীয়।

স্যর সৈয়দ আহমদকে আধুনিক মুসলিম সমাজের জনক বলিলে হয়ত ভুল বলা হয় না। তিনি প্রথম হইতেই ছিলেন মুসলিমদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে। তিনি যে নিছক কংগ্রেস বিরোধিতাকেই সমর্থন করিতেন, তাহা নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজকে উন্নত করিতে হইলে আপাতত কোনক্রমেই ইংরাজ-বিরোধিতা করা ঠিক হইবে না। মুসলিমদের ভালো করা এবং উন্নত করাই ছিল তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। 'ইংরাজ-তোষণ'কে তাই তিনি কতকটা কৌশলগত দিক হইতে ব্যবহার করিয়া তাহার সুযোগ লইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই নীতির পূর্ণ সুযোগ লইয়াছিল ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ। কারণ, এই নীতির ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন হইতে ভারতের বিরাট মুসলিমসমাজ দূরে থাকিয়া যায়। এবং ইংরাজ-কুটনীতি এই বিচ্ছেদকে আরও ইন্ধন যোগাইয়া স্থায়ী করিতে থাকে।

আর একটি অংশ কংগ্রেসে যোগদান করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করিতে চাহিলেন। ইঁহাদের নেতৃত্ব করিতেছিলেন বদরুদ্দীন তয়াবজী, আর. এম. সায়ানী প্রমুখ নেতৃবর্গ। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনে একশ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমান যোগদান করেন। আবদুল রসুল ও লিয়াকৎ হোসেন ছিলেন তাঁহাদের নেতৃত্বে। স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহাদের অবদান নিতান্ত অল্প নহে।) অবশ্য সংখ্যায় তাঁহারা ছিলেন অতি অল্প। সুতরাং মুসলিম সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশটি জাতীয় আন্দোলনের বাহিরেই থাকিয়া যায়। এবং তাহার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মুসলিম সমাজের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে থাকে। ইঁহাদের চেষ্টায় ১৯০৬ সালে আগা খাঁর নেতৃত্বে 'মুসলিম লীগ' দল গঠিত হইল।

মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের নামে কংগ্রেসের বিরোধিতা ও ইংরাজের আনুকূল্যলাভ করাই হইল এইদলের মূল লক্ষ্য। শুধু তাহাই নহে, এইসব প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবর্গ মুসলিম জনগণের মধ্যে একটি তীব্র সাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অবশ্য ইহার ক্ষেত্র-প্রস্তুতির জন্য হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে কিছুটা দায়ী, একথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। ভারতের জাতীয় সংস্কৃতিতে ঐশ্লামিক সভ্যতার অবদানগুলিকে তৎকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারা বিশেষ স্বীকৃতি দিতেন না।

দেশের এইসব গুরুতর সমস্যা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে বিচলিত ও চিন্তিত করিয়া তুলিল। তাই কিছুকাল পরে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নামক একটি প্রবন্ধে (প্রবাসী, ১৩১৪ শ্রাবণ) জাতীয় সমস্যা ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়া তিনি

বিস্তারিত আলোচনা করিলেন। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতার পর্যালোচনা করিতে গিয়া তিনি এই আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রশ্নটি উত্থাপন করিলেন তিনি বলিলেন,

"আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন।···

"মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়।···আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই···।"

কিন্তু কি সেই পাপ? তাহার উত্তরে কবি বলিলেন,

"হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই।···

"··এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমবা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

"আমরা বহুশত বৎসব পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ—তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই।···

"আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমে এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

"···যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।"

লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-সমাজকেই উদ্দেশ্য করিয়া হিন্দু-সমাজের দোষত্রুটিগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। মুসলমান বা ম্লেচ্ছ সমাজের

প্রতি হিন্দু-সমাজের ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং সামাজিক অবমাননাকর ব্যবহারগুলিই যে পরোক্ষভাবে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক চেতনা ও হিন্দুবিদ্বেষকে প্ররোচিত করিয়া তুলিতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিলেন। স্বদেশকে উদ্ধার করিতে হইলে নিজেদেরকে এই সামাজিক পাপ হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে, ইহাই কবির মূল বক্তব্য।

দ্বিতীয়ত এই প্রবন্ধে তিনি পুনরায় জাতির দৃষ্টিকে গ্রাম-সমস্যার দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন। কবির বক্তব্য, এই দরিদ্র কৃষকদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করার মধ্যেই আমাদের স্বাদেশিক বা জাতীয় আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতাটি নিহিত রহিয়াছে। তাই তিনি বলিলেন,

"...আজ আমাদের ইংরেজি-পড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে আমরা উভয়ে 'ভাই'—তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহাদিগকে আমরা 'চাষা বেটা' বলিয়া জানি, যাহাদের সুখদুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গবর্মেণ্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় তাহাদের নিকট ভাই-সম্পর্কের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিস কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা। সন্দেহ জন্মিয়াও ছিল। কোনো বিখ্যাত 'স্বদেশী' প্রচারকের কাছে শুনিয়াছি যে পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে, বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ...চাষী ঠিক বুঝিয়াছিল।...উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্রব্যক্তির কাছেও তাহা বিস্বাদ বোধ হয়—সে উদ্দেশ্য খুব বড়ো হইতে পারে, হউক তাহার নাম 'বয়কট' বা 'স্বরাজ' দেশের উন্নতি বা আর কিছু।"

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নেও তিনি বলিলেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষে কখনই এই ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে না, যদি না তাহা যথার্থ আন্তরিক প্রেম ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মিলন হয়। উপসংহারে কবি দেশের যুবকবৃন্দকে গ্রামে আসিবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

"...যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া

রাখিয়াছে; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা করো। নূতন বা পুরাতন কোনো দলেই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক পা এক পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো।···দেশের এক-একটি জায়গায় এক-একটি মানুষ বিরলে বসিয়া নিজের সমস্ত জীবন দিয়া যে-কোনো একটি কর্মকে গড়িয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকুন—এই আমাদের সাধনা।···"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৬২৭-৩২]

রবীন্দ্রনাথের এই গ্রাম-সংগঠনের প্রস্তাব স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিবার মত মানসিক স্থৈর্য তখন কাহারও ছিল না—না নরমপন্থীদের, না চরমপন্থীদের। এই সময় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রবাসী পত্রিকায় (১৩১৪ আশ্বিন) "রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধে নির্দিষ্ট 'পথকেই আমাদের গন্তব্য পথ বলিযা নির্দিষ্ট' করিয়াও 'সেই পথে বিনা বাধায় চলিতে পাইব কিনা' তাহা আলোচনা করেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো মন্তব্যের প্রতিবাদও করেন।" যদিও তাঁহার প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় তিনি স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় অবদানের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানাইলেন,

"আজ যিনি আমাদিগকে আস্ফালনে ক্ষান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, বাংলার ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায়ের আরম্ভে আমি তাঁহারই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি। ইংরেজের নিকট 'আবেদন-নিবেদন' করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে কিছুই স্থায়ীলাভ হইবে না, ইংরেজের মুখাপেক্ষা না করিয়া আপনার বলে ও আপনার চেষ্টায় যেটুকু পাওয়া যায় তাহাই স্থায়ীলাভ, বঙ্গবিভাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত তীব্র হইয়া মুহুর্মুহু ঐ কথা আমাদের কানে প্রবেশ করাইতেছিল।···

"স্বদেশী আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার একটা নূতন গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। নিস্ফল ও অনাবশ্যক আন্দোলনে তিনি কখনোই উপদেশ দেন নাই; কিন্তু সে-সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না।

"উত্তেজনার বশে আমরা দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লইব না—ইংরেজের শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া লাফালাফি করিয়া আসিতেছি; এবং

ইংরেজরাজা যখন সেই লাফালাফিতে ধৈর্যভ্রষ্ট হইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আস্ফালনের নিস্ফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—ও-পথে চলিলে হইবে না—মাতামাতি-লাফালাফির কর্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে।...

"রবিবাবু কেবল 'কাজ করো' 'কাজ করো' বলিয়া উপদেশ দিয়া চীৎকারের মাত্রা বাড়াইতেছেন না, বরং কোন্ পথে কাজ করা যাইতে পারে তাহার দু-একটা নমুনাও নিজের হাতে লইয়া দেখাইতেছেন।"

[গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৬৬৪-৬৫]

যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের এই 'গ্রামে চল' ধ্বনি রাজনৈতিক উত্তেজনার মুহূর্তে কোথাও বিশেষ স্বীকৃতি বা সমাদর পাইল না। রাজনৈতিক মতবিরোধ ও বিতর্কগুলি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, তাহার কারণ সেযুগের জনসংযোগহীন বন্ধ্যা রাজনীতি। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের এ্যাজিটেশন-আন্দোলনে যে স্বরাজ পাওয়া যাইবে না, এবং ইংরাজ যে উহাকে ভ্রূক্ষেপও করে না, রবীন্দ্রনাথ তাহা ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। বয়কট আন্দোলনের সময় গ্রামের গরীব কৃষকদের কোনই সাড়া পাওয়া যায় নাই—উহার কোন তাৎপর্যও তাহারা বোঝে নাই; রবীন্দ্রনাথ তাহা ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। বয়কট আন্দোলনের সময় নেতারা যে গ্রামে গিয়া গরীব মানুষের কাছে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাঁহার কারণ তাহাদের কৃষকপ্রীতি নহে,—পলিটিক্যাল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জনগণকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া লইবার মতলব ছাড়া অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না। রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিক সংগ্রামে কোথাও কোনোদিন জনগণকে অন্ধশক্তি বা 'যন্ত্র' হিসাবে ব্যবহার করিয়া লইবার কথা সমর্থন করেন নাই। তিনি গ্রামের মানুষকে সত্যই গভীরভাবে ভালোবাসিতেন। জনগণই যে দেশের প্রধান শক্তি—এ-কথা গভীরভাবে তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই 'জনগণ' অন্ধ অশিক্ষিত জনসাধারণ নহে,—বলিষ্ঠমনা সচেতন জনগণেরই তিনি অভ্যুদয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। দেশকর্মীরা গ্রামে গ্রামে জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে, তাহারা গ্রামের যাবতীয় উন্নয়নকার্যে আত্মনিয়োগ করিবে, ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য। ইহাকেই তিনি স্বরাজলাভের 'পূর্বশর্ত' বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু এই উত্তেজনাহীন নীরব সাংগঠনিক কর্মসূচীর প্রতি দেশকর্মীদের আহ্বান জানাইলেন না, সেইসাথে তিনি নবযুগের বিদ্রোহী চেতনাকেও আহ্বান জানাইলেন। ইহার অল্পকাল আগেই তিনি তাঁহার বিখ্যাত

'সুপ্রভাত' কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। বাংলার নবজাগ্রত বিদ্রোহী যুবশক্তিকে মা ভৈঃ জানাইয়া তিনি লিখিলেন,

"খোলো খোলা দ্বার ওগো গৃহস্থ,
থেকো না থেকো না লুকায়ে—
যার যাহা আছে আনো বহি আনো,
সব দিতে হবে চুকায়ে।
ঘুমায়ো না আর কেহ রে।
হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাণ্ড ভরিয়া দেহো রে।
ওরে দীনপ্রাণ, কী মোহের লাগি
রেখেছিস মিছে স্নেহ রে।।
উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে একদিন বাংলার মুক্তিপাগল বীর সন্তানেরা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

॥ অরবিন্দ ও রবীন্দ্র ॥

বাংলাদেশে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ তীব্র আকার ধারণ করিতে থাকে। নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় পক্ষই তাঁহাদের আপন সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিজেদের মতাদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। 'বেঙ্গলি', 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি ছিল নরমপন্থী বা মডারেটদের মুখপত্র; অপরদিকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি মুখ্যত একস্‌ট্রিমিস্টস্ বা চরমপন্থীদেরই মতাদর্শ প্রচার করিত। ইতিমধ্যে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার অভ্যুদয় হয়। ১৯০৬ সালের শেষদিকে বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে লইয়া এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। বিপিনচন্দ্র ছিলেন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। পত্রিকায় বেশির ভাগ লেখাই থাকিত বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের। প্রথম হইতেই অরবিন্দের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হইল। প্রত্যহই প্রত্যুষে বন্দে মাতরমে শুনা যাইতে লাগিল তাঁহার বলিষ্ঠ সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান। অবশ্য অরবিন্দ যতখানি সম্ভব নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কাজ করিয়া যাইতেছিলেন।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। ইংরাজের নিষ্ঠুর নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলার জাগ্রত যুবশক্তি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে রুখিয়া দাঁড়াইল। বাংলাদেশের প্রথম সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'বেঙ্গল রেভল্যুশানারি পার্টি' সবার অলক্ষিতে গড়িয়া উঠিল। ভগ্নী নিবেদিতাই ছিলেন এই আদর্শের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। প্রথমে পাঁচজন সদস্য লইয়া ইহার কাউন্সিল গঠিত হয়; নিবেদিতা ছিলেন তাহার অন্যতম মহিলা সদস্য। তিনিই বরোদা হইতে অরবিন্দকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কলেজে অরবিন্দ কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। ১৯০৭ সালের মার্চমাসে তিনি বন্দে মাতরম্ পত্রিকার ভার গ্রহণ করিয়া পত্রিকার মাধ্যমে 'বিপ্লববাদ' প্রচার করিতে শুরু করেন। অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'The Doctrine of Passive Resistance'-এর উপর পর পর সাতটি প্রবন্ধ লিখেন (১১-২৩ এপ্রিল ১৯০৭)। এই প্রবন্ধগুলিতে অরবিন্দ মূলত বিপিনচন্দ্রের passive resistance-কে সমর্থন করিলেও ইংরাজের সন্ত্রাসমূলক দমননীতির বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী

একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বা defensive resistance গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইলেন [গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী—'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]। Defensive resistance বলিতে অরবিন্দ সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপই বুঝাইতেছিলেন—গণ-প্রতিরোধ সংগ্রাম নহে। আয়র্লণ্ডের 'সিন্‌ফিন্‌ সন্ত্রাসবাদ' তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাছাড়া, প্রত্যক্ষভাবে নিবেদিতার সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারা ও পরিকল্পনার প্রভাবও তাঁহার উপর কম ছিল না। অরবিন্দ একদিকে প্রকাশ্যে বন্দে মাতরমে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী লিখিতে লাগিলেন, অপরদিকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির সহায়তায় সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতিগুলি সংগঠিত করিতে লাগিলেন।

বারীন্দ্রের সম্পাদনায় যুগান্তর পত্রিকাও তখন বাংলার যুবশক্তির মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার করিতেছে। প্রায় একই সময়ে সরলা দেবী, ব্যারিস্টার পি. মিত্র ও ঢাকার পুলিন দাসের প্রচেষ্টায় 'অনুশীলন সমিতি'র গুপ্ত সংগঠনগুলি গড়িয়া উঠিতে থাকে। প্রথম হইতেই অরবিন্দ প্রমুখ বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করিয়া জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান জানাইলেন। ইতিমধ্যে বিপিনচন্দ্রের সহিত অরবিন্দের মতবিরোধ দেখা দিল। বিপিনচন্দ্র প্রকাশ্যেই বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসবাদী ভাবধারার তীব্র নিন্দাবাদ করিলেন। অপরদিকে অরবিন্দ প্রমুখ সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্য সন্ত্রাসবাদী আদর্শের সমর্থন করিলেন। ফলে বিপিনচন্দ্র সম্পাদকমণ্ডলী হইতে নীরবে সরিয়া আসিলেন।

ইহার অল্পকাল পরেই বন্দে মাতরমে রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লিখিবার অভিযোগে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলেন (১৬ই আগস্ট ১৯০৭)। এই মামলায় বিপিনচন্দ্র সম্পাদকরূপে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহূত হন। তিনি আদালতে এই মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন,

"I have conscientious objection against taking part in a prosecution which I believe to be unjust and injurious to the cause of popular freedom and the interests of public peace."

ফলে আদালত-অবমাননার দায়ে বিপিনচন্দ্রের ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল। ইহার অল্পকাল আগেই যুগান্তরে রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লিখিবার অভিযোগে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তেরও কারাদণ্ড হয়।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকিয়াই বন্দে মাতরমের মামলার খবরাখবর রাখিতেছিলেন। এই সময়ই তিনি অরবিন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া

'নমস্কার' কবিতাটি লিখিলেন (৭ই ভাদ্র ১৩১৪)। রবীন্দ্রনাথ তখনও অরবিন্দের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কোনো সংবাদ জানিতেন না। অরবিন্দকে শ্রদ্ধানিবেদনের ছলে তিনি স্বদেশীযুগের বাংলার জাগ্রত যুব-শক্তিকে 'মাভৈঃ' জানাইলেন।

"…শান্তি? শান্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর—
কপট বেষ্টন, যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলে নি অন্যায়, আপনার
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য-অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভা-মাঝে, দুর্গতির করে অহংকার,
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত-প্রায়—
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তিভারে
রাজকারা-বাহিরিতে নিত্যকারাগারে ॥"

রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন আগে সুরেন্দ্রনাথকে নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বা মডারেটদের রাজনীতিকে কিছুতেই তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। কংগ্রেসের জন্মকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে, চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতিকে তিনি সমর্থন না করিলেও তাঁহাদের বলিষ্ঠ সংগ্রামশীলতার প্রতি তাঁহার একটি অন্তরের আকর্ষণ ছিল। অরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদের বিস্তারিত খবরও তিনি রাখিতেন কিনা সন্দেহ। তবু অরবিন্দের বলিষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামের আহ্বান যেন তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অরবিন্দের কণ্ঠস্বরে যেন তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী বাংলার চরণধ্বনি শুনিতেছেন—

"…তাই শুনি আজ
কোথা হতে ঝঞ্ঝা-সাথে সিন্ধুর গর্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণপিঞ্জর টুটি, বজ্রগর্জরব
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।

এ উদাত্ত সংগীতের তরঙ্গ-মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার ।।

অরবিন্দ বাংলার যুবকদের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ব্রিটিশ রাজত্ব, পুলিসী অত্যাচার প্রভৃতি সব কিছুকেই 'মায়া' (illusion) বলিয়া উড়াইয়া দিবার কথা বলিয়াছিলেন ; তিনি হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা হইতে আত্মশক্তি আহরণের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও অনেক আগে হইতেই এই আধ্যাত্মিক শক্তির জয়গান করিয়া আসিতেছেন। এই কবিতার উপসংহারেও আমরা সেই সুরেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই,

"...দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষতি মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্বভয় ;
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার ,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।"

অল্পকাল পরে 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লিখিবার অভিযোগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন (৩১শে আগস্ট)। প্রায় দুইমাস পরে বিচারাধীন অবস্থায় ক্যাম্বেল হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয় (২৭শে অক্টোবর)। অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু সম্পর্কে কোনো কিছু লিখেন নাই, অথচ ব্রহ্মবান্ধবই ছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মূল সংগঠক। উভয়ে বহুদিন একসাথে শান্তিনিকেতনে কাজ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে 'গোরা' উপন্যাস রচনায় ব্যস্ত। তাছাড়া বিদ্যালয়ের বহু ব্যাপারেই তাঁহাকে দেখাশুনা করিতে হয়। এমনি সময় তাঁহার পারিবারিক জীবনে আর একটি বিপর্যয় দেখা দিল—কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গেল (৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৪)। রবীন্দ্রনাথ শমীন্দ্রনাথকে পুত্রকন্যাদের মধ্যে সর্বাধিক স্নেহ করিতেন। পুত্রের মৃত্যুর পর অগ্রহায়ণের শেষদিকে কবি কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে চলিয়া গেলেন।

স্বরাট কংগ্রেস ও পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলন ।

১৯০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক স্বরাট-অধিবেশন হয়। গত বৎসর কলিকাতা কংগ্রেসে বৃদ্ধ কংগ্রেস-নেতা নৌরজী সুকৌশলে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের যে বিরোধটিকে ধামা-চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বরাট কংগ্রেসের সূচনাতেই তাহা যেন প্রচণ্ড ভাবে বিস্ফোরিত হইল।

বিপিনচন্দ্র তখন কারাগারে। এই সুযোগে মডারেটপন্থীগণ ব্রিটিশ-বয়কট ও অসহযোগনীতিকে খর্ব করিয়া কংগ্রেসের পুরাতন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিকে এই অধিবেশনে পাস করাইয়া লইবার মতলব করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব হইতেই রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্বাচন করিবেন স্থির করিয়া গিয়াছিলেন। এমনকি, শুনা যায়, সভাপতির অভিভাষণটি পূর্বেই কলিকাতার কোনো কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল। রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার এই অভিভাষণে 'বয়কট' আন্দোলন ও চরমপন্থীদের তীব্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে চরমপন্থীদের পুঞ্জীভূত আক্রোশ যেন ফাটিয়া পড়িতে চাহিল। প্রথমেই বিরোধ বাধিল সভাপতি নির্বাচন লইয়া। তিলক প্রমুখ চরমপন্থীরা রাসবিহারী ঘোষের পরিবর্তে লালা লাজপৎ রায়ের নাম প্রস্তাব করিতে উঠিলেন। সুরেন্দ্রনাথ রাসবিহারীর পক্ষ সমর্থন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর দুই পক্ষের সমর্থকদের প্রবল তর্ক, চিৎকার, হট্টগোল এবং শেষপর্যন্ত হাতাহাতি, টেবিল-চেয়ার-জুতা ছোড়াছুড়িতে সে-যেন এক দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। গোলমাল ও হট্টগোলে অধিবেশন ভাঙিয়া গেল। অবশেষে মডারেটপন্থী ও চরমপন্থীরা স্বতন্ত্রভাবে সম্মেলন করিলেন। কংগ্রেসে তখনও মডারেটপন্থীদের প্রবল প্রতাপ। অপর দিকে চরমপন্থী বা সংগ্রামপন্থীরা ছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ। বস্তুতপক্ষে চরমপন্থীরা কংগ্রেস হইতে একরকম বহিষ্কৃতই হইলেন বলিতে হইবে। রাসবিহারী ঘোষ তাহার অভিভাষণে পরিষ্কার ঘোষণা করিলেন,

"...We must not forget that the National Congress is definitely committed only to constitutional methods of agitation to which it is fast moored, and if the new party does not approve of such methods and cannot work harmoniously with the old, everybody must admit it has no place within the pale

of the Congress. Secession, therefore, is the only course open to it...."

মডারেটপন্থীরা চরমপন্থীদের রাজনীতিকে কী চোখে দেখিতেছিলেন তাহা রাসবিহারী ঘোষের বক্তৃতায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। চরমপন্থীদের সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

"...Like the Sinn Fein party in Ireland, it has lost all faith in constitutional movements but it must be said to its credit that it has also no faith in physical force ; nor does it advise the people not to pay taxes with the object of embarrasing the Government. I am of course speaking of the leaders. All its hopes are centred in passive resistance of a most comprehensive kind, derived, I presume, from the modern history of Hungary, the pacific boycott of all things English. If I understand its programme aright, we must refuse to serve Government in any capacity either as paid servants or as members of Legislative Councils, Local Boards or Municipalities. British Courts of Justice should be placed under a ban and courts of arbitration substituted for them...All schools and colleges maintained by the Government should also be boycotted...All this, however, is to be effected not by physical force but by social pressure ; for there has yet arisen no party to counsel violence or any other breach of the law."

বলা বাহুল্য, যথার্থ অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবীর মত রাসবিহারী ঘোষ চরমপন্থীদের আন্দোলনের দুর্বলতাগুলি উদ্ঘাটন করিলেন, কিন্তু ইহা কেবল সংগ্রামকে এড়াইবার জন্য। পরক্ষণই তিনি কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের নীতির সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়া বলিলেন,

"...You cannot put an end to British Rule by boycotting the administration. Your only chance under the present circumstances of gaining your object lies in co-operation with the Government in every measure which is likely to hasten our political emancipation ; for so long as we do not show ourselves worthy of it, rely upon in England will maintain her rule, and if you really want Self-Government, you must show that you are fit for such responsibility. Then and then only will the English retire from India, their task completely accomplished, and their duty done."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. pp. 770-75]

চরমপন্থীরা অরবিন্দ ঘোষের সভাপতিত্বে স্বতন্ত্রভাবে সম্মেলন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের তখনও কোনো সুস্পষ্ট আদর্শ ও কর্মপন্থা নির্দিষ্ট হয় নাই। বিভিন্ন নেতা স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করিতেছেন। তিলক মডারেটদের সহিত responsive co-operation নীতিতে আস্থা প্রকাশ করিলেন। অরবিন্দ তাঁহার আপসহীন সন্ত্রাসবাদী কর্মনীতির পক্ষে গুরুত্ব দিতে লাগিলেন। বস্তুতপক্ষে তিলক পূর্বেই অরবিন্দের সন্ত্রাসবাদী নীতির বিরুদ্ধেই মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন। বৎসর খানেক আগে জনৈক ইংরাজ সাংবাদিক বন্ধুর (Nevinson) কাছে তিনি পরিষ্কারভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার ভাষণে ইহার উল্লেখ করিতে ছাড়িলেন না। বিপিনচন্দ্র তখন কারাগারে। লাজপৎ রায়ও অবশেষে মডারেটদের সহিত সম্মেলনে যোগ দিলেন। ফলত বাংলার দলে অরবিন্দ প্রায় একাকী পড়িয়া গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে। এমন সময় সুরাট-কংগ্রেসের দলাদলির খবর পৌঁছিল তাঁহার কাছে। এই সংবাদে কবি যে কিরূপ মর্মাহত হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। শিলাইদহ হইতে গভীর ক্ষোভে ও দুঃখে তিনি বিলাতে জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন (২৩শে পৌষ ১৩১৪),

"এবারকার কন্‌গ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা তো শুনিয়াছই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর দুই দলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছুদিন হইতে গবর্মেণ্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে—এখন আর সিডিশনের সময় নাই—যেটুকু উত্তাপ এতদিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া 'বন্দে মাতরম্' কাগজে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রণাপূর্ণ কোনো উদার কথা আর পড়িতে পাই না, এখন কেবল অন্যপক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইয়াছে—চরমপন্থী মধ্যপন্থী এবং মুসলমান—চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচকি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্লিরও নয় কিচেনারেরও নয়, আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।"

[প্রবাসী, ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ ।। পৃঃ ১৭৫]

রবীন্দ্রনাথ এই দুইপক্ষের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে দেশের সামগ্রিক স্বার্থটির কথাই বেশী

করিয়া দেখিতেছেন। কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ যদি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সংগঠনকেই ভাঙিয়া দেয়, তবে তাহাতে এক ইংরাজের ছাড়া আর কাহারও উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। প্রসঙ্গত একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার মত,—'বন্দে মাতরম্ কাগজে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রণাপূর্ণ' প্রবন্ধগুলি যে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, এই চিঠিতে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ প্রমুখ চরমপন্থীদের নির্ভীক কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথকে আপেক্ষিকভাবে অধিক আকৃষ্ট করে।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি উভয়পক্ষের সমালোচনা করিয়া প্রবাসীতে (১৩১৪ মাঘ) 'যজ্ঞভঙ্গ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলিলেন,

"কন্‌গ্রেস তো ভাঙিয়া গেল।

"এবারকার কন্‌গ্রেসের যাঁহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা অপ্রিয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না বলিয়া ঘর হইতে পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। স্বীকার করিলেই পাছে তাহাকে খাতির করা হয়, এই তাঁহাদের আশঙ্কা।

"চরমপন্থী বলিয়া একটা দল যে কারণেই হউক দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে, একথা লইয়া আক্ষেপ করিতে পারো কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিতে পারো না। এই দলের ওজন কতটা তাহা বুঝিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। কিন্তু যখন স্বয়ং সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্যেও এই দলের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি নিজের বিরক্তি প্রকাশকেই কর্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে করিয়াছেন···। ইহা যে ওকালতি নহে, বিরুদ্ধ পক্ষকে বক্তৃতার গদাঘাতে পাড়িয়া ফেলাই যে এই বৃহৎ কাজের পরিণাম নহে, দেশের সকল মতের লোককে একত্রে টানিয়া সকলেরই শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনে নিয়োগ করিতে উৎসাহিত করাই যে ইহার সকলের চেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য তাহা সাময়িক উত্তেজনায় তিনি মনে রাখেন নাই।···"

স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ মিঃ মালভি, রাসবিহারী, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেট নেতৃবৃন্দের মনোবৃত্তিকে নিন্দা করিলেন। অপরদিকে চরমপন্থীদের অসহিষ্ণুতা এবং মডারেট রাজনীতির যথার্থ ভূমিকা ও অবদান স্বীকার না-করার মনোবৃত্তিকে তিনি সমর্থন করিলেন না। তিনি বলিলেন,

"আবার চরমপন্থীরাও এমনভাবে কোমর বাঁধিয়া কন্‌গ্রেসের রণক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন যেন, যে মধ্যমপন্থীরা এতদিন ধরিয়া কন্‌গ্রেসকে চালনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এমন একটা বাধা যাহাকে ঠেলিয়া অভিভূত করিয়া চলিয়া

যাইবেন, ইহাতে যাহা হয় তা হোক। এবং এটা এখনই করিতে হইবে— এইবারেই জয়ধ্বজা উড়াইয়া না গেলেই নয়।

"দেশের মধ্যে এবং কন্‌গ্রেসের সভায় মধ্যপন্থীর স্থানটা যে কী তাহা সম্পূর্ণভাবে এবং ধীরতার সহিত স্বীকার না করিবার জন্য মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আগ্রহ।"

এক কথায় তিনি বলিলেন, "বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কন্‌গ্রেস ভাঙিয়াছে।..."

রবীন্দ্রনাথ নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের রাজনীতির কোনো বিতর্কের প্রশ্নে গেলেন না। কিন্তু উভয় পক্ষের রাজনীতি যে অন্তঃসারহীন—দেশের জনগণের সহিত যে উহার কোনো সংস্রব নাই, এই মূল কথাটি তিনি বুঝিয়াছিলেন। উপসংহারে তাই তিনি জনসংযোগের জন্য আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

"এই প্রসঙ্গে আমার নিবেদন এই যে, কন্‌গ্রেসকে সত্য করিয়া তুলিতে গেলে তাহা কন্‌গ্রেসের মঞ্চে বসিয়াই করা যায় না। দেশের ভিতরে সত্য কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে, তবেই সমস্ত দেশের যোগে ওই কন্‌গ্রেস সত্য হইয়া উঠিবে···। কন্‌গ্রেসকে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর দিয়া সত্য করিয়া তুলিব এই চেষ্টাই কোনো-এক পন্থীর হউক। তাহাকে এ বৎসর বা ও বৎসর কোনো রকমে দখল করিয়া বসিব এ চেষ্টা এমন মহৎ চেষ্টা নহে যাহার জন্য দুই ভাইয়ে লড়াই করিয়া কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অভিনয় করা যাইতে পারে।"

[যজ্ঞভঙ্গ—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৬৩৫-৩৮]

কিন্তু শুধু উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হইবার লোক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। সেই সময় তিনি শিলাইদহে কিছু স্থানীয় যুবকর্মী সংঘবদ্ধ করিয়া স্বয়ং পল্লী-উন্নয়ন ও পল্লী-সংস্কার কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় ব্যারিস্টার যোগেশ চৌধুরী পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার প্রস্তাব লইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন। গত বৎসর বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন পুলিসী অত্যাচারের ফলে স্থগিত রাখিতে হয়। এদিকে সুরাট-কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞের পর বাংলার উভয়-পন্থীদের দ্বন্দ্ব-বিরোধ আরও তীব্র ও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল। এমন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন। নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করিলে সম্মেলনে বিরোধের সম্ভাবনা ছিল না বলিলেই চলে। তবুও তাঁহার বিরোধী পক্ষ যে একেবারেই ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। অলক্ষিতে থাকিয়া এইসব ব্যক্তি

নানা বেনামী পত্রে রবীন্দ্রনাথকে শাসাইয়া পাবনা সম্মেলনে তাঁহাকে সভাপতিত্ব হইতে নিরস্ত করিতে চাহিলেন। কয়েকদিন পরেই কবি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিলেন (১২ই ফাল্গুন ১৩১৪),

"কনফারেন্স আমাকে সভাপতি পদে আহ্বান করায় সংবাদ পাঠাইবামাত্র নানা পক্ষ হইতে গালি সংযুক্ত এত বিনামী পত্র পাইয়াছি যে, আমি কোন্ দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল।" [বঙ্গবাসী : ৬ষ্ঠ ভাগ ।। পৃঃ ১২৩]

যাহাই হউক প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে রবীন্দ্রনাথ পাবনায় উপস্থিত হইলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনের দিন (১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৮) চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে কবিকে ইংরাজীতেই স্বাগত জানাইলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কার ভাঙিয়া দিয়া বাংলাতেই তাঁহার লিখিত ভাষণটি পাঠ করিলেন। সে-এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিন। ইহার প্রায় দশ বৎসর আগে নাটোরে প্রাদেশিক সম্মেলনে বাংলা ভাষা চালু করিবার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথই বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পূর্বেই ইহা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। এইবার পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির পদাধিকারবলে তিনি লাঞ্ছিত বাংলা ভাষাকে যথার্থ মর্যাদা দিবার বহুআকাঙ্খিত সুযোগ পাইলেন।

রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণে প্রথমেই কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ সম্পর্কে বলিলেন,

"সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার যথাযোগ্যস্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া রাখে।"

উদাহরণস্বরূপ তিনি ইউরোপীয় দেশগুলির গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার উল্লেখ করিলেন,

"য়ুরোপের রাষ্ট্রকার্যে সর্বত্রই বহুতর বিরোধী দলের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। প্রত্যেক দলই প্রাধান্যলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। লেবার পার্টি, সোশ্যালিস্ট প্রভৃতি এমন-সকল দলও রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইয়াছে যাহারা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে নানা দিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে চায়।"

এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পরিষ্কার গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রসংবলিত সরকার

গঠনের অনুকূলে মতপ্রকাশ করিতে দেখি। কংগ্রেসের পার্টি-নীতি হিসাবেও তিনি গণতান্ত্রিক ঐক্য-নীতির উপর জোর দিয়া বলিলেন,

"...সমস্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা যে মহাসভায় আমাদের ইচ্ছাশক্তির বোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন ঔদার্য যদি না থাকে যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণী ও সকল মতের লোকই সেখানে স্থান পাইতে পারেন তবে তাহাতে আমাদের ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

"এই মিলনকে সম্ভবপর করিবার জন্য মতবিরোধকে বিলুপ্ত করিতে হইবে এরূপ ইচ্ছা করিলেও তাহা সফল হইবে না, এবং সফল হইলেও তাহাতে কল্যাণ নাই।...রাষ্ট্রসভাতেও নিয়মের দ্বারা সংযত হইয়াও প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিতে না দিলে এরূপ সভার স্বাস্থ্য নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূর্ণ, ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সংকীর্ণ হইতে থাকিবে। অতএব মতবিরোধ যখন কেবলমাত্র অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা মঙ্গলকর, তখন মিলিতে গেলে নিয়মের শাসন অমোঘ হওয়া চাই।..."

এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব জানাইলেন,

"আমরা এ-পর্যন্ত কন্‌গ্রেসের ও কনফারেন্সের জন্য প্রতিনিধিনির্বাচনের যথারীতি নিয়ম স্থির করি নাই।...কিন্তু যখন দেশের মনটা জাগিয়া উঠিয়াছে...তখন প্রতিনিধিনির্বাচনকালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লইতে হইবে, এইরূপ শুধু নির্বাচনের নহে, কন্‌গ্রেসের ও কনফারেন্সের কার্য প্রণালীরও বিধি সুনির্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।"

স্মরণ থাকিতে পারে, সুরাট অধিবেশনেই কংগ্রেসের প্রথম গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। চারমাস পরে এই কমিটি এলাহাবাদে বিশেষ সম্মেলনে [১৮-১৯ এপ্রিল, ১৯০৮] তাঁহাদের খসড়া পেশ করিলে ঐ সম্মেলনে উহা আলোচিত ও সংশোধিত হইয়া পাস হইয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, এই অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষের কারণগুলি উৎপাটিত করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের আন্তরিক মিলনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করিলেন। তিনি বলিলেন,

"বাহির হইতে এই হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব।"

এই উপলক্ষে তিনি সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে সহৃদয়তা দেখাইবার জন্য হিন্দু বুদ্ধিজীবিগণের প্রতি আবেদন জানাইলেন,

"...আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেণ্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিল হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে।..."

রবীন্দ্রনাথ এই নীতিকেই হিন্দুমুসলমান-ঐক্যের পূর্বশর্ত বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। এই নীতি বাস্তবায়িত হইলে শীঘ্রই মুসলমানগণ এই তুচ্ছ রাজ-প্রসাদের মোহ কাটাইয়া উঠিয়া একদিন হিন্দুদের সহিত এক রাষ্ট্রীয় মহাসভার (কংগ্রেসের) পতাকাতলে সমবেত হইবেন, ইহাই কবির বক্তব্য।

তৃতীয়ত, এই অভিভাষণে কবি চরমপন্থীদের হৃদয়াবেগকে সহৃদয়তার সহিত বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। বঙ্গবিভাগ ও ইংরাজের নিষ্ঠুর দলননীতিই যে দেশের মধ্যে চরমপন্থী চিন্তাধারাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্ররোচিত করিতেছে, ইহাই কবির দৃঢ় বিশ্বাস। এজন্য তিনি ইংরাজ শাসননীতিকেই দায়ী করিয়া বলিলেন,

"...আমরা দুর্বল হই আর অক্ষম হই, বিধাতা আমাদের যে একটা হৃৎপিণ্ড গড়িয়াছিলেন সেটা তো নিতান্তই একটা মৃৎপিণ্ড নহে, আমরাও সহসা আঘাত পাইলে চকিত হইয়া উঠি; সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতিবৃত্তিক্রিয়া, যাহাকে ইংরেজিতে বলে রিফ্লেক্স অ্যাকশন।..."

অবশ্য তাই বলিয়া তিনি চরমপন্থীদের রাজনীতিকে সমর্থন করিতে পারিলেন না এই কারণে যে, এই রাজনীতির গতি কখন কোন্ দিকে যাইবে তাহাও যেমন বলা যায় না, তেমনি ইহাকে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করিবার ক্ষমতাও ইহার নেতাদের নাই। তিনি আরও বলিলেন,

"...একস্ট্রিমিস্ট্ নাম দিয়া আমাদের মাঝখানে যে-একটা সীমানার চিহ্ন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দত্ত নহে। সেটা ইংরেজের কালো কালির দাগ। সুতরাং এই জরিপের চিহ্নটা কখন কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে বলা যায় না। দলের গঠন অনুসারে নহে, সময়ের গতি ও কর্তৃজাতির মর্জি অনুসারে এই রেখার পরিবর্তন হইতে থাকিবে।"

চতুর্থত, রবীন্দ্রনাথ এই অভিভাষণে সর্বাধিক পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করিলেন স্বদেশী সমাজ বা পল্লী-সমাজ সংগঠনের উপর। 'স্বদেশী সমাজ' ও পূর্বাপর প্রবন্ধগুলিতে তিনি যে কর্মসূচী উত্থাপন করিয়াছিলেন এই অভিভাষণে তিনি উহার আরো বিস্তারিত আলোচনা করিলেন। দেশের রাজনীতিবিদ্‌দের ও যুবকর্মীদের উদ্দেশ্য করিয়া পুনর্বার তাঁহার পল্লীউন্নয়ন ও পল্লীসংগঠনের পরিকল্পনা পেশ করিলেন,

"প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে।...

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন সক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক-একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে।...নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক-স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে, সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।"

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্য কুটিরশিল্পের প্রচলিত সেকেলে যন্ত্রপাতির বদলে আধুনিক হাল্কা যন্ত্রপাতি সংবলিত ছোট ছোট সমবায়-শিল্প (co-operative industry) প্রবর্তন করিবার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেছেন,

"য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানা প্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে—নিতান্ত দারিদ্র্যবশত সে-সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না—অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে-সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক-একটি মণ্ডলী অথবা এক-একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে।..."

আরো কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বড়ো বড়ো কলকারখানার ঘোরতর আপত্তি করিতেছেন। তৎপরিবর্তে তিনি গ্রামাঞ্চলে চাষীদের সম্মিলিত ছোট ছোট হাল্কা যন্ত্রপাতি সংবলিত সমবায়-শিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব করিতেছেন।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে—রবীন্দ্রনাথ গ্রামদেশে রাজা-জমিদারদের সামন্ত তান্ত্রিক শোষণ সম্পর্কে কী চিন্তা করিতেছিলেন?

সে যুগের রাজনীতিতে ভূমিসংস্কার বা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সম্পর্কে কী নরমপন্থী, কী চরমপন্থী—কেহ একটিও কথা বলেন নাই। তখনও পর্যন্ত সকলেই রাজা-জমিদারদের সামন্ততান্ত্রিক অধিকারকে ঈশ্বর-প্রদত্ত পবিত্র অধিকাররূপে গণ্য করিয়া আসিতেছিলেন। সে-যুগে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও উহার ব্যতিক্রমে কিছু চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবুও ঐ অভিভাষণে দেশের জমিদারদের সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলিলেন,

"এই উপলক্ষে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, বাংলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্‌যোগী না হইলে একাজ কখনোই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু এক পক্ষকে দুর্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকেই কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট্ বুকের পকেটে লইয়া বেড়ানো একই কথা—একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মতো কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন।

"···ইহাদিগকে (রায়তদিগকে—লেখক) দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সে অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়া রাজা হইতে শিখাইব কী করিয়া।"

আর যাহা হউক, ইহা জমিদারী ব্যবস্থার ওকালতী নহে। রবীন্দ্রনাথ এ-কথাও পরিষ্কার বলিলেন যে, এইসব অত্যাচারিত ও শোষিত রায়তদের 'মানুষ হইতে না শিখাইয়া' ইহাদের স্বাধীন করিতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের দুই বিবদমান গোষ্ঠীর অধিনায়ক ও কর্মীদের লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সাংগঠনিক পরিকল্পনার মূল তত্ত্বটি ধীর মস্তিষ্কে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবার অনুনয় জানাইলেন,

"দেশের সমস্ত কার্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে-কয়টি এই :

"প্রথম, বর্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতে হইবে। বর্তমানের সেই

প্রকৃতিটি—জোটবাঁধা, ব্যূহ বদ্ধতা, অর্গ্যানিজেশ্যন।...অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে, গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

"দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না।...জনসমাজের সহিত শিক্ষিতসমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

"তৃতীয়, এই ঐক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতে পারে না। শিক্ষিতসমাজ গণসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনি সর্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।

"সর্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিতসমাজে নিজের মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কখনও সম্ভবপর হইবে না।..." [রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪৯৮-৫২১]

অর্থাৎ এককথায় বলিতে গেলে—অর্গ্যানিজেশন, গণচেতনা ও গণসংযোগ—ইহাই রবীন্দ্রনাথের সাংগঠনিক পরিকল্পনার মূল তিন নীতি।

এই সময় বঙ্গদর্শনে (১৩১৪ ফাল্গুন) 'শক্তি' নামে অপর একটি প্রবন্ধে তিনি প্রায় একই কথা বলিলেন। দেশের প্রাণশক্তি যে গ্রামের মধ্যে সুপ্ত আকারে বিদ্যমান এবং সেই শক্তিকে জাগরিত করিবার প্রশ্নটিই যে এখন আমাদের নিকট প্রধান সমস্যা—ইহাই ঐ প্রবন্ধে কবির মূল বক্তব্য-বিষয়।

ইতিপূর্বেই শিলাইদহে একদল উৎসাহী যুবকর্মী লইয়া তিনি যে পল্লীসংগঠন-কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, সে-কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার প্রায় মাসখানেক পরে কবি অবলা দেবীকে এই প্রসঙ্গে লিখিতেছেন,

"আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারীর মধ্যে পল্লী-গঠনকার্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েকজন পূর্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করচে। তাদের দিয়ে রাস্তা-ঘাট বাঁধানো, পুকুর খোড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্ছে।...আমি সভাস্থলের আহ্বানে আর সাড়া দিচ্ছি নে কিন্তু সেই জন্যেই দেশের যেটা সকলের চেয়ে প্রয়োজন সেটা সাধনের জন্যে আমার যেটুকু সাধ্য তা প্রয়োগ করতেই হবে।" [প্রবাসী, ১৩৪৫ শ্রাবণ ।। পৃঃ ৪৬৭]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই রাজনৈতিক উত্তেজনাহীন জনসংযোগ ও পল্লী উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে কেহই কর্ণপাত করিলেন না।

এপ্রিল মাসে এলাহাবাদে কংগ্রেসের বিশেষ কন্‌ভেন্‌শনে (১৮-১৯শে এপ্রিল ১৯০৮) কংগ্রেসের প্রথম গঠনতন্ত্র পাস হইয়া যায়। সেই গঠনতন্ত্রের প্রথম অনুচ্ছেদই (first article) হইল,

"The objects of the Indian National Congress are the attainment by the people of India of a system of government similar to that enjoyed by the self-governing members of the British Empire and a participation by them in the rights and responsibilities of the Empire on equal terms with those members. These objects are to be achieved by constitutional means by bringing about a steady reform of the existing system of administration and by promoting national unity, fostering public spirit and developing and organising the intellectual, moral, economic and industrial resources of the country."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. Appendix p. XII]

ওদিকে বাংলাদেশের চরমপন্থীরা তখন বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের নেতৃত্বে পূর্ণ-স্বরাজ ও বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রচার চালাইতেছেন। অরবিন্দ বলিলেন—"We preach the gospel of unqualified Swaraj."

এপ্রিলের শেষের দিকে মৈমনসিংহে কিশোরগঞ্জের পল্লীসমিতির এক সভায় অরবিন্দ ঘোষণা করিলেন,

"Foreign rule can never be for the good of a Nation...... Foreign rule is inorganic and therefore, tends to disintegrate the subjects body-politic by destroying its proper organs and centres of life..." ['শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশী যুগ']

প্রকাশ্যে বয়কট আন্দোলনের অন্তরালে অরবিন্দ তখন বারীন্দ্র, নিবেদিতা, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় গুপ্তভাবে এই Foreign rule উৎখাত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

॥ সন্ত্রাসবাদ ও রবীন্দ্রনাথ ॥

অকস্মাৎ মজঃফরপুরে প্রচণ্ড বোমার বিস্ফোরণে সমগ্র ভারতবর্ষ সচকিত হইয়া উঠিল। কুখ্যাত অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলক্রমে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের বোমার আঘাতে মিসেস্ কেনেডি ও তাঁহার কন্যা নিহত হইলেন (৩০ এপ্রিল ১৯০৮)। সুরাট-কংগ্রেসের তিনদিন আগে গোয়ালন্দে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেন বিপ্লবীদের হাতে অতর্কিতে গুলিবিদ্ধ হইলেন।

একে একে ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, কানাই, সত্যেন, নরেন গোঁসাই ও অরবিন্দ—সকলেই একে একে গ্রেফতার হইলেন। দেশের ধমনীতে অকস্মাৎ যেন প্রাণের প্রবল স্পন্দন শুনা গেল। আনন্দে বিস্ময়ে আতঙ্কে সমগ্র দেশ শিহরিয়া উঠিল, 'এতদিনে বুঝিবা বাঙালীর ভীরু অপবাদ কাটে!' গ্রেফতার হইয়াই বারীন্দ্র বলিলেন, "My mission is over". মন্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়া তিনি বলিলেন,—"আমাদিগকে প্রকাশ্যে রাজদ্বারে ঘাতকহস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে, বুঝি এ মরণভীরু জাতি মরিতে শিখে না।" [আত্মকাহিনী ॥ পৃঃ ৫০-৫১]। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এক অভিনব ধারা আসিয়া মিলিল এবং উহাই হইল সন্ত্রাসবাদ।

অপরদিকে গভর্নর হইতে শুরু করিয়া দেশী-বিদেশী পত্রিকাগুলি একবাক্যে এইসব কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারাও একবাক্যে ইহার নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিয়া যুবকদের বহু উপদেশ দিতে লাগিলেন। একমাত্র তিলকই 'কেশরী' পত্রিকায় ইহাকে পরোক্ষভাবে কিছুটা সমর্থন করিলেন। তিলক গভর্নমেন্টের ক্রিয়াকলাপ ও দমননীতিকেই এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের উদ্ভবের কারণ বলিয়া সরকারের প্রতি অভিযোগ করিলেন। ফলে তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হইল। এমন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। কয়েকদিন পর কলিকাতায় আসিয়া তিনি চৈতন্য লাইব্রেরীতে 'পথ ও পাথেয়' নামক প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫) পাঠ করিলেন (১২ই জ্যৈষ্ঠ)।

যে সব প্রবীণ কংগ্রেস-নেতারা নিরাপদ বিবৃতির অন্তরালে "আমি ইহার মধ্যে নাই ; এ কেবল অমুকদলের কীর্তি, এ কেবল অমুক লোকের অন্যায় ; আমি পূর্ব

হইতেই বলিয়া আসিতেছি, এ সব ভালো হইতেছে না···" ইত্যাদি বলিয়া নিজেদের নির্দোষ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টায় অতিমাত্র উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে প্রথমেই তাঁহাদের তিরস্কার করিয়া বলিলেন,

"কোনো আতঙ্কজনক দুর্ঘটনার পর এই প্রকার অশোভন উৎকণ্ঠার সহিত পরের প্রতি অভিযোগ বা নিজের সুবুদ্ধি লইয়া অভিমান আমার কাছে দুর্বলতার পরিচয় সুতরাং লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হয়। বিশেষত আমরা প্রবলের শাসনাধীনে আছি এইজন্য রাজপুরুষদের বিরাগের দিনে অন্যকে গালি দিয়া নিজেকে ভালোমানুষের দলে দাঁড় করাইতে গেলে তাহার মধ্যে কেমন-একটা হীনতা আসিয়া পড়েই।···

"তাহার পরে. যাহারা অপরাধ করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, নির্মম রাজদণ্ড যাহাদের 'পরে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, আর-কিছু বিচার না করিয়া কেবলমাত্র বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ করাও কাপুরুষতা।"

দেশের তৎকালীন অবস্থার পটভূমিতে বাংলাদেশে বিপ্লববাদী প্রচেষ্টার সম্বন্ধে বলিলেন,

"···বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালিজাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায় অন্যায় ইষ্ট অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান-মোচনের উপলক্ষে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই সন্ত্রাসবাদী নীতিকে সমর্থন করিতে পারিলেন না। বোয়ার যুদ্ধের সময় হইতে তিনি পুনঃ পুনঃ একটি কথাই কেবল জোর দিয়া বলিয়া আসিতেছেন যে, ইউরোপের রাষ্ট্রনীতি মানবতা, ন্যায়নীতি ও ধর্মাধর্মবোধকে নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করিয়া আসিতেছে। অদ্যকার ভাষণেও তিনি ইহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া বলিলেন,

"য়ুরোপের এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন অবস্থায় যখন বিশেষ ঘটনায় বিশেষ কারণে কোনো অধীন জাতি সহসা নিজেদের অধীনতার ঐকান্তিক মূর্তি দেখিয়া সর্বান্তঃকরণে পীড়িত হইয়া উঠে, অথচ নিজেদের সর্বপ্রকার নিরুপায়তার অপমানে উত্তপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে একদল অধীর অসহিষ্ণু ব্যক্তি যখন গোপন পন্থা অবলম্বন করিয়া কেবল ধর্মবুদ্ধিকে নহে কর্মবুদ্ধিকেও বিসর্জন দেয় তখন দেশের আন্দোলনকারী বক্তাদিগকেই এইজন্য দায়ী করা বলদর্পে-অন্ধ গায়ের জোরের মূঢ়তা মাত্র।

"অতএব দেশের যে-সকল লোক গুপ্তপন্থাকেই রাষ্ট্রহিত সাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোনো ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে যুগে বর্তমান এ যুগে ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্যভাবে কুণ্ঠিত তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতার যে দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে ; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্বল, ধনী ও শ্রমিক কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। রাজাও প্রয়োজনের জন্য প্রজাকে দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিবে এবং প্রজাও প্রয়োজনের জন্য রাজাকেও দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিতে চেষ্টা করিবে এবং যে সকল তৃতীয়পক্ষের লোক এই-সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নহে তাহাদিগকেও এই অধম সংঘর্ষের অগ্নিদাহ সহ্য করিতে হইবে।"

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো রবীন্দ্রনাথ যেন ঘটনাস্রোতের অনিবার্য অমোঘ পরিণতি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যথা ও মানসিক যন্ত্রণাটি যে কোথায়, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। যে-সব যুক্তি ও ন্যায়-শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষের মতো মহান দেশের মুক্তি-আন্দোলন সেই সব নীতির উপরই ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিবে, রবীন্দ্রনাথ ইহা কখনই সহ্য বা সমর্থন করিতে পারেন না। তিনি বলিলেন,

"...প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয় —কোনো সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপ করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না, কাজও নষ্ট হইবে। আমার মনের তাগিদ অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনোদিন রাস্তাও নিজেকে ছাঁটিয়া দেয় না, সময়ও নিজেকে খাটো করে না।"

তিনি আরও বলিলেন,

"দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে, কিন্তু দুর্মতিকে সংবরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি তবে অন্তঃকরণকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যায় ; ন্যায়ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না, তখন বিশ্বব্যাপী ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠে।"

সংগ্রামের নীতি সম্পর্কে ইহাই কবির (এই ভাষণের) মূল কথা। Means- ও End-এর বিতর্ক তখনও এদেশে আমদানি হয় নাই। ভারতবর্ষের মুক্তি-

সংগ্রাম মহোত্তম ন্যায়-নীতি ও ধর্মবুদ্ধির উপর ভিত্তি করিয়া উত্তরোত্তর ক্রম-পরিণতি লাভ করুক, ইহাই কবির মূল বক্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রবিপ্লবকে একেবারে অস্বীকার করিতেছেন না। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের নেতিমূলক অপেক্ষা ইতিমূলক বা গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির উপর অধিকতর গুরুত্ব অরোপ করিতে গিয়া তিনি বলিলেন,

"···রাষ্ট্র বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে, তবেই সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে কাটাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে।

"···গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের এই জীবনধর্মকেই তাহাদের সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনো মতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে এই গঠনমূলক প্রচেষ্টার একান্তই অভাব লক্ষ্য করিতেছেন বলিয়াই তিনি কোনো পক্ষেরই রাজনীতিকে সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি তাঁহার অভিযোগ,

"···যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে সেই গঠনতত্ত্বটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে। কোন্ সৃজনীশক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে। ভেদের লক্ষণই তো চারিদিকে।···

"···ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগসত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবে এই প্রশ্ন যখন উঠে তখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ ত্বরান্বিত তাঁহারা এই বলিয়া কথাটা সংক্ষেপে উড়াইয়া দেন যে, সুইজারল্যাণ্ডেও তো একাধিক জাতির সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কি তাহাতে স্বরাজের বাধা ঘটিয়াছে!"

রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে বলিতেছেন,

"···সুইজারল্যাণ্ড যদি নানা জাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্তা হইয়া উঠিতে

পারিয়াছে। সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে, কিন্তু ঐক্যধর্মের অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা জাতি ধর্ম সমাজ ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোটো বড়ো বহুতর ভাগে বিভাগে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।"

আর একদল বলেন, ইংরাজ সম্রাজ্যবাদ আমাদের সকলেরই সাধারণ শত্রু। কারণ ইংরাজের অত্যাচারে সকল জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায়গুলি নিষ্পেষিত হইতেছে। সুতরাং সকলেই ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং ইংরাজের বিরুদ্ধে এই সাধারণ বিদ্বেষই আমাদের 'মহাজাতীয় ঐক্য' গড়িয়া তুলিবে। রবীন্দ্রনাথ তাহা বিশ্বাস করেন না। উহার জবাবে তিনি বলিলেন,

"একথা যদি সত্য হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এ দেশ ত্যাগ করিবে তখনই কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব। তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।"

রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণীর প্রতি উপেক্ষা আজ অভিশাপের মত ভারতবর্ষকে বার বার আঘাত করিতেছে—ভারতের সাম্প্রতিক ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা ও জাতিবিদ্বেষ ভারতের মর্মকেন্দ্রকে পীড়িত ও কলুষিত করিয়া তুলিতেছে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা ও জাতি-সমস্যাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দিক হইতে বিচার করিতেছিলেন, এমন নহে। তাঁহার মূল কথা, ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষের উপর ভিত্তি করিয়া নয়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক মিলনের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের যথার্থ জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে। বহুদিন হইতেই রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন যে, 'ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান ঐতিহ্য মিলনমূলক।' ভারতবর্ষের স্বাদেশিক সাধনায় এই মিলনতত্ত্বকেই সচেষ্টভাবে সফল করিয়া তুলিতে হইবে—ইহাই কবির বক্তব্য। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,

"...এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানবচিত্তের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবেগ মিলিত হইয়াছে—এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসংকুল—এত বহুত্ব এত বেদনা এত সংঘাত কোনো দেশই এত দীর্ঘকাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না—কিন্তু একটি অতিবৃহৎ অতিমহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই-সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে

ধারণ করিয়া আছে, পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই।...জানিয়া এবং না জানিয়া বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য মন্দির নানা ধর্ম, নানা শাস্ত্র, নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাধনাতেই যোগদান করিব, নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টিশক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনাকার্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব। তাহা যদি করিতে পারি, যদি জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে ভারতবর্ষের এই অভিপ্রায়ের মধ্যে সমস্ত প্রাণ দিয়া নিযুক্ত হইতে পারি, তবেই মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই একসত্য, সেই নিত্যসত্যকে দেখিতে পাইব। ঋষিরা যাঁহাকে বলিয়াছেন, 'স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্'—তিনিই সমস্ত লোকের বিধৃতি, তিনিই সমস্ত বিচ্ছেদের সেতু...।"

[পথ ও পাথেয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪৪৫-৬৭]

নিঃসন্দেহে ইহা অধ্যাত্মবাদী কবির মহৎ ভাবোচ্ছ্বাস। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। এতদিন পর্যন্ত—বিশেষ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচনা করিয়া জনসংযোগ ও পল্লী-উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশের সাংগঠনিক প্রস্তুতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এই ভাষণে তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আবেগ-উন্মত্ততার মাঝে যেন রাজনীতি কিংবা সমাজ-উন্নয়ন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মানবতার উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিলেন। হিংসা, বিরোধ ও অত্যাচারের সমস্ত কালিমা ধুইয়া-মুছিয়া ভারতবর্ষেই সর্বজাতি-মিলনের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র গড়িয়া উঠুক—ইহাই কবির কামনা।

ইহার কিছুদিন পরে 'সমস্যা' নামক একটি প্রবন্ধে (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৫) তিনি তাঁহার বক্তব্য-বিষয়কে আরো পরিষ্কার করিয়া বলিলেন।

ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় লইয়া এখনও পর্যন্ত একটি মহাজাতি বা মহাজাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিল না—রবীন্দ্রনাথের মতে ইহাই ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। তিনি বলিলেন,

"এ কথা বলাই বাহুল্য, যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ স্বাধীনতার 'স্ব' জিনিসটা কোথায়? স্বাধীনতা কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালি যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়ার জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্বপ্রান্তের আসামি তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল

বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।…"

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সমস্যায় বলিলেন,

"…আমরা হিন্দু ও মুসলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি এক জায়গায় বাস করিতেছি বটে কিন্তু…আমাদের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত হিতচেষ্টা পরিবার ও বংশের মধ্যে এবং এক-একটি সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।"

রবীন্দ্রনাথ জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের সমস্যাগুলি বারে বারে বিভিন্ন দিক হইতে দেখিতেছেন। তিনি বলিলেন,

"…পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে, কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা, মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরমপ্রেমের দ্বারা, উচ্চনীচ আত্মীয়পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে, শুভচেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও—যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় করো, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত করো। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করো, বারংবার আঘাত করো—কোনো নৈরাশ্যে, কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণতায় ফিরিয়া যাইয়ো না; মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনোই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।"

[সমস্যা—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪৭৯-৮৩]

ব্রাহ্ম ধর্মের ঐতিহ্যসম্পন্ন পারিবারিক ধর্মসাধনার আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ মানুষ হইয়াছেন। সুতরাং একাদিকে তাঁহার ঈশ্বর ও ধর্মোপলব্ধি যেমন জাতীয় ও বিশ্ব-সমস্যার ক্ষেত্রে ক্রমশই তাঁহার চেতনায় একটি অখণ্ড বিশ্ব ঐক্যানুভূতি আনিয়া দিতেছে, অপরদিকে তেমনি স্বদেশ ও স্বজাতির মরণান্তিক দুঃখ ও সমস্যাগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের জাতি-বিদ্বেষ ও পরজাতিশোষণের নিষ্ঠুর স্বরূপটি ক্রমশই তাঁহাকে বিশ্বমানবতার দিকে আকৃষ্ট করিতেছে। এক কথায়, জাতীয় সমস্যা ও বিশ্বসমস্যার সমাধানে তাঁহাকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। স্মরণ রাখা দরকার, তখনও পর্যন্ত এদেশে আধুনিক দর্শন, সমাজবিজ্ঞান

ও বৈজ্ঞানিক অর্থনীতি-রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে নাই। তাছাড়া ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এমনকি বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রমুখ সংগ্রামপন্থীরা পর্যন্ত তখন আধ্যাত্মিকতার সহিত প্যাট্রিয়টিজ্‌মের অর্থাৎ ধর্মের সহিত স্বাদেশিকতার মিশ্রণ করিয়া জ্বালাময়ী ভাষায় প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে দেশের স্বাদেশিকতাবোধকে জাগ্রত করিতেন। আরও উল্লেখযোগ্য, বিপিনচন্দ্র তখন বক্‌সা জেলে বসিয়াই 'Study of Hinduism' পুস্তক লিখিতেছেন। অরবিন্দের গীতা ও বৈদান্তিক মায়াবাদ ছিল সে-যুগের সন্ত্রাসবাদীদের প্রেরণার প্রধান উৎস। প্রসঙ্গত ইহাও স্মরণীয় যে, সে-যুগে একমাত্র মডারেটপন্থীরাই শুরু হইতেই ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে যথাসম্ভব রাজনীতি হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টারী রাজনীতির শিক্ষা-দীক্ষায় ইঁহারা রাজনীতিকে রাজনীতি হিসাবে বিচার করিবার চেষ্টা করিতেন।

পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে তখনও বয়কট আন্দোলন চলিতেছে। এই উপলক্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং দেশকর্মিগণ স্থানে স্থানে অশিক্ষিত অনুন্নত শ্রেণীর উপর কিছুটা যে বল প্রয়োগ করিতেছিলেন না, এমন নয়। অপরদিকে, মুসলমান সম্প্রদায় বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতা করিতেছিলেন। এবং শুধু বয়কট উপলক্ষেই নয় নানা অজুহাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ক্রমশই ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত সংবাদই রাখিতেছিলেন। এমন অবস্থায় দেশনায়ক ও দেশকর্মীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি 'সদুপায়' প্রবন্ধটি লিখিলেন (প্রবাসী, ১৩১৫ শ্রাবণ)। এই প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি বয়কট আন্দোলনের বিস্তারিত পর্যালোচনা করিয়া উহার বিপজ্জনক পরিণতিটি স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিলেন।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে 'অখণ্ড বাংলা'র শ্লোগানটি মোহমুক্ত দৃষ্টিতে বিচার করিতে চাহিয়াছেন। তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন,

"...বেহারিগণ বাঙালির প্রতিবেশী এবং বাঙালি অনেকদিন হইতেই বেহারিগণের সঙ্গে কারবার করিতেছে, কিন্তু বাঙালির সঙ্গে বেহারির সৌহৃদ্য নাই সে কথা বেহারবাসী বাঙালি মাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামিদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে দেশকে বহুদিন হইতে বাংলাদেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী, আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া কখনও স্বীকার করে নাই এবং বাঙালিও বেহারী উড়িয়া এবং আসামিকে আপন করিয়া লইতে কখনও চেষ্টামাত্র করে নাই, বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা দ্বারা পীড়িত করিয়াছে।

"অতএব বাংলাদেশের যে অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া জানে সে অংশটি খুব বড়ো নহে··· ।"

'বাঙালিয়ানা'র সেন্টিমেন্টকে এতখানি আঘাত করিয়া এমন সত্য ভাষণ সে-যুগে শুনা যায় নাই। ইহার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন,

"এমন অবস্থায় এই বাঙালির বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশের মতো এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।

"এমনস্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরেজ-রাজের প্রতি যতই রাগ করি-না কেন, এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতি-বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হউক-না, তাহার চেয়ে বড়ো আবশ্যক আমাদের পক্ষে কী ছিল। না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।"

তিনি আরও বলিলেন,

"সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনো প্রকারেই হোক, বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে সহায়তা করিলাম।···

"ক্রমশ লোকের সম্মতি জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না। এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্ন শ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম,···তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতার দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি।···আমরা যে সকল স্থানেই মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অসুবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি, একথা সত্য নহে। এমনকি, যাহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে।"

ইহার কারণ কি? রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন যে, এই বিভেদ বিদ্বেষ সৃষ্টি করার পিছনে ইংরাজেরও হাত আছে, কিন্তু উহা গৌণ কারণ। মুখ্য কারণ হইতেছে, দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, হিন্দু ও মুসলমান, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সত্যকারের ব্যবধান। নিজেদের এই বিভেদ-বিদ্বেষ দূর না করিয়া আমরা

জোর করিয়া আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাগুলি গরীব হিন্দু-মুসলমানের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চাহিয়াছি। বয়কট বা স্বদেশী আন্দোলনের কোনো তাৎপর্যই এইসব দরিদ্র জনসাধারণ উপলব্ধি করে নাই। তাই তিনি বলিলেন,

"আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া 'মা' শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে আমরা মনে করিতে পারি না, দেশের মধ্যে মা'কে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই।...এইজন্য দেশের সাধারণ গণসমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মা'কে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য হইয়া মনে করি, সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভান, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরা যে মা'কে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই, এই অপরাধটা আমরা কোনোমতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি।..."

অর্থাৎ তিনি জনসংযোগ ও গণচেতনার প্রশ্নে জোর দিতে চাহিলেন।

'বয়কট' আন্দোলন কার্যকরী করিতে গিয়া স্বদেশীরা যে জোর জুলুম করিতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,

"জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না। দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী-প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই-সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না।

"এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না! 'যাহারা কখনও বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে, তাহারা আজ কাপড়-পরানো বা অন্য যে-কোনো উপলক্ষে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে ইহা আমরা সহ্য করিব না', দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমঃশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া এমনকি ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।

"তাই বলিতেছি, বিলাতি দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এতবড়ো অহিত আর কিছু নাই।...সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না।..."

উপসংহারে, রবীন্দ্রনাথ এইসব বলপ্রয়োগ এবং গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসবাদী

কার্যকলাপের নিন্দা করিয়া, সংগ্রামের মূলনীতিটি কী হওয়া উচিত, সেই সম্পর্কে বলিলেন,

"একটি কথা আমাদের কখনও ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই, অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়।...অদ্য বারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্যই দুর্বলতা; প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান; এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্য-ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস।...প্রেমের কাজে, সৃজনের কাজে, পালনের কাজেই যথার্থ-ভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে।..."

[সদুপায়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫২৩-৩১]

কিছুদিন আগে শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সন্ত্রাসবাদী গুপ্তহত্যার নিন্দা করিয়া লিখিয়াছিলেন (২৩শে বৈশাখ ১৩১৫),

"মাতঃ, ইহা নিশ্চয় মনে রাখিবে, নিজের বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে পাপকে আশ্রয় করি তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।...দেশের যে দুর্গতিদুঃখ আমরা আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে—গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করিয়া আমরা সে কারণ দূর করিতে পারিব না, আমাদের পাপের বোঝা কেবল বাড়িয়াই চলিবে। এই ব্যাপারে যে-সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই দণ্ড আমাদের সকলের দণ্ড—ঈশ্বর আমাদিগকে এই বেদনা দিলেন—কারণ, বেদনা ব্যতীত পাপ দূর হইতে পারে না—সহিষ্ণুতার সহিত এ সমস্তই আমাদিগকে বহন করিতে হইবে—এবং ধর্মের প্রশস্ততর পথকেই অবলম্বন করিতে হইবে।..."

[গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৬৬২]

এই সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি উগ্র ধর্মবোধ ও কঠোর ন্যায়-নিষ্ঠার ভাব লক্ষ্য করা যায়,—একথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতনভাবে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করিতে চাহিতেছিলেন। বাংলাদেশের সমগ্র স্বদেশী আন্দোলনেরই কেমন যেন একটি আধ্যাত্মিকতা-ঘেঁষারূপ প্রত্যক্ষ করা যায়—এই মর্মে সে-সময়ে এদেশের কোনো কোনো ইংরাজী সংবাদপত্রে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। কবির উহা নজরে

আসে। তিনি এই মন্তব্যকে উপলক্ষ করিয়া 'দেশহিত' নামক একটি প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১৫) সংগ্রামের লক্ষ্য ও পন্থা সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানাইলেন। প্রবন্ধের শুরুতেই কবি ইংরাজী সংবাদপত্রের ঐ মন্তব্যের উল্লেখ করিলেন,

"...লেখক বলেন যে, আমাদের দেশের এই স্বাদেশিকতার উৎসাহ গভীরতর আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ; এইজন্য ইহা একটা ধর্মসাধনার আকার ধারণ করিতেছে।"

কবি যেন কিছুটা গর্বের সহিত মন্তব্যটি মানিয়া লইলেন,

"এ কথা নিশ্চয় মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোনো উদ্‌যোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্মকে অবলম্বন না করিলে কোনো মতেই কৃতকার্য হইবে না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন কোনোদিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই।

"অতএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের ধর্মবুদ্ধিকে যদি একটা নূতন চৈতন্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে, তবে তাহা সত্য হইবে, স্থায়ী হইবে, দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, দেশের এই 'যজ্ঞের পবিত্র হুতাশন'কে ইংরাজের যথেচ্ছাচারই নষ্ট করিতে চাহিতেছে না, পরন্তু একদল বিপথগামী স্বদেশের লোক ইহাকে পণ্ড ও কলুষিত করিতে চলিয়াছে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এই কথার দ্বারা সন্ত্রাসবাদীদেরই বুঝাইতেছেন। এই প্রবন্ধে কবি সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে শুধু সমালোচনাই করিলেন না, অত্যন্ত কঠোরভাবে তিনি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার আহ্বান জানাইলেন। তিনি বলিলেন,

"...কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ-পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভর্ৎসনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না। তাহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু নহে।

"...আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায় পীড়ন দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে, একি এক মুহূর্তের জন্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন যাহারা জানেন আত্মহিত, দেশহিত, লোকহিত, যে কোনো হিতসাধনই লক্ষ্য হউক-না কেন, কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহারা যথার্থ সাধক।...

"...ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য। · ফললাভ চরমলাভ নহে, ধর্মলাভেই লাভ, একথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।" [দেশহিত—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৬৩৯-৪২]

সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে এতখানি কঠোর উক্তি সত্যসত্যই কানে বাজে। কিন্তু কী কারণে রবীন্দ্রনাথকে এতখানি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, তাহা আমাদের বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমাদের দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী নীতির নিজস্ব কোনো সার্বিক মূল্য ও সত্যতা নাই, অন্তত রবীন্দ্রনাথের মত একজন ধর্মনিষ্ঠ ভাববাদী কবির নিকট উহার কোনো মূল্য ও সত্যতা থাকিবার কথা নয়। প্রয়োজনের জন্য হিংসা ও মিথ্যা দেশের পুণ্যকর্ম ও সত্যপন্থা হইতে পারে—এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষে মানিয়া লওয়া ছিল অসম্ভব।

তবে একথাও সত্য যে, কবির অধ্যাত্মবোধের মধ্যে তাঁহার বাস্তবতাবোধ বিলুপ্ত হয় নাই। গ্রীষ্মের ছুটি ফুরাইলে আষাঢ়ের মাঝামাঝি তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। কিন্তু যতদিন শিলাইদহে ছিলেন, ততদিন তিনি তাঁহার পল্লী উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার একটা-না-একটা দিক বাস্তবায়িত করিবার প্রচেষ্টা শুরু করিয়াছিলেন; এই সময় (৩০শে আষাঢ় ১৩১৫) কবি একখানি পত্রে লিখিতেছেন,

"আমাদের জমিদারির মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগনাকে পাঁচটি মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে—পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিসের বিচারে বিবাদনিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়—তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।

"আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে—হিন্দুপল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম হিন্দুসমাজের মূলেই এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দুসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে idealize করে কোনো আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছাই হয় না।"

[স্মৃতি ।। পৃঃ ৭০-৭১]

কবির হিন্দুয়ানীর মোহ কিভাবে আস্তে আস্তে কাটিয়া যাইতেছে, সেই প্রসঙ্গে শেষোক্ত মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিছুদিন পর তিনি পতিসরে পল্লীসমাজের গ্রাম্য অধ্যক্ষগণকে চাষীদের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের ব্যাপারে বিস্তারিত পরিকল্পনা দিয়া লিখিলেন (১৭ই শ্রাবণ ১৩১৫),

"প্রজাদের বাস্তুবাড়ি ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সুতা বাহির হয়, ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল-আঙুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে। · কাছারিতে যে আমেরিকান ভুট্টার বীজ আছে তাহা পুনর্বার লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।···কৃষি-বিজ্ঞানের উপদেশমত চেষ্টা করিবে।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ১৭২]

শ্রাবণের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রদের এক সভায় তিনি 'পূর্ব ও পশ্চিম' নামে একটি প্রবন্ধ (প্রবাসী, ১৩১৫ ভাদ্র) পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে বঙ্গদর্শনে (১৩১৫ ভাদ্র) প্রকাশিত হয়। নানা দিক দিয়া এই প্রবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নববর্ষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিচার করিয়াছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধের সুর তাহা হইতে বেশ কিছুটা পৃথক। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আদর্শ বলিতে তিনি এতকাল যে হিন্দুয়ানীর সংকীর্ণ দৃষ্টিতে উহার ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছিলেন, এই প্রবন্ধে উহাকে অস্বীকার ও বর্জন করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু আর্য আর অনার্যদের ইতিহাস নয়। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে মুসলমানগণও এদেশের মাটিকে আপন করিয়া লইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের ঐতিহ্য বিশেষ কোনো একটিমাত্র জাতি বা সম্প্রদায়ের নয়। এমন কি পশ্চিমী-সভ্যতার পসরা লইয়া যে ইংরাজ আজ আমাদের শাসনকর্তারূপে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারও এখানে স্থান আছে—তাহাকেও যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তিনি বলিলেন,

"আজ যে পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতেতিহাসের একটা প্রধান অংশ জুড়িয়া বসিয়াছে ইহা কি সম্পূর্ণ আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয়। ইংরেজের নিকট কি আজ আমাদের শিখিবার কিছুই নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাহা আমাদের দিয়া গিয়াছেন, বিশ্বমানব-ভাণ্ডারে তাহা অপেক্ষা নূতন জ্ঞান কি আর কিছুই থাকিতে পারে না। নিখিলমানবের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা আদানপ্রদানে আমাদের অনেক প্রয়োজন আছে; ইংরেজ বিধাতৃ-প্রণোদিত হইয়া তাহারই উদ্যম আমাদের মধ্যে জাগাইতে আসিয়াছে,—সফল না

হওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইবে না। সে সফলতা পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে, বিরোধে নহে।…"

তিনি অত্যন্ত জোর দিয়া বলিলেন,

"আসল কথা এই, পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যকে মিলিতেই হইবে। পশ্চিমকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতেই হইবে।…

"…শক্তির নিকটেই যথার্থ মর্যাদা প্রকাশ পায়; অতএব সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে। আমাদিগের সকল দাবিই আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে—হীনতার দ্বারা নহে, কিন্তু মহত্ত্বের দ্বারা, মনুষ্যত্বের দ্বারা।…

"তীব্র উক্তির দ্বারা নহে, দুঃসাহসিক কার্যের দ্বারা নহে, কিন্তু ত্যাগের দ্বারা আজ আমাদিগকে শ্রেয়কে বরণ করিয়া লইতে হইবে।…"

[গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী ঃ ১২শ খণ্ড ।। পৃঃ ৬১১-১৩]

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালেই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, ওকাকুরা, প্রমুখ মনীষীদের প্রায় সকলেরই চিন্তায় উগ্র 'প্রাচ্যবাদ' প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল। স্বদেশী যুগের শেষার্ধে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই উগ্র প্রাচ্যবাদ এবং সেইসাথে হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধে আহ্বান জানাইলেন, "পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যকে মিলিতেই হইবে।"

॥ প্রায়শ্চিত্ত ও শারদোৎসব ॥

১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাস। 'আলিপুর বোমার মামলা' চলিতেছে। জেলখানায় রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার অপরাধে কানাই ও সত্যেনের ফাঁসি হইয়া গেল (১০ই ও ২৩শে নভেম্বর)। গভর্নমেণ্ট দেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১১ই ও ১২ই ডিসেম্বর শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ছাত্রনেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পুলিন দাস ও ভূপেন্দ্রচন্দ্র নাগকে একে একে অন্তরায়িত করা হইল। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সাময়িকভাবে যেন কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসিল।

১৭ই ডিসেম্বর মর্লি-প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার প্রকাশিত হইল। মডারেটপন্থীরা উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। ২৮শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে কংগ্রেস-অধিবেশন শুরু হইল। রাসবিহারী ঘোষ এবারেও সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। অভিভাষণের শুরুতেই বিদ্রোহী চরমপন্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন,

"...It is true a few men have left us, but the Congress is as vigorous as ever. We have now closed up our ranks....There can be no reconciliation with the irreconcilable."

মর্লি-প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

"The reforms which have now been announced were foreshadowed in the King-Emperor's message which came to cheer us in our hour of deepest gloom and dejection, of affliction and of shame....

The reform scheme has no doubt been very carefully thought out, but it is impossible to say that it is not susceptible of improvement....I would therefore invite your attention to the best method of securing the proper representation of the people in the Legislative Councils, and in this connection I would ask you to consider the question of the constitution of the electoral colleges."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. pp. 779-84]

দেশের এই নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই সময় আমরা রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই না।

এই সময় হইতে তিনি তাঁহার সমস্ত সময় ও উদ্যম সাহিত্য সৃষ্টি ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন 'গোরা' উপন্যাস রচনায় রত, ইহারই ফাঁকে তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি এবং 'শারদোৎসব' গীতিনাটিকাটি প্রণয়ন করিলেন। স্মরণ থাকিতে পারে, প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে (১২৮৯ পৌষ) রবীন্দ্রনাথ যে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই কাহিনী ভাঙিয়া এবং স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত নাটকটি রচনা করিলেন (১৩১৫)।

বৌঠাকুরাণীর হাটে রবীন্দ্রনাথ প্রতাপকে যে রকম স্বেচ্ছাচারী, ক্রূর ও অত্যাচারী রাজা হিসাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও প্রতাপকে অনুরূপভাবে চিত্রিত করিলেন। এই নাটকে তিনি একটি নূতন ঘটনার সংযোজন করিলেন; তাহা হইতেছে প্রজাবিদ্রোহ। প্রতাপাদিত্যের স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রজাবিদ্রোহ সৃষ্টি করিলেন এবং ধনঞ্জয় বৈরাগী হইলেন সেই প্রজাবিদ্রোহের নায়ক।

ধনঞ্জয় মাধবপুর পরগনার দুই বৎসরের খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য বলিলেন,··· 'দেবে কিনা বলো'। নির্ভীক ধনঞ্জয় উত্তর দিল, 'না মহারাজ দেব না।···যা তোমার নয়, তা তোমাকে দিতে পারব না।···আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী ব'লে!' প্রতাপ প্রশ্ন করিলেন, 'তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে!' অবিচল কণ্ঠে ধনঞ্জয় উত্তর করিলেন, 'হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি।' এই ধনঞ্জয় বৈরাগী একদিন বিদ্রোহী প্রজাদের লইয়া মিছিল করিয়া চলিলেন যশোহরে, রাজার সহিত বুঝাপড়া করিতে—মিছিলের জনতা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ প্রতাপ-চরিত্রকে হেয় করিয়া ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রকে আদর্শ দেশনায়করূপে গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইলেন কেন?

স্মরণ থাকিতে পারে, দেশাত্মবোধের উজ্জীবনে স্বদেশী যুগের সূচনাকালেই ইতিহাস হইতে আদর্শ বীর চরিত্র খুঁজিয়া বাহির করা শুরু হয়, এবং সেই সময় হইতেই বীরপূজাও শুরু হয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথও শিবাজী-উৎসবের জন্য কবিতা লিখিয়াছিলেন। এমন সময় সরলা দেবী বাংলাদেশে শিবাজী-উৎসবের অনুকরণে 'প্রতাপাদিত্য-উৎসব' শুরু করিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উহা সমর্থন

করিতে পারিলেন না। কেননা ঐতিহাসিক দিক হইতে তিনি যতটুকু তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে প্রতাপাদিত্যকে তিনি একজন নিষ্ঠুর অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রাজা হিসাবেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং সেই ভাবেই তিনি 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' প্রতাপচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিতেছেন,

"তিলক-প্রবর্তিত শিবাজী-উৎসবের (১৮৯৫ খ্রীঃ) অনুকরণে সরলা দেবী (১৯০৩ এপ্রিল) বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রতাপাদিত্য-উৎসব আরম্ভ করিলেন। ...প্রতাপাদিত্য-উৎসব লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত সরলা দেবীর মতের অনৈক্য হয়। 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে দিয়া তাঁহার খুড়া বসন্ত রায়কে খুন করাইয়াছেন। তিনি বলেন, সরলা একজন খুনী লোককে লইয়া মাতামাতি ও দাপাদাপি করিতেছে। সরলা দেবী বলেন যে, তিনি প্রতাপাদিত্যের বীরত্বকে পূজা করিতেছেন।" [শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ ।। পৃঃ ৩৩৯-৪১]

এই রকম সময়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩, ১৫ই আগস্ট স্টার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত) ও 'বঙ্গের শেষবীর' (১৯০৩, ২৯শে আগস্ট ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত) নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাছাড়া এই স্বদেশী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের অনুসরণে ঐতিহাসিক চরিত্র ও কাহিনী অবলম্বনে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ নাটক প্রণয়ন করিয়া জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়। এই যুগে গিরিশচন্দ্র লিখিলেন 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'ছত্রপতি শিবাজী'; ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখিলেন 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'রঘুবীর', 'আলমগীর', 'প্রতাপাদিত্য', 'বাঙলার মস্‌নদ', 'নন্দকুমার'; দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিলেন 'দুর্গাদাস', 'প্রতাপসিংহ', 'নূরজাহান', 'সাজাহান', 'মেবার পতন'। রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক এই সকল রচনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি ঐতিহাসিক রাজরাজড়াদের শৌর্য, বীরত্ব, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, 'সিভ্যালরী'র মহিমা প্রচারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন নাই। তাঁহার আদর্শ বীর চরিত্র—বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশু, সক্রেটিস, ব্রুনো। যে চরিত্রের কথা তিনি 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই ছিল তাঁহার আদর্শ চরিত্র।

"দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে ;
... ... শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক।"

রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর বীর সেনাপতির মূর্তি পূজা করেন নাই, তিনি শিবাজীর ধর্মপ্রীতির আদর্শকেই গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন,

"ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন—
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল ॥"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্মনিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রচণ্ড ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখিবার আহ্বান জানাইতেছেন। এই ন্যায়ধর্ম ও আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত গণশক্তির সংমিশ্রণ ঘটাইয়া তিনি গণবিদ্রোহের ইঙ্গিত দিলেন প্রায়শ্চিত্ত নাটকে। প্রতাপাদিত্য বা রানা প্রতাপ নয়—ধনঞ্জয় বৈরাগীর মত আদর্শ সন্ন্যাসী-চরিত্রের পুরুষেরাই হইতেছে তাঁহার নিকট দেশের ভাবীকালের আদর্শ দেশনায়ক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঠিক এই সময়ে (১৯০৮ আগস্ট) দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে সহস্র সহস্র ভারতীয় শ্রমিক (indentured labourers) গান্ধীজীর নেতৃত্বে এক বিরাট বহ্ন্যুৎসবে ঘৃণ্য অবমাননাকর 'পরিচয় পত্রগুলি' (passes) দাহ করিতেছিল। বোয়ার যুদ্ধ ও জুলু বিদ্রোহে ইংরাজদের অকুণ্ঠ সাহায্য করা সত্ত্বেও সেই বোয়ার-আমলেরই ঘৃণ্য অবমাননাকর অবস্থা ও আইনগুলিই আরো দৃঢ় হইয়াছিল ভারতীয়দের ও এশিয়াবাসীদের ভাগ্যে। ইহারই প্রতিবাদে গান্ধীজী তাঁহার এই ঐতিহাসিক অহিংস সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের প্রবর্তন করিলেন। সত্যাগ্রহীরা দলে দলে 'Transvaal Immigrants' Restriction Bill' অমান্য করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে লাগিল। ট্রান্সভাল গভর্নমেণ্ট তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া নাটালে ফিরাইয়া পাঠাইলেন। সত্যাগ্রহীরা পুনরায় আইন ভঙ্গ করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিল। গভর্নমেণ্ট তখন সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করিয়া ভারতবর্ষে আনিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। দীর্ঘ চার বৎসর ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিল; গান্ধীজী ও তাঁহার সহকর্মীরা অধিকাংশ সময়ই রহিলেন কারাগারে। গান্ধীজী পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষের কংগ্রেস-নেতৃত্বের নিকট সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন জানাইলেন। কংগ্রেস নেতৃত্বও অত্যন্ত বিব্রত ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ১৯০৯ সালে লাহোর-কংগ্রেসে সভাপতি মদনমোহন মালব্য বলিলেন,

"...We admire the unflinching courage, the unbending determination with which our noble brother, Mr. Gandhi, and our other countrymen have been fighting for the honour of the Indian name....It was but yesterday that the Government of

England went to war with the Boers, one of the avowed grounds being that Indians had been badly treated by the Boers. Has the position become weaker since the Government has established the might of its power there, that it is afraid to require that the Boer-British Government should follow a course of conduct towards its Indian fellow-subjects different from the one persued before—a course of conduct consistent with the claims of a common humanity and of fellowship as subjects of a common Sovereign ?..."

[Congress Presidential Addresses : Vol. I. pp. 840-41]

অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, দক্ষিণ আফ্রিকার এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না ; অন্তত কোনো প্রতিবাদ লিপিও তিনি লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। গান্ধীজী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম সম্পর্কেও সেই সময় তিনি কিছু লিখিয়াছিলেন, সেরূপ কোনো প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে কি প্রায়শ্চিত্ত নাটক কবি-মনে দক্ষিণ আফ্রিকার ঐ রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ার ফল ? অথচ ইতিপূর্বে আফ্রিকায় সাম্রাজ্য-বাদীদের লুণ্ঠনকার্যের প্রতিবাদে, সেখানকার ভারতীয় ও এশিয়াবাসীদের উপর শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের বর্ণবিদ্বেষ, লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর ব্যবহারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদীদের যেরূপ কঠোর ভৎ‌র্সনা করিয়াছিলেন, সমকালীন কোনো ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাকে তাহা করিতে দেখা যায় নাই। কিন্তু এখন কবির এই নীরবতার হেতু কি ? মনে হয়, এই সময় হইতেই কবি একটি কঠিন বাক্-সংযম অবলম্বন করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি এতো বেশী কথা বলিয়াছেন, অথচ তাহা কোনো মহলেই গ্রাহ্য হইল না—এই নিদারুণ অভিমানই বোধ হয় তাহার এই কঠিন নীরবতার কারণ।

বহির্জগৎ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া কবি শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়টিকে মনোমত রূপদান করিতে চাহিলেন। এই সময়েই ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনে আসেন। ক্ষিতিমোহন আসিয়াই আশ্রমের সকল কাজে কবির সহায়ক হইলেন। জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের যুগে কবি যে সব পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাই এখন তিনি ক্ষিতিমোহন, বিধুশেখর প্রভৃতির সহায়তায় বাস্তবে পরিণত করিতে উদ্‌যোগী হইলেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শনের মূলকথাই হইতেছে—স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্য দিয়া শিশুমনের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলির উন্মেষ যাহাতে সম্ভবপর হয়, বিদ্যালয়ে

তাহার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা, এবং সে বিদ্যালয় হইবে আদর্শ তপোবন-বিদ্যালয়। 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন,

"...যে জলস্থল,-আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও।...তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও।..."

কবি তাঁহার এই কল্পনাকে এই সময় হইতে শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ে বাস্তবে রূপদান করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই সেখানে ঋতু-উৎসব প্রবর্তিত হয়, এবং কবি ঋতু-উৎসবের উপর গান ও নাটিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

"১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বিদ্যালয় খুলিলে তিনি (ক্ষিতিমোহন) কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন ও সেই বৎসরই বর্ষাকালে কবির ইচ্ছানুসারে বর্ষা-উৎসব নিষ্পন্ন করেন। ক্ষিতিমোহন ও বিধুশেখর বেদাদি গ্রন্থ হইতে বর্ষার উপযোগী শ্লোক ও স্তোত্র সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদের দ্বারা আবৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন।...

"...এইবারকার বর্ষা-উৎসবের সময় হইতে আশ্রমের উৎসবাদির মধ্যে বৈদিক মন্ত্রাদি প্রচলনের সূত্রপাত হইল।...

"রবীন্দ্রনাথের প্রগতিপরায়ণ মন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি 'শাস্ত্রে'র মোহ কবির কোনো কালেই ছিল না। কিন্তু সাংস্কৃতিক পারম্পর্যহেতু তাহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধাও কখনো দেখান নাই। তবে বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও আকর্ষণটা এই সময় হইতে ক্রমেই যেন বেশি করিয়া দেখা দিতে থাকে।..."

[রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ১৭৭-৭৮]

বর্ষা-উৎসবের সময় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গ্রাম-সংস্কার কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। উৎসবের সংবাদ পাইবার পর কবি শারদোৎসবের জন্য গান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকাল পরে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া তিনি 'শারদোৎসব' গীতি-নাটিকাটি প্রণয়ন করিলেন (৭ই ভাদ্র ১৩১৫)।

॥ বিশ্বমানবতা ও বিশ্বপ্রাগতিকতা-বোধের বিকাশ ॥

শারদোৎসবের পর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি প্রবল ধর্মজিজ্ঞাসা ও আধ্যাত্মিক আকুলতা প্রকাশ পায়। সেই আধ্যাত্মিক তন্ময়তায় তিনি 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের উপদেশমালা রচনা করেন (প্রথম আট খণ্ড—১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫ হইতে ৭ই বৈশাখ ১৩১৬)।

শান্তিনিকেতন উপদেশমালার বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের বিষয়বহির্ভূত। তবুও একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই উপদেশমালায় রবীন্দ্রনাথ হিন্দুয়ানির কিংবা আদি ব্রাহ্মসমাজেব সংকীর্ণ গণ্ডি ভাঙিয়া নিখিল-বিশ্বমানবতার সহিত যুক্ত হইয়াছেন। তিনি আব 'ব্রাহ্মবাদী' নহেন, তিনি এখন 'ব্রহ্মবাদী'। তাঁহার বিশ্বমানবতায় আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান—এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেবিকা—সকলেই স্থান পাইয়াছে। তাঁহার ধর্মসাধনায় বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক, কবীব, চৈতন্য সকলেবই বাণী প্রেরণা আনিয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই তীব্র আধ্যাত্মিক আকুলতা কিসের ফলশ্রুতি?

এই সময়ে কবির পারিবারিক জীবনে পব পর কয়েকটি বিয়োগ বিপর্যয় ও শোকাঘাতজনিত মানসিক অবস্থাকে রবীন্দ্রজীবনীকার ইহার প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই কারণ গৌণ। পক্ষান্তরে, বিগত বেশ কয়েক বৎসরের ঘটনাপরম্পরার পটভূমিকায় যদি কবির চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, তাঁহার এই ধর্মজিজ্ঞাসা ও আধ্যাত্মিক আকুতির মূল কারণ তৎকালীন দেশের ও বিশ্বের পরিস্থিতি। আরো গভীরে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে, মানুষই তাঁহার ধর্মবোধ ও জীবনদর্শনের কেন্দ্র-বিন্দু—মানবসমাজের ও যুগের প্রয়োজনে তিনি পুরাতন ধর্মসংস্কারগুলি নির্মমভাবে ছাঁটিয়া ফেলিয়া যুগোপযোগী নূতন ধর্মমত ব্যাখ্যান করিলেন এবং উহাই শান্তিনিকেতন উপদেশমালা। বিশ্বের মানুষের প্রয়োজনে তিনি বারবার তাঁহার জীবনদর্শন ও ধর্মাদর্শের সংস্কার করিয়া আসিয়াছেন।

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার নৃশংস বর্বরতা ও বর্ণবিদ্বেষ বারবার কবিকে মর্মান্তিক দুঃখ ও পীড়া দিয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন, পলিটিক্যাল স্বার্থ-প্রয়োজনে পাশ্চাত্যের রাজনীতি কী অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় ন্যায়ধর্ম ও বিচারবুদ্ধিকে পদদলিত

করিতে পারে। আর ভারতবর্ষে কিনা সেই রাজনীতি-আদর্শেরই পূজা হইতেছে! পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী লালসা যেন কবিকে পাশ্চাত্যের সব কিছুরই উপর (বিশেষ করিয়া রাজনীতির উপর) সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। তাছাড়া, সেইসাথে তাঁহার গভীর ঈশ্বরপ্রেম ও ধর্মবিশ্বাস বিশ্ব-সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি তাঁহাকে আধ্যাত্মিক-ভাবেই চিন্তা করিতে বাধ্য করিয়াছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন নবযুগের সমস্যা—ধর্মাদর্শের সমস্যা, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা নহে—সেই ধর্মাদর্শের সমস্যা, যাহা সর্বদেশ সর্বজাতি ও বিশ্বমানবকে এক করিয়া মিলাইয়া দিবে। তাই এইবারকার (১৩১৫) মাঘোৎসবের ভাষণে তিনি ঐ উৎসবকে 'ব্রাহ্মোৎসব' না বলিয়া 'ব্রহ্মোৎসব' আখ্যা দান করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নহে, উহা মানব-সমাজের উৎসব বলিয়া আজ তিনি অনুভব করিতেছেন; আজ তিনি ধর্ম-সমন্বয় ও জাতি-সমন্বয়ের কথা চিন্তা করিতেছেন।

এই যুগে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার স্বরূপটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,

"শান্তিনিকেতনের উপদেশমালার পর্ব হইতে কবির জীবনে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন নানাভাবে দেখা দিয়াছে। ধর্মের একত্ব ও সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কবির যে জ্ঞান এতাবৎকাল উপনিষদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহা এখন তাহার সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বিচিত্র ধর্ম ও মতের উদার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে, ঈশ্বর যে সম্প্রদায়ের বাহিরে তাহা স্পষ্টতর হইতেছে। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে কবি খৃষ্ট ও চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে স্বয়ং ভাষণ দান করিলেন এবং অনতিকালের মধ্যে ভগবান বুদ্ধ ও হজরত মহম্মদের স্মরণ দিন পালন-রীতি প্রচলিত হইল। এছাড়া কবির ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান এতকাল উপনিষদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহা বিস্তার লাভ করিল মধ্য-যুগীয় সন্তদের জীবনের মধ্যে। এই সন্তদের বাণীর মধ্যে কবি তাঁহার অন্তরের বাণীর সায় পাইলেন।...এই মধ্যযুগীয় সাধকদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটাইলেন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড।। পৃঃ ১৮৮]

এই উপদেশমালা লিখিবার কয়েকমাস পরেই রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' রচনা শুরু করেন (১৩১৬ আষাঢ়)। ইহারই ফাঁকে বিদ্যালয় পরিচালনা ও 'গোরা' উপন্যাস রচনার কাজ দ্রুত চলিতে থাকে। ভাদ্র মাসের শেষের দিকে রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে পাঠ সমাপন করিয়া দেশে ফিরিলেন। প্রায় মাসখানেক পরে রথীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া কবি শিলাইদহে যান। রথীন্দ্রনাথ সেখানে পল্লী-উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন—ইহাই ছিল কবির ইচ্ছা। এই সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এই বৎসরের রাখি-উৎসব উদ্‌যাপনের সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশ

দিয়া অজিতকুমারকে একটি পত্র লিখেন। নানাদিক দিয়া পত্রখানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবি লিখিতেছেন,

"ছুটি পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব মনে ছিল। যদি থাকতুম তাহলে ৩০শে আশ্বিনের উৎসবকে আমি একটা বড়ো দিক থেকে সত্য দিক থেকে দেখবার ও দেখাবার বিশেষ চেষ্টা করতুম। আমি কোনো সংকীর্ণ বিরোধের ভাব এবং তৎসংক্রান্ত চিত্তদাহকে প্রশ্রয় দিতুম না, আমার রাখিবন্ধনের মধ্যে কোনো সাময়িকতার ক্ষোভ ও খণ্ডতা থাকতে দিতুম না। যে-রাখিতে আত্মপর শত্রু-মিত্র স্বজাতি-বিজাতি সকলকেই বাঁধে সেই রাখিই শান্তিনিকেতনের রাখি। ঈশ্বর শান্তির বীজকে বিরোধের ভিতরেই নিহিত করেন, কিন্তু বিরোধকে ভেদ করে তাকে অতিক্রম করেই সে বড়ো হয়ে ওঠে—বিরোধের মাটির ভিতরেই যদি সে থেকে যায় তবে সে পচে মরে। আমাদের রাখিবন্ধনের বীজ বিরোধের ভিতর থেকে তাকে ভেদ করেই ছায়াময় বনস্পতি হয়ে উঠবে। বর্তমান ভারতবর্ষে যাদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিকূলতা আছে এ-রাখি তাদের কাছ থেকেও নিরস্ত হবে না।...আমরা বারংবার সহস্রবার সকলকেই প্রীতির বন্ধনে, ঐক্যের বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করব।...পূর্ব-পশ্চিম রাজা-প্রজা সকলকেই ভারতবর্ষ সকল প্রকার বিরুদ্ধতার ভিতরেও একক্ষেত্রে আকর্ষণ করবার জন্য চিরদিন চেষ্টা করছে—এই তার ধর্ম, এই তার কাজ, অন্যদেশের পোলিটিকাল ইতিহাস থেকে এ-সম্বন্ধে আমি কোনো শিক্ষা নিতে প্রস্তুত নই, আমাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের একটি অতি উদার অতি বিরাট ইতিহাস সৃষ্টির আয়োজন চলছে এই আমার নিশ্চয় বিশ্বাস—যেমন ইংরেজ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে সত্যই স্বতন্ত্র করে দেবার মালিক নয় তেমনি আমরাও রাখিবন্ধনের গণ্ডির দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল আমাদের মনের মতো জাতিকেই গড়ব এবং অন্যকে বর্জন করব তা চলবে না। যারা আমাদের আঘাত করতেও এসেছে তাদেরও আমরা আত্মসাৎ করব, আমাদের উপর এই আদেশ আছে।

"তোমাদের আশ্রমে তোমাদের রাখিবন্ধনের দিনকে খুব একটা বড়োদিন করে তুলো। বড়োদিন মানে প্রেমের দিন, মিলনের দিন—যে-প্রেমে যে-মিলনে ভারতের সকলেই আহূত, ভারতবর্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে আজ বিধাতা যাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন আমরা তাদের কাউকে শত্রু বলে দূরে ফেলতে পারবো না।...বঙ্গবিভাগের বিরোধ-ক্ষেত্রে এই যে রাখিবন্ধনের দিনের অভ্যুদয় হয়েছে এর অখণ্ড আলোক এখন এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাতরূপে পরিণত হোক। তাহলেই এই দিনটি ভারতের বড়োদিন হবে। তাহলেই এই বড়োদিনে বুদ্ধ, খৃস্ট,

মহম্মদের মিলন হবে। একথা কেউ বিশ্বাস করবে না কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে।…আমাদের মধ্যে অনেকেই সাময়িক নেশায় ভোর হয়ে আছি—সেইজন্য ৩০শে আশ্বিনের মতো দেশব্যাপী উন্মত্ততার দিনে নিত্য সত্যকে অবজ্ঞা করার আশঙ্কা আছে—সেইজন্যই আমি বারবার করে তোমাদের সতর্ক করতে চাই। যা শ্রেষ্ঠ, যা মহত্তম, যা সত্যতম তার থেকে লক্ষ্য কোনো কারণেই কোনোমতেই ফেরাতে দিয়ো না। যদি লোকের কর্ণ বধির হয় তবু সত্যের মন্ত্রই শোনাতে হবে—অন্তত আমাদের আশ্রমে বেসুর না বাজে, যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং তাঁকে যেন কোনোদিনই কোনোমতেই আমরা না ভুলি—তাঁর চেয়ে আর-কাউকে আমরা যেন বড়ো করে না তুলি।…" [বিশ্বভারতী পত্রিকাঃ ১ম বর্ষ।। ৫ম সংখ্যা, ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ]

এই পত্রটিতে আমরা রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন চিন্তাধারার একটি পূর্ণ চিত্র পাই। জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আদর্শ মানবতাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিয়া নিখিল-মানবের মাঝে বিভেদ-বিদ্বেষ বাড়াইয়া তুলিতেছে—রাজনীতির এই বিভেদমূলক আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মত সত্যনিষ্ঠ মানবপ্রেমিক কবিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। এমনকি ইংরাজবিরোধী জাতীয় আন্দোলনকেও তিনি 'সাময়িকতার ক্ষোভ' বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধা করিলেন না। রাজনীতির সাময়িক লক্ষ্য হইতে আরো বড়ো লক্ষ্য ও আদর্শ আজ ভারতবর্ষে উচ্চে তুলিয়া ধরিতে হইবে; এবং উহা হইতেছে সর্বদেশ-সর্বজাতি মিলনের আদর্শ।

ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদের বিচারে হয়ত রবীন্দ্রনাথের এই অতিমাত্র বিশ্বপ্রেমের আদর্শ দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভ্রান্তি-জনক মতাদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভারতবর্ষের মত একটি পরাধীন দেশে জাতীয় মুক্তিলাভই তখন প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত; পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ পরোক্ষভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গুরুত্বকে লঘু করিয়া দিবে এবং পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থায়িত্বকে সহায়তা করিবে—আপাতদৃষ্টিতে হয়ত এইরূপ মনে হইতে পারে।

কিন্তু ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথ আসলে মহান মানবপ্রেমিক কবি ও ভাবুক। শুধু আজ নয়, বিংশশতাব্দীর সূচনাকালেই তিনি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে কী কঠোর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ রাখা দরকার। 'নৈবেদ্য'-এ সেদিন কবি লিখিয়াছিলেন,

"The naked passion of self-love of Nations, in its drunken delirium of greed, is dancing to the clash of steel and the howling verses of vengeance."

রবীন্দ্রনাথের ভয়, জাতিপ্রেমের নামে পাশ্চাত্য দেশের এই জাতিবিদ্বেষ ও পরস্বাপহরণ-প্রবৃত্তি অলক্ষিতে পাছে আমাদিগকেও পাইয়া বসে। তাই তিনি ভারতবর্ষের স্বাদেশিক সংগ্রামে পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই উন্মত্ত বর্বরতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখিতেছেন, চারিদিকে আজ সভ্যতা ও আদর্শের সংকট উপস্থিত হইয়াছে। পৃথিবীর এই সংকট-মুহূর্তে প্রাচ্যদেশ হইতেই, এবং হয়ত ভারতবর্ষ হইতেই, বিশ্বমানবের মুক্তির ইশারা ও সন্ধান মিলিবে। আর শান্তিনিকেতনই সারা পৃথিবীর সমক্ষে আজ সেই বিশ্ব-মানবতা ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ তুলিয়া ধরুক, ইহাই কবির কামনা। তাই তিনি ঐ পত্রে অজিতকুমারকে বার বার সতর্ক করিয়া দিয়া লিখিলেন,

"সাধারণত আমাদের দেশে যে ভাবের উত্তেজনা প্রচলিত হয়েছে আমি সেই ভাবটিকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের উপযোগী মনে করি নে—বস্তুত সে-ভাবটি ও-জায়গার পক্ষে অসংগত।"

ইহার কয়েক মাস পরে, ১৫ই অগ্রহায়ণ, কলিকাতায় ওভারটুন হলে কবি তাঁহার বিখ্যাত 'তপোবন' প্রবন্ধটি (প্রবাসী, ১৩১৬ পৌষ) পাঠ করিলেন।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রাচীন তপোবন-সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন। আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে তিনি উহাকে কিছুটা সংস্কার করিয়া লইতেও প্রস্তুত। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাদর্শের প্রশ্নে তিনি প্রাচীন তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীর মূল ভাবটিকেই গ্রহণ করিবার কথা বলিলেন,

"বর্তমানকালে এখনি দেশে এইরকম তপস্যার স্থান, এইরকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে, আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারত-বর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের ঊর্ধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।"

অর্থাৎ তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছেন। তিনি আরও বলিলেন,

"ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা।…"

উপসংহারে কবি বলিলেন,

"তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে; বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্য ব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে—দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে সাধকভাবে।…"

[তপোবন—শিক্ষা (সংস্করণ : ১৩৫৭ আষাঢ়) ।। পৃঃ ১২৬-২৯]

এক কথায়, রবীন্দ্রনাথ দেশকে পাশ্চাত্যের উগ্র জাতীয়তাবাদের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বজাগতিকতার আদর্শ গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইলেন। রবীন্দ্রনাথের এই আন্তর্জাতিকতাবাদকে 'আধ্যাত্মিক বিশ্ব-জাগতিকতাবাদ' (Spiritual Internationalism) নামে অভিহিত করাই শ্রেয়।

ইহার প্রায় মাস দুই পরে কলিকাতায় মাঘোৎসব উপলক্ষে কবি 'বিশ্ববোধ' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। তপোবন প্রবন্ধে তিনি যে কথা বলিয়াছেন, তাহাই এই ভাষণে আরো জোর দিয়া তিনি বলিলেন,

"…আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবল আঘাত পেতে থাকব,—কেবলি অপমান কেবলি ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।"

[শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৪শ খণ্ড ।। পৃঃ ৫১৬]

॥ গোরা ॥

ইতিমধ্যে শ্রাবণ মাস ১৩১৬ নাগাদ কবি 'গোরা' উপন্যাসখানি রচনা সমাপ্ত করিলেন।

গোরা উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের বিষয়বহির্ভূত। কিন্তু এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গোরা মূলত রাজনৈতিক উপন্যাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের সংস্কারবাদী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল ধারাটি রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণভাবে এই উপন্যাসে চিত্রিত করিয়াছেন। এই আন্দোলনেই সমগ্র উপন্যাসখানির পটভূমিকা রচিত হইয়াছে।

গোরা উপন্যাসের আখ্যানভাগ সকলেরই নিকট এতই সুপরিচিত যে উহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। গোরা চরিত্র যেন রবীন্দ্রনাথের নিজেরই আত্মকাহিনী। গোরার শুরু ধর্মে ও সাম্প্রদায়িকতায়, সমাপ্তি ধর্ম ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতায়। গোরার শুরু হিন্দু জাতীয়তাবাদে, সমাপ্তি বিশ্বমানবতায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসানকালে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শ কিরূপ তীব্র ও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, সে-কথা আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সেই যুগে লিখিত রবীন্দ্রনাথের নববর্ষ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণ, সমাজভেদ প্রভৃতি প্রবন্ধ আলোচনাকালে আমরা তাঁহার 'হিন্দুয়ানি'র একটা বিস্তারিত চিত্র পাইয়াছি। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তীকালে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই 'হিন্দুয়ানি'র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া এক অখণ্ড বিশ্বমানবতার ও বিশ্বজাগতিকতার সত্যে উপনীত হইতেছেন। হিন্দুধর্ম হইতে সর্বধর্মসমন্বয়, জাতীয়তাবাদ হইতে বিশ্বজাগতিকতাবাদ—কবি-জীবনের এই আদর্শ-অন্বীক্ষার সুদীর্ঘ গতিপথটিই যেন গোরা উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

গোরার মতো বলিষ্ঠ ও প্রবলপ্রাণ চরিত্র বাংলা-সাহিত্যে আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে কিনা সন্দেহ। গোরা যেন বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, ব্রহ্মবান্ধব, রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ হৃদয়বত্তার মূর্ত প্রতীক। গোরা যেন সমগ্র ভারতের অপমানিত ও লাঞ্ছিত জাতীয়তার প্রচণ্ড সংক্ষোভ। তাহার ক্রুদ্ধ অশান্ত প্রাণ কালবৈশাখীর ঘন আঁধির দুর্যোগে যেন বজ্রের মত আকাশে-আকাশে গর্জন করিয়া ফিরিতেছে।

গোরার অভীপ্সা—ঈশ্বর নয়, ধর্মতত্ত্ব নয়, ন্যায়শাস্ত্র নয়; তাহার লক্ষ্য—পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া ভারতের জাতীয় কলঙ্ক মোচন, ভারতের জাতীয় পুনরুভ্যুত্থান। তাহার স্বপ্ন—প্রাচীন হিন্দুভারত।

গোরা—গোঁড়া হিন্দু-ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাহার হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদের জন্য। সে যে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে তাহা পুণ্যসঞ্চয়ের লোভে নয়, গঙ্গাস্নানের প্রতি বিশ্বাসবশেও নয়; পরন্তু "গোরা যে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে সংকল্প করিয়াছে তাহার কারণ এই যে, সেখানে অনেক তীর্থযাত্রী একত্র হইবে। সেই জনসাধারণের সঙ্গে গোরা নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়।···দেশের সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নামিয়া দাঁড়াইয়া মনের সঙ্গে বলিতে চায়, 'আমি তোমাদের, তোমরা আমার।"

[গোরা (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৩৫ চৈত্র) ।। পৃঃ ৫১]

স্বদেশের যে মূর্তি গোরাকে বিক্ষুব্ধ অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই কথা-প্রসঙ্গে সে বিনয়কে শুনাইল, "ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি সে তো সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে, ফুল দিয়ে পুজো নয়; সেখানে প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে পুজো করতে হবে—···এ একটা দুর্জয় দুঃসহ আবির্ভাব—এ নিষ্ঠুর, এ ভয়ংকর—এর মধ্যে সেই কঠিন ঝংকার আছে যাতে করে সপ্ত স্বর একসঙ্গে বেজে উঠে তার ছিঁড়ে পড়ে যায়। মনে করলে আমার বুকের মধ্যে উল্লাস জেগে ওঠে—···রক্তবর্ণ আকাশক্ষেত্রে একটা বন্ধনমুক্ত জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি—দেখো আমার বুকের ভিতরে কে ডমরু বাজাচ্ছে।" [ঐ ।। পৃঃ ১২৭-২৮]

একদিন সুচরিতাকে সে বলিল, "···ভারতবর্ষের নানা প্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের সঙ্গে এক দলে মিশে ধুলোয় গিয়ে বসতে আমার মনে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ হয় না।··আমি আমার ভারতবর্ষের সকলের সঙ্গে এক; তারা আমার সকলেই আপন; তাদের সকলের মধ্যেই চিরন্তন ভারতবর্ষের নিগূঢ় আবির্ভাব নিয়ত কাজ করছে···।" [ঐ ।। পৃঃ ১৯৭]

গোরা খালি পায়, খালি গায়, মাথায় চাদর জড়াইয়া গ্রাম পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছে; ঘোষপুর-চরে নীল কুঠির সাহেব ও পুলিসী দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে শাসাইয়া আসিয়াছে; ছেলেদের পক্ষ লইয়া পাহারাওয়ালা

সিপাহীদের ধরিয়া প্রহার করিয়াছে,—বিচারে একবৎসর কারাদণ্ডও ভোগ করিয়াছে। জেলখানা হইতেই মা-আনন্দময়ীকে সে লিখিতেছে,

"পৃথিবীতে যখন আমরা ঘরে বসিয়া অনায়াসেই আহারবিহার করিতেছিলাম, বাহিরের আকাশ এবং আলোকে অবাধ সঞ্চরণের অধিকার যে কত বড়ো প্রকাণ্ড অধিকার তাহা অভ্যাসবশত অনুভবমাত্র করিতে পারিতেছিলাম না, সেই মুহূর্তেই পৃথিবীর বহুতর মানুষই দোষে এবং বিনা দোষে ঈশ্বরদত্ত বিশ্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যে বন্ধন এবং অপমান ভোগ করিতেছিল আজ পর্যন্ত তাহাদের কথা ভাবি নাই, তাহাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখি নাই—এবার আমি তাহাদের সমান দাগে দাগি হইয়া বাহির হইতে চাই, পৃথিবীর অধিকাংশ কৃত্রিম ভালোমানুষ যাহারা ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়া আছে তাহাদের দলে ভিড়িয়া আমি সম্মান বাঁচাইয়া চলিতে চাই না।

"মা, এবার পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হইয়া আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে।··· যাহারা দণ্ড পায় না, দণ্ড দেয়, তাহাদেরই পাপের শাস্তি জেলের কয়েদিরা ভোগ করিতেছে; অপরাধ গড়িয়া তুলিতেছে অনেকে মিলিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ইহারাই।

[ঐ ।। পৃঃ ২৯৬-৯৭]

আর একদিন বিনয়কে গোরা বলিতেছে, "···সমস্ত পৃথিবী যে-ভারতবর্ষকে ত্যাগ করেছে, যাকে অপমান করেছে, আমি তারই সঙ্গে এক অপমানের আসনে স্থান নিতে চাই—আমার এই জাতিভেদের ভারতবর্ষ, আমার এই কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌত্তলিক ভারতবর্ষ। তুমি এর সঙ্গে যদি ভিন্ন হতে চাও তবে আমার সঙ্গেও ভিন্ন হবে।"

[ঐ ।। পৃঃ ৪৬২]

সুচরিতার কাছে গোরা একদিন পরিষ্কার স্বীকার করিল, "দেখো, আমি তোমাকে সত্য কথা বলব। আমি ঠাকুরকে ভক্তি করি কি না ঠিক বলতে পারি নে, কিন্তু আমি আমার দেশের ভক্তিকে ভক্তি করি। এতকাল ধরে সমস্ত দেশের পূজা যেখানে পৌঁচেছে আমার কাছে সে পূজনীয়। আমি কোনো মতেই খৃস্টান মিশনারির মতো সেখানে বিষদৃষ্টিপাত করতে পারি নে।"

আরো পরিষ্কার করিয়া গোরা বলিল, "অর্থাৎ, তুমি জানতে চাও, আমি কোনোদিনই ঈশ্বরকে চেয়েছি কি না। না, আমার মন ও দিকেই যায় নি। ···কিন্তু আমার দেশের লোকের ভক্তিকে তোমরা যে উপহাস করবে, এও আমি কোনোদিন সহ্য করতে পারব না।···"

[ঐ ।। পৃঃ ৫৩২-৩৫]

তারপর একদিন কঠিন নির্মম আঘাতে গোরার হিন্দুয়ানির স্বপ্ন-সৌধ ভাঙিয়া গেল। সে জানিল—সে মিউটিনির সময় কুড়াইয়া-পাওয়া ছেলে, সে আইরিশম্যান।

কঠিন দুঃখ ও আঘাতের মাঝে গোরা সত্যকে আবিষ্কার করিল। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার বাঁধ ভাঙিয়া গিয়া তাহার মধ্যে আসিল বিশ্বমানবতার প্লাবন। গোরা ছুটিয়া পরেশবাবুর কাছে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, "না, আমি হিন্দু নই।...ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার আজ আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে—আজ সমস্ত দেশের মধ্যে কোনো পঙ্‌ক্তিতে কোনো জায়গায় আমার আহারের আসন নেই।

"আজ আমি মুক্ত, পরেশবাবু। আমি যে পতিত হব, ব্রাত্য হব, সে-ভয় আর আমার নেই। আমাকে আর পদে পদে মাটির দিকে চেয়ে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে না।

"...আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি।..আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি, সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে—সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়—সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র।

"...আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।"... [ঐ।। পৃঃ ৬৭৩-৭৫]

এ কথা গোরার জবানীতে রবীন্দ্রনাথেরই কথা, তপোবন প্রবন্ধে যে কথা মাত্র কয়েকদিন আগেই তিনি বলিয়াছিলেন,

"ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে—দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে।"

সমগ্র উপন্যাসখানিতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণতাকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও উপহাস করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তখনও আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, তবুও এই সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলিকে নির্মমভাবে সমালোচনা করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। মনে-প্রাণে তখন তিনি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সকল গণ্ডিই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। গোরা উপন্যাসেও আমরা তাহারই প্রতিফলন দেখিতে পাই।

গোরা রচনার পর হইতে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের মধ্যে আস্তে আস্তে সামাজিক সংস্কারগুলি ভাঙিয়া ফেলিতে শুরু করিলেন। ইহার মাস পাঁচ-ছয় পরে তিনি রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দিলেন। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ছিলেন বালবিধবা।

কিছুকাল হইতেই কবি এই বালবিধবা-সমস্যা লইয়া গভীরভাবে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি রথীর বিবাহ হয় অসবর্ণে দিব, নয় বিধবার সহিত দিব।' শেষপর্যন্ত কবি তাঁহার এই কথা কার্যে পরিণত করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

"মাঘোৎসবের তিন দিন পরে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হইল (১৩১৬ মাঘ ১৪)। এই বিবাহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল; রথীন্দ্রনাথের বধূ প্রতিমা দেবী,—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী বিনয়নী দেবীর বিধবা কন্যা। বিধবাবিবাহ ঠাকুরবাড়িতে এই প্রথম, সুতরাং সামাজিক দিক হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ইহা বিপ্লবাত্মক। আইনের সাহায্যে হিন্দুসমাজের কোনোপ্রকার সামাজিক সংস্কার করা বিষয়ে মহর্ষির ঘোর আপত্তি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আইন দ্বারা বিধবাবিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য আন্দোলন করায় মহর্ষির অনুকূলতা তিনি লাভ করেন নাই। যাহাই হউক, এতকাল পরে ঠাকুর পরিবারের বহু প্রাচীন সংস্কার রবীন্দ্রনাথের হাতেই আঘাত পাইল, তবে তিনি কোনো আইনের দ্বারা এই বিবাহ সিদ্ধ করেন নাই। এই ঘটনার পর আদিসমাজের বহু সংস্কার একে একে ভাঙিয়া গেল।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ২১৯]

এই ঘটনার প্রায় চার মাস পরে তিনি আশ্রমের মধ্যে একটি অসবর্ণ বিবাহ দিলেন ;—অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহিত আশ্রমকন্যা লাবণ্যলেখার বিবাহের তিনিই ছিলেন মূল উদ্যোক্তা।

।। গীতাঞ্জলি ।।

১৩১৭ সালের শরতের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি রচনা সমাপ্ত করিলেন (২৯শে শ্রাবণ)। পূজার পূর্বেই উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ভাবসম্পদের দিক হইতে শান্তিনিকেতন উপদেশমালা ও গীতাঞ্জলির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। এককথায়—শান্তিনিকেতন উপদেশমালার মূল ভাবটি গীতাঞ্জলির কবিতা ও গানগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এইসকল কবিতা ও গানের অধিকাংশই আমাদের আলোচনার এক্তিয়ারের বাহিরে। কিন্তু গীতাঞ্জলির শেষের দিকের 'ভারততীর্থ' (১৮ই আষাঢ় ১৩১৭), 'দীনের সংগীত' (যেথায় থাকে সবার অধম ।। ১৯শে আষাঢ়), 'অপমানিত' (২০শে আষাঢ়), 'ছাড়িস নে ধরে থাকিস এঁটে' (২১শে আষাঢ়) প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় কবির মানবতাবাদ ও দেশাত্মবোধ সুতীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

ভারততীর্থ একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা। কবি স্বপ্ন দেখিতেছেন, ভারতবর্ষেই সর্বজাতির মিলনযজ্ঞের বেদীভূমি প্রস্তুত হইবে—ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও মিলনের মহোৎসব হইবে,

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।।"

তপোবন ও বিশ্ববোধ প্রবন্ধেও কবি এই কথা অন্যভাবে বলিয়াছিলেন।

অপমানিত কবিতায় তিনি পতিত জাতিগুলির প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের সামাজিক লাঞ্ছনা ও অপমানের বিরুদ্ধে জানাইলেন তীব্র ধিক্কার,

"দেখিতে পাও না তুমি, মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,—
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।

সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যু-মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান ॥"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সময় জনৈক নিষ্ঠাবতী হিন্দুরমণীর সহিত কবির ধর্ম ও সমাজসমস্যা সম্বন্ধে পত্রালাপ চলিতেছিল। ২০শে আষাঢ় অর্থাৎ,অপমানিত কবিতাটি রচনার দিন তিনি ঐ মহিলাকে এক পত্রে লিখেন,

"·আমি আমাদের দেশ-প্রচলিত দেবপূজার প্রণালীকে কেন-যে সমস্ত মন থেকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি তা নিশ্চয়ই আমার সমস্ত 'শান্তিনিকেতনে'র লেখাগুলির ভিতরে কতকটা প্রচ্ছন্ন ও কতকটা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে।···

"···আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্ত অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করছি।···আমরা ধর্মের নামে পাছে জাত যায় (এ আমার জানা) অপরিচিত মৃতদেহকে সৎকার করি নে—মানুষের স্পর্শকে বীভৎস জন্তুর চেয়ে বেশি ঘৃণা করি।···আর যাই হোক সাধনাকে নীচের দিকে নামতে দিলে কোনো মতেই চলবে না। কল্পনাকে, হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, কর্মকে কেবলি মুক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করতে হবে···। আমি নিজের জন্য এবং দেশের জন্য সেই মুক্তি চাই। মনে করো না সেই মুক্তি—জ্ঞানের মধ্যে মুক্তি, সে—প্রেমের মধ্যে মুক্তি।···"

[কয়েকখানি পত্র—প্রবাসী, ১৩৩৪ পৌষ]

গীতাঞ্জলির এই কবিতাগুলিকে রবীন্দ্রজীবনীকার সমসাময়িক কয়েকটি ঘটনার বিশেষ প্রতিক্রিয়া বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,

"···১৯১০ সালে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতবর্ষে অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা (free and compulsory) ব্যবস্থা গবর্মেণ্টের সাহায্যে দেশমধ্যে প্রবর্তিত করিবার আন্দোলন উপস্থিত করেন। দেশের প্রায় সর্বত্রই উচ্চবর্ণের ধনী হিন্দুরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। গোখলে এই বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও পাস করাইতে পারেন নাই। বিদেশী গবর্মেণ্ট যে কেবল জনশিক্ষার বিরোধী ছিল তাহা নহে,—দেশের সর্বহারা শ্রেণী ও সর্বহারাদের অজ্ঞতা ঘুচাইতেও পরাঙ্মুখ।···এই সময় হিন্দু অসবর্ণ বিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য ভূপেন্দ্রনাথ বসু যে আন্দোলন উপস্থিত করেন; তাহাও শিক্ষিত হিন্দুদের দ্বারা বাধা পাইতেছিল। এই সব পারিপার্শ্বিক ঘটনা কবির মনে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়া কবিতা কয়টির মধ্যে সুস্পষ্ট।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ॥ পৃঃ ২৩২]

॥ অচলায়তন ॥

গীতাঞ্জলির পর কবি 'জীবনস্মৃতি' এবং 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'ডাকঘর' প্রভৃতি রূপক নাট্যগুলি রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে অচলায়তনই কিছুটা আমাদের আলোচনার আওতার মধ্যে আসে।

অচলায়তন (১৩১৮ আষাঢ়) এবং পরবর্তীকালের 'কালের যাত্রা', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি রূপক নাট্যগুলি ভাবসম্পদের দিক হইতে প্রায় এক শ্রেণীর রচনা।

অচলায়তন নগরী মায়া ও যাদুমন্ত্র দিয়া ঘেরা। পুরোহিততন্ত্রই সেখানে প্রকৃত শাসনকর্তা—মন্ত্রতন্ত্র, সংস্কার ও সনাতন বিধিকে তাঁহারা কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, একচুল এদিক-ওদিক হইবার উপায় নাই। চারিদিকেই কঠিন নিষেধের সান্ত্রী খাড়া—বাহিরের আলোবাতাস যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে। মহাপঞ্চক এই প্রাচীন রক্ষণশীলতার মূর্ত প্রতীক।

অচলায়তনের দাদাঠাকুর বা গুরু আয়তনের দুর্লঙ্ঘ্য ও দুর্ভেদ্য প্রাচীরগুলি ভাঙিয়া দিয়া অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছদের লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে অচলায়তন ধ্বংস হইল। কিন্তু শুধু ভাঙনেরই গান নয়—শুধু ধ্বংসেই সমাপ্তি নয়। দাদাঠাকুর পঞ্চকের উপর ভার দিলেন নূতন নগরী গড়িয়া তুলিবার। সেই বিপ্লব ও ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়াইয়া দাদাঠাকুর বলিলেন, "আমাদের পঞ্চকদাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে।

সকলে। বেশ, বেশ, রাজি আছি।

দাদাঠাকুর। ওই ভিতের উপরে কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোনপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।

সকলে। হাঁ মিলেছে।

দাদাঠাকুর। সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে।"

অবশ্য মহাপঞ্চককে নির্বাসিত করা হইল না। তাহারও বিশেষ ভূমিকা আছে—"...কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার

তার ওর উপর। ক্ষুধাতৃষ্ণা-লোভভয়-জীবনমৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।”

অচলায়তন যে ভারতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সনাতন হিন্দুসমাজ, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু প্রশ্ন এই, রবীন্দ্রনাথ নিপীড়িত অস্পৃশ্যদের দিয়া এই সনাতন অচলায়তন সমাজকে ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিলেন কেন? রবীন্দ্রনাথ কি সশস্ত্র সমাজ-বিপ্লবকে সমর্থন করিলেন?

কিছুটা তাই বৈকি। ধনঞ্জয় বৈরাগী নিরস্ত্র গণ-বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিয়াছে, অচলায়তনের দাদাঠাকুর তো রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মন্ত্র দিলেন। এই বিপ্লবে শুধু ভাঙনই নাই—নূতন সৃষ্টি ও মুক্তির বাণীও আছে। অবশ্য বিপ্লব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কতকগুলি ধারণা ছিল। ‘পথ ও পাথেয়’ প্রবন্ধে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য করিয়া বিপ্লবের একটা ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন,

“…সকল দেশের ইতিহাসেই কোনো বৃহৎ ঘটনা যখন মূর্তিগ্রহণ করিয়া দেখা দেয় তখন তাহার অব্যবহিত পূর্বেই আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন দেখিতে পাই। রাষ্ট্রে বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে, তবে সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে কাটাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে।…

“…গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্মকেই তাহাদের সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।”

[পথ ও পাথেয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১০ম খণ্ড ।। পৃঃ ৪৫৪]

বিপ্লবের এই মূল ভাবটিই অচলায়তনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অচলায়তন প্রকাশিত হইলে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সমালোচনা করিয়া একজায়গায় অভিযোগ করিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ সমাজ ভাঙিতেছেন, তিনি মন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জবাবে রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় লিখিলেন,

"...অচলায়তনের গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন। গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন কি তিনি বলেন নাই 'না, তা যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে'? গুরুর আঘাত, নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা।..."

কয়েকদিন পর পুনরায় ললিতকুমারকে লিখিতেছেন,

"...অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা।...নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালোবাসিবে সে-ই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণে আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর।...দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারি দিকে আবদ্ধ করিয়াছে।... অন্তরে যে-সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র। অন্তরের সেই পাপগুলাকে কেবলই বাপু-বাছা বলিয়া নাচাইব, আর ধিক্কার দিবার বেলায় ওই বাহিরের শিকলটাই আছে? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে। যত লড়াই ওই শাস্তির সঙ্গে আর, যত মমতা ওই পাপের প্রতি?.. আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের-সমস্ত-দেশ ব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই...। অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।..."

[গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১১শ খণ্ড ।। পৃঃ ৫০৬ ও ৫০৮-১০]

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। কখনও তিনি ভাবিতেছেন রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূকে লইয়া সিঙ্গাপুর যাইবেন, কখনও ভাবিতেছেন জাপান যাইবেন, আবার কখনও বা ভাবিতেছেন ইউরোপ যাইবেন। এই সময়কার প্রায় সমস্ত চিঠিপত্রেই কবির বিদেশ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সময়ে নির্ঝরিণী দেবীকে এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন (২২শে আশ্বিন ১৩১৮),

"...সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে—আমার চারিদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মন উৎসুক হয়ে পড়েছে।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ২৪৯]

অল্পকাল পরেই শিলাইদহ হইতে কবি হেমলতা ঠাকুরকে লিখিতেছেন,

"নিজের বাইরের আবেষ্টন ভেদ করে আপনার যথার্থ সত্যরূপটিকে লাভ করবার জন্যে মনে ভারি একটা বেদনা বোধ করচি। সেই চিন্তা আমাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিচ্চে না। কেবলি বল্‌চে, বেরও, বেরও—না বেরোতে পারলে অন্ধকারের পর অন্ধকার—আপনার প্রকাশ একেবারে আচ্ছন্ন।...আমি যেন আর সহ্য করতে পারচি নে, বেরও, বেরও, বেরও—সমস্ত অসত্য থেকে সমস্ত স্থূলত্ব জড়ত্ব থেকে বেরও, বেরও—একবার নির্মল মুক্তির মধ্যে প্রাণ ভরে নিশ্বাস গ্রহণ কর—আর নয়—আর দিনের পর দিন এমন ব্যর্থতার মধ্যে কেবলি নষ্ট করে ফেলা নয়—কোথায় ভূমা কোথায়—কোথায় সমুদ্রের হাওয়া, আকাশের আলো, অপরিমিত প্রাণের বিস্তার।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ২৫০]

কবির প্রাণের এই আকুলতা কী কারণে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাঁহার অখণ্ড ভূমাচেতনা ও বিশ্ববোধের আকাঙ্ক্ষা ভিতর হইতে ক্রমাগত তাঁহাকে বিশ্ব-জগতের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য তাগিদ দিতেছে। বিশ্বভ্রমণ ছাড়া বিশ্বোপলব্ধি সম্ভব নহে, ইহাই কবির ধারণা। উদ্দেশ্যহীন কিংবা নিছক ভ্রমণের জন্যই তাঁহার এই বহির্ভ্রমণ নহে।

'ডাকঘর' রচনার (১৩১৮) পর রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনা করেন। এই সময় প্রবাসী, ভারতী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি পুনরায় ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সব পত্রিকায় তিনি 'ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা', 'ধর্মের অর্থ', 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়', 'রূপ ও অরূপ', 'ধর্মের নবযুগ', 'ধর্মের অধিকার', 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রভৃতি কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেন। ইহাদের প্রায় সবগুলিই 'পরিচয়' ও 'সঞ্চয়' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুব যে নূতন কথা কিছু বলিলেন তাহা নহে; তবে এই পর্বের কয়েকটি লেখায় বের্গসঁর 'গতিবাদ' বা 'অভিব্যক্তিবাদে'র (Creative Evolution) বেশ কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যাহাই হউক, এইসব প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনা আমাদের এক্তিয়ারের বাহিরে। এই প্রবন্ধগুলির একটি সংক্ষিপ্তসার হিসাবে আমরা রবীন্দ্রজীবনীকারের মন্তব্যটুকুই মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিতেছেন,

"সঞ্চয়ের ও পরিচয়ের পূর্ব-আলোচিত নয়টি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ ধর্ম দর্শন ও ভারতীয় সমাজের সমস্যা বিষয়ে যে আলোচনা করিলেন তাহাতে ধর্মের নৈর্ব্যক্তিক, অসাম্প্রদায়িক তত্ত্বটি প্রধানত ব্যক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান বলিতে যেমন ইংরেজের বিজ্ঞান, ভারতীয় বিজ্ঞান বলিয়া পৃথক বস্তু থাকিতে পারে না, বিজ্ঞান

সর্বত্র বিজ্ঞান,—তেমনি ধর্ম বলিতে মানুষের ধর্মই বুঝায়, কোন বিশেষ religion বুঝায় না। বিশেষ ধর্ম যদি মানবধর্মকে আঘাত করে তবে বুঝিতে হইবে অসত্য গোপনে কাজ করিতেছে তাহাই শয়তান, তাহাই মার। নবযুগের ধর্ম হইতেছে মানবের ধর্ম। ধর্মের নবযুগে ধর্মশিক্ষার আদর্শ বদলাইয়া গিয়াছে, ধর্মের অধিকার আজ বিশ্বব্যাপী মানবের জন্মাধিকার। তৎসত্ত্বেও যেসব পুরাতন বিশ্বজনীন ধর্ম আছে, তাহাদিগকেও নূতন আলোকে নূতন যুগের সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ২৬৯]

ঐ বৎসর কলিকাতায় মাঘোৎসবে কবি যোগদান করেন, এবং সেখানেই তাঁহার বিখ্যাত 'জনগণমন' সংগীতটি ব্রহ্মসংগীতরূপে গীত হয়। মাসখানেক পূর্বে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনেও গানটি গীত হইয়াছিল। বহুকাল পরে এক শ্রেণীর পরশ্রীকাতর ও নিন্দুক রাষ্ট্র করেন যে, সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লীদরবার উপলক্ষেই (১২ই ডিসেম্বর ১৯১১) রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীপুলিনবিহারী সেন এ ব্যাপারে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে তাঁহাকে লিখিলেন (ইং ২০।১১।৩৭),

"রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান্ আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক। সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনো ক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না।" [বিচিত্রা, ১৩৪৪ পৌষ]

হিন্দুমেলায় মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে যিনি দিল্লীদরবার উৎসবকে বিদ্রূপ করিয়া স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন, যিনি প্রত্যেকটি দরবারের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি যে পঞ্চম জর্জের দরবার উপলক্ষে ব্রিটিশ প্রশস্তি গাহিবার কথা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ভারতবর্ষের জাতীয়-সংগীত' ও 'India's National Anthem' পুস্তিকা দুইটি দ্রষ্টব্য। প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় বহু তথ্যাদি সংকলন করিয়া নিন্দুকদের অপপ্রচারের ভিত্তি খণ্ডন করিয়াছেন।

১৩১৮ সালে চৈত্রের প্রথম ভাগেই (৫ই চৈত্র) কবি বিলাতযাত্রার আয়োজন করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার তাহা স্থগিত রাখিতে হয়।

অতঃপর কবি অসুস্থ শরীর লইয়া শিলাইদহে চলিয়া আসেন। এই শিলাইদহে থাকাকালেই তিনি গীতাঞ্জলির ইংরাজি তর্জমা করিতে থাকেন। এই তর্জমাগুলিই যে একদিন তাঁহাকে জগদ্বিখ্যাত করিবে, ইহা কি তিনি সেদিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন ! শিলাইদহে শুধু যে তিনি কাব্যচর্চায়ই রত ছিলেন, তাহা নহে ; এই সময়ে তিনি তাঁহার জমিদারির কৃষক প্রজাদের আর্থিক সমস্যা ও উন্নয়নের নানারকম পরিকল্পনাও করেন। এই সময় কবি কলিকাতায় রথীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখিতেছেন,

"বোলপুরে একটি ধানভানা কল চলচে—সেইরকম একটা কল এখানে আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এ দেশ ধানের দেশ—বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়। আমার ইচ্ছা ৫।১০ টাকা শেয়ার করে এখানকার অনেক চাষায় মিলে এই কলটা যদি চালায় তাহলেই ওদের মধ্যে মিলে কাজ করবার যথার্থ সূত্রপাত হতে পারবে। আমাদের ব্যাঙ্ক (পতিসর কৃষিব্যাঙ্ক) থেকে ধার দিয়ে এই ধানভানার ব্যবসাটা এখানে সহজেই চালানো যেতে পারে।...এই কলের সন্ধান দেখিস্।

"তারপরে এখানে চাষাদের কোন্ industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছু জন্মায় না—এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিসটাকে cottage industry রূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস্—অর্থাৎ ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে একাজ সম্ভবপর কিনা। মুসলমানরা যে রকম সান্‌কির জিনিস ব্যবহার করে এরা যদি সেই রকম মোটা গোছের প্লেট বাটি প্রভৃতি তৈরি করতে পারে তাহলে উপকার হয়।...আরেকটা জিনিস আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে।...যাই হোক্ ধানভানা কল, Pottery'র চাক ও ছাতা তৈরির শিক্ষকের খবর নিস্—ভুলিস্‌নে।" [চিঠিপত্র : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ১৯-২০]

রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনা সে-যুগে কতখানি বাস্তব বা অবাস্তব সে-বিতর্কে না গিয়াও এ-কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য রবীন্দ্রনাথ সে যুগে যেরূপ চিন্তা ভাবনা করিয়াছেন, সমকালীন কোনো দেশনেতাকে সেরূপ করিতে দেখা যায় নাই। সব হইতে বড়ো কথা,

রবীন্দ্রনাথ গ্রামের গরীব মানুষের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, গভীরভাবে তাহাদের ভালোবাসিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রার পূর্বে দেশের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণাবলে দীর্ঘ সাত বৎসর পরে বঙ্গচ্ছেদ রহিত করিয়া পুনরায় অখণ্ডবঙ্গকে নূতন ভাবে গড়া হইল (১লা এপ্রিল ১৯১২)। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে, কংগ্রেসের কলিকাতা-অধিবেশনের প্রায় এক পক্ষকাল পূর্বে, দিল্লীদরবারেই পঞ্চম জর্জ বঙ্গচ্ছেদ রহিত করার কথা ঘোষণা করেন। মডারেট পন্থীরা উল্লসিত হইয়া কলিকাতা-কংগ্রেসে পঞ্চম জর্জ ও ব্রিটিশের প্রশস্তি গাহিলেন। অপরদিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও দেশে পুনরায় মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। দেশের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা এই সময় রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই না। একদিকে কংগ্রেসের রাজনীতির মধ্যে কোনো নূতনত্ব ছিল না—চিরন্তন আবেদন-নিবেদনই ছিল কংগ্রেসের সেই রাজনীতির মূলকথা। সুতরাং ইহা যে কবি সমর্থন করিতে পারিবেন না, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। অপরদিকে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আদর্শ ও নীতিকেও তিনি সমর্থন করিতে পারিলেন না। সেইকারণে দেশের রাজনৈতিক প্রশ্নে তাঁহাকে আমরা একটি কঠিন নীরবতা অবলম্বন করিতে দেখিতে পাই। কবি ভাবিতেছেন, তাঁহার আদর্শ লইয়া তাঁহাকে একলাই অগ্রসর হইতে হইবে—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।"

॥ তৃতীয়বার বিলাত যাত্রা ॥

২৭শে মে ১৯১২ রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন; সঙ্গে চলিলেন রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী।

সমুদ্রপথের নৈসর্গিক চিত্র কবির মনের তন্ত্রীতে বিচিত্র সুরের ঝঙ্কার তুলিতেছে, তাহারই আবেগে তিনি কবিতা ও গান লিখিয়া চলিয়াছেন। কখনও বা তিনি অনুবাদ করিতেছেন। দেশের সমস্যাও মনে জাগিতেছে। কখনও বা দেশে চিঠিপত্র লিখিতেছেন। চলার আনন্দে কবি গতির জয়গান গাহিয়া একসময় লিখিলেন (২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯),

"...যাহা-কিছু আমাদের বাধা তাহাকেই আমাদের চলিবার পথ, আমাদের মুক্তির উপায় করিয়া লইতে হইবে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ আছে। যাহারা এই আদেশ মানিয়াছে তাহারাই পৃথিবীতে ছাড়া পাইয়াছে। যাহারা মানে নাই এই পৃথিবীটা তাহাদের পক্ষে কারাগার।...

কেবলমাত্র এই চলিবার আনন্দটুকুই পাইব বলিয়া আমি বাহির হইয়াছি।...

প্রাণ আপনি চলিতে চায়; সেই তাহার ধর্ম। না চলিলে সে যে মৃত্যুতে গিয়া ঠেকে। এইজন্য নানা প্রয়োজনের ও খেলার ছুতায় সে কেবল চলে।..."

[যাত্রা—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ২৬শ খণ্ড ।। পৃঃ ৪৯২-৯৩]

১৬ই জুন রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে পৌছিলেন। লণ্ডনে আসিয়া প্রথমে তাঁহারা একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে শিল্পী রোদেনস্টাইনের চেষ্টায় হাম্পস্টেড হীথ-এ একটি বাসা ভাড়া করিলেন।

প্রায় এক বৎসর পূর্বে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রোদেনস্টাইন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সেই সময় কলিকাতায় অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি এই দুই প্রতিভাবান শিল্পীকে ইংলণ্ডে আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তারপর লণ্ডনে আসিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনার সহিত পরিচিত হন এবং তখন হইতেই তিনি কবির জন্য উদগ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।

লণ্ডনে পৌছিয়াই রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার হস্তে গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ সংবলিত একটি নোটবই দিলেন। রোদেনস্টাইন

গীতাঞ্জলির টাইপকরা কপি ইংলণ্ডের কয়েকজন বিখ্যাত ভাবুক-কবির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইয়েট্‌স্ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

তাহার পরের ইতিহাস সকলেরই নিকট সুপরিচিত। রোদেনস্টাইন ও ইয়েট্‌স্—এই দুইজনে গীতাঞ্জলি লইয়া সারা ইংলণ্ডের কবি সমাজকে মাতাইয়া তুলিলেন। এই দুইজন শিল্পীর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিকদের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ক্রমে কবির সহিত স্ট্যাফোর্ড ব্রুক, ব্রাডলে, হাড্‌সান, শ, মেসফীল্ড, ওয়েল্‌স্, গল্‌স্ওয়ার্দি, আনেস্টরীস, কুমারী সিনক্লেয়ার, জে. এল. হ্যমাণ্ড, আন্‌ডারহিল্, ফক্স-স্ট্রাংওয়েজ, স্ট্রাগমূর, রবার্ট ব্রীজেস্, এজ্‌রা পাউণ্ড প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণীজনের সহিত আলাপ হইল। এই লণ্ডনেই এক সান্ধ্যভোজের আসরে এণ্ড্রুজের (C. F. Andrews) সহিত কবির প্রথম আলাপ হয়। এণ্ড্রুজ্ ছিলেন দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেনস্ কলেজের অধ্যাপক এবং সেই সময় রবীন্দ্রনাথের রচনার সহিত তাঁহার কিছু কিছু পরিচয় হয়। তবে কবির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। পরবর্তীকালে এণ্ড্রুজ্ কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন, পরে তাহা আমরা দেখিতে পাইব।

রোদেনস্টাইন ও ইয়েট্‌স্ প্রমুখ কয়েকজন ভারতবন্ধুর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে ১০ই জুলাই ইণ্ডিয়া সোসাইটির পক্ষ হইতে ট্রকেডারো হোটেলে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার আয়োজন হয়। এই সান্ধ্যসভায় অন্যান্য গুণীজনের সহিত এইচ্. জি. ওয়েল্‌স্, মিস্ মে. সিন্‌ক্লেয়ার, নেভিন্‌সন্, হ্যাভেল, কবি রলেস্‌টন্ প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ইয়েট্‌স্ উঠিয়া এক আবেগময়ী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলেন। এইদিনের সভায় রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষুদ্র ভাষণটি দেন, তাহাতে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার ভাষণের এক জায়গায় বলিলেন,

"আজ এই সন্ধ্যায় আপনারা আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করিলেন, আমার ভয় হয়, যে ভাষার মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই সে ভাষায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার নাই।…সেইজন্য আমি কেবলমাত্র আপনাদিগকে এইটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে, এদেশে আসা অবধি যে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি দ্বারা আপনারা আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাকে এত মুগ্ধ করিয়াছে যে আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। আমি একটি শিক্ষালাভ করিয়াছি—এবং সহস্র মাইল পথ সেই শিক্ষালাভের জন্য আমার আসা সার্থক যে,

যদিও আমাদের ভাষা, আমাদের আচার-ব্যবহার সমস্তই পৃথক তথাপি ভিতরে ভিতরে আমাদের হৃদয় এক। নীলনদের তীরে যে বর্ষার মেঘ উৎপন্ন হয় সে যেমন সুদূর গঙ্গার উপত্যকাকে শস্যশ্যামলা করিয়া দেয়, তেমনি পূর্বাকাশের সূর্যালোকের অনিমেষ দৃষ্টির নিম্নে যে আইডিয়া আকারপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে হয়ত সমুদ্রপার হইয়া পশ্চিমে আসিতে হইবে—সেখানকার মনুষ্যহৃদয়ের মধ্যে তাহার সম্ভাষণ লাভের জন্য সেখানকার সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য। প্রাচী প্রাচীই এবং প্রতীচীও প্রতীচী সন্দেহ নাই এবং ঈশ্বর না করুন যে ইহার অন্যথা হয়—তথাপি এই উভয়ই মিলিতে পারে। না—সখ্যে, শান্তিতে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিচয়ে ইহারা একদিন মিলিবেই। ইহাদের মধ্যে ভিতরে প্রভেদ আছে বলিয়াই ইহাদের মিলন আরও সফল মিলন হইবে—কারণ সত্যকারের প্রভেদ কখনই বিলুপ্ত হইবার নয়—তাহা ইহাদের উভয়কে বিশ্বমানবের সাধারণ বেদিকার সম্মুখে এক পবিত্র বিবাহবন্ধনে মিলিত করিবার দিকেই লইয়া চলিবে।"

[রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৩০১]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এখানে পূর্ব ও পশ্চিমের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মিলনের কথাই বলিতেছেন। স্মরণ থাকিতে পারে, ইতিপূর্বে অল্প বয়সেই যখন তিনি দুইবার বিলাতভ্রমণে আসেন, তখনই তিনি লণ্ডনে ইউরোপীয় সংগীত ও চিত্রকলা গভীর অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া ইউরোপীয় সংগীতের সহিত দেশী সুরের মিশ্রণের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করিয়াছিলেন। এসব কথা আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এবারেও লণ্ডনবাসকালে তিনি পাশ্চাত্য সংগীত ও চিত্রকলা শুনিবার ও দেখিবার সুযোগ ছাড়িলেন না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন,

"লণ্ডনে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ সুবিধা ও সময় পাইলেই পাশ্চাত্য সংগীত ও অভিনয় দেখিতে যাইতেন। তাঁহারা যখন লণ্ডনে পৌঁছিলেন, তখন তথায় সংগীতের আসর ভাঙিবার মুখে। তবুও তিনি গিয়া পাইলেন হানডেল উৎসব। ক্রিস্টাল প্যালেসের গীতশালায় বিখ্যাত জার্মান সংগীতস্রষ্টা হানডেল (George Frederic Handel : 1685-1759) স্মরণে উৎসব—চারি সহস্র যন্ত্রী ও গায়ক তজ্জন্য মিলিত হইয়াছে। এই গীত-উৎসব হইতে ফিরিয়া কবির মনে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীতকলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যেসব চিন্তার উদয় হইতেছে তাহা তিনি 'সংগীত' নামক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন।

"ভারতীয় সংগীত পাছে য়ুরোপের সংসর্গে পড়িয়া আপনাকে বিস্মৃত হয়, এই ভয়ের কথা আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছি; রবীন্দ্রনাথ তাহা বিশ্বাস করেন

না, তিনি বলেন তার উল্‌টা কথাই সত্য ; 'য়ুরোপের সংগীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে আমাদের সংগীতকে আমরা সত্যকার বড়ো করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিব।' 'য়ুরোপের প্রবল সজীব শক্তির প্রথম সংঘাতে কিছুকালের জন্য আমরা দিশে হারিয়ে থাকি কিন্তু শেষকালে আমরা নিজের প্রকৃতিকেই জাগ্রততর করে পাই।...আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্বোধন দেখা যাচ্ছে তার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রয়েছে।' সেইজন্য কবি স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, 'আমার বিশ্বাস সংগীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংস্রব প্রয়োজন হয়েছে।' ··

[রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৩০৫]

তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ যে সময় ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সে সময় ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় একটা ঘোর প্রতিক্রিয়া ও বিভ্রান্তিতে দিশাহারা হইয়া ছিল। টিউডর যুগ হইতে ইংলণ্ডের কবি ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সারা ইউরোপের ক্ষেত্রে যে একটি বিশিষ্ট প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহার অবসান ঘটে। মিল্টন-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-শেলীর ঐতিহ্যসম্পন্ন ইংলণ্ড তখন একটা প্রতিক্রিয়ার মোড়ে আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছে। এক কথায় ইংলণ্ড তখন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ভাবনা ও চিন্তারাজির প্রতিনিধিত্ব করিতেছে না, এ-কথা বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হইবে না। এবং এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইংলণ্ডে থাকিয়া ইউরোপের প্রগতিশীল মতাদর্শের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। বার্নার্ড শ বা এইচ. জি. ওয়েলসের সহিত কবির এমনি পরিচয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু 'ফেবিয়ান সমাজে'র চিন্তাধারার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ইংলণ্ডের কবিকুল রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ভগবৎপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতা লইয়া মাতিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বমানবতার ও সর্বজাতিক মিলনমন্ত্রের এতটুকুও আবেদন ছিল না তাঁহাদের কাছে।

ইংলণ্ডে আসিয়া কবি যে বিশেষ চমৎকৃত হইলেন তাহা নহে। একেশ্বরবাদী স্টপফোর্ড ব্রুকের সহিত আলাপ আলোচনায় তিনি আনন্দ পাইয়াছিলেন বটে তবে ইংলণ্ডের কবিকুলের মধ্যে আইরিশ কবি ইয়েট্‌সই তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই সময়ই তিনি 'কবি ইযেট্‌স্' প্রবন্ধটি (প্রবাসী, ১৩১৯ কার্তিক) লিখেন। ইংলণ্ডের আধুনিক কবিদের প্রাণশক্তির উৎস মুখ যে শুকাইয়া আসিতেছে এই প্রবন্ধে কবি স্পষ্ট করিয়া তাহাই উল্লেখ করিলেন,

"ইংলণ্ডের বর্তমানকালের কবিদের কাব্য যখন পড়িয়া দেখি তখন ইঁহাদের অনেককেই আমার মনে হয়, ইঁহারা বিশ্বজগতের কবি নহেন। ইঁহারা

সাহিত্যজগতের কবি। এদেশে অনেকদিন হইতে কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি চলিতেছে,—হইতে হইতে কাব্যের ভাষা উপমা অলংকার ভঙ্গী বিস্তর জমিয়া উঠিয়াছে। শেষকালে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, কবিত্বের জন্য কাব্যের মূল প্রস্রবণে মানুষের না গেলেও চলে। কবিরা যেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ প্রাণ হইতে গান করিবার প্রয়োজনবোধই তাহাদের চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল গান হইতেই গানের উৎপত্তি চলিতেছে। যখন ব্যথা হইতে কথা আসে না, কথা হইতেই কথা আসে, তখন কথার কারুকার্য ক্রমশ জটিল ও নিপুণতর হইয়া উঠিতে থাকে; আবেগ তখন প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে হৃদয়ের সামগ্রী না হওয়াতে সে সরল হয় না; সে আপনাকে আপনি বিশ্বাস করে না বলিয়াই বলপূর্বক অতিশয়ের দিকে ছুটিতে থাকে; নবীনতা তাহার পক্ষে সহজ নহে বলিয়াই আপনার অপূর্বতা-প্রমাণের জন্য কেবলি তাহাকে অদ্ভুতের সন্ধানে ফিরিতে হয়।"

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মূলকথা—জীবনের সহিত সংযোগ না থাকার দরুনই style, technique ও form-এর রকমারি বৈচিত্র্যই আধুনিক ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে কাব্যের মূল লক্ষ্য হইতে আজ সে কেন্দ্রচ্যুত। উহাদের মধ্যে ইয়েট্‌স্‌ই যেন কিছুটা ব্যতিক্রম। ইয়েট্‌স্‌কে কেন তাঁহার ভালো লাগিয়াছিল, সে সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন,

"...কবি য়েট্‌সের কাব্যে আয়র্লণ্ডের হৃদয় ব্যক্ত হইয়াছে।

সকলেই জানেন, কিছুকাল হইতে আয়র্লণ্ডে একটা স্বাদেশিকতার বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসন সকল দিক হইতেই আয়র্লণ্ডের চিত্তকে অত্যন্ত চাপা দিয়াছিল বলিয়াই এই বেদনা একসময়ে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন হইতে এই বেদনা প্রধানত পোলিটিক্যাল বিদ্রোহ-রূপেই আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অবশেষে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা চেষ্টা দেখা দিল। আয়র্লণ্ড আপনার চিত্তের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়া তাহাই প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল।

"...আয়র্লণ্ড নিজের চিত্তস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিবার চেষ্টায় নিজের ভাষা কথা কাহিনী ও পৌরাণিকতাকে অবলম্বন করিবার যে উদ্যোগ করিয়াছে, সেই উদ্যোগের মধ্যে এক-একজন অসামান্য লোকের প্রতিভা আপনার যথার্থ ক্ষেত্র পাইয়াছে। কবি য়েট্‌স তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। ইনি আয়র্লণ্ডের বাণীকে বিশ্বসাহিত্যে জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছেন।"

[কবি য়েট্‌স্‌—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ২৬শ খণ্ড ।। পৃঃ ৫২১-২৭]

ইয়েট্‌সের কাব্যসাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে,

কিন্তু এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় না।

ইংলণ্ডে থাকাকালে কবির পক্ষে আধুনিক পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শন কিংবা মার্কসীয় দর্শনের সহিত পরিচয় ঘটিবার সুযোগ হয় নাই বটে, তবে আধুনিক ইংলণ্ডবাসীর খ্রীস্টান ধর্মমতের মধ্যে কিছু উদারতাব লক্ষণ যেন তিনি দেখিতে পাইলেন। ইংলণ্ডের জনৈক খ্রীস্টান পাদরীর আমন্ত্রণে তিনি কিছুদিন তাঁহার গ্রামের বাড়িতে কাটাইয়া আসেন। এই সময়ই তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য 'ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি' প্রবন্ধটি লিখিয়া পাঠান। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, ইউরোপের ধর্মবোধে সম্প্রতি একটি যুক্তিবাদী ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিলেও ইউরোপের বাহিরে খ্রীস্টান মিশনারীরা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনীতির নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া পবোক্ষে উহাকে সমর্থন করিতেছেন। তিনি বলিলেন,

"...এইজন্য সমস্ত দেশ জুড়িয়া পাদ্রির দল বসিয়া থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ দস্যুবৃত্তি ও কসাইবৃত্তি করিতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিনায়কদের লেশমাত্র সংকোচ বোধ হয় না; তাঁহাদের সেই পুণ্যজ্যোতি নাই যাহার সম্মুখে এই-সকল বিরাট পাপের কলঙ্ককালিমা সর্বসমক্ষে বীভৎসরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়।"

[ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ২৬শ পযস্ত ।। পৃঃ ৫৪৭]

নিছক দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য লইয়া কবি ইংলণ্ড আসেন নাই। ইংলণ্ডের শিক্ষাবিধির সহিত সম্যকভাবে পবিচিত হইবার একটা বাসনা তাঁহার বহুকাল হইতেই ছিল। ইংলণ্ডে আসিয়া তিনি এ সম্পর্কে বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন। বোদেনস্টাইন পবিবারের সহিত ইংলণ্ডের চ্যালফোর্ড নামক একটি গ্রামে তিনি কয়েকদিন কাটান। এই গ্রামে বসিয়া তিনি শিক্ষাবিষয়ক পর পর দুইটি প্রবন্ধ লিখিলেন। প্রবন্ধ দুইটি—'শিক্ষাবিধি' [প্রবাসী, ১৩১৯ আশ্বিন] এবং 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৮৩৪ অগ্রহায়ণ]—পরবর্তীকালে 'শিক্ষা' পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে।

শিক্ষাবিধি প্রবন্ধের শুরুতেই কবি লিখিলেন,

"এখানে আসিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল, এখানকার বিদ্যালয়গুলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া লইব—শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কিনা তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্য কিছু দেখিয়াছি, কাগজ-পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা বকমের উদ্ভাবিত হইতেছে।..."

দেশের গভর্নমেণ্টের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলিলেন,

"…দেশের মন'প্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মতলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিদ্যার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের মুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। ·"

রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য,

"যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে।…'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীযের শাসনেই হউক আর বিজাতীযের শাসনে হউক, যখন কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা-কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না—তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।"

[শিক্ষাবিধি—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ২৬শ খণ্ড ।। পৃঃ ৫৬৭-৭২]

লক্ষ্য ও শিক্ষা প্রবন্ধে কবি বলিলেন,

"আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণত ইস্কুল হইতে হয় না, এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না।…মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল সেইখানেই তাহার বিদ্যা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে।…"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ স্কুলের বাহিরে বৃহত্তর সমাজজীবনে মানুষের মহত্তম জীবনাদর্শ ও লক্ষ্যের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন,

"··আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোন অর্থই নাই।…"

[লক্ষ্য ও শিক্ষা—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ২৬শ খণ্ড ।। পৃঃ ৫৭৬-৭১]

রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকমাস ইংলণ্ডে থাকেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ 'রবীন্দ্র-জীবনী', 'বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই কয়মাস আমরা রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কবিতা ও নাটকগুলি অনুবাদ করিবার (এবং অপরকে দিয়া অনুবাদ করাইবার) কাজে ব্যস্ত দেখিতে পাই। এই সময়ে জানা গেল, 'ইণ্ডিয়া-সোসাইটি' হইতে গীতাঞ্জলি প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অক্টোবরের শেষের দিকে কবি আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

।। আমেরিকায় ।।

২৮শে অক্টোবর ১৯১২ রবীন্দ্রনাথ নিউইয়র্ক মহানগরীতে পৌঁছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও ডাঃ ডি. এন. মৈত্র।

রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুকাল হইতেই অর্শরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। অস্ত্রোপচার না করিয়া আমেরিকায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার আমেরিকায় আসা। আমেরিকায় নামিয়াই তাঁহার তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মাইল। এই প্রসঙ্গে ডাঃ ডি. এন. মৈত্র লিখিতেছেন,

"আমেরিকায় নেমে এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা আমরা পেয়েছিলাম। মনে করেছিলাম কয়জন মিলে একটু ঘরোয়া গোছে থাকবো, সেই চেষ্টায় বাহির হলেম। আমার য়ুরোপীয় পোশাক ছিল। একটি বোর্ডিং হাউসে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি 'ঘর আছে?' বলে—হাঁ; কিন্তু পরমুহূর্তেই কবির আলখেল্লা পরা দীর্ঘ গুম্ফশ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারা দেখেই বলে 'না নেই।' এমন কয়েক জায়গায় ব্যর্থ হয়ে আমরা হেরল্ড স্কোয়ার হোটেল-এ আশ্রয় নিলাম।

"কবি অত্যন্ত বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হলেন এইরূপ অভদ্রোচিত ব্যবহারে, বিশেষত ভারতবাসীর প্রতি অবজ্ঞার জন্য।...নিউইয়র্কে থাকতে তাঁর মন চাইল না।" [জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ ।। পৃঃ ৪৬-৪৭]

নিউইয়র্কে কিছুদিন জনৈক চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসা করাইয়া তাঁহারা আর্বানায় যাত্রা করিলেন। আর্বানায় ইউনিটারিয়েনদের ক্লাবে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন উপদেশমালার বিশ্ববোধ, আত্মবোধ, ব্রহ্মসাধন ও কর্মযোগ—এই চারিটি প্রবন্ধের ইংরাজী তর্জমা করিয়া বক্তৃতা করিলেন।

জানুয়ারির শেষের দিকে কবি আর্বানা হইতে শিকাগো আসিলেন। এইখানে 'Ideals of the ancient civilisation of India' এবং 'The problems of Evil' নামক প্রবন্ধ দুইটি ভাষণ হিসাবে পাঠ করিলেন।

কয়েকদিন পরেই তাঁহারা রচেস্টারে পৌঁছিলেন। রচেস্টারে তখন উদার ধর্মমতাবলম্বীদের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে যোগদান করিবার আমন্ত্রণ পাইলেন। সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের

মনীষীরা যোগদান করেন। এই সম্মেলনেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বক্তৃতা 'Race conflict' পাঠ করিয়াছিলেন।

এই বক্তৃতার মূল কথাটা হইতেছে,—মানব সভ্যতার আদিকাল হইতে জাতি-সংঘাত লাগিয়াই রহিয়াছে, এই জাতিসংঘাতের নানা দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও বৈষম্যের মাঝেও মানুষ তাহার আপন প্রয়োজনে একটি ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়, যাহা নানা পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলিকে সমন্বিত করিয়া এক সূত্রে গাঁথিতে পারিবে। ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের মূলই হইতেছে, তাহার নিজের অভ্যন্তরের নানা দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা। ভারতসভ্যতা যে-ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক, রবীন্দ্রনাথ একথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন তাঁহার এই বক্তৃতায়। কিন্তু অধুনাকালের জাতিসংঘাতের মধ্যেও তিনি এক মহান ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন যেন। তাই তিনি বলিলেন,

"আজ যে সুসভ্য মানুষের সম্মুখে এই জাতিসংঘাতের সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের আনন্দিত ও উৎসাহিত হইবার কথা। বিশ্বমানবের চেতনার মধ্যে মানুষ যে নবজন্ম লাভ করিয়াছে, ইহাই এ যুগের সকলের চেয়ে গর্ব করিবার বিষয়।···মনুষ্যত্বের মহা আহ্বান যখন সমুচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত, তখন মনুষ্যের উচ্চতর প্রকৃতি কি তাহাতে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে। জানি, শক্তি ও জাতীয় গর্বের মদোন্মত্ত উন্মাদনার উৎসব-নিশীথে মানুষ সেই আহ্বানকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, তাহাকে শূন্য ভাবুকতা ও দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া ঠেলিয়া দিতে পারে—কিন্তু সেই মত্ততার মধ্যেই,—তাহার সমস্ত প্রকৃতি যখন প্রতিকূল, তাহার প্রবল আক্রমণ যখন বিচারমূঢ় ও ন্যায়ঘাতী—সেই সময়েই, এই কথাই তাহার মানসপটে সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে যে নিজের অন্তর্নিহিত সর্বোচ্চ সত্যকে আঘাত করা আত্মঘাতের চরমতম রূপ। যখন ব্যূহবদ্ধ জাতীয় স্বাতন্ত্র্যপরতা, পরজাতি-বিদ্বেষ এবং বাণিজ্যের স্বার্থান্বেষণ অত্যন্ত অনাবৃতভাবে তাহার বীভৎসতম রূপ প্রকাশ করে, তখনি মানুষের জানিবার সময় উপস্থিত হয় যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাপকতর বাণিজ্যের আয়োজনে, কিংবা সামাজিক কোনো যন্ত্রবদ্ধ নূতন ব্যবস্থায় মানুষের মুক্তি নাই। জীবনের গভীরতর রূপান্তর সাধনে, চৈতন্যকে সর্ব বাধা হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তিদানে এবং নরের মধ্যে নারায়ণের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতেই, মানুষের যথার্থ মুক্তি।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৩১৪-১৫]

বিষয়ের অভিনবত্বে আমেরিকার পত্রপত্রিকাগুলি সাময়িকভাবে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু ধনতন্ত্রবাদী ও উগ্র নিগ্রো-বিদ্বেষী বা বর্ণবিদ্বেষী

আমেরিকার কাছে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয়তাবাদবিরোধী বিশ্বমানবতার আদর্শের কোনো আবেদন ছিল না।

আমেরিকা হইতে লেখা চিঠিপত্রগুলি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রায় এই সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য বিদেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার কল্পনা উদয় হয়।

আমেরিকায় থাকিতেই কবি জানিতে পারিলেন, লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ ('Song-Offerings') প্রকাশিত হইয়াছে; ম্যাকমিলান কোম্পানি উহা প্রকাশ করেন (১৯১২ নভেম্বর)। গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইলে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে বিরাট চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, সে ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা।

এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিলেন। কিছুদিন পরে তিনি ক্যাক্স্টন হলে পরপর কয়েকটি বক্তৃতা করিলেন। প্রায় সবগুলি বক্তৃতাই শান্তিনিকেতন উপদেশমালার ইংরাজী তর্জমা। সেগুলি হইতেছে—The relation of the individual and the universe (ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ), Soulconsciousness (আত্মবোধ), The problem of evil (পাপবোধ), Problems of Self (আত্মসমস্যা), Realisation in love (ভক্তিযোগ), Realisation in action (কর্মযোগ), Realisation in beauty (সৌন্দর্যবোধ) ও Realisation of the infinite (বিশ্ববোধ)। এইগুলি পরবর্তীকালে ইংরাজী 'Sadhana' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯১৩ রবীন্দ্রনাথ লিভারপুল হইতে দেশের পথে যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্বেকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন,

"লিভারপুলে জাহাজে উঠিবার পূর্বেই ১৪ই আগস্ট (১৯১৩) তারিখের একখানি 'বেঙ্গলি' দৈনিক কবির হস্তগত হইল; সেই কাগজ হইতে কবি জানিতে পারিলেন যে বর্ধমানে প্রলয়ংকরী বন্যা হইয়া গিয়াছে। বিদায়কালে যে সব সাংবাদিকের দল কবির নিকট হইতে বাণী গ্রহণের জন্য উপস্থিত হন, তাহাদের নিকট তিনি অত্যন্ত তীব্রভাবে বলেন যে বাংলাদেশের এতবড়ো একটি মর্মন্তুদ ঘটনা বিলাতের কোনো কাগজে প্রকাশমাত্র হয় নাই; অথচ তিনি জানিতে পারিয়াছেন বন্যার বিস্তারিত সংবাদ জার্মান কাগজে যথাসময়ে বাহির হইয়া গিয়াছিল।…"

[রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৩২৫-২৬]

প্রায় একমাস পরে—৪ঠা অক্টোবর জাহাজ বোম্বাই পৌছিল। দুইদিন পরে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় পৌছিলেন।

॥ মহাযুদ্ধের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী ॥

কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হৈ-চৈ ও গোলমালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাই দুইদিন পরই তিনি শান্তিনিকেতন যাত্রা করিলেন (৮ই অক্টোবর ১৯১৩)।

কিছুদিন পর বিদ্যালয় খুলিল। তারপর সেই স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিন, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর ভারতবাসী জানিতে পারিল—১৯১৩ সালের সাহিত্যের 'নোবেল প্রাইজ' রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর দেশে ও বিদেশে এবং বিশেষ করিয়া কবির মনে কী প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, তাহা বিভিন্ন পুস্তকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে বোধকরি সে-সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি একদিকে যেমন ভারতবাসীর জাতীয় মর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিয়াছে, অপরদিকে তেমনই পরোক্ষভাবে ইহা আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে করিয়াছে বেগবান। অকস্মাৎ মুহূর্তে যেন ভারতবর্ষ পৃথিবীর বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যখন বিলাতে, সেই সময়ই এণ্ড্রুজ্ ও তাঁহার বন্ধু পিয়ার্সন কবির আদর্শে মুগ্ধ হইয়া শান্তিনিকেতনে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে থাকিতেই তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই দুই আদর্শবাদী ইংরাজ যুবক শুধু শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শেই আকৃষ্ট হন নাই, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার পবাধীনতার জন্য ইঁহারা অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেন। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে যে ইঁহাদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, এ-কথা বোধকরি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল। এই আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার। ট্রান্সভালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জের তখনও শেষ হয় নাই। ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'Union of South Africa' প্রতিষ্ঠিত হইল (১৯০৯)। জেনারেল

স্মাট্স্ হইলেন তাহার প্রথম বিচারমন্ত্রী। অল্পকালের (১৯১৩) মধ্যেই সেখানকার সুপ্রিম কোর্টে নির্ধারিত হইল যে, অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকায় খ্রীস্টান বিবাহই একমাত্র বৈধ বিবাহ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহার ফলে, ভারতীয় বিবাহিত মহিলারা আইনের চোখে বারবনিতা শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত হইলেন। এই নিদারুণ অপমানে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমাজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

অপরদিকে নাটালে তখন ভারতীয় শ্রমিকরা মাথাপিছু তিন পাউণ্ড ট্যাক্সের বিরুদ্ধে ধর্মঘট-সংগ্রাম শুরু করিয়া দিয়াছে; A. Christopher নামক জনৈক ভারতীয় খ্রীস্টান ইহাদের নেতৃত্ব করিতেছিলেন। আর একদিকে নিউ ক্যাসেল-এর কয়লাখনির ভারতীয় শ্রমিকরা ভারতীয় মহিলাদের প্রতি অবমাননাকর ব্যবহারের প্রতিবাদে ধর্মঘট ও অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রাম শুরু করিয়া দিল। স্বয়ং গান্ধীজী ইহাদের নেতৃত্ব করিতেছিলেন। নিউ ক্যাসেল এবং সমগ্র নাটালে সহস্র সহস্র ভারতীয় শ্রমিক ধর্মঘট ও সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান করিল। গভর্নমেণ্ট নৃশংসভাবে এই আন্দোলনকে দমন করিতে শুরু করিলেন। সহস্র সহস্র মজুরকে গ্রেপ্তার করিয়া খনি অঞ্চলে প্রেরণ করা হইল, উদ্যত সঙ্গীনের মুখে তাহাদের কাজ করিতে বাধ্য করা হইতে লাগিল।

এই সংবাদে ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বিশ্বে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ অবধি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের এই আচরণের তীব্র নিন্দাবাদ করিলেন। চারিদিকের এই নিন্দাবাদ ও জনমতের চাপে স্মাট্স্ সরকার কিছুটা নতি স্বীকার করিলেন। শেষ পযন্ত স্মাট্স্ এই ব্যাপারে একটি তদন্ত-কমিশন নিযুক্ত করিলেন। গান্ধীজীও এইরকম একটা শান্তিপূর্ণ মধ্যস্থতা বা আপস-আলোচনার পক্ষেই ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে গোখলের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া এ ব্যাপারে পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইলেন। এণ্ড্রুজ্ ও পিয়ার্সন-সাহেব ভারতবর্ষ হইতে গোখলের পরামর্শ ও নির্দেশ লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

আফ্রিকাযাত্রার পূর্বে এণ্ড্রুজ্ ও পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য আসিলেন। তাঁহাদের যাত্রার সাফল্য কামনা করিয়া শান্তিনিকেতনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সেদিন মন্দিরের বিশেষ উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ আচার্যের কার্য সম্পন্ন করেন। ৩০শে নভেম্বর ১৯১৩ এণ্ড্রুজ্ ও পিয়ার্সন বোলপুর ত্যাগ করিলেন। যাত্রার পূর্বে ছাত্রদেব উদ্যোগে এক বিদায়সভায় পিয়ার্সন বলিলেন, "আমি এবং আমার বন্ধুর (এণ্ড্রুজ্) পক্ষ হইতে একটি মাত্র কথা তোমাদিগকে বলিতেছি যে এই শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে যে

শান্তি আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার কার্যে আমাদিগকে সাহায্য করিবে।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৩৩৮]

বিস্ময়ের কথা, দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি কিংবা গান্ধীজী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ-আন্দোলন সম্পর্কে তখনও আমরা রবীন্দ্রনাথকে কোনো মন্তব্য করিতে দেখিতে পাই না। রবীন্দ্রজীবনীকারও এ সম্পর্কে কোনো তথ্যাদি সরবরাহ করেন নাই। তবে মনে হয় এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের মোটামুটি সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। প্রায় মাস দুই পরে (১৯১৪ ফেব্রুয়ারী) শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজ্‌কে এক পত্রে লিখিতেছেন, "You know our best love was with you, while you were fighting our cause in Africa along with Mr. Gandhi and others. [ঐ ।। পৃঃ ৩৩৮]

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধর্ম ও অধ্যাত্মবিষয়ক বক্তৃতা এবং গীতাঞ্জলির স্বীকৃতি ও সমাদর লাভের ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে কেমন যেন একটি ধারণা ক্রমশই বদ্ধমূল হইতে থাকে যে, জগতের মূল সমস্যাই হইতেছে ধর্ম ও অধ্যাত্মসমস্যা। রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে ক্রমশই তিনি গভীরভাবে সন্দিহান হইয়া উঠিতে থাকেন। এই সকল কারণেই তিনি দেশের ও বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর বিশেষ কোনো গুরুত্ব আরোপ করিতে পারিলেন না।

এইখানেই গান্ধীজীর সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রধান পার্থক্য। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মানবিক অধিকারের দাবিতে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং গণসংগ্রামে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ গণসংযোগ ও পল্লী উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেও প্রত্যক্ষ গণসংগ্রামের নির্দেশ কখনও দেন নাই। প্রায়শ্চিত্ত ও অচলায়তন নাটকে তিনি গণবিদ্রোহ ও সমাজ-বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়াছেন বটে, তবে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে সেইভাবে পরিচালিত করিবার নির্দেশ তিনি দেন নাই। ইহার একমাত্র কৈফিয়ত—রবীন্দ্রনাথ কবি, রাজনীতিবিদ নহেন।

গান্ধীজী ভারতবর্ষীয় ও এশীয়দের—বিশেষ করিয়া আফ্রিকাবাসী ভারতবর্ষীয়দের স্বার্থের কথা ছাড়া আর কাহারও স্বার্থ ও দাবি লইয়া সংগ্রাম করেন নাই। ভারতবর্ষীয়ের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া বোয়ারদের ও জুলুদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ১৯১৩ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় রেলওয়ে ধর্মঘটের সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন তিনি ভারতীয়দের পরিষ্কারভাবে ইউরোপীয় ধর্মঘটীদের পক্ষ সমর্থন করিতে

নিষেধ করিলেন। গান্ধীজীর যুক্তি গভর্নমেণ্টের সংকটজনক মুহূর্তের সুযোগ লইয়া ইউরোপীয়দের ধর্মঘট তিনি সমর্থন করিতে পারিবেন না। শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার বুকে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণকেই নয়, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও লুণ্ঠনকে তিনি দেখিতে পাইলেন না; পরন্তু তখনও পর্যন্ত (এবং তার পরও বহুদিন পর্যন্ত) তিনি ছিলেন ব্রিটিশ এম্পায়ারের একনিষ্ঠ ভক্ত। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়স হইতেই সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপটি সামগ্রিকভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই সময় হইতেই তাহাকে অত্যন্ত তীব্র ও কঠোর ভাষায় নিন্দা ও আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। একদিকে যেমন তিনি সাম্রাজ্যবাদের বর্ণ-বিদ্বেষ ও মিথ্যা জাত্যাহঙ্কারের প্রতি বিনিপাত জানাইয়াছেন, অপর দিকে তেমনই তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন ও লাঞ্ছিত দেশগুলির প্রতি জানাইয়াছেন অকুণ্ঠ আন্তরিক সমবেদনা।

আদর্শের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিক ভাবে জাতীয়তাবাদকে (Nationalism) নিন্দা ও অস্বীকার করিয়া সর্বজাতির মিলন ও বিশ্বমানবতার আদর্শকে সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত স্পষ্টভাবে তাঁহার আদর্শকে রূপদান করিতে পারেন নাই। তখনও তিনি তাঁহার অন্বিষ্ট খুঁজিয়া পান নাই।

অবশ্য সংগ্রামের নীতির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বেশ একটি ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই ছিলেন সন্ত্রাসবাদী নীতির ঘোরতর বিরোধী। সংগ্রামের নীতি ও পন্থার ক্ষেত্রে উভয়েই ন্যায়নীতি ও ধর্মবোধের উপর সংগ্রামের ভিত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন। গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উপর টলস্টয়ের চিন্তাধারার প্রভাব ছিল। তাঁহার ন্যায়নীতিতে শত্রুর কার্যকলাপের সমালোচনা করিবার কিংবা শত্রুকে ঘৃণা অথবা অবিশ্বাস করিবার অধিকার ছিল না। আফ্রিকায় বার বার স্মাট্‌স কর্তৃক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার পরও তিনি পুনরায় স্মাট্‌সের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখেন। তাঁহার মতে, "No matter how often a satyagrahi is betrayed, he will repose his trust in the adversary so long as there are not cogent grounds for distrust. Pain to a satyagrahi is the same as pleasure. He will not therefore be misled by the mere fear of suffering into groundless distrust." "Distrust is a sign of weakness and satyagraha implies the banishment of all weakness and therefore of distrust, which is clearly out of place when the adversary is not to be destroyed but only won over." [Hiren Mukherjee—Gandhi : A study. pp. 30-31]

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে ফললাভ গৌণ—বেদনা ও দুঃখ ভোগই মুখ্য। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সংগ্রামের চুলচেরা বিচার করেন নাই। মানবতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিটি অপকর্মের তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি তাহাদের নিপাত জানাইয়াছেন। নৈবেদ্য-এ রুদ্রের নিকট শক্তি ভিক্ষা মাগিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে ॥"

ইহাই রবীন্দ্রনাথের সংগ্রাম-নীতির মর্মকথা। সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের সহিত সহযোগিতা বা আপসের স্থান ছিল না তাঁহার সংগ্রামের নীতিতে। কিন্তু গান্ধীজী ভারতবর্ষের স্বার্থ চিন্তা করিয়া যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপস করিয়াছেন। পরবর্তীকালে প্রথম মহাযুদ্ধেও তিনি সক্রিয়ভাবে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা করেন, যথাসময়েই আমরা তাঁহার বিস্তারিত আলোচনা করিব।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে গ্রহণের প্রশ্নেও উভয়ের চিন্তাধারায় বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। গান্ধীজী আধুনিক সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে উহাকে বর্জন করিয়াছেন। ১৯০৯ সালে এক বন্ধুকে তিনি 'হিন্দ-স্বরাজ' গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার দিয়া যে পত্রখানি লিখেন, এই প্রসঙ্গে তাহা লক্ষণীয়,

"4. It is not the British people who are ruling India, but it is modern civilization, through its railways, telegraph, telephone, and almost every invention which has been claimed to be a triumph of civilization.

"5. Bombay, Calcutta, and the other chief cities of India are the real plague-spots.

"6. If British rule were replaced tomorrow by Indian rule based on modern methods, India would be no better, except that she would be able to retain some of the money that is

drained away to England ; but then India would only become a second or fifth nation of Europe and America.

"10 Medical science is the concentrated essence of black magic. Quackery is infinitely preferable to what passes for high medical skill as such.

"11. Hospitals are the instruments that the Devil has been using for his own purpose, in order to keep his hold on his kingdom. They perpetuate vice, misery and degradation and real slavery...If there were no hospitals for venereal diseases, or even for consumptives, we should have less consumption, and less sexual vice amongst us.

"12. India's salvation consists in unlearning what she has learnt during the past fifty years or so. The railways, telegraphs, hospitals, lawyers, doctors and such like have all to go."

"15. There was true wisdom in the sages of old having so regulated society as to limit the material conditions of the people ; the rude plough of perhaps five thousand years ago is the plough of the husbandman today. Therein lies salvation..." [D. G. Tendulkar—Mahatma : Vol. I. p.p. 130-31]

উপরোক্ত পত্রটিতে গান্ধীজীর আধুনিক সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিটি অতি সংক্ষেপের মধ্যে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পক্ষান্তরে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর রবীন্দ্রনাথের ছিল শ্রদ্ধা ও আস্থা। পল্লীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কৃষিবিজ্ঞানকে কিভাবে কাজে লাগাইবার পরিকল্পনা করিতেছেন, সে-কথা পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যদেশের সাম্রাজ্যলালসা ও পরজাতি-বিদ্বেষের সমালোচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও মনীষার উপর তিনি শ্রদ্ধা হারান নাই। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা ও তপোবন-সংস্কৃতিকে তিনি কবিকল্পনার দৃষ্টিতে বহুবার বিভিন্নভাবে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রাচীন যুগে কখনও ফিরিয়া যাইতে চাহেন নাই। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের একটি কাব্যিক সমন্বয় করিবার যে স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহা তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবির প্রগতিশীল মন ক্রমশই কিভাবে আধুনিক সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিতে থাকে, যথাসময়ে আলোচনা কালে আমরা তাহা দেখিতে পাইব।

ইহার অল্প কিছুকাল পরেই প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' পত্রিকা বাহির হয় (১৩২১ বৈশাখ)। এই সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যাতেই চির-নবীনের চিরযৌবনের জয়গান গাহিয়া তিপান্ন বৎসরের প্রৌঢ় কবি লিখিলেন (১৫ই বৈশাখ, ১৩২১) 'সবুজের অভিযান' নামক বিখ্যাত কবিতাটি।

কবি লিখিলেন,

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।..."

রক্ষণশীল সনাতনী বৃদ্ধ জরদ্গবদের লক্ষ্য করিয়া কবি বিদ্রূপ করিলেন,

"ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্র-পটে-আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।..."

সনাতনী অচলায়তন সমাজের পুঁথিপত্র ও অনুশাসনের বন্ধন ছিন্ন করিবার আহ্বান জানাইয়া কবি বলিলেন,

"শিকল দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া।
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি ..
আন্ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।
বিবাগি কর্ অবাধপানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে—
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥"

সবুজপত্রের ঐ বৈশাখ সংখ্যাতেই 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে তিনি দেশের যুবশক্তিকে 'বাধভাঙার' আহ্বান জানাইলেন। তিনি বলিলেন,

"পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস।...যাহাদের সে দুঃসাহস নাই তাহারা আজও

মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যতলে মূঢ়তার স্বকপোলকল্পিত বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগযুগান্তর গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

"এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছেলে হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। যাহা আছে তাহাই যে চূড়ান্ত, একথা কোনো-মতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া, পুরাতন বেড়া সরাইয়া, কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই।···

"আমাদের দেশে সেই জন্মলক্ষ্মীছাড়া কি নাই ? নিশ্চয়ই আছে। কারণ তাহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি, প্রাণ যে আপনার গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়।··· মানা, মানা, মানা—শুইতে বসিতে কেবলই তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো কারণ নাই, যুক্তি নাই, তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য দুরস্ত হইয়া উঠে যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না।···আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে। ···প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর কোথায় ঘটিয়াছে ?"

উপসংহারে কবি বলিলেন,

"যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকদিন একাধিপত্য করিয়াছেন।···কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঙ্গল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হউক ; তাহার অবিবেচনার উদ্দাম বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক।"

[বিবেচনা ও অবিবেচনা—কালান্তর ।। পৃঃ ২৪-২৭]

ইতিমধ্যে এণ্ড্রুজ্ ও পিয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া শান্তিনিকেতনের কাজে যোগদান করিলেন। ইহার কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে রামগড় যাত্রা করিলেন (মে ১৯১৪)। এই রামগড়ে বসিয়াই কবি পরপর 'সর্বনেশে', 'আহ্বান' ও 'শঙ্খ' (৫ই, ৬ই ও ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) কবিতা তিনটি লিখিলেন (বলাকা কাব্যগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। 'সর্বনেশে' কবিতায় তিনি লিখিলেন,

"এবার যে ঐ এলো সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে যায় ভেসে গো।

রক্তমেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহনপারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো।
এবার যে ঐ এলো সর্বনেশে গো।।"

কিন্তু কী সেই 'সর্বনেশে'? কবি কি মহাযুদ্ধের পূর্বাভাস দেখিতে পাইলেন? রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই কবিতাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অন্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

"...আমার এ অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্বেগ ছিল... ।"

[গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১২শ খণ্ড।। পৃঃ ৫৯৭]

'আহ্বান' কবিতায় আমরা সবুজের অভিযানেরই সুর শুনিতে পাই। 'শঙ্খ' কবিতায় কবি যেন পাঞ্চজন্য আপন হস্তে তুলিয়া লইয়া যোদ্ধার বেশে অবতীর্ণ হইতে চাহিলেন; জগতের যত কিছু অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁহার এই যুদ্ধ ঘোষণা। কবি জীবনদেবতার নিকট শক্তিভিক্ষা করিয়া বলিলেন,

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল রবো,
বক্ষে আমার দুঃখে, তব
বাজবে জয় ডঙ্ক।
দেবো সকল শক্তি, ল'বো
অভয় তব শঙ্খ।।"

কবি স্বয়ং এই কবিতাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বানশঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয়—অকল্যাণের সঙ্গে পাপের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে উদাসীনভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে

দিতে নেই। সময় এলেই দুঃখ স্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে।" [গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১২শ খণ্ড ।। পৃঃ ৫৯৩]

আবার অন্যত্র কবি বলিতেছেন,

"এই কবিতা যে-সময়কার লেখা তখন যুদ্ধ শুরু হতে দুমাস বাকি আছে। তারপর শঙ্খ বেজে উঠেছে; ঔদ্ধত্যে হোক, ভয়ে হোক, নির্ভয়ে হোক তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বারস্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সর্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে।...আরও ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে-কাল সর্বজাতির লোকের।...শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে। রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে, সর্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই। পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায়, এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।

"...'বলাকা'য় আমার সেই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। এই কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজাস্বরূপ হয়েছিল।"

[ঐ ।। পৃঃ ৫৯৭]

সবুজপত্রের প্রথম বর্ষেই (১৩২১) রবীন্দ্রনাথ নারী-মুক্তির সমস্যা লইয়া পর-পর তিনটি ছোট গল্প লিখিলেন। এই গল্প তিনটি হইতেছে,—'হৈমন্তী' (জ্যৈষ্ঠ), 'বোষ্টমী' (আষাঢ়) ও 'স্ত্রীর পত্র' (শ্রাবণ)। 'স্ত্রীর পত্রের' মৃণাল বাংলা সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর সৃষ্টি। মৃণাল সনাতনী হিন্দু সমাজের অনুশাসনের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া বাংলা সাহিত্যে নারী-মুক্তির ধ্বজা উড়াইয়া দিল। কেহ কেহ অনুমান করেন 'স্ত্রীর পত্রে' ইব্‌সনের নারীমুক্তির আদর্শের প্রভাব আছে।

॥ প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনাপর্বে

১৯১৪ সালে জুলাইয়ের শেষদিকে এবং আগস্টের প্রারম্ভে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে পুনর্বিভাগ ও পুনর্বণ্টনের জন্য এই মহাযুদ্ধ শুরু করিল। বস্তুতপক্ষে বহুপূর্বে হইতেই তাহারা মহাযুদ্ধের জন্য ভিতরে-ভিতরে প্রস্তুত হইতেছিল। জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই এই মহাযুদ্ধের জন্য দায়ী।

বেশ কিছুকাল হইতেই জার্মানীর শিল্পশক্তি, নৌশক্তি ও বিরাট সৈন্যবাহিনী সারা ইউরোপের ভারসাম্য বিঘ্নিত ও বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। জার্মানীর গতিবিধি ও কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থকে বিঘ্নিত করিতেছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালি মিলিয়া একটি জোট গঠন করে, উহা ত্রিশক্তি চুক্তি (Triple Alliance) নামে খ্যাত। ইহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয় ; ইহা 'ত্রিশক্তি মিতালি' (Triple Entente) নামে খ্যাত। দুই পক্ষই গোপনে তাহাদের সামরিক শক্তিকে জোরদার করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জনৈক সার্বীয় যুবকের হস্তে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত হইলেন (২৮শে জুন, ১৯১৪)। অল্পকালের মধ্যেই এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ১লা আগস্ট জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ২রা আগস্ট অস্ট্রিয়া ও জার্মানী ফ্রান্স, রাশিয়া ও সার্বিয়া আক্রমণ করিল। ৪ঠা আগস্ট ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িল। ইতালি যুদ্ধের প্রারম্ভেই জার্মানার পক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল, কিছুকাল পরে ইতালি ও জাপান ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষ অবলম্বন করিল। আমেরিকা প্রথমে এই যুদ্ধে কোনো পক্ষই অবলম্বন করে নাই। যুদ্ধজনিত অবস্থার সুযোগে আমেরিকা দুই পক্ষের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া, বিশেষত তাহাদের নিকট সামরিক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা লুটিতে লাগিল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যুদ্ধের এই প্রস্তুতি জনসাধারণের নিকট গোপন রাখিয়াছিল। যুদ্ধ শুরু হইলে তাহারা সকলেই সাধু সাজিবার ভান করিল। তাহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র কর্তৃক তাহারাই আক্রান্ত হইয়াছে ; অতএব এই যুদ্ধ তাহাদের 'মহান্ পিতৃভূমি রক্ষার জন্য আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ' ; এবং সেই কারণে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর এ-যুদ্ধে যোগদান করা প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কর্তব্য।

এই বিশ্বযুদ্ধ সত্য সত্যই একটি মহা কষ্টিপাথর। এই কষ্টিপাথরেই বিচার হইয়া গেল, কাহারা সত্যই মানবপ্রেমিক। ইউরোপের মানবপ্রেমিক 'শান্তিবাদী'রা (Pacifist) এই অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ দুই-চারিজন মহাপ্রাণ শিল্পী এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে সারা ইউরোপের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিবেকবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়া অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধোন্মাদনায় মাতিয়া উঠিলেন। সেক্সপীয়র-মিল্টন-ওয়র্ডসওয়ার্থ-শেলীর ঐতিহ্যসম্পন্ন ইংলণ্ডে রুপার্ট ব্রুকের (Rupert Brooke) মত কবির যুদ্ধোন্মাদী কবিতাগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে সারা ইংলণ্ড সামরিক কুচকাওয়াজ করিতে লাগিল। বৃটেনের শ্রমিকদল, এমন কি ফেবিয়ানপন্থীরাও যুদ্ধে সরকারকে সমর্থন করিলেন (যদিও বার্নার্ড শ ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধকে সমর্থন করেন নাই)। ইউরোপের সোস্যালিস্ট ও শ্রমিক দলগুলি, যাঁহারা এতকাল যুদ্ধের বিরুদ্ধে গরম-গরম বক্তৃতা করিয়া আসিতেছিলেন, যুদ্ধের শুরুতেই পিতৃভূমি রক্ষার মহান কর্তব্যের অজুহাতে আপন আপন দেশের সরকারকে যুদ্ধে সমর্থন করিলেন। ব্যক্তিগতভাবে দুই-চারিজন সোস্যালিস্ট যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন সত্যকথা, কিন্তু ব্যাপকভাবে একমাত্র লেনিনের নেতৃত্বেই রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করিলেন। এক কথায়, সমগ্র ইউরোপের বুকে নামিয়া আসিল বিভীষিকার অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। যুদ্ধের সংবাদে তিনি যে কী পরিমাণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন, তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনায় কবি 'মা মা হিংসীঃ' ভাষণটি পাঠ করিলেন (২০শে শ্রাবণ, ১৩২১)। আকুল হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন,

"...সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। এই বাণী যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে মুখরিত হয়ে আকাশকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

"স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে...মরছে মানুষ, বাঁচাও

তাকে।···বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর করো।···বিনাশ থেকে রক্ষা করো।”

কিন্তু কেন এই যুদ্ধ—কেন এতো রক্তপাত? এই বিশ্বঘাতী আত্মঘাতী মহাযুদ্ধের মূল কোথায়? কবি বলিলেন,

“সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলেছিল! অনেকদিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকে আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। এক-এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে। Peace Conference-এ শান্তিস্থাপনের উদ্যোগ চলেছে; সেখানে কেবলই নানা উপায় উদ্ভাবন করে নানা কৌশলে এই মারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, কোনো রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে। এ যে মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে; সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। যে মার থেকে রক্ষা পেতে গেলে বলতেই হবে: মা মা হিংসীঃ। ·”

[শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্র-রচনাবলী: ১৬শ খণ্ড।। পৃঃ ৪৯৩ ও ৪৯২]

এতকাল ধরিয়া কবি যে সতর্কবাণী করিয়া আসিতেছিলেন, মন্দিরে উপাসনান্তিক ভাষণে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন।

যুদ্ধের সূচনাকালেই বেলজিয়ান সৈন্য অসীম সাহসিকতার সহিত জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাইতে থাকে। এই ঘটনাটি কবির মনে গভীর রেখাপাত করে। সমসাময়িক একখানি পত্রে কবি ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, “বেলজিয়ামের কীর্তি মনে খুব লেগেছে—সেদিন ছেলেদের এই নিয়ে কিছু বলেওছিলুম—হয়তো দেখবে কবিতাও একটা বেরিয়ে যেতে পারে।”

[চিঠিপত্র: ৫ম খণ্ড।। পত্র ৩১—৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪]

অবশ্য ইহার প্রায় এক পক্ষকাল আগেই (৪ঠা ভাদ্র) ‘গীতালি’র একটি কবিতায় কবি লেখেন,

“বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই? সরতে হবে।

লুট-করা ধন করে জড়
কে হতে চাস সবার বড়,
এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে।...”

পরদিন (৫ই ভাদ্র) কবি লিখেন বলাকার ‘পাড়ি’ কবিতাটি। পাড়ি কবিতাটির মধ্যে সর্বনেশে কবিতারই মূল ভাবটি নিহিত রহিয়াছে।

কয়েকদিন পরে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে ‘পাপের মার্জনা’ প্রবন্ধটি পাঠ করেন (৯ই ভাদ্র ১৩২১)। ঐ ভাষণে তিনি বলিলেন,

“আজ এই যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে, এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে...বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে, সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়।... আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে, তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব।...”

[শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্র রচনাবলী : ১৬শ খণ্ড ।। পৃঃ ৪৯৪]

এই সময়ে কবি কয়েক মাসের ব্যবধানে লিখেন ‘লোকহিত’ (সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩২১) ও ‘লড়াইয়ের মূল’ (সবুজপত্র, পৌষ ১৩২১) রাজনৈতিক প্রবন্ধ দুইটি। নানা দিক দিয়া প্রবন্ধ দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন পরে কবি পুনরায় দেশের ও বিশ্বের রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া আলোচনা করিলেন।

তখন লোকহিতকর বা জনহিতকর কার্যের একটা ধূয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন হইতেই কংগ্রেস বুঝিতে পারিতেছিল যে, শুধু কথায় বিশেষ কাজ হইবে না, পিছনে কিছু জনশক্তি বা লোকশক্তির প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ সত্যকারের জনসাধারণের প্রতি ভালোবাসা হইতে নয়—নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনেই আজ তাহার লোকহিতকর কার্যের দিকে নজর গেল। ইহাই কবির লোকহিত প্রবন্ধটি লিখিবার পিছনে মূল কারণ। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই এই যান্ত্রিক জনসংযোগ নীতির বিরুদ্ধে। তাই ঐ প্রবন্ধের ভূমিকাতেই তিনি শ্লেষাত্মক সুরে বলিলেন,

“লোকসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে এটা আমরা কিছুদিন হইতে আন্দাজ করিতেছি এবং ‘এই লোকসাধারণের জন্য কিছু করা উচিত’ হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে।...

“কিন্তু আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল

বিষয়ে বড়ো, এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও আহত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

"হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা।

"...লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই, তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহাদের হিত হইবে।"

তারপর তিনি স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের বিস্তারিত পর্যালোচনা করিয়া দেখাইলেন যে, আন্তরিক প্রেম ও ভালোবাসার অভাবেই আমরা মুসলমান সম্প্রদায় ও গ্রামের নির্যাতিত গরীব সম্প্রদায়গুলিকে আন্দোলনের মধ্যে আনিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন,

"...মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া, আপন বলিয়া মানিতে না পারি, দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গি করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।...

"...বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।

"লোকসাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা। তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়া জানি।...

"...তাই একথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা যাহাদিগকে দূরে রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গলসাধনের সমারোহ করিয়া সেই অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই।"

এইখানে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির একটি মূলগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। গান্ধীজী জনসেবার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে আরো গভীরে প্রবেশ করিবার

চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের নিম্ন জনসাধারণের সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাপ্রণালী স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়া তিনি জনগণের সহিত একাত্ম হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথাসময়ে আমরা ইহার আলোচনা করিব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঐ ব্যাপারে ইউরোপীয় দেশগুলি হইতেও কিছু শিক্ষা লইতে প্রস্তুত। তিনি লিখিতেছেন,

"সম্প্রতি য়ুরোপে লোকসাধারণ সেখানকার রাষ্ট্রীয় রঙ্গভূমিতে প্রধান নায়কের সাজে দেখা দিয়াছে।...

"শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোক-সাধারণের কাঁধের উপর তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষেব পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের স্টীম উৎপন্ন করে।

"...এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্মপ্রণালী-নামক প্রকাণ্ড একটা জাঁতা মানুষের আর-সমস্তই গুঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকু মাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

"ধনের ধর্মই অসাম্য।...এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

"তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

"তাই, ও দেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে অল্পস্বল্প এটা-ওটা দিয়া কোনোমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা।..."

তিনি আরও বলিলেন,

"...এখন ও দেশে লোকসাধারণ কেবল সেন্সস্ রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে; সে একটা শক্তি। সে আর ভিক্ষা করে না, দাবি করে। এইজন্য তাহার কথা দেশের লোকে আর ভুলিতে পারিতেছে না; সকলকে সে বিষম ভাবাইয়া তুলিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ কোনো Political Economy-র পাঠ হইতে একথা বলিতেছেন না। বিদেশ ভ্রমণকালে এবং বিদেশী সংবাদপত্র হইতে ইউরোপের ঘটনাবলীর যে সব সংবাদ তিনি পাইয়াছিলেন এবং পাইতেছিলেন, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সংকট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণটি প্রায় নির্ভুল হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে,

ইউরোপে জনগণই যে তখন রাষ্ট্রীয় রঙ্গভূমিতে প্রধান নায়কের ভূমিকায় দেখা দিতেছে, ইহাও তিনি লক্ষ্য করিতেছেন।

তারপর তিনি এদেশের জনগণের সমস্যার প্রশ্নে ফিরিয়া আসিলেন এবং এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে ইউরোপের জনশক্তির খবরে আমাদের বিশেষ উল্লসিত হইবার কারণ নাই। কেননা, ইউরোপের জনগণের সহিত এদেশীয় জনগণের আকাশ পাতাল তফাত। কারণ,

"আমাদের দেশে লোকসাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না।···

"···এইজন্য জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড়োজোর ধর্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি 'তুমি কর্তব্য করো', মহাজনকে বলি 'তোমার সুদ কমাও', পুলিসকে বলি 'তুমি অন্যায় করিয়ো না'—এমনি করিয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে কতদিন কতদিক ঠেকাইব। চালুনি দিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব 'যতটা পার তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও'—সে হয় না, তাহাতে কোনো এক সময়ে এক মুহূর্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের এ ব্যবস্থা নয়।···"

কিন্তু তাহা হইলে উপায় কি? পথ কোথায়? তাহার উত্তরে কবি বলিতেছেন,

"অতএব সব-প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ দেখিতে পায়। অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই।···

"···লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা···

"আমি কিন্তু সবচেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি, কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা। তাহা কিছু লাভ নহে, তাহা কেবলমাত্র রাস্তা—সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট, কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে।"

ইউরোপীয় জনগণের শক্তি-রহস্যের অন্যতম প্রধান কথাই হইতেছে সেখানকার ব্যাপক জনশিক্ষা। তাই তিনি ইউরোপের জনগণের নজির তুলিতেও দ্বিধা করিলেন না। তিনি বলিলেন,

"য়ুরোপের লোকসাধারণ আজ যে এক হইয়া উঠিবার শক্তি পাইয়াছে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহারা সকলেই পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।…একথা নিশ্চিত সত্য যে, য়ুরোপে লোকশিক্ষা আপাতত অগভীর হইলেও তাহা যদি ব্যাপ্ত না হইত তবে আজ সেখানে লোকসাধারণ নামক যে সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া আপন প্রাপ্য দাবি করিতেছে তাহাকে দেখা যাইত না।"

সমাজহিতৈষীরা নাইট-ইস্কুল খোলার কথা বলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নীতিগতভাবে তাহার বিরোধী। তিনি বলিলেন,

"…কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আমরা ভদ্রলোকেরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি…। কিন্তু লোকসাধারণেরও সেই জোরের দাবি আছে; যতদিন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রতি অন্যায় জমা হইয়া উঠিতেছে এবং সেই অন্যায়ের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করিতেছি, একথা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বীকার না করিব ততক্ষণ দয়া করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধটা নাইট ইস্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোকসাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ 'সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার' কথা বলিতেছেন। উপসংহারে কবি বলিলেন,

"…আমাদের সমাজ লোকসাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে।…

"…এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে—সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।"

[লোকহিত—কালান্তর ।। পৃঃ ২৯-৪১]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষের উপর জমিদার, মহাজন, পুরোহিত, মনিব, পুলিসের শোষণ-অত্যাচারকে দেখিতে পাইলেন কিন্তু কোথাও তাহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের আহ্বান জানাইতে পারিলেন না। তিনি জননেতাদের প্রতি ব্যাপক জনশিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইলেন মাত্র। এইখানেই গান্ধীজীর সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রধান পার্থক্য দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের অনতিকালপরেই গান্ধীজী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই সুতাকল শ্রমিক ও গ্রামের শোষিত কৃষকের দাবিতে প্রত্যক্ষ গণসংগ্রাম

(অবশ্য উহা অহিংস সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম) শুরু করিলেন। যথাসময়েই আমরা ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিব।

আশ্বিনের মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বুদ্ধগয়া ও এলাহাবাদে কাটাইয়া আসেন। ঐ সময় তিনি কয়েকটি গান ও বলাকার কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা রচনা করিলেন। নভেম্বরের গোড়ার দিকে তিনি এলাহাবাদ হইতে ফিরিলেন। মহাযুদ্ধের নানা খবর তখন কবির নিকট আসিয়া পৌছিতেছে। কয়েকদিন পর আশ্রমে উপাসনান্তে একটি ভাষণে তিনি বলিলেন,

"···শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ কত আঘাত কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে।···

"···এইখানে (শান্তিনিকেতন আশ্রমে) আমরা মানুষের সমস্ত জাতিভেদ ভুলব। আমাদের দেশে চারি:দিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে, মানুষকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে···আমরা এই আশ্রমেই সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব।···"

[শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৬শ খণ্ড ॥ পৃঃ ৪৯৮]

অল্পকাল পরে কবি পুনারায় উত্তর ভারতে যাত্রা করিলেন। এই সময়েই এলাহাবাদে তিনি তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'লড়াইয়ের মূল' রচনা করেন। এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের মূল কারণগুলিকে গভীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি লিখিলেন,

"সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।

"এক সময়ে জিনিস ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কী তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। সে আমলে যেখানে রাজত্ব রাজাও সেইখানেই ; জমাখরচ সব এক জায়গাতে।

"কিন্তু এখন বাণিজ্য-প্রবাহের মতো রাজত্ব-প্রবাহেরও দিনরাত আমদানি রফতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে —তাহা একদেশের উপর আর-এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

"এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর-কখনো ছিল না।

"য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।

"এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মনির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট,

মাছেরও গন্ধ পাইতেছে, অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো-কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গগগস করিতেছে। সে বলিতেছে, 'আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে, আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।'

"এক সময় ছিল যখন কাড়িয়া-কুড়িয়া লইবার বেলায় ধর্মের দোহাই পাড়িবার কোনো দরকার ছিল না। এখন তার দরকার হইয়াছে।...

"আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে—যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

"য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে না।

"আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্তু জর্মন পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল, সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন-পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।" [লড়াইয়ের মূল—কালান্তর ।। পৃঃ ৪৪-৪৬]

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্বরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই বিচার-বিশ্লেষণ মোটামুটি ভাবে নির্ভুল এবং তাঁহার এই বিশ্লেষণের তাৎপর্যও অপরিসীম।

এই প্রসঙ্গে মহাযুদ্ধ সম্পর্কে দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দল-গুলির চিন্তা ও কর্মধারার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কংগ্রেসের মডারেটপন্থী ও চরমপন্থী ন্যাশনালিস্ট নেতৃবর্গ—কেহই তখন এই মহাযুদ্ধের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। এমনকি তাঁহারা ব্রিটেনের এই দুর্দিনে 'এম্পায়ারে'র স্বার্থরক্ষার কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। যুদ্ধ তখন শুরু হইয়াছে। সেই সময় কংগ্রেসের একটি ডেপুটেশন লণ্ডনে যায়। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে লালা লাজপৎ রায়, জিন্না, লর্ড সিংহ প্রমুখ এই ডেপুটেশনের সদস্যগণ এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে 'এম্পায়ারে'র জয় কামনা করিয়া ব্রিটেনকে সবপ্রকারে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

যুদ্ধ শুরু হইবার দুইদিন পরে গান্ধীজী পীড়িত গোখলের সহিত দেখা করিতে লণ্ডনে উপস্থিত হন, এবং লণ্ডন হইতেই তিনি দেশবাসীকে 'ব্রিটিশ এম্পায়ারে'র স্বার্থে চিন্তা করিবার এবং ব্রিটেনের এই সংকটকালে সক্রিয় সাহায্যের মাধ্যমে ভারতবাসীকে তাহার যথোচিত কর্তব্য করিয়া যাইবার আহ্বান জানাইলেন। শুধু তাহাই নহে, আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট তিনি তাঁহার সহযোগিতার প্রস্তাব পাঠাইলেন। এবং

অনতিবিলম্বে তিনি প্রায় আশিজন স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া 'ফাস্ট এড ট্রেনিং' গ্রহণ করিলেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্র লর্ড হার্ডিঞ্জ জার্মানীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে ফ্রান্সের রণাঙ্গনে প্রেরণ করেন। ভারতীয় সেনাদল অসম সাহসিকতার সহিত জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করে। এই সংবাদে উল্লসিত হইয়া ভারতীয় নেতৃবর্গ ইহার প্রতিদান ও পুরস্কারস্বরূপ স্বরাজের দাবি পুনরুত্থাপন করিলেন। ১৯১৪ সালে ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের উনত্রিংশ অধিবেশনে (সভাপতি: ভূপেন্দ্রনাথ বসু) মাদ্রাজের তৎকালীন গভর্নর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ডের সমক্ষে ব্রিটিশ এম্পায়ারের প্রতি কংগ্রেসের আনুগত্য ও সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এবং এই আনুগত্য ও সহযোগিতার বিনিময়ে স্বরাজের দাবিটিও পুনরুত্থাপন করা হয়।

এই সময় মিসেস এ্যানি বেসান্ত 'থিওসফি' ছাড়িয়া রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। বেসান্ত বলিলেন যে, যুদ্ধে সাহায্য বা সহযোগিতার পুরস্কারস্বরূপ নহে, পরন্তু ভারতবর্ষ তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার-বলেই স্বরাজ দাবি করিতেছে ("...not as a reward, but as a right does she ask for it. On that there must be no mistake.")। তিনিই প্রথম 'হোমরুলে'র দাবি উত্থাপন করিয়া উহার জন্য আন্দোলন শুরু করিলেন। যুদ্ধ শুরুর কিছুদিন পূর্বেই তিলক মুক্তিলাভ করেন (১৯১৪ জুন)। তিনিও হোমরুলের দাবি সমর্থন করিয়া আন্দোলন শুরু করিলেন। কিন্তু হোমরুলের দাবিতে দেশে উত্তেজনা সৃষ্টি করিলেও যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্যের নিমিত্ত তিলক ও বেসান্ত উভয়েই প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের জন্য ছাত্র ও যুবকদের প্রতি আবেদন জানান।

অপরদিকে, যুদ্ধে ইংরাজ গভর্নমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করা ত দূরের কথা, পরন্তু এই সময় হইতেই দেশের সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলি জার্মানীর সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন।

টেণ্ডুলকর লিখিতেছেন,

"When the war broke out all parties, with the exception of the terrorist group, declared their support and loyalty to the British Empire. 'At such a crisis,' observed Tilak, 'it is the duty of every Indian, be he great or small, rich or poor, to support and assist his Majesty's Government to the best of his ability.'" [Mahatma : Vol. I. p. 190]

এক কথায়, এই বিধ্বংসী মহাযুদ্ধ সম্পর্কে সারা দেশে তখন এতটুকুও

সচেতনতা ছিল না। কংগ্রেসের মহা-মহা রথী হইতে ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দেশবাসীকে এই যুদ্ধে 'কামানের খোরাক' হিসাবে ইংরাজ কমাণ্ডারের হাতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। এমনকি শ্রীনেহরু পর্যন্ত সেই সময় উত্তর প্রদেশে সৈন্যদলের খাতায় নাম লেখান। কিন্তু দেশের এই অন্ধতার দুর্দিনে বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। তিনিই কেবল মোটামুটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্বরূপটি বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যলোলুপ ও যুদ্ধোন্মাদ রাষ্ট্রগুলির প্রতি জানাইয়াছেন ধিক্কার ও বিনিপাত।

পৌষ-উৎসবের পূর্বদিন রবীন্দ্রনাথ উত্তর-ভারত হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (৬ই পৌষ ১৩২১)। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর Phoenix বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এণ্ড্রুজের মধ্যস্থতায় কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে আশ্রয়লাভ করেন। গান্ধীজী তখনও লণ্ডনে। রবীন্দ্রনাথ সানন্দে তাঁহার সম্মতি জানাইয়া গান্ধীজীকে এক পত্রে লিখিলেন,

"Dear Mr. Gandhi,

That you could think of my school as the right and the likely place where your Phoenix Boys could take shelter when they are in India has given me real pleasure—and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be of great value to our boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their stay in Shantiniketan fruitful. I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form a living link in the '*sadhana*' of both our lives.

Very sincerely yours
Rabindranath Tagore"

রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন, "বোধহয় ইহাই গান্ধীজীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্র।" লক্ষ্য করিবার বিষয়, ঐ পত্রের সম্বোধনে রবীন্দ্রনাথ Mr. Gandhi শব্দ ব্যবহার করিতেছেন,—গন্ধীজী তখনও 'মহাত্মা' নামে দেশের মধ্যে পরিচিত হন নাই।

মহাযুদ্ধের সংবাদে কবি তখন অত্যন্ত বিমর্ষ ও মর্মাহত। কিন্তু তবুও ভয়ে বা হতাশায় তিনি মুহ্যমান হইলেন না। ৭ই পৌষ (১৩২১) উৎসবের দিনে উপাসনান্তে এক ভাষণে তিনি বলিলেন,

"একবার ভেবে দেখো দেখি, এই মুহূর্তে যখন এখানে আমরা আনন্দোৎসব

করছি তখন সমুদ্রের পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের কী নিদারুণ যুদ্ধ চলেছে! সেখানে আজ এই প্রভাতের আলোক কী দেখছে, কী প্রলয়ের বিভীষিকা! সেখানে এই বিভীষিকার উপর দাঁড়িয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে প্রচার করছে।...কে ভুল করেছে, কে ভুল করে নি, এ যুদ্ধে কোন্ পক্ষ কী পরিমাণ দায়ী, সে কথা দূরের কথা। কিন্তু, ইতিহাসের ডাক পড়েছে; সে ডাক জার্মান শুনেছে, ইংরেজ শুনেছে, ফরাসী শুনেছে, বেলজিয়ান শুনেছে, অস্ট্রিয়ান শুনেছে, রাশিয়ান শুনেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের দেবতা তাঁর পূজা গ্রহণ করবেন; এ যুদ্ধের মধ্যে তাঁর সেই উৎসব। কোনো জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত করে তার জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে তা হবে না, ইতিহাসবিধাতার এই আদেশ। মানুষ সেই জাতীয় স্বার্থ-দানবেব পায়ে এতদিন ধরে নরবলির উদ্‌যোগ করেছে, আজ তাই এই অপদেবতার মন্দির ভাঙবার হুকুম হয়েছে। ইতিহাসবিধাতা বলেছেন, এ জাতীয় স্বার্থদানবের মন্দিরের প্রাচীর তোমাদের সবাইকে চূর্ণ করে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে, এ নরবলি আর চলবে না।..."

উপসংহারে কবি বলিলেন,

"...আজ জগৎ জুড়ে যে ক্রন্দন বেজেছে তার মধ্যে ভয়ের সুর নেই; তার ভিতর দিযে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে, তারই মধ্যে ইতিহাসবিধাতার আনন্দ। ...সেই শান্ত শিবং অদ্বৈতমের মধ্যে মৃত্যু মরেছে। তিনি নিজের হাতে মানুষের ললাটে জয়তিলক পরিয়েছেন।...রুদ্রের প্রসন্ন হাসি তখনই দেখা যায় যখন তিনি দেখতে পান যে তাঁর বীর সন্তানেরা দুঃখকে অগ্রাহ্য করেছে।... রুদ্রের সেই প্রসন্নতা আজ উৎসবের দিনে আমাদের জীবনের উপরে বিকীর্ণ হোক।" [শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৬শ খণ্ড ।। পৃঃ ৫০৩-০৪]

ইহা অধ্যাত্মবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের কথা। আধ্যাত্মিক তন্ময়তায় তিনি দেখিতেছেন, কোনো এক অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছায় মানব-ইতিহাসের গতিটি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মহাযুদ্ধের সেই প্রচণ্ড বিধ্বংসের মধ্যে কবি মঙ্গলময় ঈশ্বরের একটি বিশেষ ইচ্ছাও লুক্কায়িত দেখিতে পাইলেন; এবং তাহাই হইতেছে নিখিল বিশ্ব-মানবের মিলন। কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁহার একটি ভাষণে বলিয়াছিলেন,

"...মানুষের ধর্ম তাকে ভূমার সঙ্গে বড়োর সঙ্গে যোগযুক্ত করবে, সকলকে এক করবে, এই তো তার উদ্দেশ্য। কিন্তু, সেই ধর্মের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে মানুষের ঐক্যকে খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছে...। মানুষের জাতীয়তা, ইংরেজিতে যাকে nationality বলে, ক্রমশ উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠেছে এইজন্য যে তার মধ্যে মানুষের

সাধনা মিলিত হয়ে মানুষের এক বৃহৎ রূপকে ব্যক্ত করবে, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎমঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে। কিন্তু, সেই তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ কত আঘাত কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে। মানুষের তপস্যা একদিকে, অন্যদিকে তপস্যা ভঙ্গ করবার আয়োজন—এ দুইই পাশাপাশি রয়েছে।

"শান্তিনিকেতন আশ্রমেও সেই তপস্যা রয়েছে···। এইখানে আমরা মানুষের সমস্ত জাতিভেদ ভুলব। আমাদের দেশে চারিদিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে,··· আমরা এই আশ্রমেই সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব। এত বড়ো আমাদের কাজ।"

[শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৬শ খণ্ড ।। পৃঃ ৪২৮]

মানুষ সমাজ-সচেতন হইয়া কিভাবে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বিশ্বজাগতিকতার ধ্রুব আদর্শের দিকে অগ্রসর হয়, সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তখনও জানা সম্ভব নয়।

১০ই পৌষ খ্রীস্টোৎসবের দিনে আশ্রমে কবি 'খ্রীস্টধর্ম' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন (সবুজপত্র, ১৩২১)। কবি বলিলেন,

"আমাদের আশ্রমে আমরা সম্প্রদায়ের উপর রাগ করে সত্যের সঙ্গে বিরোধ করবো না। আমরা খ্রীস্টধর্মের মর্মকথা গ্রহণ করবার চেষ্টা করব খ্রীস্টানের জিনিস বলে নয়, মানবের জিনিস বলে।"

উহার দুইদিন পরে (১২ই পৌষ) কবি বলাকার 'বিচার' কবিতাটি (বলাকা ।। ১১ সংখ্যক কবিতা) লিখিলেন। রুদ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিলেন,

"তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারংবার—
এদের মার্জনা করো, হে রুদ্র আমার।"

কিছুদিন পূর্বে 'পাপের মার্জনা' নামক ভাষণটিতে কবি যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই কবিতার মূল মর্মকথা। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটির ইংরাজি তর্জমা করিয়া খ্রীস্টজন্মোৎসবের স্মরণে এণ্ড্রুজ্‌কে উপহার পাঠান।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরে গান্ধীজী ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিলেন (৯ই জানুয়ারী ১৯১৫)। কিন্তু তিনি নরমপন্থী বা চরমপন্থী—কোনো পক্ষেই ভিড়িলেন না। তবে গোখলেকে তিনি অসীম শ্রদ্ধা করিতেন। গোখলের নির্দেশে তিনি সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভারতের নিরন্ন গরীব জনসাধারণের সহিত যথার্থ পরিচয়লাভই ছিল তাঁহার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য। দেশের গরীব জনসাধারণের সহিত একাত্ম হইয়া মিশিয়া

যাইবার চেষ্টায় সর্বত্রই তিনি সাধারণ বেশে রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ফিনিক্স (Phoenix) বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তখনও শান্তিনিকেতনে; তাই কিছুদিন পরে তিনি শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌছিলেন (৫ই ফাল্গুন ১৩২১)। রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায়। ইতিমধ্যে গোখলের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া দুইদিন পর গান্ধীজী শান্তিনিকেতন হইতে পুনা যাত্রা করিলেন। প্রায় সতেরো দিন পরে গান্ধীজী পুনা হইতে পুনরায় শান্তিনিকেতনে আসিলেন (২২শে ফাল্গুন ১৩২১ ।। ৬ই মার্চ ১৯১৫)। এইদিন ভারতের তথা বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ প্রথম ঘটিল।

আশ্রম পরিদর্শন করিতে গিয়া আশ্রমের বিধিব্যবস্থা ও কাজকর্ম সম্পর্কে গান্ধীজীর কতকগুলি ত্রুটি চোখে পড়িল। ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রান্নাবান্না ও যাবতীয় কাজকর্মে ভৃত্য ও পাচকের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাবলম্বী হইবার উপদেশ দিলেন। গান্ধীজীর উপদেশে কাজ হইল,—ছাত্র-অধ্যাপক সকলে মিলিয়া নব উন্মাদনায় স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা শুরু করিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন,

"গান্ধীজীর কথা ও কাজ বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে আশ্রমবাসীদের অধিকাংশেরই ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। অথচ যে স্বাবলম্বন-শক্তি অধ্যাপকগণের মধ্যে উদ্‌বোধিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এতাবদ্‌কাল চেষ্টান্বিত ছিলেন, এবং যাহাকে আশ্রমবাসীরা প্রসন্নচিত্তে কোনোদিনও জীবনধর্মে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাহা আজ উত্তেজনার মুহূর্তে, নূতনত্বের মোহে ও অভাবিতের প্রত্যাশায় সকলে কিভাবে অনুমোদন ও গ্রহণ করিলেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।...রবীন্দ্রনাথ সুরুলে আছেন; কবির সহিত আশ্রম-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ও তাঁহার অনুমোদন পাইয়া তবে গান্ধীজী আশ্রমবাসীদিগকে এই কর্মে প্রবৃত্ত করিলেন। শান্তিনিকেতনের পাকশালায় ও ভোজনগৃহে তখন পর্যন্ত হিন্দু-সমাজের জাতিবিচার মানিয়া চলা হইত। কবির সহিত কথাবার্তায় এই আলোচনাটি উঠে। গান্ধীজী বলেন যে তাঁহার মতে আশ্রমের সকলে সমানভাবে থাকিবে, আহারে বিহারে অশনে আসনে কোনো প্রকার পার্থক্য থাকা উচিত নহে। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ ছাত্ররা পৃথক পংক্তিতে ভোজন করিত, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা এবিষয়ে ছাত্রদের কখনো কোনো উপদেশ দিতেন না, ছাত্ররা নিজ নিজ অভিভাবকের নির্দেশানুসারে পংক্তিবিচার করিত। গান্ধীজী বলিলেন, এভাবে পৃথক পংক্তি ভোজন করা আশ্রমধর্ম-বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে বলেন যে, তিনি কোনোদিন ছাত্রদের ধর্ম বা সমাজবিষয়ক মত সম্বন্ধে বল প্রয়োগ

করেন নাই। জোর করিলে আপাতদৃষ্টিতে তাহারা নিয়ম পালন করিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহা তাহাদের অন্তরে গাঁথা হইয়া যাইবে না। যে-জিনিস অন্তর হইতে গৃহীত হয় না, তাহা বাহিরের চাপে স্থায়ী ফলপ্রদ হয় না। সেইজন্য তিনি বাহির হইতে নৈতিক চাপের পক্ষপাতী নহেন।

"যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পাইয়া ছাত্ররা (১০ই মার্চ ১৯১৫ ॥ ২৬শে ফাল্গুন ১৩২১) স্বেচ্ছাব্রতী হইয়া আশ্রমের সকল প্রকার কর্ম করিবার দায় গ্রহণ করিল ;—রান্না করা, জল তোলা, বাসন মাজা, ঝাড়ু দেওয়া এমনকি মেথরের কাজ পর্যন্ত। অধ্যাপকদের মধ্যে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, এণ্ড্রুজ্, পিয়ার্সন, নেপালচন্দ্র রায়, অসিতকুমার হালদার, অক্ষয়কুমার রায়, প্রমদারঞ্জন ঘোষ ও লেখক প্রভৃতি অনেকেই সেদিন সহযোগিতা করিয়াছিলেন ; করেন নাই এমন লোকও ছিলেন। ১০ই মার্চ দিনটি এখনো 'গান্ধীদিবস' বলিয়া শান্তিনিকেতনে পালিত হয় ; সেদিন প্রাতে পাচক চাকর মেথরদের ছুটি দিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকেরা সকল প্রকার কাজ আপনাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া মহোৎসব করেন।"

[রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ॥ পৃঃ ৩৭৭-৭৮]

১১ই মার্চ গান্ধীজী রেঙ্গুন চলিয়া গেলেন। প্রায় কুড়ি দিন পর শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া তাঁহার ছাত্র ও কর্মীদের লইয়া তিনি হরিদ্বার যাত্রা করিলেন। ইহার প্রায় দুইমাস পরে আমেদাবাদের নিকটে একটি গ্রামে (Kochrab) গান্ধীজী তাঁহার আদর্শ 'সত্যাগ্রহ-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৯১৫ মে)। গান্ধীজীর আশ্রমের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদর্শ ও লক্ষ্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। স্বদেশী ও অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য আশ্রমবাসীদের কয়েকটি মূল-নীতির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করিলেন এবং উহা হইতেছে— সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, রসনা-সংযম, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যবরণ ইত্যাদি। প্রায় দুই বৎসর পরে গান্ধীজী 'সবরমতী-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশে এই সময় ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রমুখ কয়েকজনের চেষ্টায় 'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী' নামক একটি সমাজ-সংস্কারক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ইহার মূল প্রেরণা আসিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে। ইতিপূর্বে কবি লোকহিত প্রবন্ধে গ্রাম-সমস্যা সম্পর্কে দেশসেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর মাধ্যমে তিনি পল্লীর উন্নয়নমূলক কাজে যুবকদের নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মণ্ডলীর অধিবেশনে কবি 'কর্মযজ্ঞ' (সবুজপত্র, ১৩২১ ফাল্গুন) ও 'পল্লীর উন্নতি' (প্রবাসী, ১৩২২ বৈশাখ) প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করেন। এই হিতসাধনমণ্ডলীর কর্মসূচী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এইভাবে নির্ধারণ করিয়া

দিয়াছিলেন—(১) নিরক্ষরদিগকে অন্তত যৎসামান্য লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখানো। (২) ছোট ছোট ক্লাস ও পুস্তিকার মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষা, সেবাশুশ্রূষাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান। (৩) ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা ও নানাবিধ অজীর্ণ ও উদরাময় রোগের প্রতিষেধের ব্যবস্থা। (৪) শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বন। (৫) গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা। (৬) গ্রামে গ্রামে যৌথ ঋণদান সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র লোকদিগকে ইহার উপকারিতা প্রদর্শন। (৭) দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়ক প্রভৃতির সময় দুঃস্থদিগকে বিবিধপ্রকারে সাহায্য।

কিন্তু গান্ধীজীর মত একমুখী কঠোর একনিষ্ঠ সাধনা রবীন্দ্রনাথের জন্য নহে। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী বিরাট সৃজনশীল প্রতিভা নিয়তই বিচিত্রমুখে ধাবিত হইয়াছে। শিল্পসৃষ্টি ও সাহিত্যকর্মের দিক হইতে এই পর্বে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তির মধ্যে বলাকা, ফাল্গুনী, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ই রবীন্দ্রনাথও অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিচিত্রার ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক আসরের পত্তন হয়। অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সাহিত্যে বাস্তবতা লইয়া এই সময় রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের একচোট বিতর্ক হইয়া যায় (সবুজপত্র, ১৩২১-২২)।

৩রা জুন (১৯১৫) সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে 'নাইট্' উপাধি দান করা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য গান্ধীজী এতদিন যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে 'কাইজার-ই-হিন্দ্' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এই সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাবিধির ঘোরতর বিরোধী হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহাকে শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাবিধি গ্রহণ করিতে হয়। এই লইয়া তাঁহার সহিত পিয়ার্সনের মতবিরোধ ঘটে এবং পিয়ার্সন বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন। (দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ॥ পৃঃ ৩৯৮)

অল্পকাল পরেই পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ্ ফিজি দ্বীপে যাত্রা করিলেন (সেপ্টেম্বর ১৯১৫)। কিছুদিন হইতেই রবীন্দ্রনাথ জাপান যাইবার পরিকল্পনা করিতেছিলেন, পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ্ চলিয়া গেলে বাহিরে যাইবার জন্য কবির মন পুনরায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মহাযুদ্ধের খবরাখবরেও কবিচিত্ত তখন চিন্তা ও বেদনায় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। এই সময়ই রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটি (বলাকা ॥ ৩৭ সংখ্যক কবিতা) লিখিলেন। কবি দেখিতেছেন, সারা পৃথিবী জুড়িয়া এই ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যে বীরের দল মানবসমাজের মহান্ ভবিষ্যতের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে,

"বাহিরিয়া এল কারা ? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল ;
'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ—
'বন্দরের কাল হল শেষ।' "

শাশ্বত মানবতার পথের নির্ভীক অভিযাত্রীদের প্রতি মাভৈঃ জানাইয়া কবি বলিলেন,

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?"

শাশ্বত মানবতার যাত্রাপথের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া কবি কিছুকাল আগে (১১ই মাঘ ১৩২১) বলিয়াছিলেন,

"এই উৎসব যাত্রীর উৎসব। আমরা বিশ্বযাত্রী···। কোনো বাঁধা মতামতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে থেকে উৎসব হয় না—চলার পথে উৎসব, চলতে চলতে উৎসব।···

"রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়ে নি। সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্ছিত হয় নি। অপমানে মাথা হেঁট হয় নি ? সইবে না বন্ধন ; বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে। সেই উদবোধনের প্রলয়মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে, সেই ভাঙবার মন্ত্র জেগেছে। বসে থাকবার নয়···চলবার, ভাঙবার ডাক আজ এসেছে। আজকের এই উৎসব, সেই সত্যের মধ্যে উদ্‌বোধিত হবার উৎসব।

"...উদ্‌বোধনের মন্ত্র আজ জগৎ জুড়ে বাজছে : যাত্রী বেরিয়ে, এসো, বেরিয়ে এসো। ভেঙে ফেলো তোমার নিজের হাতের রচিত কারাগার। সেই যাত্রীদের সঙ্গে চলো যারা চন্দ্র-সূর্য-তারার সঙ্গে একতালে পা ফেলে ফেলে চলেছে।"

[শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৬শ খণ্ড ।। পৃঃ ৪৬১—৬৪]

ইহাই 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার মর্মকথা। এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতে করিতে একদিন বিপদ্‌সংকুল রাত্রি-অন্ধকারে বাংলার বিপ্লবীরা যাত্রা করিয়াছিল অরুণোদয়ের পথে।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরিতে 'শিক্ষার বাহন' নামক প্রবন্ধটি (সবুজ পত্র, ১৩২২ পৌষ) পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে সর্বপ্রথমেই কবি, দেশে যাঁহারা সর্বজনীন শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁহাদের বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,

"প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সে দিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কিনা, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কিনা, এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যে বেহারা বসিয়া বসিয়া পাখা টানিবে তার পক্ষে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি কাজের, যে গোরু ঘানি ঠেলিবে তার পক্ষে খোলা আকাশের চেয়ে চোখের ঠুলিই বড়ো সহায়,—এ কথা সহজেই মনে আসে। যে দেশে একই চক্রে ঘানি ঠেলাটা সবচেয়ে বড়ো কাজ সে দেশের বিজ্ঞ লোকেরা আলোটাকে শত্রু মনে করিতে পারেন।

"কিন্তু, দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরো বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

"আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই—তার চলা-ফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক, আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি, দেশের মধ্যে বাংলা-দেশের কাছ হইতেই তিনি সবচেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে।..."

স্মরণ থাকিতে পারে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই বাংলাভাষার মাধ্যমে দেশে

ব্যাপক শিক্ষার জন্য বলিয়া আসিতেছেন। এই প্রবন্ধেও তিনি তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলে,

…"পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশি ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

"…আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।"

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রশ্নে তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,

"…ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বৈ কি। সেইজন্যই কঠোর সংকল্প চাই।…"

তিনি আরো বলিলেন,

"বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা-রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু চুপা'ও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা-তৈরির তাগিদ কোথায়। ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই। দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাকশাল চলিতেই থাকিবে, এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়।" [শিক্ষা ।। পৃঃ ১৮৩-২০২]

এতখানি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সে-যুগে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো দেশনেতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না! এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে অনেকের ধারণা গোখলেই বুঝি এদেশে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতির প্রথম আন্দোলন তুলেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ১৯০৩ সালে কার্জনের শিক্ষা-সংকোচননীতির প্রতিবাদকালে লালমোহন ঘোষই এদেশে সর্বপ্রথম compulsory free education-এর দাবি তুলেন। ১৯০৩ সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ-অধিবেশনে তিনি সভাপতির অভিভাষণে বলেন,

"…It is the system of compulsory free education which has rendered it possible for representatives of the working classes to enter the British House of Commons and to hold their own

against those who by birth were more fortunately situated. Coming nearer home, we have seen what wonderful results have been achieved in Japan by the introduction of the same system of compulsory free education. If, therefore, all progressive nations have found it necessary to adopt this system to keep abreast of the times, is it too much to ask our people to take up this question in earnest? I am sure that on mature consideration all our thoughtful men will agree that this reform is very much to be desired..."

[Congress Presidential Address : Vol. I. p. 653.]

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয়ও তাঁহার 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ' গ্রন্থে এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সে যাই হোক, পরবর্তীকালে গোখলে এবিষয়ে আন্দোলন শুরু করিলে বাংলাদেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার বিপক্ষে গিয়াছিলেন।

এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের জনৈক ইংরাজ-অধ্যাপক ভারতীয়দের সম্পর্কে অপমানসূচক মন্তব্য করিলে ছাত্ররা সেই অধ্যাপককে প্রহার করে। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' নামক প্রবন্ধটি লিখেন (সবুজপত্র, ১৩২২ চৈত্র)। এই প্রবন্ধে তিনি ছাত্রদের পরাধীনতার মনোবেদনা ও তাহাদের বয়ঃসন্ধিকালোচিত মনোবৃত্তিটিকে সহৃদয়তার সহিত বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন,

"...যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেণ্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন; যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।"

তিনি আরও বলিলেন,

"...তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করিবে আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে। আমার কথা এই, ছেলেরা যা খুশি তাই কখনোই করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতাসত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা

অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই—যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা ও দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।" [শিক্ষা ।। পৃঃ ২১২-১৪]

'শান্তং শিবং অদ্বৈতং' মন্ত্রের উপাসক আচার্য রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে দেশ আজ এ কী কথা শুনিল। স্বদেশ ও জাতির অবমাননার বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে তিনি ছাত্রদের নির্ভীক স্বাদেশিকতাবোধকে অভিনন্দন জানাইলেন।

ফাল্গুন মাসের শেষ শেষি (১৩২২) রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গে জমিদারিতে চলিয়া যান। স্মরণ থাকিতে পারে, কিছুকাল পূর্বে তিনি পুনরায় নবোদ্যমে পল্লী-উন্নয়নের কাজে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এই সময়ে পল্লী-উন্নয়নের কাজে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত পাঁচটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিলেন—চিকিৎসা বিধান, প্রাথমিক শিক্ষা পূর্ত কার্য বা কূপ খনন, রাস্তা তৈয়ারি ও মেরামতি, জঙ্গলসাফ ইত্যাদি, ঋণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষার ব্যবস্থা সালিসির মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি।

সমসাময়িক একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন (২৩শে ভাদ্র ১৩২২),

"পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা একত্রে মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে, নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করে এই আমার অভিপ্রায়। প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি—আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায় তাহাতে আমাদের ১১,০০০্ টাকার আয় দাঁড়াইয়াছে। এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু অপব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খলতা যথেষ্ট আছে। এইজন্য কিছুদিন হইল আমি নিজে গিয়া সকলকে ডাকিয়া নূতন নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছি। [চিঠিপত্র : ৫ম খণ্ড ।। পত্র ৪১]

কিছুদিন পর (১৬ই ফাল্গুন) আত্রাই হইতে পল্লীকর্মী অতুল সেনের নিকট লিখিত কবির একখানি পত্রে তাঁহার গ্রাম উন্নয়ন কার্যের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। 'শনিবারের চিঠি' (১৩৪৮ আশ্বিন) এই পত্রটির সহিত রবীন্দ্রনাথের এই যুগের গ্রাম উন্নয়ন কার্যের একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছিলেন। শনিবারেব চিঠি একজায়গায় লিখিয়াছে,

"...ঋণদান হইতে বিপন্ন প্রজাদের রক্ষা ; ইহাও কালিগ্রামে সম্ভব হইয়াছিল ; এই পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের। অথচ বাংলাদেশে একটা জনশ্রুতি আছে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় অত্যাচারী জবরদস্ত জমিদার ছিলেন, ঋণের দায়ে প্রজার ফসল পর্যন্ত গায়ের জোরে ঘরে তুলিতেন। এই মিথ্যা অপবাদ রটিবার একটা হেতু ছিল। তাহাই বলিতেছি। প্রজারা স্বভাবতই নিঃস্ব ; এক বৎসরের ফসলে পর-বৎসর

পর্যন্ত তাহাদের চলে না ; কারণ মাঝখানে কাবুলী অথবা কাবুলী-প্রবৃত্তি সম্পন্ন মহাজন বসিয়া থাকে। শুধু সুদের দায়ে ফসল যায়, ঋণ যেমনকার তেমনি রহিয়া যায়। চাষী প্রজা বৎসরের কয়েকমাসই প্রায় অনশনে কাটায়। ইহার প্রতিকারার্থে রবীন্দ্রনাথ এক উপায় উদ্ভাবন করেন। এস্টেট হইতে প্রজাদিগকে ঠিক প্রয়োজন মাফিক শতকরা নয় টাকা হারে ঋণ দেওয়া হইতে লাগিল। প্রয়োজন মাফিক এইজন্য যে, অনেক সময় তাহারা বুঝিতে না পারিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ লইয়া বিলাসে তাহা ব্যয় করিয়া বিপন্ন হইয়া পড়ে।…অতুল সেনের কর্মীসংঘ হিসাব করিয়া এই প্রয়োজন নির্ধারণ করিতে লাগিলেন।…ঋণ লইয়া চাষী চাষ করিল। ফসল কিন্তু তাহার ঘরে উঠিল না, ঋণশোধ বাবদ এস্টেট তাহা গ্রহণ করিল ; এই সময়ে শতকরা তিন টাকা সুদ সর্বক্ষেত্রেই মাফ করা হইত, অর্থাৎ প্রজাকে শতকরা ছয় টাকা সুদ দিতে হইত। ফসলের দাম হিসাব করিয়া ঋণ শোধ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, প্রজা তাহা ঘরে লইয়া যাইতে পারিত। যদি টান পড়িত, তাহা হইলে তাহা প্রায়ই মাফ করা হইত। ইহার পর ঋণমুক্ত প্রজা পুনরায় প্রয়োজনমত ঋণ লইবার অধিকারী থাকিত।…এই ব্যবস্থার ফলে কালিগ্রাম পরগনার প্রজারা বহুদিনের দুঃসহ ঋণের বোঝা হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি পাইতেছিল। রবীন্দ্রনাথের যে অপবাদ রটিয়াছিল তাহা জমিদারের বাড়িতে ওই ফসল উঠানো লইয়া।" [রবীন্দ্রজীবনীর নূতন উপকরণ—শনিবারের চিঠি ।।]

আপাতদৃষ্টিতে, গণতন্ত্র ও ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে কাজটা গর্হিত বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিচার করিয়া ঐ পন্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছিলেন, যেমন করিয়া হোক মহাজনের ঋণ হইতে কৃষকদের মুক্ত করিতেই হইবে, নতুবা ঋণের দায়ে কৃষকের সর্বস্ব মহাজনের ঘরে উঠিবে। এই গ্রাম্য মহাজনদের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জমিদারিতে থাকিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাদের সুদের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। ছলে বলে কৌশলে এই মহাজনশ্রেণী খাতকের জমিজমা সর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া বসিত। ইহাদের কবল হইতে কৃষকদের রক্ষার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ পতিসর সমবায় ব্যাঙ্কটিকে শত সংকটেও বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, এমন কি তাঁহার 'নোবেল প্রাইজে'র এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা (১,২০,০০০৲ টাকা) এই পতিসর ব্যাঙ্কেই গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে কবিকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, 'গ্রামের উন্নতির জন্য চাষী কোথায় টাকা পাইবে ; তাঁহার ধনে তাঁহার পরিবারের লোকের যেমন দাবি, তাঁহার প্রজাদের দাবি তাহা হইতে কম নহে।'

শুধু এই ঋণ-সমস্যাই নয়, গ্রামের সামগ্রিক সমস্যাকে তিনি যেমনভাবে দেখিয়াছিলেন, তেমনিভাবে দেখিতে সমসাময়িক আর কাহাকেও দেখা যায় না। অতুল সেনের কর্মী-সংঘের মধ্যস্থতায় সালিসি বিচারের ফলে বহুদিন পর্যন্ত এই পরগনা হইতে একটি মামলাও শহরে যায় নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এই সময় বাঁকুড়ায় ভয়ঙ্কর দুভিক্ষ দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী'র অভিনয় দ্বারা সংগৃহীত সমস্ত অর্থ সেখানে পাঠাইয়া দেন।

তাছাড়া, গ্রামের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তন সম্পর্কেও চিন্তা করিতেছিলেন। এসব সম্পর্কে পূর্বেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। আমাদেব দেশের মান্ধাতা আমলের কৃষি-পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির বদলে কৃষিতে বিজ্ঞানের পূর্ণ ব্যবহার প্রসঙ্গে কবি কয়েক মাস পূর্বে এণ্ড্রুজ্‌কে একখানি পত্রে লিখিতেছেন,

"We all hope that here, science in the end will help man. She will make the necessities of life easily accesible to every man, so that humanity will be freed from the tyranny of matter which now humiliates her. This struggling mass of men is great in its pathos, in its latency of infinite power."

[Letters. p. 64]

এতখানি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন কোনো দেশনেতার মধ্যে ছিল না—স্বয়ং গান্ধীজীরও নয়। কারণ, গান্ধীজী ছিলেন আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিষয়ে মূলগত ঐক্য দেখা যায়, তাহা হইতেছে—জনগণের অনন্ত শক্তি ও সৃজনশীলতার উপর উভয়েরই ছিল অপরিসীম দৃঢ় প্রত্যয়। কিন্তু তবুও একটি জায়গায় তাঁহাদের বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইতেছে—গণসংগ্রাম। গ্রামের কৃষকদের যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যেরূপ বিস্তারিত বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল, সেরূপ গান্ধীজীর ছিল না। গ্রামসংস্কার-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের যতখানি সামগ্রিক বা সর্বাত্মক কর্মসূচী ছিল, ততখানি গান্ধীজী তখনও চিন্তা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু গান্ধীজী দেশে পদার্পণ করিয়াই শোষিত মানুষের দুঃখকষ্ট ও লাঞ্ছনার কারণগুলি লইয়া আন্দোলন ও গণসংগ্রাম শুরু করেন। ১৯১৫-১৮ সালের মধ্যে তিনি পরপর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম পরিচালনা করিলেন; তন্মধ্যে 'বিরামগ্রাম কাস্টম্‌স্‌'-এর ও 'Indian Emigration Act'-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, চম্পারনে নীল চাষিদের সংগ্রাম, আমেদাবাদের কাপড় কলের শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজী এইসব আন্দোলনের প্রত্যেকটিতেই স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। সাধারণ

দরিদ্র মানুষের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করিয়া তিনি এমনভাবে মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন যে জনসাধারণ আপন হইতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁহাকে নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই; কারণ হাজার হইলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন প্রতিপত্তিশালী জমিদার। যদিও তিনি সরল জীবন যাপন করিতেন, তবুও সাধারণ মানুষের সহিত একাত্ম হইয়া মিশিয়া যাইবার পথে জমিদার হিসাবে তাঁহার অনেক বাস্তব প্রতিবন্ধ ছিল। এমনকি তিনি মিলিত হইতে চাহিলেও জনসাধারণ তাঁহার সহিত ব্যবধান রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিত।

ফাল্গুন মাসের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গ হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। কবি তখন নানা কাজের মাঝে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস লিখিয়া চলিয়াছেন। মাস-খানেক পরে অপ্রত্যাশিতভাবে আমেরিকা হইতে তাঁহার বক্তৃতা দিবার আমন্ত্রণ আসিয়া পড়িল। এই বক্তৃতার আয়োজন করিয়াছিল আমেরিকার একটি বক্তৃতা-কোম্পানি; কবিকে তাহারা ১২ হাজার ডলার পারিশ্রমিক দিতে রাজি হইল। এইবার জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগর-পথে আমেরিকা যাইবার সুযোগ মিলিল। এই সুযোগে ঐ পথে জাপানও দেখিয়া যাইতে পারিবেন ভাবিয়া কবি অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। নববর্ষের দিন (১৩২৩ ।। ১৯১৬) তিনি মীরা দেবীকে একখানি পত্রে লিখিতেছেন,

"কোথাও যাব যাব করছিলুম।···এমন সময় আমেরিকা থেকে যেই টেলিগ্রাম এল অমনি আমার মনে হল বড় পৃথিবীর নিমন্ত্রণ এসেছে। আমি বারবার পরীক্ষা করে এবং চেষ্টা করে শেষকালে স্পষ্ট বুঝেছি আমাকে বিধাতা গৃহস্থ ঘরের জন্য তৈরি করেন নি।···বিশ্ব আমাকে বরণ করে নিয়েছে আমিও তাকে বরণ করে নেব।" [চিঠিপত্র : ৪র্থ খণ্ড ।। পত্র ২৫]

পরদিন কবি কলিকাতা আসিলেন। তাহার কয়েকদিন পরেই তিনি বলাকার অন্যতম বিখ্যাত কবিতা [৪৫ সংখ্যক] 'নববর্ষের আশীর্বাদ' রচনা করিলেন (২ই বৈশাখ ১৩২৩)। কবি লিখিলেন,

"ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।"

কবিতাটিতে নূতন ভাব বিশেষ নাই; 'ঝড়ের খেয়া' কবিতা ও মাঘোৎসবের 'যাত্রীর উৎসব' ভাষণের মূলভাবটিই এই কবিতার মর্মকথা। জাপান যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে সবুজপত্রের সম্পাদককে একটি খোলা চিঠিতে কবি লিখিলেন,

"এমনকি যুবকেরা পর্যন্ত স্থবির হয়ে উঠেচে। তারা মনে করচে, যা কিছু আছে তাকে মেনে চলাটাই দেশভক্তি। একথা একেবারে ভুলে গেছে যে, দেশ যুবকের কাছ থেকে তার যৌবনের দানই চেয়েচে—নতুন করে ভাবব, বুঝব, প্রশ্ন করব, সন্দেহ করব, নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে দেখব; কেবলমাত্র শাস্ত্রের 'পরে নয়, মনুষত্বের 'পরে শ্রদ্ধা রাখব, চিন্তা ও চেষ্টার সকল বিভাগেই দুঃসাহসের জয়পতাকা সগর্বে তুলে ধরে দুর্গম পথে যাত্রা করব, দেশের কোথাও কিছুকে বদ্ধ হয়ে থাকতে দেব না, যৌবনের চাঞ্চল্যে সমস্তকে নাড়া দিয়ে প্রাণশক্তিকে সকল দিকেই তরঙ্গিত মুখরিত করে তুলব—দেশের যুবকের কাছ থেকে দেশ যে সেই অস্থির প্রাণ, সেই অস্থির বুদ্ধির অর্ঘ্যই চেয়েছিল।...যা' নূতন, যা' চঞ্চল, যা' ক্রমশ ব্যক্ত হতে থাকে, যাকে সংশোধন করতে করতে পরিবর্তন করতে করতে নিজের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করে তুলতে হবে—তাকে, বুড়োদের নকল করে' আজকের দিনের যুবকেরাও ব্যঙ্গ করতে শিখেছে, এতেই আমাদের দেশ তার মর্মে আঘাত পাচ্চে। এই জন্যেই সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে কেউ সৃষ্টি করাবার বর চাচ্চে না, সকলেই কেবলি আবৃত্তি পুনরাবৃত্তি করতে করতে ভালো ছেলের মতো সামাজিক এগ্‌জামিনে ছাত্রবৃত্তি পাবার চেষ্টা করচে। কিন্তু আমাদের বৃত্তিটা কি কেবলি ছাত্রবৃত্তি?" [সবুজপত্র, ১৩২৩ বৈশাখ]

॥ ঘরে-বাইরে

১৩২২ সালের বৈশাখ মাস হইতে সবুজপত্রে ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রায় এক বৎসর পরে ১৩২৩ সালের প্রথম দিকে উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন জাপানে।

ঘরে-বাইরে লইয়া সে যুগে বাংলাদেশে তুমুল তর্কবিতর্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জনৈকা মহিলার সমালোচনার জবাবে এই উপন্যাস রচনার কৈফিয়ত হিসাবে লিখিয়াছিলেন,

" ··এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।

"···ঘরে-বাইরে গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েছে···। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয় পাঠকের।"···

[গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ৮ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫২২-২৩]

অর্থাৎ এই উপন্যাস লিখিবার পিছনে বিশেষ কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল শুধু উপন্যাসের জন্যই উপন্যাস সৃষ্টির প্রেরণা। সুতরাং এই উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনা যদিও এই গ্রন্থের বিষয়-বহির্ভূত, তবু ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঘরে-বাইরে মূলত রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র, নিখিলেশ ও সন্দীপ দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে। নিখিলেশ যেন রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র, স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশী সমাজ ও পল্লীউন্নয়নমূলক আদর্শের প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, নিখিলেশ যেন সেইরকম আদর্শে নিষ্ঠাবান বলিষ্ঠ উদারচরিত্রের নির্ভীক যুবক। অপরদিকে, সন্দীপ বাংলাদেশের তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয়রূপে এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে।

সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কোনো উপন্যাসে যথার্থ villain বা পাষণ্ড নাই—একমাত্র এই সন্দীপ ছাড়া। মন্তব্যটি নেহাত অসঙ্গত নয়, কিন্তু সেইসঙ্গে কতকগুলি প্রশ্ন থাকিয়া যায়—রবীন্দ্রনাথ সন্দীপকে এরূপ

হীন জঘন্য ও কাপুরুষ হিসাবে চিত্রিত করিলেন কেন? সন্দীপ কি যথাযথভাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আদর্শকে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে? সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতারা কি সকলেই সন্দীপ-চরিত্রের লোক? রবীন্দ্রনাথ কি ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই, সত্যেন, অরবিন্দ, মদনলাল ধিংড়া, রাসবিহারী ঘোষ, বাঘা যতীন প্রমুখ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতাগণকে দেখিতে পাইলেন না? সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বলিবার জন্য কেন তিনি সন্দীপকেই বাছিয়া লইলেন? এই সকল প্রশ্নের জবাব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ঐ কৈফিয়ত, অর্থাৎ ঘরে-বাইরের উপন্যাসধর্মের স্বার্থেই সন্দীপকে প্রয়োজন হইয়াছিল—অরবিন্দ বা বাঘা যতীনকে নয়। তবুও এই ধরনের উপন্যাস লেখার (বিশেষত দেশের তদানীন্তন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে) বিপদটা কোথায়, রবীন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতেন না। তাই পরবর্তীকালে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসখানি লইয়াও এইরকম তুমুল তর্ক-বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার, সে সময় বাংলাদেশে বাঘা যতীন প্রমুখ কয়েক জনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। ঘরে-বাইরে যখন সবুজপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে, সেই সময় (৯ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫) বুড়ীবালামের তীরে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে মাত্র পাঁচজন বাঙালী সন্তান অসংখ্য পুলিসের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অসম-সাহসিকতার পরিচয় দেন। তাছাড়া, এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, ইহার কিছুদিন পূর্বে রাসবিহারী ঘোষ P. N. Tagore ছদ্মনামে পূর্বগামী একখানি জাহাজে করিয়া জাপান যাত্রা করেন।

অবশ্য একটি কথা আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, নীতিগতভাবে যদিও রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করিতে পারেন নাই, তবু সন্ত্রাসবাদী তথা বিপ্লবীদের বীরত্ব, ত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রতি তাঁহার ছিল অন্তরের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা। এ সম্পর্কে পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি; পরে যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

।। জাপানযাত্রা ।।

২০শে বৈশাখ ১৩২৩ (ইং ৩রা মে ১৯১৬) রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে জাপানী জাহাজ 'তোষামারু'তে জাপান হইয়া আমেরিকা যাত্রা করিলেন ; সঙ্গে চলিলেন এণ্ড্রুজ্, পিয়ার্সন ও মুকুল দে।

জাপানের পথে এইবারকার সমুদ্রযাত্রার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করিয়া প্রায় প্রতিদিনই কবি একটি করিয়া চিঠি লিখিতে থাকেন। সেগুলি ক্রমে ক্রমে সবুজপত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে, এবং প্রায় তিন বৎসর পরে একত্রে 'জাপান-যাত্রী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১৩২৬)। পরবর্তীকালে জাপান-যাত্রী 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

২৪শে বৈশাখ অপরাহ্ণে জাহাজ রেঙ্গুন বন্দরে পৌঁছিল। আগে হইতেই ঠিক ছিল, রবীন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে নামিবেন। রেঙ্গুনের ভারতীয়রা বিরাট মিছিল করিয়া বন্দর হইতে কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। পরদিন অপরাহ্ণে জুবিলি হলে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানানো হইল। এই সভায় বাঙালিদের তরফ হইতেও স্বতন্ত্রভাবে একটি মানপত্র পাঠ করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রই উক্ত বাংলা মানপত্রটি রচনা করেন, এবং ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র সেন উহা সভায় পাঠ করেন। সাহিত্যিক হিসাবে তখনও শরৎচন্দ্র খ্যাতিলাভ করেন নাই এবং তিনি কবির সহিত পরিচিত হইবার কোনো চেষ্টাও করেন নাই। দুইদিন পর রবীন্দ্রনাথ পুনরায় সমুদ্রপথে যাত্রা করিলেন।

কয়েকদিন পরই তাঁহারা হংকং-এ পৌঁছিলেন (৯ই জ্যৈষ্ঠ)। পথে সাংহাইয়ে একবার কবির নামিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু জাহাজের কাপ্তেন জানাইলেন যে, জাপানবাসীরা কবিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে, সুতরাং জাপানের কর্তৃপক্ষের জরুরি নির্দেশানুযায়ী জাহাজ কোথাও না থামিয়া সোজা জাপান যাইবে। ফলে এ যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চীন দেখা সম্ভব হইল না। চীনের প্রতি কবির ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ। হংকং বন্দরে কর্মরত সুঠামদেহী চীনা শ্রমিকদের দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ যেন মহাচীনকে দেখিতে পাইলেন। কবি লিখিলেন,

"...এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না।...কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলই ঢেউ খেলাচ্ছে।...জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-

নামার কাজ দেখতে যে এত আনন্দ হবে, এ কথা আমি পূর্বে মনে করতে পারতুম না।..."

কবি বলিতেছেন,

"কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখতে পেযে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে। এখানে মানুষ পূর্ণ পরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত হচ্ছে।...চীন সুদীর্ঘকাল সেই সাধনায় পূর্ণভাবে কাজ করতে শিখেছে, সেই কাজের মধ্যেই তার নিজের শক্তি উদারভাবে আপনার মুক্তি ও আনন্দ পাচ্ছে,—এ একটি পরিপূর্ণতার ছবি। চীনের এই শক্তি আছে বলেই আমেরিকা চীনকে ভয় করছে; কাজের উদ্যমে চীনকে সে জিততে পারে না, গাযের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়।

"এই এত বড়ো একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন্ শক্তি আছে?...এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে, তারা চীনেব সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়।"

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখিলেন,

"আমাদের জাহাজের বাঁ পাশে চীনের নৌকার দল। সেই নৌকাগুলিতে স্বামী-স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সকলে মিলে বাস করছে এবং কাজ করছে। কাজের এই ছবিই আমাব কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগল। কাজের এই মূর্তিই চরম মূর্তি; একদিন এরই জয় হবে। না যদি হয়, বাণিজ্যদানব যদি মানুষের ঘরকন্না স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস করে চলতে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাসসম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে তোলে, তারই সাহায্যে অল্প কযজনেব আবাম এবং স্বার্থ-সাধন করতে থাকে, তা হলে পৃথিবী রসাতলে যাবে।...ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখতে পাব?...

[জাপান-যাত্রী ।। পৃঃ ৬৬-৬৯]

বাণিজ্যদানব বলিতে রবীন্দ্রনাথ এখানে সাম্রাজ্যবাদী বাণিজ্যনীতিরই কথা বলিতেছেন। চীন সম্পর্কে কবির ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইয়াছে।

২৯শে মে (১৬ই জ্যৈষ্ঠ) জাহাজ জাপানের কোবে বন্দরে পৌঁছিল। বন্দরেই কবিকে বিরাট অভ্যর্থনা জানান হইল। বহু ভারতীয় এবং বিশিষ্ট জাপানীদের মধ্যে টাইকন, কাট্‌সুটা, কাওয়াগুচি প্রমুখ অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কাহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন—এই লইয়া ভারতীয় ও

জাপানীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় গুজরাটি বণিক মোরারজীর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

কোবে হইতে রবীন্দ্রনাথ ওসাকায় আসিলেন। জাপানী প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ওসাকার টেন্নোজী হলে তাঁহাকে বিরাট সংবর্ধনা জানান হইল। কবি এই সভায় ভারত ও জাপানের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐক্য-সম্পর্কের উপর একটি বক্তৃতা করিলেন। কোবে ও ওসাকায় থাকিতে রবীন্দ্রনাথ জাপানের কাব্য, সাহিত্য, নৃত্য ও চিত্রকলা অর্থাৎ জাপানের সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনকে গভীরভাবে অনুধাবন করিবার সুযোগ পান।

ওসাকা হইতে তারপর কবি জাপানের রাজধানী টোকিওতে গেলেন। সেখানে তিনি জাপানের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী টাইকনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা ও সাম্রাজ্যলিপ্সার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই ওসাকায় থাকিতেই তিনি জাপান ও আমেরিকার জন্য জাতীয়তাবাদবিরোধী ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা লিখিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানে যে সকল বক্তৃতা করেন, সেগুলির মধ্যে 'The Nation' ও 'The spirit of Japan' প্রবন্ধ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল বক্তৃতার মূলকথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। টোকিও হইতে রবীন্দ্রনাথ ইয়োকোহামায় যান এবং সেখানে কিছুদিন হারাসন নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বণিকের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

জাপানে তিনি প্রায় তিন মাস থাকেন এবং এই তিনমাসেই তিনি সে-দেশকে গভীরভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ পান। ফলে জাপান সম্পর্কে কবির মনে দুইটি বিরুদ্ধভাবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

একদিকে জাপানের শিল্প-সাহিত্য, নৃত্য, চারুকলা, আচার-অনুষ্ঠান—এক কথায় জাপানের সাংস্কৃতিক জীবনের গভীর সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধ যেমন রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তেমনি অপরদিকে আধুনিক জাপানের সাম্রাজ্যলালসা ও উগ্র জাতীয়তা তাঁহাকে গভীরভাবে পীড়া দিয়াছিল।

জাপানীদের সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধে কবি কতখানি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা জাপান-যাত্রীর চিঠিতে পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি লিখিতেছেন,

"...অন্য দেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপরসের যে বোধ দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েছে।...এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

"...য়ুরোপে যখন গেছি তখন তাদের কলকারখানা, তাদের কাজের ভিড়,

তাদের ঐশ্বর্য এবং প্রতাপ খুব করে চোখে পড়েছে এবং মনকে অভিভূত করেছে। তবু, 'এহ বাহ্য'। কিন্তু জাপানের আধুনিকতার ছদ্মবেশ ভেদ করে যা চোখে পড়ে, সে হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি।...জাপান আপনার ঘরে-বাইরে সর্বত্র সুন্দরের কাছে আপনার অর্ঘ্য নিবেদন করে দিচ্ছে।...এমন সাবধানে, যত্নে, এমন শুচিতা রক্ষা করে সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে অন্য কোনো জাতি শেখে নি।"

[ঐ ।। পৃঃ ৯৭-৯৮]

জাপানীদের এই সৌন্দর্যবোধ কবিকে এতখানি অভিভূত করে যে, রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ই ভারত ও জাপানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কথা চিন্তা করিয়া দেশে চিঠিপত্র লিখিতে থাকেন। কবি লিখিতেছেন,

"আমরা অনেক আচার অনেক আসবাব য়ুরোপের কাছ থেকে নিয়েছি—সব সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে নয়, কেবলমাত্র সেগুলো য়ুরোপীয় বলেই। য়ুরোপের কাছে আমাদের মনের এই-যে পরাভব ঘটেছে অভ্যাসবশত সেজন্যে আমরা লজ্জা করতেও ভুলে গেছি। য়ুরোপের যত বিদ্যা আছে সবই আমাদের শেখবার, একথা মানি, কিন্তু যত ব্যবহার আছে সবই যে আমাদের নেবার এ কথা আমি মানি নে। তবু, যা নেবার যোগ্য জিনিস, তা সব দেশ থেকেই নিতে হবে, একথা বলতে আমার আপত্তি নেই।...যে-সব বিদ্যা এবং আচার ও আসবাব জাপানের সম্পূর্ণ নিজের, তার মধ্যে কি আমরা গ্রহণ করবার জিনিস কিছুই দেখি নে?

"আমি নিজের কথা বলতে পারি, আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী জিনিস আমরা এখান থেকে যত নিতে পারি এমন য়ুরোপ থেকে নয়। তাছাড়া জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসংকোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম, তা হলে আমাদের ঘরদুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হোত, সুন্দর হোত, সংযত হোত।"...

রবীন্দ্রনাথ আরও বলিলেন,

"বাংলাদেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েছে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করছি। নকল করবার জন্যে নয়, শিক্ষা করবার জন্যে। শিল্প জিনিসটা যে কত বড়ো জিনিস. সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড়ো সম্পদ, কেবলমাত্র সৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে—তার মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, রসিকের রসবোধ যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে, তা এখানে এলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়।" [ঐ ।। পৃঃ ১০০-০১]

ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক সম্পর্কের দিক হইতে কবির এ কথার গুরুত্ব খুব কম নয়। স্মরণ থাকিতে পারে, বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালেই জাপানী মনীষী ওকাকুরা সমগ্র এশিয়ার একটি সাংস্কৃতিক মিলনের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারত

হইতে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি চিত্রশিল্পী টাইকন ও হিসিদাকে কলিকাতায় অবনীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দেন। অবনীন্দ্রনাথ এই দুই জাপানী শিল্পীর নিকট হইতে জাপানী চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির কলা-কৌশল আয়ত্ত করেন। ফলে তাঁহার চিত্রাঙ্কনরীতির অভিনব পরিবর্তন দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়া দেখিলেন—টাইকন ও তানজান তখন সারা দেশে বিরাট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কবি তাঁহাদের অঙ্কনরীতিতে মুগ্ধ হন। এই সময় তিনি দেশে প্রতি চিঠিপত্রেই জাপানী চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি শিক্ষা ও অনুধাবন করিবার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। টাইকনের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি শিল্পী আরাইকে জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রার স্কুলে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই প্রসঙ্গে এক পত্রে তিনি গগনেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন,

"বাইরে থেকে একটা নূতন আঘাত পেলে আমাদের চেতনা বিশেষভাবে জেগে ওঠে। এই আর্টিস্টের সংসর্গে অন্তত তোমাদের সেই উপকার হবে।··· জাপানী তুলি টানার বিদ্যেয় তোমাদের ছেলেদের হাত পাকান দরকার।"

কবি রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন,

"নন্দলালরা যদি এঁর কাছ থেকে খুব বড় আয়তনের পটের উপর জাপানী তুলির কাজ শিখে নিতে পারে তা হলে আমাদের আর্ট অনেকখানি বেড়ে উঠবে।···" [দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৪৩০]

পরবর্তীকালে 'কলাভবন' প্রতিষ্ঠার পর শান্তিনিকেতনে জাপানী ও চীনা অঙ্কনপদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা যথাস্থানে আমরা আলোচনা করিব।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আধুনিক জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সা ও উগ্র স্বাদেশিকতাকে রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তাই তিনি বলিলেন,

"জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেটা অহঙ্কারের প্রকাশ নয়, আত্মনিবেদনের প্রকাশ; সেইজন্যে এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে, আঘাত করে না। এই-জন্যে জাপানে যেখানে এই ভাবের বিরোধ দেখি, সেখানে মনের মধ্যে বিশেষ পীড়া বোধ করি। চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল—সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মতো দেশের চার দিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে-কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল।···" [জাপান-যাত্রী ।। পৃঃ ৯৯]

স্মরণ থাকিতে পারে, জাপান ইউরোপের নিকট হইতে বিজ্ঞান ও অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সর্বপ্রথমে তাহা প্রয়োগ করে চীনের উপর। ১৮৯৪-৯৫ সালে জাপান চীনের উপর আক্রমণ শুরু করিল। এই যুদ্ধে চীন জাপানের নিকট পরাজিত হয়। ফলে কোরিয়ার উপর হইতে চীনের আধিপত্যের অবসান হয়

এবং ঐসাথে চীন জাপানকে ফরমোজা দ্বীপটিও ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করিবার পর জাপানের সাম্রাজ্য ও ক্ষমতালিপ্সা আরও প্রবল আকার ধারণ করে। তারপর মহাযুদ্ধ আসিয়া পড়িল। জাপান এই যুদ্ধে মিত্রশক্তির (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া) পক্ষ অবলম্বন করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জাপান চীন হইতে জার্মানদের বিতাড়িত করিয়া কিয়াচো ও সিঙটাঙ প্রদেশ দখল করিয়া লইল। জাপানের উদ্দেশ্য হইল, এই যুদ্ধের সুযোগে চীনে নিজের আধিপত্য বিস্তার করা এবং যুদ্ধের পরে এশিয়ায় জার্মানীর সাম্রাজ্যটি দখল করা। জার্মানী চীন হইতে বিতাড়িত হইলে জাপানকে তাহার সৈন্য সরাইয়া লইবার জন্য চীন অনুরোধ জানাইল। জাপান যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির অজুহাতে চীনের দাবি অগ্রাহ্য করিল। এই সময়ে চীনের কর্তৃত্ব ছিল ক্ষমতালোভী প্রেসিডেন্ট ইয়ান সি-কাই-এর হাতে। জাপানের অনুগ্রহের উপরেই ইয়ান সি-কাই-এর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল ছিল। জাপান সুযোগ বুঝিয়া চীনের নিকট 'একুশ দফা'র এক দাবি পেশ করিল (১৯১৫)। এই দাবিগুলি মানিয়া লইলে চীন আপনার স্বাধীনতা হারাইয়া জাপানের আজ্ঞাবহ একটি ভৃত্যদেশে পরিণত হইবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপানের বেয়নেটের মুখে চীন দাবিগুলি মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। ফলে সে জাপানের অর্ধ-উপনিবেশে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথ জাপানে পৌছিয়াই সর্বত্রই জাপানের এই উগ্র সাম্রাজ্যলিপ্সা ও যুদ্ধোন্মাদনার আয়োজন দেখিলেন। এই উদ্দেশ্যে জাপান সমগ্র দেশটিকে জাতীয়তাবাদের মদ্য পান করাইয়া মাতাল করিয়া তুলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ ইহা গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি লিখিলেন,

"জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে বসেছে।…জাপানি সভ্যতার সৌধ এক মহলা—সেই হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারের সবচেয়ে বড়ো জিনিস যা সঞ্চিত হয়, সে হচ্ছে কৃতকর্মতা; সেখানকার মন্দিরে সবচেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্মনির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সবচেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্যন্ত জাপান ভালো করে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্মে তার প্রয়োজন আছে কি না, এবং ধর্মটা কী।…" [ঐ ।। পৃঃ ১১৪]

জাপানে জাতীয়তাবাদের উগ্র বিভীষিকা-রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া গভীর ক্ষোভে ও অন্তর্বেদনায় কবি ইহার পরিণতি সম্পর্কে আর একবার পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন;

এবং তাহারই ফলে তাঁহার জাতীয়তাবাদবিরোধী বক্তৃতামালার সৃষ্টি। বলিষ্ঠ নির্ভীক কণ্ঠে কবি এই সাম্রাজ্যলিপ্সা ও উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্য জাপানকে কঠিন তিরস্কার করিলেন। জাপানে বসিয়াই জাপানের বিরুদ্ধে এইরূপ কঠোর সমালোচনার ফলে জাপ-সরকার তাঁহার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। অবিলম্বে সারা দেশব্যাপী ইহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিয়াছেন,

"…জাপানে আসিবার সময় যাঁহাকে সমগ্র জাতি অভ্যর্থনা করিয়াছিল—তাঁহাকে বিদায় দিবার ক্ষণে জাহাজঘাটে কোনো জনতার ভিড় হয় নাই—একমাত্র হারাসান তাঁহার অতিথিকে বিদায় দিবার জন্য উপস্থিত হন। জাপান সরকারের অন্তরটিপুনিতে সমস্ত দেশ কবির প্রতি বিমুখ হইয়া ছিল।…"

[রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৪২৫]

জাপানে থাকিবার কালেই কানাডার একটি প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথকে ভাঙ্কুভারে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কানাডার এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, যতদিন কানাডায় ভারতীয় ও এশিয়াবাসীদের প্রতি ভেদনীতি প্রচলিত থাকিবে এবং যতদিন কানাডায় ভারতবাসী তথা এশিয়াবাসীর প্রতি অবজ্ঞা ও নির্যাতন চলিবে ততদিন তিনি কানাডার মাটিতে পদার্পণ করিবেন না। কিছুদিন পূর্বে বজবজে 'কামগাটমারু' জাহাজে যে নির্মম হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য কানাডা-সরকারও অংশত দায়ী ছিলেন। সে সময় কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলিতে চীনা, জাপানী ও ভারতীয় শ্রমিকদের বহু বিধিনিষেধ ও অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও অর্থোপার্জনের জন্য যাইতে হইত। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে একদল পঞ্জাবী শ্রমিক কামগাটমারু জাহাজে করিয়া কানাডায় উপস্থিত হয়। কিন্তু কানাডা-সরকারের নির্দেশে তাহাদের জাহাজ হইতে নামিতে দেওয়া হইল না এবং একরকম জোর করিয়াই তাহাদের দেশে ফিরিতে বাধ্য করা হইল। নিরুপায় শ্রমিকদল ভারতবর্ষের পথে রওনা হইল। জাহাজ বজ্‌বজে পৌঁছিলে এই পঞ্জাবী শ্রমিকদের উপর ইংরাজ সরকার অকথ্য অত্যাচার ও নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায়।

যে দেশে স্বদেশবাসী ও এশীয়রা এইভাবে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয়, সেখানে তিনি কিছুতেই যাইতে পারেন না, এইকথা বলিয়া সেদিন কবি কানাডা-সরকারের ঘৃণ্য অপকর্মের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। তাছাড়া, এই ঘটনাটি হইতেই বুঝা যায়, কবির স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় মর্যাদাবোধ কত গভীর ছিল।

॥ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় ॥

১৯১৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ জাপান হইতে আমেরিকা যাত্রা করিলেন, সঙ্গে রহিলেন পিয়ার্সন ও মুকুল দে।

১৮ই সেপ্টেম্বর জাহাজ আমেরিকার সিয়াটলে পৌছিল। মিঃ পণ্ড কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

'পণ্ড লীসিয়াম বুরো' নামক একটি বক্তৃতা কোম্পানি আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করেন। এই কোম্পানিটির সহিত রবীন্দ্রনাথের ৪০টি বক্তৃতার চুক্তি হয়। স্থির হয়, প্রতিটি বক্তৃতার জন্য কবি পাঁচশত ডলার (প্রায় ১,৫০০ টাকা) পাইবেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য অর্থের তখন খুবই প্রয়োজন। তাই রবীন্দ্রনাথ সিয়াটলে পৌছিয়াই পণ্ডকে বলিলেন,…'তুমি যত বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবে, আমি দিব। আমার নিজের কোনো প্ল্যান নাই; যতই বক্তৃতা হইবে ততই আমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা হইবে।'

বিদ্যালয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে, সত্য কথা। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, কেবল অর্থের প্রয়োজনে আমেরিকার বিলাসী ধনকুবেরদের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য কবি আমেরিকায় আসেন নাই। ভারতবর্ষ হইতে জাপানের পথে তিনি জাহাজে বসিয়াই আমেরিকায় বক্তৃতার জন্য 'Personality'-র প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানে আসিয়া তিনি যেন মহাযুদ্ধের স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করিলেন। পূর্বরণাঙ্গন বা দূরপ্রাচ্যের কোনো যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ দৃশ্য তাঁহাকে দেখিতে হয় নাই, কিন্তু জাপানের উগ্র জাত্যাত্মম্ভরিতা ও সাম্রাজ্যলিপ্সার বিভীষিকাময় রূপটি দেখিয়া তিনি যেন মহাযুদ্ধের সমগ্র চিত্রটি দেখিতে পাইলেন। জাপানে বসিয়াই তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদকে তীব্র ভাষায় নিন্দিত করিয়া 'Nationalism' গ্রন্থে সংকলিত বক্তৃতাগুলি লিখিলেন। এই বক্তৃতাগুলির জন্য তিনি জাপানে অপ্রিয় ও জাপ-সরকারের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, ধনতান্ত্রিক আমেরিকায় এইসব বক্তৃতার জন্য তিনি উপহাসের পাত্র হইবেন। কিন্তু তবুও কবি তাঁহার সংকল্পে অটল রহিলেন, "Nationalism is a great menace."

তিনি বলিলেন,

"In this war the death-throes of the Nation have commenced....It is the fifth act of the tragedy of the unreal."

পণ্ড কোম্পানির অনুষ্ঠানলিপি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ সিয়াটল, পোর্টল্যাণ্ড, সানফ্রানসিসকো, লস্‌এঞ্জেলস্‌, ডেনভর, চিকাগো, ইণ্ডিয়ানোপোলিস, ডেট্রয়েট, পীটস্‌বার্গ, ফিলাডেলফিয়া, ব্রুকলীন, বোস্টন, নিউইয়র্ক, ক্লীভল্যাণ্ড প্রভৃতি আমেরিকার বিখ্যাত নগরীগুলিতে বক্তৃতা করিলেন। অধিকাংশ জায়গায় তিনি Personality ও Nationalism গ্রন্থদ্বয়ের প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন। বলা বাহুল্য, কবির ঐ যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদবিরোধী বক্তৃতাগুলি ধনতন্ত্রবাদী আমেরিকার আদৌ ভালো লাগে নাই। ভারতবর্ষের মত পশ্চাৎপর দেশের এক কবি পাশ্চাত্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির সমালোচনা করিবেন—আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীল মহল ইহা আদৌ সহ্য করিতে পারেন নাই। ফলে চারিদিকে পত্র-পত্রিকায় কবির বক্তৃতাগুলির বিরূপ ও বিকৃত সমালোচনা হইতে লাগিল। অতি উৎসাহে কয়েকটি পত্রিকা এমনকি ব্যক্তিগতভাবে কবিকে অত্যন্ত হীন ও জঘন্য আক্রমণ করিতেও ছাড়িল না।

১৭ই অক্টোবর আমেরিকার Los Angeles Express কবিকে অতি হীনভাবে বিদ্রূপ করিয়া লিখিল,

"যাই হৌক অর্থ রোজগার হিসাবেও আমেরিকানদের প্রয়োজন আছে দেখিতেছি। ঠাকুর মহাশয় তাহাদিগকে তাহাদের ধনের জন্য সমালোচনা করিয়াছেন—কিন্তু সেখানে আসিয়াছেন তো তাহাদের উপার্জিত ধনের কিছু অংশ গ্রহণ করিতে।...ধন খুবই হীন পদার্থ, ধনোপার্জন বৃত্তি অত্যন্ত গর্হিত... কিন্তু আমাদের এই সান্ত্বনা যে আমাদের এই তুচ্ছধন—যাহা তিনি এতই ঘৃণা করেন তাহাই তাঁহাকে এতদূর টানিয়া আনিয়াছে। তিনি যাহা নিন্দা করেন, তাহাই পাইবার জন্য আসিয়াছেন, এবং এখানে আসিয়া সেই কাজই নিজে করিতেছেন, যার জন্য এত নিন্দাবাদ।" [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৪৩৮]

Salt Lake Tribune লিখিল,

"...স্যর রবীন্দ্রনাথ আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে কেবল দোষ দেখেন নাই, আমাদের রাজনীতি সম্বন্ধেও দোষ দেখিয়াছেন। কিন্তু এসব কথার আলোচনায় পৃথিবীর বড়ো বড়ো সমস্যার প্রশ্ন উঠিবে, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দার্শনিকেরই এইসব আলোচনার সময় ও অবসর আছে।" [ঐ ।। পৃঃ ৪৩৮]

সে-সময় কবির বিরুদ্ধে এই ধরনের অনেক হীন সমালোচনা হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকার কেন এই অন্তর্দাহ?

স্মরণ থাকিতে পারে, তখনও পর্যন্ত আমেরিকা মহাযুদ্ধে কোন পক্ষই অবলম্বন করে নাই। পরন্তু যুদ্ধ একটা মহা-আশীর্বাদের মত আমেরিকার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের সুযোগে আমেরিকা—ইংলণ্ড ও জার্মানী, উভয়পক্ষের নিকটই সমরোপকরণ ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা লুটিতে থাকে। এমন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের ঐ যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদবিরোধী বক্তৃতাগুলি চারিদিকে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করিবে এবং তাহার ফলে সমরোপকরণ উৎপাদনের কাজ ব্যাহত হইবে, ইহাই ছিল ধনতান্ত্রিক আমেরিকার আশঙ্কা; এবং এইখানেই নিহিত রহিয়াছে তাহার অন্তর্দাহের মূল কারণটি। ডেট্রয়টে পুঁজিপতিদের একটি পত্রিকা অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই মন্তব্য করিয়া বসিল,

"...such sickly saccherine mental poison with which that Tagore would corrupt the minds of the youth of our great United States." [ঐ।। পৃঃ ৪৪০]

কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে ইহাও স্মরণীয় যে, আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে কবি চিন্তাশীল সুধীবর্গ ও সাধারণ মানুষের নিকট হইতে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে সানফ্রানসিসকোতে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া একটি অতি বিশ্রী ঘটনা ঘটে, যাহার জের চলিয়াছিল অনেক বৎসর ধরিয়া।

এই সময় আমেরিকায় 'হিন্দুস্থান গদর পার্টি'র কিছু লোক সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বিদেশী শক্তির সহিত গোপনে যোগাযোগ করিয়া ভারতবর্ষে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করিতেছিল। রামচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি ছিলেন এই দলের অন্যতম নেতা। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদবিরোধী বক্তৃতাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় তাহাদের ধারণা হইল, এই সময় রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের উক্তি ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে। রবীন্দ্রনাথ তখন সানফ্রানসিসকোতে। এই সময় স্টকটন নামে একটি শহর হইতে জনৈক ভারতীয় রবীন্দ্রনাথকে তাহাদের শহরে লইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে আসে। হোটেলের কাছে রামচন্দ্রের গদর দলের লোকেরা তাহাকে বাধা দেয়। উদ্দেশ্য—কবিকে তাহারা মেলামেশা করিতে দিতে চাহে না।

এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির পর হঠাৎ চারিদিকে কে বা কাহারা গুজব রটাইল যে, রামচন্দ্রের গদর দলের লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন,

"চারিদিকে গুজব ছড়াইল (৫ই) যে গদর দল রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করিবে। এই কথা শোনামাত্র স্থানীয় পুলিস ও ডিটেকটিভ রবীন্দ্রনাথের হোটেল ও কলম্বিয়া

থিয়েটারে তাঁহার বক্তৃতার স্থান বিশেষভাবে রক্ষা করিতে লাগিল। বস্তুশত হিন্দুকে সভায় তাহারা প্রবেশ করিতে দিল না। ইণ্টারন্যাশনাল ডিটেক্‌টিভ এজেন্সির লোকেরা কবিকে সভার পর বাহির করিয়া লইয়া যায় ও হোটেলেও পিছনকার দরজা দিয়া তাঁহার ঘরে পৌছাইয়া দেয়।···

"এইসব ঘটনার পরদিনই কবি Saint Barbara শহরে যান।···তিনি সাংবাদিক ডগ্‌লাস টুর্নিকে (Tourney) মোলাকাতে বলেন যে, 'সানফ্রানসিসকো কাগজে আমাকে হত্যা লইয়া একটা খবর প্রকাশ পায়; আমি তাহা সমস্ত পড়ি নাই।···হত্যা সম্বন্ধে যে গুজব রটিয়াছে সে-সম্বন্ধে আমার দেশবাসীর বুদ্ধির প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, এবং আমি আমার সমস্ত কাজ পুলিসের সহায়তা ব্যতীতই করিব। আমি এখানে স্পষ্ট বলিতেছি যে আমাকে হত্যা করিবার কোনো ষড়যন্ত্র হইয়াছিল—তাহা আমি বিশ্বাস করি না।

[রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৪৩৬-৩৭]

আসলে এই ঘটনার পিছনে মার্কিন সরকারের একটি হীন অভিসন্ধি ছিল। এই রকম একটি অলীক 'ষড়যন্ত্র' আবিষ্কারের নামে তাহারা পরোক্ষে বিশ্ববাসীকে ইহাই বুঝাইতে চাহিল যে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসীরাই তাঁহার বক্তৃতায় ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে; অথচ মার্কিন সরকার কবির অমূল্য জীবন রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সদাই তৎপর। এই ঘটনার বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মার্কিন সরকারের এই ভণ্ডামির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া 'দি আটলাণ্টিক মান্‌থ্‌লি' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,

"জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'স্যর' পদবী ত্যাগ করা এমনই কী কুকাজ হইয়াছে যে তাহার জন্য আমার নামে কলঙ্ক রটান হইতেছে যে, আমেরিকা ভ্রমণের জন্য আমি জার্মানদের নিকটই হইতে টাকা গ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্য আমাকে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট কেব্‌ল্ করিয়া তার প্রতিবাদ করিতে হয়।

"এমন কি আমার সানফ্রানসিসকো নগরে অবস্থিতির সময় গোয়েন্দা বিভাগের লোক আসিয়া 'মায়ের অপেক্ষা মাসীর দরদ' দেখাইবার মতো আমাকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পালাইতে বলিয়া গেল; কারণ হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা না কি আমার প্রাণ হরণ করিবে।

"কিন্তু ১৯১৬ সালে যখন আমি জাপান হইতে ক্যালিফোর্নিয়াতে পাড়ি দি—আমেরিকাবাসীরা আমায় বহু নগরে সাদরে সংবর্ধনা করে এবং আমার কথা ধীর চিত্তে শ্রবণ করিয়াছিল। আমার বিশ্বভারতীর জন্য টাকাও কিছু সংগ্রহ

করিয়াছিলাম। যদিও স্বার্থান্বেষিগণ আমার জাতীয়তাবাদমূলক বক্তৃতাগুলির প্রতিকূল সমালোচনা করেন—তথাপি অনেক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া ইহার প্রকৃত মর্মকথা জানিয়া যায়।" [বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ ।। পৃঃ ৭২-৭৩]

এইসব ব্যাপারে কবির মন ক্রমশই আমেরিকার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু উপায় নাই—পণ্ড কোম্পানির সহিত তিনি চুক্তিবদ্ধ; তাছাড়া, শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থেরও প্রয়োজন। নানা প্রতিকূল সমালোচনা সত্ত্বেও অধিকাংশ স্থানেই তিনি তাঁহার জাতীয়তাবাদবিরোধী বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। তাছাড়া, আমেরিকায় এশিয়াবাসীদের প্রবেশাধিকার লইয়া মার্কিন সরকারের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করিতেও তিনি ছাড়িলেন না। নিউইয়র্কের সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রসঙ্গে কথা উঠিলে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"Your treatment of Asiatics is one of the darkest sides of your national life". [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৪৪১]

আমেরিকার নিগ্রো-বিদ্বেষ ও বর্ণ-বিদ্বেষের সমালোচনা করিতেও কবি ছাড়িলেন না। আমেরিকার কয়েকটি পত্র-পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতাবাদের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছিল, 'ভারতের জাতিভেদ কি ভ্রাতৃস্নেহের উপর প্রতিষ্ঠিত?' 'Nationalism in India' নামক বক্তৃতায় কবি উহার পাল্টা জবাবে বলিলেন,

"...Many people in this country ask me what is happening as to the caste distinctions in India. But when this question is asked me, it is usually done with a superior air. And I feel tempted to put the same question to our American critics with a slight modification, 'What have you done with the Red Indian and the Negro?' For you have not got over your attitude of caste toward them. You have used violent methods to keep aloof from other races, but until you have solved the question here in America, you have no right to question India".

[Nationalism. p. 98]

কিন্তু এইসব প্রতিকূলতাও আজ কবির নিকট অতি তুচ্ছ বিষয়, মহাযুদ্ধ আজ কবির চোখের নিদ্রা হরণ করিয়াছে। কবি ভাবিতেছেন, এই বিশ্বব্যাপী মহাবিধ্বংসের শেষ পরিণতি কোথায়? কোথায় মানুষের মুক্তি? কোথায় সমাধান? 'Nationalism' বক্তৃতাগুলি লিখিবার পর কবি ক্রমশই আন্তর্জাতিক মিলনের আদর্শের উপর জোর দিতে শুরু করিলেন। কিন্তু কিভাবে এই আন্তর্জাতিক মিলন গড়িয়া উঠিবে? রবীন্দ্রনাথ ভাবিতেছেন, একদিন তাঁহার

শান্তিনিকেতনেই বিদ্যাশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমেই নিখিল মানবের মিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হইবে। আমেরিকা হইতে তিনি দেশে রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন (১১ই অক্টোবর : ৯১৪),

"ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে, ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হবে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ।"

[রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৪৩৯]

কয়েকদিন পরে অপর একখানি পত্রে কবি লিখিতেছেন (চিকাগো, ২৮শে অক্টোবর ১৯১৬),

"বাংলাদেশের চিত্ত সর্বকালে সর্বদেশে প্রচারিত হোক্, বাংলাদেশের বাণী সর্বজাতি সর্বমানবের বাণী হোক্। আমাদের বন্দে মাতরম্ মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনা-মন্ত্র নয়—এ হচ্চে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনা-গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।···আমরা মানববিধাতার রাজপথে মহামানবের গান গেয়ে বেড়াব।···মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব।" [ঐ ।। পৃঃ ৪৩৯]

'বিশ্বভারতী'র পরিকল্পনা ধীরে ধীরে কবির মানসপটে রূপ গ্রহণ করিতেছে, বিশ্বভারতীর মাধ্যমেই তিনি আন্তর্জাতিক মহামিলনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। বলা বাহুল্য, কবির এই চিন্তাধারা হঠাৎ কিংবা আকস্মিক কিছু নয়। শান্তিনিকেতন উপদেশমালা ও গীতাঞ্জলির পর্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে বিশ্বজাগতিকতা বা আন্তর্জাতিকতা বোধ ধীরে ধীরে স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। কিন্তু মহাযুদ্ধের ফলে কবির মনে আজ বিশ্বমানবতার প্রশ্নটিই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন,

"দেশের গণ্ডি আমার ঘুচে গেছে, সকল দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে একদেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব।" [ঐ ।। পৃঃ ৪৩৯]

ইহার পর আরও প্রায় দুইমাস রবীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় থাকিতে হয়। অবশেষে দেশে ফিরিবার জন্য কবি অধৈর্য হইয়া উঠিলেন। ২১শে জানুয়ারি তিনি আমেরিকা হইতে জাপান যাত্রা করিলেন।

।। ন্যাশনালিজ্‌ম্

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ জাপান ও আমেরিকায় যে সব বক্তৃতা দেন, সেগুলির প্রায় অধিকাংশই তাঁহার 'Personality' ও 'Nationalism' গ্রন্থে সংকলিত হয়। ইহার মধ্যে Nationalism গ্রন্থের বিষয়বস্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তাহার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নিতান্ত অল্প, তবু উহার মূল কথাটি আমাদের অবশ্যই আলোচনা করিতে হইবে।

Nationalism গ্রন্থে তিনটি প্রবন্ধ আছে—'Nationalism in the West', 'Nationalism in Japan' ও 'Nationalism in India'। তাছাড়া, এই গ্রন্থের পরিশেষে নৈবেদ্যর কয়েকটি কবিতার অনুবাদও আছে।

বলা বাহুল্য, ন্যাশনালিজ্‌ম্ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা নূতন কিছু নহে। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালেই তিনি বঙ্গদর্শনে আধুনিক ন্যাশনালিজ্‌ম্ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইউরোপের এই ন্যাশনালিজ্‌ম্ যে উদগ্র সাম্রাজ্যলালসা ও উগ্র পরজাতি-বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নহে, একথা রবীন্দ্রনাথ সেইদিনই উপলব্ধি করিয়া দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। ন্যাশনালিজ্‌ম্—বিচারে কবির সমালোচনার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখন 'Nationalism' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য বিষয় কী দেখা যাক।

"What is this Nation?" স্বয়ং এই প্রশ্ন করিয়া রবীন্দ্রনাথ Nation-এর সংজ্ঞা নির্ণয় করিতেছেন,

"A Nation, in the sense of the political and economic union of a people, is that aspect which a whole population assumes when organised for a mechanical purpose." [Nationalism. p. 9]

কিন্তু নেশনরূপী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংঘের সেই বিশেষ 'যান্ত্রিক উদ্দেশ্য' বা লক্ষ্যটি কী? রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, লোভ ও ব্যক্তিস্বার্থের তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতই নেশনের যান্ত্রিক উদ্দেশ্যের মর্মকথা। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মানুষের সামগ্রিক স্বার্থকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই মানবসমাজ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে পাশ্চাত্যের এই জাতীয়তাবাদ সমাজের মূল লক্ষ্যকে

বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যেই গড়িয়া উঠিল। তারপর বিজ্ঞান ও যন্ত্রের উদ্ভাবনের পর হইতে তাহাদের উৎপাদিকা শক্তি এমনই বাড়িয়া উঠিল যে উহাদের গতি-বেগকে সংযত করা আর সম্ভব হইতেছে না। অপরদিকে, সমাজের অভ্যন্তরে লোভ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং প্রতিযোগিতাও তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। সমাজের সহিত ব্যক্তির, ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, পুরুষের সহিত নারীর, কল মালিকের সহিত মজুরের—সর্বত্রই এই স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তিনি বলিলেন,

"...the living bonds of society are breaking up, and giving place to merely mechanical organization....It is owing to this that war has been declared between man and woman, because the natural thread is snapping which holds them together in harmony ; because man is driven to professionalism, producing wealth for himself and others, continually turning the wheel of power for his own sake or for the sake of the universal officialdom, leaving woman alone to wither and to die or to fight her own battle unaided.…" [Ibid. p. 10]

তিনি আরও বলিলেন,

"And what is the meaning of these strikes in the economic world, which like the prickly shrubs in a barren soil shoot up with renewed vigour each time they are cut down ?...This state of things inevitably gives rise to eternal feuds among the elements freed from the wholeness and wholesomeness of human ideals, and interminable economic war is waged between capital and labour. For greed of wealth and power can never have a limit, and compromise of self-interest can never attain the final spirit of reconciliation....

"When this organization of politics and commerce, whose other name is the Nation, becomes all-powerful at the cost of the harmony of the higher social life, then it is an evil day for humanity....When it allows itself to be turned into a perfect organization of power, then there are few crimes which it is unable to perpetrate.…" [Ibid. pp. 11-12]

ইউরোপের ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই ধরিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজের সহিত 'নেশন'কে এক করিয়া ফেলিতেছেন। অর্থাৎ, ধনতন্ত্রকেই তিনি ন্যাশনালিজ্‌ম্ নামে অভিহিত করিতেছেন। কিছু পরে আমরা এই আলোচনায় আসিব।

পাশ্চাত্যের ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ ভারতেবর্ষে তথা প্রাচ্য ভূখণ্ডে কী বেশে দেখা দিয়াছে, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

"This abstract being, the Nation, is ruling India....

"But we, who are governed, are not a mere abstraction. We, on our side, are individuals with living sensibilities....In this reign of the nation, the governed are persued by suspicious ; and these are the suspicions of a tremendous mass of organized brain and muscle. Punishments are meted out, which leave a trail of miseries across a large bleeding tract of the human heart ; but these punishments are dealt by a mere abstract force, in which a whole population of a distant country has lost its human personality.

"I have not come here, however, to discuss the question as it affects my own country, but as it affects the future of all humity....

"This government by the Nation is neither British nor anything else ; it is an applied science and therefore more or less similar in its principles whereever it is used....Our government might have been Dutch, or French, or Portuguese, and its essential features would have remained much the same as they are now...." [Ibid. pp. 13-17]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপটি সামগ্রিকভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং এক্ষেত্রেও মোটামুটিভাবে তাঁহার বিশ্লেষণ সঠিক হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখানেও তিনি সাম্রাজ্যবাদের সহিত নেশনকে এক করিয়া ফেলিতেছেন। অর্থনীতিবিদ্‌রা যাহাকে 'উপনিবেশবাদ' ও 'সাম্রাজ্যবাদ' (Colonialism & Imperialism) বলিয়া থাকেন, রবীন্দনাথ তাহাকে ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ নামে অভিহিত করিতেছেন।

পাশ্চাত্য ন্যাশানালিজ্‌মের তীব্র নিন্দাবাদ করিলেও রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল মর্মবাণীটুকু গ্রহণ করিবার পক্ষে। তাই ঐ সাথে তিনি এ-কথাও স্মরণ করাইয়া দিলেন,

"...Then, again, we have to consider that the West is necessary to the East. We are complementary to each other because of our different outlooks upon life which have given us different aspects of truth. Therefore if it be true that the spirit of the West has come upon our fields in the guise of a

storm it is nevertheless scattering living seeds that are immortal. And when in India we become able to assimilate in our life what is permanent in Western civilization we shall be in the position to bring about a reconciliation of these two great worlds. Then will come to an end the one-sided dominance which is galling...." [Ibid. p. 15]

রবীন্দ্রনাথ দেখিতেছেন, পাশ্চাত্যের এই ন্যাশনালিজ্‌ম্ ইংরাজ শাসনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে আজ যে বেশে দেখা দিয়াছে, তাহা যেমনই কদর্য, তেমনি নৃশংস ও বীভৎস। ইহার কারণ কি? তিনি দেখিতেছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলেই একটি অন্তর্বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন,

"The truth is that the spirit of conflict and conquest is at the origin and in the centre of Western nationalism; its basis is not social co-operation....It is like the pack of predatory creatures that must have its victims....In fact, these nations are fighting among themselves for the extension of their victims and their reserve forests. Therefore the Western Nation acts like a dam to check the free flow of Western civilization into the country of the No-Nation...

"...And we cannot but acknowledge this paradox, that while the spirt of the West marches under its banner of freedom, the Nation of the West forges its iron chains of organization which are the most relentless and unbreakable that have ever been manufactured in the whole history of man."

[Ibid. pp. 21-25]

ভারতবর্ষে তথা প্রাচ্য দেশগুলিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম অবদানগুলি কার্যকরী হইবার পথে বাধা পাশ্চাত্য সভ্যতার ন্যাশনাল সত্তা।

রবীন্দ্রনাথ দেখিতেছেন, নেশনের পরম শত্রু নেশন। নূতন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেশনকে সে উঠিতে দিতে চায় না। এইজন্য উদীয়মান জাপানকে তাহাদের এত ভয়। তাছাড়া, নেশনগুলির নিজেদের মধ্যেই বিরোধ-সংঘাত লাগিয়াই আছে। তিনি বলিলেন,

"The Nation, with all its paraphernalia of power and prosperity, its flags and pious hymns, its blasphemous prayers in the churches, and the literary mock thunders of its patriotic bragging, cannot hide the fact that the Nation is the greatest evil for the Nation, that all its precautions are against it, and any

new birth of its fellow in the world is always followed in its mind by the dread of a new peril. Its one wish is to trade on the feebleness of the rest of the world, like some insects that are bred in the paralysed flesh of victims kept just enough alive to make them toothsome and nutritious....For this the Nation has had and still has its richest pasture in Asia...."

[Ibid. pp. 29-30]

তিনি আরও বলিলেন,

"...Nation can only trust Nation where their interests coalesce, or at least do not conflict...." [Ibid. p. 40]

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, জাতীয়তাবাদ উগ্রতম নেশা। এই 'জাতীয়তাবাদের মদ' খাইয়া আজ সমগ্র জাতিকে-জাতি বিবেকবুদ্ধি ভুলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়াছে। তিনি বলিলেন,

"And the idea of the Nation is one of the most powerful anæsthetics that man has invented. Under the influence of its fumes the whole people can carry out its systematic programme of the most virulent self-seeking without being in the least aware of its moral perversion,—in fact feeling dangerously resentful if it is pointed out.

"This European war of Nations is the war of retribution....

"The Nation has thriven long upon mutilated humanity. Men, the fairest creations of God, came out of the National manufactory in huge numbers as war-making and money-making puppets, ludicrously vain of their pitiful perfection of mechanism. Human society grew more and more into a marionette show of politicians, soldiers, manufacturers and bureaucrats, pulled by wire arrangements of wonderful efficiency.

"...In this war the death-throes of the Nation have commenced. Suddenly, all its mechanism going mad, it has begun the dance of the Furies, shattering its own limbs, scattering them into the dust. It is the fifth act of the tragedy of the unreal.

"The veil has been raised, and in this frightful war the West has stood face to face with her own creation, to which she had offered her soul. She must know what it truly is."

[Ibid. pp. 43-45]

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতাটির প্রতিটি ছত্রে ছত্রে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কবির তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বব্যাপী জাত্যাভিমানের ও রণোন্মাদনার কোলাহলের মাঝে উচ্চকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিলেন, 'মহাযুদ্ধেই জাতীয়তাবাদের অন্তিমকাল সূচিত হইয়াছে...মিথ্যা ও অবাস্তবতার সেই চরম দুঃখজনক বিয়োগান্ত নাটকের আজ পঞ্চমাঙ্কের পালা চলিতেছে।'

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য মোটামুটি নির্ভুল হইলেও ন্যাশনালিজ্‌ম্‌-বিচারে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষা বিজ্ঞানসম্মত নহে। তাহার কারণ, আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করিতে কবি অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁহার আক্রমণের উদ্দেশ্য যদিও শুধুই জাতীয়তাবাদ নহে—ইউরোপের ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতিই কবির আক্রমণের মূল লক্ষ্য, তবু জাতীয়তাবাদকেই তিনি যত কিছু অনিষ্টের মূল বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। Nationalism, Nationalist State এবং Capitalism-Imperialism-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য তিনি দেখিতে পারেন নাই; পরন্তু এইগুলির সম্মিলিত একটিমাত্র রূপকে তিনি ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ নামে অভিহিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিজম্‌কেই পুঁজিবাদ বা Capitalism-এর জন্য দায়ী করিয়াছেন। অথচ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ই বিপরীত। Capitalism-এরই ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদে ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ গড়িয়া উঠিয়াছে—Capitalism-এর বাঁচিবার ও বিকশিত হইবার উপায় হইতেছে Nationalism. অর্থাৎ মূলবিষয় হইতেছে Capitalism, যাহা Nationalism-এর রূপ বা অবয়বে প্রকাশ পাইয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে মিলনের কাজ করিতেছে state (রাষ্ট্র)—যাহা প্রায় সর্বত্রই Nationalist State রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ Nationalism-এর সামগ্রিক যে চিত্রটি তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা আসলে ইউরোপের পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদেরই সামগ্রিক রূপ।

কিন্তু পরাধীন ঔপনিবেশিক (এবং এমনকি ইউরোপেরও) দেশগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে একটি বিশেষ প্রগতিশীল ভূমিকা আছে, একথা রবীন্দ্রনাথ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন, এশিয়া ও আফ্রিকাই ইউরোপের প্রভুত্বের ক্ষেত্র। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলির প্রতি তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের আহ্বান জানাইতে পারিলেন না। অথচ পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল অকুণ্ঠ দরদ ও সহানুভূতি। তাই এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, কবির মূল বক্তব্য হইল—পাশ্চাত্যের বীভৎস মানবতাবিরোধী

জাতীয়তাবাদ কখনই আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। এই কারণেই তিনি সামগ্রিকভাবে নীতিভ্রষ্ট জাতীয়তাবাদের নিপাত জানাইলেন; এবং সেইসাথে বিশ্বমানবের প্রতি আহ্বান জানাইলেন ন্যায়নিষ্ঠ মানবতার।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এই সকল ভাষণে পরিষ্কার কোনো সমাধান দিতে পারিলেন না। তিনি দেখিতেছেন, মহাযুদ্ধের এই ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যে মানুষ তাহার শুভবুদ্ধি ও মানবতাবোধকে ফিরিয়া পাইবে, এবং তারপর শুরু হইবে এক নূতন যুগ।

যাহাই হউক, ন্যাশনালিজ্‌ম্, যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদকে রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করুন না কেন, পৃথিবীর সেই দুর্যোগ মুহূর্তে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র জাতীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে অবিরাম আপসহীন সংগ্রামের বার্তাবহ হিসাবে তাঁহার Nationalism গ্রন্থখানি এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকারের বক্তব্য স্মরণযোগ্য। একস্থানে তিনি লিখিতেছেন,

"...কবির ন্যাশনালিজ্‌ম্-বিরোধী বক্তৃতাগুলি লইয়া জাপানে, আমেরিকায় ও য়ুরোপে যেরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, বোধহয় তাঁহার আর-কোনো গ্রন্থ সম্বন্ধে তাহা হয় নাই। 'ন্যাশনালিজ্‌ম্' গ্রন্থ ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়, ফরাসীদেশে ইহার অনুবাদ হয় অনেক পরে। শোনা যায়, যুদ্ধের মধ্যে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে টাইপকরা কপি সৈনিকদের মধ্যে চালাচালি হইত। Max Plowman নামে একজন তেজস্বী ইংরেজ যুবক ১৯১৪ সালে যুদ্ধে যোগদান করেন, কিন্তু ১৯১৭ সালে 'ন্যাশনালিজ্‌ম্' পাঠ করিয়া তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। তিনি যুদ্ধ করিবেন না স্থির করায় সমরবিভাগীয় শাস্তি তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,

"What to do when the personal application of such words came home to me, I did not know, but what not to do was plain as a pikestaff, and in the moment of that recognition I had ceased from organised war for ever ?"

[রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড।। পৃঃ ৪৩৪-৩৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এইসময় ইউরোপে কবির এই 'ন্যাশনালিজ্‌ম্' বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া রোমাঁ রোলাঁ রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন। যুদ্ধের সূচনাতেই রোলাঁ তাঁহার বিখ্যাত 'Above the battle' পুস্তিকায় (১৯১৫) যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের শুভ বিবেকবুদ্ধির প্রতি আবেদন জানাইয়া-

ছিলেন। কিন্তু বিকারগ্রস্ত রণোন্মত্ত ইউরোপের সেকথা শুনিবার অবকাশ ছিল না। ফলে অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণায় রোলাঁ স্বদেশ হইতে স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন বরণ করেন। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজ্ম্‌বিরোধী বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া তিনি নূতন আশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার তখনও পরিচয় হয় নাই। তবুও কবির অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই রোলাঁ তাহার ভগ্নীকে দিয়া ঐ বক্তৃতাগুলির অংশবিশেষ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে এণ্ড্রুজ্ লিখিতেছেন,

"The lectures that were thus delivered in Tokio very soon reached Europe. The spiritual personality of Tagore, which was revealed in the midst of this war fever in Japan, through these lectures, at once appealed with sympathetic poignant force to Romain Rolland himself. Through his sister, he translated them into French and published them with an introduction of his own in the very centre of Europe in the midst of the struggle of nations. He declared that a new voice had arisen in the East proclaiming peace and goodwill to mankind and called upon Europe to listen to it with humility and awe."

[Rolland And Tagore. p. 13]

মহাযুদ্ধের শেষে রোলাঁ যখন চিন্তার স্বাধীনতার দাবিতে বুদ্ধিজীবীদের সংঘবদ্ধ করিবার আন্দোলন শুরু করিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের কথাই তাঁহার সর্বাগ্রে মনে আসিয়াছিল। যথাসময়ে আমরা এ আলোচনায় আসিব।

এই প্রসঙ্গে সর্বশেষে একটি কথা বলা দরকার।—রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক দিকটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেন না। স্মরণ থাকিতে পারে, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ও তিনি 'দেশের কথা' প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদ ও প্যাট্রিয়টিজ্মের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

॥ মহাযুদ্ধ-কালে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী ॥

চৈত্রের প্রথমভাগেই রবীন্দ্রনাথ জাপান ও আমেরিকা ঘুরিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন (৪ঠা চৈত্র ১৩২৩ ॥ ১৭ই মার্চ ১৯১৭)।

ইতিমধ্যেই তাঁহার জাতীয়তাবাদবিরোধী বক্তৃতাগুলি এদেশের সংবাদপত্রে আংশিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, এদেশের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও কবির বক্তৃতাগুলির যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তাঁহারা প্রায় সকলেই উহার বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাস পর্যন্ত প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভামঞ্চ হইতে কবির ঐ বক্তৃতাগুলির বিরূপ ও বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেন। এই সম্পর্কে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বেশ একটু বাদ-প্রতিবাদ চলে।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। মহাযুদ্ধের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষেও দেখা দিয়াছে। জিনিসপত্র দুর্মূল্য ও মহার্ঘ—দেশে দুঃখ কষ্টের সীমা নাই। মডারেটপন্থী ও চরমপন্থীরা যুদ্ধের সূচনা-কাল হইতেই ইংরাজ সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধজনিত প্রতিক্রিয়ায় ক্রমশই সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতে থাকেন। অপরদিকে, এই সময় সন্ত্রাসবাদীদেরও কার্যকলাপ তীব্রতর হইয়া উঠে। দেশের যুবশক্তি ক্রমশই সন্ত্রাসবাদের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। এই জাগ্রত যুবশক্তিকে নিষ্পিষ্ট করিবার জন্য 'ভারতরক্ষা আইনে'র জাঁতাকল দেশের বুকে প্রবলভাবে চাপিয়া বসে; এক বাংলাদেশেই ১২০০ শতের অধিক যুবক এই আইনের কবলে পড়িয়া অন্তরায়িত কিংবা নির্বাসিত হইলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে তিলক Home Rule League প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রায় ছয় মাস পরে (সেপ্টেম্বর ১৯১৬) অ্যানি বেসান্তও অপর একটি হোম রুল লীগ (পরে ইহার নামকরণ হয় All-India Home Rule League) স্থাপন করেন। চরমপন্থীরা তিলক ও বেসান্তের নেতৃত্বে ক্রমশই 'হোম রুলে'র দাবিকে তীব্র ও প্রবল করিয়া তুলিতে লাগিলেন। অবস্থা বুঝিয়া মডারেটপন্থীরাও উহাতে কিছুটা সায় দিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে, দীর্ঘ নয় বৎসর পরে কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ-অধিবেশনে (১৯১৬) মডারেটপন্থী ও চরমপন্থীরা পুনরায় মিলিত হন। মুসলিম লীগও কংগ্রেসের সহিত

সমানতালে চলিতে লাগিল। এই লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসেই কংগ্রেস ও লীগের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে ঐতিহাসিক Congress-League Scheme of Reforms পাস হয়। সেই পরিকল্পনার মুখবন্ধের একস্থানে বলা হইয়াছে,

"(a)...the time has come when His Majesty the King-Emperor should be pleased to issue a Proclamation anouncing that it is the aim and intention of British policy to confer Self-Government on India at an early date.

"(b) That the reconstruction of the Empire, India shall be lifted towards Self-Government by granting the Reforms contained in the scheme prepared by the All-India Congress Committee in concert with the Reform Committee appointed by the All-India Muslim League."
[The History of the Indian National Congress : Vol. I. p. 623]

এদিকে মিসেস্ বেশান্তের উচ্চ কণ্ঠস্বর ও সাংগঠনিক তৎপরতায় ইংরাজ সরকার আতঙ্কিত হইয়া উঠিতে থাকে। ফলে অ্যানি বেশান্ত অন্তরীণাবদ্ধ হইলেন (১৫ই জুন ১৯১৭)। এই সংবাদে সারা দেশ বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। কংগ্রেসের বিভিন্ন মহল হইতেও ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হইল। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া সংবাদপত্রে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন এবং ঐ সাথে বেশান্তের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন।

দেশের সমগ্র পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া কবি কিছুদিন পরে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি রচনা করেন এবং কয়েক দিন পর তাহা কলিকাতায় আলফ্রেড থিয়েটারে পাঠ করেন (১১ই আগস্ট ১৯১৭)। এই প্রবন্ধে তিনি প্রথমেই ভারতের জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের (self-determination) দাবি ঘোষণা করিলেন,

"মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার।

"আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, 'তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।'

"আর যাই হোক, মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীন কর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত

নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয়, তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।...

"এর চেয়েও একটা বড়ো কথা আমাদের বলিবার আছে, সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয়।...অতএব ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব; দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।"

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুক্ষেত্রে এই দাবি জানাইলেও তাঁহার আমেরিকায় প্রদত্ত 'Nationalism in India' ভাষণে ঠিক এই ধরনের দাবি জানাইতে পারেন নাই। হয়ত উগ্র ন্যাশনালিজ্‌ম্‌বিরোধী সংগ্রামের আত্যন্তিক ঝোঁকের মুখে ভারতের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবির তাৎপর্যটি তিনি লঘু করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়ত, এদেশের ধর্মতন্ত্র ও সামাজিক নিগ্রহের বিরুদ্ধেও তিনি এই প্রবন্ধে আক্রমণ চালাইলেন। তিনি বলিলেন,

"সত্য দেখা দিল বলিয়াই আজ এতটা জোর করিয়া বলিতেছি যে, দেশের যে আত্মাভিমানে আমাদের শক্তিকে সম্মুখের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি সাধু, কিন্তু যে আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল খোঁটায় আমাদের বলির পাঁঠার মতো বাঁধিতে চায় তাকে বলি ধিক্! এই আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্বসভায় আমাদের আসন পাতা চাই; আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি 'খবরদার! ধর্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, এমনকি ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না'— ইহাকেই বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে, আর-এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।"

প্রসঙ্গক্রমে তিনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিলেন, "সমাজের সকল বিভাগেই ধর্মতন্ত্রের শাসন এক সময় য়ুরোপেও প্রবল ছিল। তারই বেড়া-জালটাকে কাটিয়া যখন বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লম্বা করিয়া পা ফেলিতে পারিল।...

"আজ য়ুরোপের ছোটো বড়ো যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে, সর্বত্রই ধর্মতন্ত্রের অন্ধ কর্তৃত্ব আলগা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করাইয়া দিলেন, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। তিনি ধর্মতন্ত্র বলিতে পুরোহিততন্ত্র ও হিন্দুসমাজের কুসংস্কার পূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-বিধানকেই বুঝাইতেছেন। আমাদের সামাজিক কুসংস্কারের উদাহরণ দিতে গিয়া তিনি (তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে) একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন,

"আমি জানি, একদিন একজন রাজা কলিকাতায় আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাঁর তিনি কলেজে পাস-করা সুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা সারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এমন সময় বাড়ি যাঁর তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন; বলিলেন, 'আপনার মুখে পান!' গাড়ি যাঁর তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথি মুসলমান। এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই নাই, 'সারথি যেই হোক্, মুখের পান ফেলা যায় কেন?' ধর্মবুদ্ধিতে বা কর্মবুদ্ধিতে কোথাও কিছুমাত্র আটক না খাইলেও গাড়িতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে দেশের মানুষ অনায়াসে বর্জন করিতে প্রস্তুত, সে দেশের লোক স্বাধীনতার অন্ত্যেষ্টিসৎকার করিয়াছে। অথচ দেখি, যারা গোড়ায় কোপ দেয় তারাই আগায় জল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত।"

প্রাচীনদের জন্য রবীন্দ্রনাথের দুঃখ নাই; তাঁহার দুঃখ এই যে, আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরাও এই কুসংস্কারের ভূতটা কাঁধে লইয়া মাতামতি করিতেছে,

"...এরা এখনও সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে বুড়ি এদের জাতিকুল ধর্মকর্ম ভালোমন্দ শোওয়াবসা সমস্তই বাহির হইতে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারি না, কেননা বুড়ি এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি, কলেজের তরুণ ছাত্রেরাও সেই বুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। ভারতবর্ষকে সনাতন ধাত্রীর কাঁখে চড়িতে দেখিয়া ইঁহাদের ভারি গর্ব; বলেন, ওটা বড়ো উচ্চ জায়গা, ওখান হইতে মাটিতেই পা পড়ে না। বলেন, ওই কাঁখে থাকিয়াই আত্মকর্তৃত্বের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড়ো শোভা হইবে।"

ক্রুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ যেন গর্জন করিয়া উঠিলেন,

"...যত রাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করাই আমাদের গৌরবের কথা হয়, তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলিতে হয়, 'এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার জন্য দল বাঁধো।' কিন্তু দুই বিপরীত কূলকে এক সঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেরই নাই।..."

অপরদিকে, রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর প্রতি ইউরোপীয় সভ্যতার মহত্তম অবদান-গুলি গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইলেন। তিনি বলিলেন,

"...ইংরেজের সেই অন্যায়ের গোপন লজ্জা আর আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকাশ্য সাহস—এই দুয়ের মধ্যে মিল করিতে হইবে। ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যে বদ্ধ; ইংরেজ য়ুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্বদেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি-বাণী। সেই দলিলকেই আমরা সবচেয়ে বড়ো দলিল করিয়া চলিব; একথা তাকে কথনোই বলিতে দিব না যে 'ভারতবর্ষকে আমরা টুকরা টুকরা করিয়া মাছ-কাটা করিবার জন্যই সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি।'

"...য়ুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্বলাভ। এই সম্পদ, এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিধিদত্ত রাজপরোয়ানা।..."

ভারতবর্ষের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের নানা গলদ ও দোষক্রটি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের আত্মকর্তৃত্বের দাবিটি উত্থাপন করিতে ছাড়িলেন না। পরিশেষে ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন,

"...আমাদের চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্তৃশক্তির বিশেষ অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই বিশেষ দরকার কর্তৃত্বের চর্চা।...

"...মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে, তার পরে সুযোগ পাইবে, এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির দেমাক করিতেছ! কিন্তু য়ুরোপের জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎসতা আছে—সেসব কুৎসার কথা ঘাঁটিতে ইচ্ছা করে না। যদি কোনো কর্ণধার বলিত এই সমস্ত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ডিমক্রেসি তার কোনো অধিকার পাইবে না, তবে বীভৎসতা তো থাকিতই, আবার সেই পাপের স্বাভাবিক প্রতি-কারের উপায়ও চলিয়া যাইত।

"তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায় দুর্বলতা যথেষ্ট আছে, সে কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই।...আজ মনুষ্যত্বের দেয়ালি-মহোৎসবে কোনো দেশই তার সব বাতি পুরা জ্বালাইয়া উঠিতে পারে নাই, তবু উৎসব চলিতেছে। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছু কাল হইতে নিবিয়া গেছে; তোমাদের শিখা হইতে যদি ওটাকে জ্বালাইয়া লইতে যাই তবে তা লইয়া রাগারাগি করা কল্যাণের নহে। কেননা, ইহাতে তোমাদের আলো কমিবে না, এবং উৎসবের আলো বাড়িয়া উঠিবে।"

[কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—কালান্তর ।। পৃঃ ৪৯-৭৪]

রবীন্দ্রনাথের ভাষা রাজনীতির ভাষা নহে, তবুও এতখানি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতের জাতীয় সমস্যাকে দেখিতে সমকালীন কোনো দেশনেতাকে দেখা যায় না। গান্ধীজী সবরমতী আশ্রমে 'অস্পৃশ্য'দের আশ্রয় দিলেন বটে, কিন্তু সনাতনবাদ কিংবা সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম তিনি করিতে চাহেন নাই। পরন্তু গান্ধীজী কতকগুলি সংস্কারকে জিয়াইয়া রাখিবারই চেষ্টা করিলেন। সর্বোপরি, গান্ধীজী ছিলেন আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঘোরতর বিরোধী। অথচ রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার মর্মবাণীটিকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন।

বিস্ময়ের কথা, রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণটির তীব্র সমালোচনা করিয়া বিপিনচন্দ্র এইসময় 'বুদ্ধিমানের কর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ (নারায়ণ, ১৩২৪ ভাদ্র-কার্তিক) লিখেন। বিপিনচন্দ্রের অভিযোগ, রবীন্দ্রনাথ ভারতের ধর্মসাধকদের ধর্মসাধনার মহান ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ না করিয়া শুধু অশিক্ষিত জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের সমালোচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আধ্যাত্ম সাধনার পথে ভারতের ধর্মসাধকদের বাণীকে ভিন্ন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাছাড়া, ঐ ভাষণে তিনি ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্যও দেখাইয়াছিলেন।

কিন্তু আসল কথা, এই সময় চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিন্দু রক্ষণশীলতার নব নব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের পৃষ্ঠপোষকতায় 'নারায়ণ' পত্রিকার অভ্যুদয়ও (১৩২১ অগ্রহায়ণ) এই কারণেই। বেশ কিছুকাল হইতে এই পত্রিকার মাধ্যমে চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র একাধারে ব্রাহ্মধর্ম এবং রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল মতবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই নারায়ণ পত্রিকা হিন্দু রক্ষণশীল মহলে সমাদৃত হইল। রবীন্দ্রনাথ দেশের নেতৃবর্গের মধ্যে এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণায় অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতে থাকেন।

এদিকে দেশের যুবকদের উপর পুলিসের অত্যাচার ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে কিছুকাল পূর্বে বেসান্তের প্রতি সরকারের অন্তরীণ আদেশের প্রতিবাদ জানাইয়া রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন। বিলাতের কোনো বন্ধু উহা পাঠ করিয়া কবিকে এক পত্র দেন। কবি উহার জবাবে বিখ্যাত দৈনিক 'বেঙ্গলি'তে একখানি খোলা-চিঠি প্রকাশ করিলেন (৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১৭)। বাংলার যুবশক্তিকে দমন করিবার জন্য সেদিন চারিদিকে ইংরাজ সরকার যে

অত্যাচারের বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ এই খোলা-চিঠিতে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন। কবি লিখিয়াছিলেন,

"In your letter you seem puzzled at my conduct in sending a message of sympathy to Mrs. Besant, who has been interned for public utterances here. I am afraid compared with yours, our troubles may appear to you too small, but yet sufferings have not lost their keenness for us and moral problems still remain as the gravest of all problems in all parts of the world. The constant conflict between the growing demand of the educated community of India for a substantial share in the administration of their country, and the spirit of hostility on the part of the Government, has given rise among a considerable number of our young men to methods of violence bred of despair and distrust. This has been met by the Government, by a thorough policy of repression. In Bengal itself hundreds of men are interned without trial—a great number of them in unhealthy surroundings in jails and in solitary cells, in a few cases driving them to insanity or suicide. The misery that is carried into numerous households is deep and widespread, the greatest sufferers being women with their children who are stricken at heart and rendered helpless.

"I do not wish to go into details, but as a general proposition I can safely say that the whole evidence against them the opportunity to defend themselves, we are justified in thinking that a large number of those punished are innocent, many of whom were specially selected as victims by secret spies only because they had made themselves generously conspicuous in some noble mania of selfsacrifice....In this crisis the only European who shared our sorrow, incurring the anger and derision of her countrymen, is Mrs. Annie Besant. This was what led me to express my grateful admiration for her noble courage in this present time when it is particularly dangerous to be on the side of humanity against blind expediency. Possibly there is such a thing as political exigency,...but as a man, I pay my homage to those who have faith in ideals and therefore are willing to take all other risks except that of weakening the foundation of moral responsibility." [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৪৬১-৬২]

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদলিপি সারা দেশের লাঞ্ছিত যুবশক্তির মধ্যে এক প্রবল উদ্দীপনা ও সাহসের সঞ্চার করিল। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করিলেন না, কিন্তু বাংলার এই সকল আদর্শনিষ্ঠ নির্ভীক বীরসন্তানের প্রতি তিনি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে ভুলিলেন না।

এই সময় কবি 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি রচনা করেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বেশান্ত ও তাঁহার সহকর্মীদের প্রতি অন্তরীণ-আদেশের প্রতিবাদে প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রাহ্মণ্য আয়ার তাঁহার 'স্যর' উপাধি (knighthood) পরিত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে অ্যানি বেশান্তের উপর হইতে অন্তরীণাদেশ প্রত্যাহার করা হইল। মুক্তিলাভ করিয়াই তিনি কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কলিকাতায় তখন দারুণ রাজনৈতিক উত্তেজনা। অল্পকাল আগেই বিলাতের পার্লামেণ্টে মণ্টেগু ভারতশাসনের সংস্কার-পরিকল্পনার আভাস দেন (২০শে আগস্ট ১৯১৭)। মণ্টেগুর ঘোষণার ফলে সারা দেশে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। একদিকে মডারেটপন্থীরা উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, অপরদিকে চরমপন্থীরা অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে প্রস্তাবটির বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন। সুতরাং উভয়পক্ষই কনফারেন্সের প্রস্তুতির জন্য নিজ নিজ দল ভারি করিতে লাগিলেন। চরমপন্থীরা ক্রমশই কংগ্রেসে প্রধান্য লাভ করিতেছিলেন। তাঁহারা আগামী কলিকাতা-কনফারেন্সের সভাপতিপদের জন্য অ্যানি বেশান্তের নাম প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মডারেটপন্থীরা আপত্তি তুলিলেন। ফলে উভয়পক্ষেই মনকষাকষি চলিতে থাকে। এই সময় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিপদ লইয়া মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন,

"...সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেটগণ বহরমপুরের প্রখ্যাতনামা বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিপদে নির্বাচিত করিতে চাহেন। কিন্তু নবীন জাতীয়তাবাদী দল ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাহাতে সম্মত হইলেন। এইরূপে দুই দলে মতভেদ হইয়া উঠিল, তখন সৌভাগ্যক্রমে একটা আপসের ব্যবস্থা হইল। মডারেট দল মিসেস অ্যানী বেশান্তকে সভানেত্রীরূপে স্বীকার করিয়া লইলেন। রবীন্দ্রনাথও শেষ মুহূর্তে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের অনুকূলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে যোগ দেন এবং 'জাতীয় প্রার্থনা' পাঠ করেন।" [জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ॥ পৃঃ ৯৮]

মণ্টেগুর ঘোষণা লইয়া সারা দেশে যখন উত্তেজনা ও আলোচনা চলিতেছে, তখন অকস্মাৎ বিহারের শাহাবাদ জেলায় এক ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিল (সেপ্টেম্বর ১৯১৭)। বকর-ঈদের সময় হিন্দুরা বলপূর্বক গো-কোরবানি বন্ধ করিবার চেষ্টা করে; ইহা হইতেই দাঙ্গার সূত্রপাত। অল্পকালের মধ্যেই দাঙ্গা জেলার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। ইতিপূর্বে এমন ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দেখা যায় নাই।

দেশের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই সময় 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধটি রচনা করেন (প্রবাসী, ১৩২৪ অগ্রহায়ণ), এবং অল্পকাল পরে কলিকাতায় তিনি প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বিহারের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন,

"...হোমরুলের প্রবল মৈসুম হাওয়া আরব-সমুদ্র পাড়ি দিয়াছে, মুষলধারে বৃষ্টি নামিল বলিয়া; ঠিক সেই সময়েই মুষলধারে নামিল বেহার অঞ্চলে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের একটা হাঙ্গামা।

"অন্য দেশেও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ লইয়া মাঝে মাঝে তুমুল দ্বন্দ্বের কথা শুনি। আমাদের দেশে যে বিরোধ বাধে সে ধর্ম লইয়া, যদিচ আমরা মুখে সর্বদাই বড়াই করিয়া থাকি যে, ধর্ম বিষয়ে হিন্দুর উদারতার তুলনা জগতে কোথাও নাই।..."

তিনি বলিলেন,

"এ কথা মানিতেই হইবে, আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর-কিছু নয়।...অহিংসাকে যদি ধর্ম বল, তবে সেটাকে কর্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য বলিয়া ব্যবহারে না মানিতে পারি, কিন্তু বিশুদ্ধ আইডিয়ালের ক্ষেত্রে তাহাকে স্বীকার করিয়া ক্রমে সেদিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে।...নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর-কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচার-প্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো-একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।"

আমাদের পরাধীনতাই যে এই ধরনের ভুল বোঝাবুঝি ও দাঙ্গার মূল কারণ, এই সত্যটিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইল না। তাই তিনি বলিলেন,

"আমাদের নালিশটাই যে এই—কর্তৃত্বের দায়িত্ব আমাদের হাতে নাই, কর্তা বাহির হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। ইহাতে আমরা ক্রমশই অন্তরের মধ্যে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইতেছি ;···কর্তৃত্ব যদি থাকিত তবে তাহাকে বজায় রাখিতে ও সার্থক করিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সমান গরজ থাকিত, সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার দায়িত্ব সকলে মিলিয়া অতি সাবধানে বহন করিতে হইত। এমনি করিয়া শুধু আজ নহে, চিরদিনের মতো ভারতবর্ষের পোলিটিকেল আশ্রয় নিজের ভিত্তিতে পাকা হইত।"

লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এযাবৎ আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের গোঁড়ামিকেই হিন্দুমুসলমান-বিরোধের মূল কারণ নির্দেশ করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসাবে সেই সকল গোঁড়ামিকে নির্মূল করিবার নির্দেশ দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্বটি উপলব্ধি করিয়া সামগ্রিক দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সমস্যাটি বিশ্লেষণ করিলেন।

ঐ প্রবন্ধে তারপর তিনি মণ্টেগুর খসড়া-পরিকল্পনা সম্পর্কে বলিলেন,

"এই রকম চোরা উৎপাতের সময় সমুদ্রের ওপার হইতে খবর আসিল, আমাদিগকে দান করিবার জন্য স্বাধীন শাসনের একটা খসড়া তৈরি হইতেছে। মনে ভাবিলাম, কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন যে, শুধু দমনের বিভীষিকায় অশান্তি দূর হয় না, দাক্ষিণ্যেরও দরকার।···এই কথা যে ইংলণ্ডের মনীষী রাষ্ট্রনৈতিকেরা বুঝিতেছেন না তাহা আমি মনে করি না। বুঝিতেছেন বলিয়াই হোম রুলের কথাটা উঠিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, 'বড়ো-ইংরেজ' অর্থাৎ ইংলণ্ডের উদারচেতা শাসক-সম্প্রদায় আমাদের জন্য সত্যই কিছু দিতে চান, কিন্তু মাঝখানে 'ছোটো-ইংরেজ' অর্থাৎ ভারতের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আমলাতান্ত্রিক শাসকসম্প্রদায় এইসব শাসন-সংস্কারের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বলিলেন,

"বড়ো-ইংরেজ অব্যবহিতভাবে ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না—সে মাঝখানে রাখিয়াছে ছোটো-ইংরেজকে। এইজন্য বড়ো-ইংরেজ আমাদের কাছে সাহিত্যে—ইতিহাসের ইংরেজি পুঁথিতে। এবং ভারতবর্ষ বড়ো-ইংরেজের কাছে আপিসের দফ্‌তরে এবং জমা-খরচের পাকা খাতায়, অর্থাৎ ভারতবর্ষ তার কাছে স্তূপাকার স্ট্যাটিস্টিক্সের সমষ্টি।···কিন্তু, সৃষ্টি তো শুধু নীলাকাশ-জোড়া অঙ্কের তালিকা নয়। সেই অঙ্কমালার চেয়ে অনেক বেশির হিসাবটা ভারত-আপিসের কোনো ডিপার্ট্‌মেণ্ট দিয়া কোনো মানবজীবের কাছে গিয়া পৌঁছায় না।

"কিন্তু ছোটো-ইংরেজ অগ্রসর হইয়া চলে না।···ভারত-অধিকারের গোড়ায় ইহারা সৃজনের কাজে রত ছিল, কিন্তু তাহার পর দীর্ঘকাল ইহারা পাকা সাম্রাজ্য ও পাকা বাণিজ্যকে প্রধানত পাহারা দিতেছে ও ভোগ করিতেছে।···"

এইজন্য রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন,

"অতএব, ওরে মরীচিকালুব্ধ দুর্ভাগা, বড়ো-ইংরেজের কাছ হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া বর আসিতেছে, কেবল এই আশাটাকে বুকে করিয়াই পশ্চিমের ঘাটের দিকে অত বেশি কলরব করিতে করিতে ছুটিয়ো না। এই আশঙ্কাটাকেও মনে রাখিয়ো যে, ভারতসাগরের তলায় তলায় ছোটো-ইংরেজের মাইন সার বাঁধিয়া আছে। এটা অসম্ভব নয় যে, তোমার ভাগ্যে জাহাজের ভাঙা কাঠ আছে সেটা স্বাধীনশাসনের অন্ত্যেষ্টিসৎকারের কাজে লাগিতে পারে।···"

অর্থাৎ, মণ্টেগুর সংস্কার-পরিকল্পনায় কবীর এতটুকু আস্থা ও মোহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিতে চরমপন্থার ঘোরতর বিরোধী। এই প্রবন্ধে তিনি যেমন একদিকে ইংরাজের সন্ত্রাসমূলক দমননীতিকে তীব্র আক্রমণ করিলেন, অপরদিকে তেমনি দেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লববাদের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিলেন,

"···বিনা বিচারে শত শত লোককে বন্দী করার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে একখানি ছোটো চিঠি লিখিয়াছিলাম। ইহাতে ভারতজীবী কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল। ইঁহারা ভারতশাসনের তকমাহীন সচিব, সুতরাং আমাদিগকে সত্য করিয়া জানা ইঁহাদের পক্ষে অনাবশ্যক, অতএব আমি ইঁহাদিগকে ক্ষমা করিব।"

তিনি আরও বলিলেন,

"···স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয়পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি।···দিশি বা বিলিতি যে-কোনো কালিতেই হোক-না আমার নিজের নামে কোনো লাঞ্ছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে পন্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই এক্‌স্‌ট্রিমিজ্‌ম্‌ বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সেকথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি; সেইজন্যই আমি জোরের সঙ্গেই বলিবার অধিকার রাখি যে, এক্‌স্‌ট্রিমিজ্‌ম্‌ গবর্মেণ্টের নীতিতেও অপরাধ। আইনের রাস্তা বাঁধা রাস্তা বলিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বেলজিয়ামের বুকের উপর দিয়া সোজা হাঁটিয়া রাস্তা সংক্ষেপ করার মতো এক্‌স্‌ট্রিমিজ্‌ম্‌ কাহাকেও শোভা পায় না।"

বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে কবি সেই একই যুক্তি দিলেন,

"…বাংলাদেশের একদল বালক ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশীর সত্য যোগসাধনের বাধা-অতিক্রমের যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি।…পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ মিশানোর মতো মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। আমরাও শিখিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে বসাইয়া ধর্ম লইয়া টিকটিক করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্বলতা, ইহা সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্—বর্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে এবং অধর্মকে দিয়াই ধর্মকে মজবুত করা চাই।…"

উপরে উদ্ধৃত অংশটিতে রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের বীরসন্তানদের কঠোর আদর্শনিষ্ঠা ও মহান আত্মত্যাগের প্রতি তিনি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে কখনোই ভুলেন নাই। তাই সেই সঙ্গে তিনি লিখিলেন,

"কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।…আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে, বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গম পথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই…। আত্মঘাতী শচীন্দ্রের অন্তিমের চিঠি পড়িলে বোঝা যায় যে, এ ছেলেকে যে ইংরেজ সাজা দিয়াছে সেই ইংরেজের দেশে এ যদি জন্মিত তবে গৌরবে বাঁচিত এবং ততোধিক গৌরবে মরিতে পারিত।…দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিসের গুপ্ত দলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া—এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি? এ-যে পাপকে হীনতাকে রাজপেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া।…"

ইহা হইতেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ বাংলার মুক্তিপাগল বীর যুবক-তরুণদের কী অপরিসীম দরদ দিয়া ভালোবাসিতেন। স্মরণ থাকিতে পারে, এই সময় বাংলাদেশে পুলিসী অত্যাচার এক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই অত্যাচারের ফলে কত যে ছেলে অকালে মারা যায়, কত ছেলে যে পাগল হইয়া যায়, তাহার

ইয়ত্তা নাই। রংপুরের উকিল যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্তের পুত্র শচীন্দ্র পুলিসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া অন্তরীণ-অবস্থায় গৃহে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পিতাকে যে চিঠি লিখিয়া যান, তাহা যেমনই বেদনাদায়ক, তেমনি মর্মান্তিক। দেশে পুলিসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবি এই প্রবন্ধে আরও বলিলেন,

"আর-একটা সর্বনাশ এই যে, পুলিস একবার যে চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে চারায় কোনো কালে ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে। আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি তেমনি বিদ্যা, তেমনি চরিত্র ; পুলিসের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণ বয়সে উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলা গারদে জীবন কাটাইতেছে।…পুলিসের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক।… আর বেশি কিছু করিবার দরকার নাই ; উহাদের নিশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে। উহাদের খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল।…"

বাংলার 'হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া'দের জন্য এতখানি দরদভরা সহানুভূতি সেদিন আর কোনো দেশনেতার কাছ হইতে আসিল না। স্বয়ং গান্ধীজীর নিকট হইতেও নহে। ঘরে ও বাইরে ইহারা সেদিন পাইয়াছে শুধু নিন্দা ও ভর্ৎসনা।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুনরায় স্বাধীন শাসনের দাবি জানাইলেন। তিনি বলিলেন,

"যদি জিজ্ঞাসা কর, এই দুষ্ট সমস্যার মূল কোথায় তবে বলিতেই হইবে— স্বাধীন শাসনের অভাবে …।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট সমস্যা আরও গভীরে। ভারতের ইংরাজ শাসন সম্পর্কে তিনি বলিলেন,

"শত বৎসর ধরিয়া মানুষ মানুষের কাছে আছে অথচ তার সঙ্গে মানবসম্বন্ধ নাই, তাকে শাসন করিতেছে অথচ তাকে কোনোমতেই আত্মীয় করিতেছে না, পূর্বধরণীর প্রাচীর ভাঙিয়া পশ্চিম একেবারে তার গোলাবাড়ির ভিতরে আসিয়া পড়িল অথচ এ মন্ত্র ছাড়িল না যে 'never the twain shall meet'—এত বড়ো অস্বাভাবিকতার দুঃখকর বোঝা বিশ্বে কখনোই অটল হইয়া থাকিতে পারে না। যদি ইহার কোনো স্বাভাবিক প্রতিকার না থাকে তবে একটা ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির পঞ্চমাঙ্কে ইহার যবনিকাপাত হইবে।…"

পৃথিবীর সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্যোগ মুহূর্তে আশাবাদী কবি দৃপ্তকণ্ঠে তাঁহার আদর্শ ও স্বপ্নের কথা ঘোষণা করিলেন,

"বর্তমানের চেহারা যেমনি হোক্, তবু এই আশা, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিয়াছি যে, পশ্চিম পূর্বের সহিত মিলিবে।...পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন যে মারিতে পারিবে তার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে।...এই মহত্ত্ব প্রমাণ করিবার ভার আমাদের উপর আছে। পূর্বপশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আই-ডিয়ালের উপর হইবে। তাহা...কামান বন্দুক এবং রণতরীর উপরও হইবে না। দুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, মৃত্যুকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, তবে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সহায় হইবেন।" [ছোটো ও বড়ো—কালান্তর ।। পৃঃ ৭৮-১০৭]

এই বক্তৃতার কয়েকদিন পরই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন চলিয়া যান। স্মরণ থাকিতে পারে, এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কারের জন্য স্যাডলার-কমিশন নিযুক্ত হয়। স্যাডলার-কমিশনের সদস্যগণ শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই কমিশনের সমক্ষে তাঁহার শিক্ষাসম্পর্কীয় মতামত জানান। উহার সারমর্ম কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। নানা দিক দিয়া উহা গুরুত্বপূর্ণ।

"It is Sir Rabindranath's conviction that, while English should be skilfully and thorough taught as a second language, the chief medium of instruction in schools (and even in colleges up to the stage of University degree) should be the mother tongue.... He holds that the essential things in the culture of the West should be conveyed to the whole Bengali people by means of a widely diffused education, but that this can only be done through a wider use of the vernacular in the schools. Education should aim at developing the characteristic gifts of the people, especially its love of recited poetry and of the spoken tale, its talent for music, its (too neglected) aptitude for expression through the work of the hand, its power of imagination, its quickness of emotional response. At the same time education should endeavour to correct the defects of the national temperament, to supply what is wanting in it, to fortify what is weak, and not least to give training in the habit of steady co-operation with others in the alert use of opportunities for social betterment, in the practice of methods of organisation for the collective good." [রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৪৬৮-৬৯]

ইতিমধ্যে ভারতসচিব মণ্টেগু ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া ভারত শাসন-

সংস্কার সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে মণ্টেগু কলিকাতায় আসেন। শোনা যায়, দেশের অবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট একখানি দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, কবি এই পত্রে নাকি দেশের জমিদারি প্রথা বিলোপের পক্ষে তাঁহার মতামত জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আজও পর্যন্ত এই পত্রটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই, রবীন্দ্রজীবনীকারও এসম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য সরবরাহ করিতে পারেন নাই।

ডিসেম্বরের শেষভাগে (১৯১৭) কলিকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন। অ্যানি বেশান্ত সভানেত্রী। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে যোগদান করেন। কংগ্রেসের উদ্বোধন সঙ্গীতের পরই কবি তাঁহার বিখ্যাত 'India's Prayer' আবৃত্তি করিলেন।

কিন্তু এই কলিকাতা-অধিবেশনে কংগ্রেসের নীতির তেমন কিছু উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন হইল না। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, সকলেই মণ্টেগুর ভারতসফরে আশা ও আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এবং সকলেই তাঁহারা যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করিবার প্রশ্নে অটল রহিলেন। ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া এই অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে,

"This Congress, speaking on behalf of tne united people of India, begs respectfully to convey to His Majesty the King-Emperor their deep loyalty and profound attachment to the throne, their unswerving allegiance to the British connection, and their firm resolve to stand by the empire at all hazards and at all costs." [Mahatma : Vol. I. p. 266]

মিসেস্ বেশান্ত তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে একদিকে যেমন পুনরায় হোম রুলের দাবি উত্থাপন করিলেন, অপরদিকে তেমনি যুদ্ধে ইংরাজপক্ষকে সমর্থন করিলেন। এমনকি তিলকও যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের কাজ সমর্থন করেন। গান্ধীজী তখনও কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন নাই, তিনি তখনও চম্পারনের নীল-কৃষকদের সংগ্রাম লইয়া ব্যস্ত। মোট কথা, দেশে কোথাও আশার আলো দেখা গেল না—নেতারা প্রায় সকলেই তখন বিভ্রান্ত।

এই সময়ই রবীন্দ্রনাথ 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' প্রবন্ধটি লিখিলেন (১৩২৪ মাঘ)। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একটি সঠিক পরিপ্রেক্ষিত দিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন,

"...একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্যা আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড়ো ঘটনা; কারণ পূর্ব ও পশ্চিম

আপন অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করিবে, আজ পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।..."

তিনি আরও বলিলেন,

"এই পশ্চিমের বিদ্যালয়ে নিজের জাতির সত্তাকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া অনুভব করিতে শেখায়—এই শিক্ষায় যে স্বাদেশিকতা জন্মে তার ভিত্তি অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ পার্থক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত।...

"আজ পশ্চিম মহাদেশের লোক হঠাৎ পৃথিবীর সকল জাতির সংস্রবে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মহৎ ঘটনার জন্য তার ধর্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। তাই ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য আজ বিধ্বস্ত, চীন বিষে জীর্ণ, পারস্য পদদলিত ; তাই কঙ্গোয় য়ুরোপীয় বণিকের দানবলীলা এবং পিকিনে বক্সার যুদ্ধে য়ুরোপীয়দের বীভৎস নিদারুণতা দেখিয়াছি। ইহার কারণ, য়ুরোপীয়েরা স্বজাতিকেই সবচেয়ে সত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে।...

"আজ তাই এমন দিন আসিয়াছে যখন পশ্চিমের মানুষ নিজের ঘরের মধ্যেই বেশ করিয়া বুঝিতেছে, স্বাজাতিকতা বলিতে কী বুঝায়।...

"...তা হউক, এই সহজ সত্যটুকু তার ভালো করিয়াই জানা দরকার ছিল যে, মনুষ্যত্ব জিনিস একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। সেটাকে যখন কেহ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করে তখন শীঘ্রই হোক্, বিলম্বেই হোক্, তার আঘাত একদিন নিজের বক্ষে আসিয়া পৌঁছে।..."

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব ও পশ্চিমের আধ্যাত্মিক মিলনবাদ অলস ভাববিলাসীদের কোনো অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের কুজ্ঝটিকা নহে। যাহা হউক, এই প্রবন্ধে কবি পাশ্চাত্যসভ্যতার মহত্তম অবদানগুলিকে আত্মস্থ করিবারও আহ্বান জানাইলেন জাতির প্রতি। তিনি বলিলেন,

"...প্রকৃতি যে মানুষের পরিপূর্ণতালাভের পথে অন্তরায় নহে, প্রকৃতির সহিত সত্য ব্যবহার করিয়া তবেই আমাদের চিন্ময়কে রূপদান করিয়া তাহার বাস্তপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, য়ুরোপের প্রতি এই সত্য-প্রচারের ভার আছে।

"বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব-মোচনের কাজে লাগে, সেখানে তার দান বিশ্বজনের কাছে গিয়া পৌঁছায়, সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয় সেইখানেই তার ভয়ংকর পতন।...

"ঈর্ষার অন্ধতায় য়ুরোপের মহত্ত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না।..."

মণ্টেগুর ঘোষণা সম্পর্কে কবি বলিলেন,

"...ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না—কিছুতেই না। স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী।

"তপস্যার বলে আমরা সেই দানের অধিকার পাইব, ভিক্ষার অধিকার নয়, একথা যেন কোনো প্রলোভনে না ভুলি।...মণ্টেগুর ডাক খুব বড়ো ডাক, আজ এই কথা বলিয়া ভারতের সভা হইতে সভায়, সংবাদপত্র হইতে সংবাদপত্রে ঘোষণা চলিতেছে। কিন্তু এই ভিক্ষার ডাকে আমরা মানুষ হইব না।..."

[স্বাধিকারপ্রমত্তঃ—কালান্তর ।। পৃঃ ১১২-২১]

কিন্তু কী সেই তপস্যা ? রবীন্দ্রনাথ কী রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামের আহ্বান জানাইতেছেন ? বলা বাহুল্য, কবি বারবার এইখানেই আসিয়া থামিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার রাজনীতির দ্বিধা। এইখানেই তাঁহার আধ্যাত্মিকতা আসিয়া দেখা দিয়াছে। তিনি বলিতেছেন,

"...মানুষ যেহেতু মানুষ এই হেতু বস্তুর দ্বারা সে বাঁচে না। সত্যের দ্বারাই সে বাঁচে। এই সত্যই তাহার যে : তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ; তাঁহাকে জানিয়াই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার উদ্ধারের অন্য কোনো উপায় নাই। এই সত্যকে দান করিবার জন্য আমাদের উপর আহ্বান আছে।...আমাদের পিতামহেরা অমরলোক হইতে আমাদের আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন, 'তোমরা যে অমৃতের পুত্র এই কথা জানো এবং এই কথা জানাও ; মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে এই সত্য দান করো যে, কোনো কর্মপ্রণালীতে নয়, রাষ্ট্রতন্ত্রে নয়, বাণিজ্য ব্যবস্থায় নয়, যুদ্ধ-অস্ত্রের নিদারুণতায় নয়—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ।।"

[ঐ—কালান্তর ।। পৃঃ ১২১-২২]

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের জাত্যাত্মন্তরিতা ও সাম্রাজ্যবাদী লালসাকে দেখিতেছেন, দেশের আত্মকর্তৃত্বের দাবিও ঘোষণা করিতেছেন, কিন্তু কোথায়ও তিনি যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিরোধ-সংগ্রামের আহ্বান জানাইতে পারিলেন না, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামেরও পরিষ্কার নির্দেশ দিতে পারিলেন না।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রশ্নে কবি বারবার আশ্চর্য রকমের নীরবতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, জগতের যতকিছু অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারবার তিনি অবিরাম আপসহীন সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহার লেখনীর মাধ্যমে। এবং বিস্ময়ের কথা এই যে, এই কবি-মানুষটির রাজনৈতিক বিচার ও বিশ্লেষণ সেদিন যতখানি সঠিক হইয়াছিল, তদানীন্তন ভারতবর্ষের কোনো রাজনৈতিক নেতার বোধকরি তাহা হয় নাই।

ইহার ঠিক তিনমাস পরে দিল্লীতে War Conference আহ্বান করা হইল (এপ্রিল ১৯১৮)। ইংলণ্ডকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবার জন্য ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ভারতবাসীর প্রতি আহ্বান জানান; তাই এই War-Conference. এই সম্মেলনে তিলক ও অ্যানি বেশান্ত বাদে সারা ভারতে প্রায় সমস্তই ছোটো বড়ো নেতা আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন (অবশ্য আলি ভ্রাতাদ্বয় তখনও জেলে)। গান্ধীজীও ভাইসরয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। প্রায় সকলেই একবাক্যে যুদ্ধ সমর্থন করিলেন। গান্ধীজী বলিলেন যে, যদি তাঁহাকে হিন্দীতে বলিতে সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তিনি ভাষণ দিতে রাজি আছেন। ভাইসরয় তাহাতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু গান্ধীজী কোনো ভাষণ দিলেন না; হিন্দীতে শুধু একটিমাত্র বাক্যে যুদ্ধপ্রস্তাব সমর্থন করিলেন—"With a full sense of my responsibility I beg to support the resolution."

ইহার কয়েকদিন পরেই ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ডকে একটি চিঠিতে গান্ধীজী ব্রিটেনের উপর পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করিয়া এম্পায়ার রক্ষার জন্য সর্বশক্তিতে সহযোগিতা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঐ পত্রে ভাইসরয়কে তিনি লিখিলেন,

"I recognize that in the hour of its danger we must give, as we have decided to give, ungrudging and unequivocal support to the empire of which we aspire in the near future to be partners in the same sense as the dominions overseas....If I could make my countrymen retrace their step. I would make them withdraw all the Congress resolutions and not whisper 'Home Rule' or 'Responsible Government' during the pendency of the war. I would make India offer all her able-bodied sons as a sacrifice to the empire at its critical moment..."

[Mahatma : Vol. I. pp. 277-78]

যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করিবার আহ্বান জানাইয়া কিছুদিন পরে দেশবাসীর প্রতি গান্ধীজী বলিলেন,

"If we want to learn the use of arms with the greatest possible despatch, it is our duty to enlist ourselves in the army.... The easiest and straightest way, therefore, to win Swaraj is to participate in the defence of the empire. If the empire perishes, with it perish our cherished aspirations. Some say that if we do not secure rights just now, we would be cheated afterwards. The power acquired in defending the empire will be the power that can secure those rights," [Mahatma : Vol. I. p. 280]

গান্ধীজীর এই যুক্তি অদ্ভুত ও হাস্যকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, তখনও পর্যন্ত, তিনি সত্যসত্যই ব্রিটিশ 'এম্পায়ারে'র উপর পূর্ণ আস্থাবান। তাঁহার এই বক্তব্যে কোথায়ও কূটনীতি কিংবা ফাঁকি ছিল না। তাই তিনি শুধু বিবৃতি দিয়া কিংবা বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; স্বয়ং গুজরাটের খেদা জেলায় সৈন্য সংগ্রহ-অভিযান শুরু করিলেন। গান্ধীজীর জীবনীকার টেণ্ডুলকর তাই এই অধ্যায়টির নাম দিয়াছেন 'Recruiting Sergeant'। এই সৈন্যসংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে অচিরেই গান্ধীজী অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন।

শুধু গান্ধীজীই নয়, তিলকের মত উগ্র চরমপন্থীও তখন সৈন্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন। এই সময় তিনি গান্ধীজীকে ৫০,০০০৲ টাকার একটি চেক দিয়া বলিয়া পাঠান যে, গান্ধীজী যদি ভাইসরয়ের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে পারেন যে, ভারতীয় সৈন্যদের 'কমিশনড্ র‍্যাঙ্ক' (commisioned rank) উন্নীত বা নিয়োগ করা হইবে, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং মহারাষ্ট্র হইতে পাচ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিবেন। তদুত্তরে গান্ধীজী তিলককে সেই চেক ফেরত পাঠাইয়া জানাইয়া দিলেন যে, নীতিগতভাবে তিনি এই ধরনের bargaining-এর মনোবৃত্তি বা উদ্দেশ্যকে সমর্থন করিতে পারেন না।

কেন এই যুদ্ধে ইংরাজকে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার কৈফিয়ত হিসাবে ইহার বেশ কিছুকাল পরে গান্ধীজীই বলিয়াছিলেন,

"I put my life in peril four times for the cause of the empire—at the time of the Boer War I was in charge of the ambulance corps,...at the time of the Zulu revolt in Natal when I was in charge of a similar corps, at the time of the commencement of the late war when I raised an ambulance corps and as a result of the strenuous training had a severe attack of pleurisy, and lastly, in fulfilment of my promise to Lord Chelmsford at the War Conference in Delhi, I threw myself in such an active recruiting campaign in Kheda district, involving long and trying marches, that I had an attack of dysentry which proved almost fatal. I did all these in the belief that acts such as mine must gain for my country an equal status in the empire." [Mahatma : Vol. II. pp. 30-31]

অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে চার-চারবার গান্ধীজী সাম্রাজ্য-বাদীদের জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির কার্যে সমর্থন ও সহযোগিতা করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার ন্যায়নীতিতে ফললাভ বা লক্ষ্য (end) অপেক্ষা উপায় বা পন্থাটিই (means)

মুখ্য। এবং তাঁহার সংগ্রামের আদর্শে ফললাভ বা লক্ষ্যের প্রয়োজনে উপায় বা পন্থার ক্ষেত্রে অন্যায় বা দুর্নীতির সহিত আপসের কোনো স্থান ছিল না। গান্ধীজীর আদর্শ ও কার্যের মধ্যে বারবার (তখনও পর্যন্ত) আমরা এই ধরনের তীব্র স্ববিরোধিতা দেখিতে পাই। এইখানে গান্ধীজীর সহিত রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটি লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ কখনও লক্ষ্য বা ফললাভের প্রয়োজনে অন্যায়ের সহিত আপস করেন নাই। তাই একদিকে যেমন তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধোন্মাদনার প্রতি বিনিপাত জানাইয়াছেন, অপরদিকে তেমনি তিনি দেশের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ এবং মডারেটদের ভিক্ষাবৃত্তি ও ইংরাজ তোষণনীতিকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। তাই তিনি দেশকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন,

'...যে দৈন্য, যে জড়তায় এতকাল আমরা পোলিটিকেল ভিক্ষাবৃত্তিকেই সম্পদলাভের সদুপায় বলিয়া কেবল রাজদরবারে দরখাস্ত লিখিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছি, দেশপ্রীতির নববসন্তেও 'সেই দৈন্য, সেই জড়তা, সেই আত্ম-অবিশ্বাস পোলিটিকেল চৌর্যবৃত্তিকেই রাতারাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ মনে করিয়া সমস্ত দেশকে কি কলঙ্কিত করিতেছে না? এই চোরের পথ আর বীরের পথ কোনো চৌমাথায় একত্র আসিয়া মিলিবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতায় এই দুই পথের সম্মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা ভ্রম করি, কিন্তু বিধাতার দরবারে এখনো পথের বিচার শেষ হয় নাই সে কথা মনে রাখিতে হইবে। আর বাহ্য ফললাভই যে চরমলাভ একথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে—বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি, তারপর পোলিটিকেল মুক্তি যদি পাই তো ভালো, যদি না পাই তবে তার চেয়ে বড়ো মুক্তির পথকে কলুষিত পলিটিক্সের আবর্জনা দিয়া বাধাগ্রস্ত করিব না।" [ছোটো ও বড়ো—কালান্তর ॥ পৃঃ ৯৭-৯৮]

রবীন্দ্রনাথের এই বাণী ও আচরণের মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা দেখা যায় না।

গান্ধীজী যে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের স্বরূপ একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই, এমন নহে। আফ্রিকায় থাকিতে গান্ধীজী স্বয়ং বোয়ারদের ও জুলুদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধ সম্পর্কেও তিনি কিছুটা সচেতন ছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পরে গান্ধীজী স্বয়ং তাঁহার যুদ্ধকালীন মানসিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলেন,

"No doubt it was a mixed motive that prompted me to participate in the war. Two things I can recall. Though as an individual I was opposed to war, I had no status for offering effective non-violent resistance. Non-violent resistance can

only follow some real disinterested service, some heart expression of love. For instance, I would have no status to resist a savage offering animal sacrifice until he could recognise in me his friend through some loving act of mine or other means. I do not sit in judgment upon the world for its many misdeeds....

"The other motive was to qualify for swaraj through the good offices of the statesmen of the empire....I am writing of my mentality in 1914 when I was a believer in the empire and its willing ability to help India in her battle for freedom. Had I been the non-violent rebel that I am today, I should certainly not have helped but through every effort open to non-violence I should have attempted to defeat its purpose....The fact is that the path of duty is not always easy to discern amidst claims seeming to conflict one with the other."

[Mahatma : Vol. I. pp. 284-85]

একটু ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, গান্ধীজীর জীবনদর্শনের সহিত তাঁহার এই যুক্তির বিশেষ সঙ্গতি নাই ; অন্তত গান্ধীজীর মতো কঠোর ন্যায়নিষ্ঠ সত্যসাধকের নিকট হইতে ঐ যুক্তি কানে অত্যন্ত দুর্বল ও বেসুরো শুনায়। জগতের বিবেকী মানুষ গান্ধীজীর নিকট হইতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রাম প্রত্যাশা করেন নাই ; কিন্তু যুদ্ধ যে যুদ্ধই—যুদ্ধ যে অমানুষিক পাশবিক বর্বরতা, অন্তত এইটুকু কথাও গান্ধীজীর নিকট হইতে তাঁহারা শুনিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। জগতের যত পাপাচারের বিচারের জন্য গান্ধীজী বিচারাসনে বসিয়া থাকিতে না পারেন, কিন্তু অগণিত লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তবন্যায় ও আর্তরোলে জগৎ ভরিয়া গেল, তাহার জন্য গান্ধীজীর মনে এতটুকুও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।—ইহাই নিদারুণ বিস্ময়ের কথা!

পৃথিবীর সেই চরম দুর্যোগ মুহূর্তে এদেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সাম্রাজ্যবাদী পাশবিকতার প্রতি অভিসম্পাত জানাইলেন—নিপাত যাক্ তোমাদের ঐ যুদ্ধবাদী সভ্যতা! ক্রুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ গর্জন করিয়া উঠিলেন,

"No, for the sake of your own salvation, I say they shall *live* and this is truth. It is extremely bold of me to say so, but I assert that man's world is a moral world, not because we blindly agree to believe it, but because it is so in truth which would be dangerous for us to ignore...." [Nationalism. p. 32]

তিনি বলিলেন,

"...The time has come when, for the sake of the whole outraged world, Europe should fully know in her own person the terrible absurdity of the thing called the Nation.

"...In this war the death-throes of the Nation have commenced. Suddenly, all its mechanism going mad, it has begun the dance of the Furies, shattering its own limbs, scattering them into the dust. It is the fifth act of the tragedy of the unreal." [Nationalism. pp. 43-44]

কিন্তু শুধু ধ্বংসই নয়, বিশ্বব্যাপী আর্তের ক্রন্দনরোলের মাঝে রবীন্দ্রনাথ জগতের সর্বজাতিক মিলনের আহ্বান শুনিতে পাইলেন। যুদ্ধের নিদারুণ বীভৎসতা ও পাশবিকতায় অন্তর তাঁহার ক্ষতবিক্ষত, তবু আশাবাদী কবি অবিচল দৃঢ়কণ্ঠে তাঁহার আশার কথা ঘোষণা করিলেন,

"বর্তমানের চেহারা যেমনি হোক্, তবু এই আশা, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিয়াছি যে, পশ্চিম পূর্বের সহিত মিলিবে।...পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে।...পূর্ব ও পশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আইডিয়ালের উপর হইবে। তাহা নিছক অনুগ্রহের উপরে হইবে না। এবং কামান বন্দুক এবং রণতরীর উপরও হইবে না।..."

[ছোটো ও বড়ো—কালান্তর ॥ পৃঃ ১০৭]

এবং সেই মহৎ আইডিয়ালের বাস্তব রূপ কবির 'বিশ্বভারতী'।

শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার স্বপ্ন ও সাধনার কথা জানাইয়া আমেরিকা হইতে কবি দেশে রথীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন,

"...ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে, ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হবে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশবন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ।"

[চিঠিপত্র : ২য় খণ্ড ॥ পৃঃ ৫৫-৫৬]

১৯১৮ সালের মে মাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, এখানে যাহার উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। এই সময়ে কবি পুনরায় আমেরিকা যাত্রার পরিকল্পনা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে জাপান ও আমেরিকায় প্রদত্ত (১৯১৬) তাঁহার যুদ্ধ ও

ন্যাশনালিজ্‌ম্‌বিরোধী বক্তৃতাগুলি লইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এবং কবির বিরুদ্ধে তাঁহারা জঘন্য কুৎসা রটনা করিতে থাকেন। এইসব শুনিয়া ক্ষোভে দুঃখে ঘৃণায় রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা-যাত্রা পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিয়াছেন,

"...এণ্ড্রুজ্‌ দিল্লি হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। কয়েকদিন পরে (৯ই মে) তিনি বাংলার লাটপ্রাসাদে লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ গুরলের (Gourlay) সহিত কবির বিদেশযাত্রা লইয়া কথাবার্তা কহিতে যান। সেইসময়ে কথা প্রসঙ্গে গুরলে বলেন, সানফ্রানসিসকোতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যে কয়জন ভারতীয় যুবকের বিচার হইতেছে, তাহাদের কাগজপত্র হইতে নাকি জানা গিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গুরলে বলেন যে, কবির বিরুদ্ধে গুজব যে তিনি ১৯১৬ সালে জাপান হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিলেন জারমানদের অর্থানুকূল্যে। এই হইল বৃটিশ সরকারের বক্তব্য; আর আমেরিকার গদর দলের বক্তব্য যে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশের স্যর উপাধি পাইয়া আপনাকে তাহাদের কাছে বিকাইয়া দিয়াছেন। আসলে ন্যাশনালিজ্‌মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করায় ভারতীয়রা যে বিরক্ত হয়, তাহার কারণ তাহারা ভারতের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। আর ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যে তাঁহার উপর সদয় নহে তাহার কারণ কবি যুদ্ধের সময়ে ন্যাশনালিজ্‌মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া পাশ্চাত্য যুবমনকে ঘুরাইয়া দিতেছেন। সুতরাং উভয় পক্ষই কবির নামে কুৎসা রটাইয়া তাঁহাকে বিদেশ যাইতে দিতে চাহে না।

"আমেরিকার এই সব মিথ্যা অভিযোগের কথা শুনিয়া কবি অত্যন্ত বিরক্ত। ফলে তথায় যাইবার সংকল্পই পরিত্যক্ত হইল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ করিয়া প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে এক পত্র দিলেন ও তাঁহার প্রতিলিপি পাঠাইয়া দিলেন বড়লাটকে। এছাড়া স্বয়ং গিয়া আমেরিকান কন্সালের সহিতও সাক্ষাৎ করিলেন; কন্সাল তাঁহাকে বলিলেন যে, আমেরিকানরা তাঁহার সম্বন্ধে এই অভিযোগ আদৌ seriously লইবে না। লোকে তাঁহাকে পূর্বের ন্যায়ই সমাদর করিয়া গ্রহণ করিবেন—আমেরিকায় যাইতে তাঁহার কোনো বাধা নাই। সুতরাং রহস্য পূর্বের ন্যায়ই জটিল থাকিল।"

[রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড ।। পৃঃ ৪৭৩]

॥ মহাযুদ্ধের অবসানে ॥

মহাযুদ্ধ শেষ হইতে তখনও কয়েকমাস বাকি—১৯১৮ সালের জুন মাসে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। মণ্টফোর্ড সংস্কারের ভিত্তিস্বরূপ রিপোর্টে নিম্নোক্ত চারিটি মূলনীতির উল্লেখ ছিল: (১) বাহিরের হস্তক্ষেপ ব্যতীত জেলা ও পল্লী অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথাসম্ভব জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা, (২) প্রদেশসমূহেই সর্বপ্রথম দায়িত্বশীল গণশাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, (৩) ভারতের কেন্দ্রস্থ শাসন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে রাখা কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচিত সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা, এবং (৪) এদেশের জনপ্রতিনিধিবর্গের শাসন দায়িত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রস্থ শাসন ও প্রাদেশিক শাসনের উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও ভারত-সচিবের নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে অপসারিত করা।

বলা বাহুল্য, মণ্টফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিরাট চাঞ্চল্য ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বিশেষত, ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই (৮ই জুলাই) কুখ্যাত 'রাওলাট কমিটি'র তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হইলে কংগ্রেস ও দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিল। এই রিপোর্টে ভারতের গণ-আন্দোলন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে দমন করিবার সুপারিশ ছিল। ইংরাজের কূটনীতির গূঢ় উদ্দেশ্যটি কাহারও নিকট যেন আর গোপন রহিল না। অপরদিকে, মণ্টফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের মডারেটপন্থী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে তীব্র মত-পার্থক্য দেখা দিল। মডারেটপন্থীগণ মোটামুটিভাবে মণ্টফোর্ড পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উগ্রপন্থী জাতীয়তা-বাদীরা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন—তাঁহারা পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার (Full Responsible Government) ব্যতীত যেন সন্তুষ্ট হইবেন না। 'মণ্টফোর্ড রিফর্ম' আলোচনার জন্য বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয় (২৯শে আগস্ট ১৯১৮)। মণ্টফোর্ড প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হইবে আশঙ্কা করিয়া মডারেটগণ এই অধিবেশনে যোগদানে বিরত রহিলেন। চারিদিন ব্যাপী আলোচনার পর কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, ভারতবর্ষ

পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্টের সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত এবং অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে অবিলম্বে 'কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনা'কে কার্যকরী করা প্রয়োজন। 'রাওলাট রিপোর্টে'র বিরুদ্ধেও কংগ্রেসে প্রতিবাদ-প্রস্তাব গৃহীত হইল। গান্ধীজী বোম্বাই-অধিবেশনে যোগদান করেন নাই, তিনি তখনও রিক্রুটিংয়ে ব্যস্ত। তিনি ছিলেন মডারেট ও উগ্রপন্থীদের মাঝামাঝি পন্থা গ্রহণের পক্ষে। ২৫শে আগস্ট (১৯১৮) এক চিঠিতে তিনি তিলককে লিখিলেন,

"I do not intened to attend the (special) Congress session. Also I do not intend to attend the Moderates' conference. I believe that we can render a great service to India by devoting to the work of recruitment and taking lakhs of people with us. Mrs. Besant and you do not agree with my view. I also know that the Moderates will not be keen on joining this work. This is one thing. The second thing is that we should accept the principle of the Montague-Chelmsford scheme (of reforms) and clearly state whatever changes we want to propose. And we should fight to death to get those changes accepted."

[Mahatma : Vol. I. p. 283]

মণ্টফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশের পর এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে কোনো মন্তব্য করিতে আর দেখা যায় না। যদিও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির বিনিময় ও মিলনের প্রশ্নটি তখন তাঁহার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও তিনি তখন চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। কিন্তু মণ্টফোর্ড সংস্কার প্রস্তাব জাতীয় ইংরাজের কোনো দয়ার দানে যে তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা বা মোহ ছিল না, সে-সম্পর্কে তিনি কিছুদিন পূর্বে 'ছোটো ও বড়ো', 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' প্রভৃতি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না—কিছুতেই না। স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী।" কিন্তু যদি ইংরাজের দয়া বা ভিক্ষার দানকে বর্জন করিতে হয়, তবে সংগ্রামের পথকে বাছিয়া লইতে হয়। কিন্তু এইখানে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার যত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এবং সংশয়। তাছাড়া, কবি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তখন বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তির জটিল ঘূর্ণাবর্ত হইতে সরিয়া গিয়া তিনি দেশের শিক্ষাসমস্যা ও গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে চাহিলেন। স্বদেশী যুগের মত তিনি পুনরায় গ্রামোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নটি দেশের রাজনৈতিক সমস্যার উপরে স্থান দিতে

চাহিলেন। বিশেষ করিয়া, গ্রামের কৃষি ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনকে তিনি সংগঠিত ও বেগবান করিবার আহ্বান জানাইলেন। প্রধানত তাঁহারই উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় 'বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি' গড়িয়া উঠে। এই সমিতির মুখপত্র নূতন-প্রকাশিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় সমবায়প্রথাকে জনপ্রিয় ও কার্যকরী করিয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া কবি 'সমবায়' নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি লিখিলেন (ভাণ্ডার—১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, ১৩২৫ শ্রাবণ)।

প্রবন্ধের শুরুতেই কবি গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য ও রুজি-রোজগারের সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,

"···আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে, একথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসলকথা আমাদের দেশে ভরসার অভাব।···আমাদের নিজেদের হাতে যে কোনো উপায় আছে, একথা ভাবিতেও পারি না।

"এইজন্যই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া। মানুষ না খাইয়া মরিবে—শিক্ষার অভাবে, অবস্থার গতিকে হীন হইয়া থাকিবে, এটা কখনোই ভাগ্যের দোষ নয়, অনেকস্থলেই এটা নিজের অপরাধ। দুর্দশার হাত হইতে উদ্ধারের কোনো পথই নাই, এমন কথা মনে করাই মানুষের ধর্ম নয়। মানুষের ধর্ম জয় করিবার ধর্ম, হার মানিবার ধর্ম নয়।···

"···সভ্যতা কী ? আর কিছু নয়, যে অবস্থায় মানুষের এমন একটি যোগের ক্ষেত্র তৈরি হয় যেখানে প্রতি মানুষের শক্তি সকল মানুষকে শক্তি দেয় এবং সকল মানুষের শক্তি প্রতি মানুষকে শক্তিমান করিয়া তোলে।"

লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি এখানে মানুষের সংগ্রামী সত্তার ও সংঘশক্তির মহিমায় মুখর, এখানে তিনি মানুষের সামাজিক সত্তারও জয়গান গাহিতেছেন।

ইউরোপের সমবায় বা co-operative আন্দোলনের মূল ভাবটা বা আইডিয়াটা কবিকে যেন নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। কিন্তু শুধু আইডিয়ার জন্যই আইডিয়া নয়, বাস্তবত দেশের কৃষিসমস্যায় কবি গভীরভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন। জমিদারী পরিদর্শনকালে তাঁহার মনে দেশের কৃষি-পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি গম্ভীর প্রশ্ন দেখা দেয়। সেই সম্পর্কে কবি স্বয়ং বলিতেছেন,

"আমাকে এক পাড়াগাঁয়ে মাঝে মাঝে যাইতে হয়। সেখানে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায় পাঁচ-ছয় মাইল ধরিয়া খেতের পর খেত চলিয়া গেছে। ঢের লোকে এইসব জমি চাষ করে। কারো-বা দুই বিঘা জমি কারো-বা চার কারো-বা দশ। জমির ভাগগুলি সমান নয়, সীমানা আঁকাবাঁকা।···হালের গোরু কোথাও-বা জমির পক্ষে যথেষ্ট, কোথাও-বা

যথেষ্টর চেয়ে বেশি, কোথাও-বা তার চেয়ে কম। চাষার অবস্থার গতিকে কোথাও-বা চাষ যথাসময়ে আরম্ভ হয়, কোথাও সময় বহিয়া যায়। তার পরে আঁকা বাঁকা সীমানায় হাল বারবার ঘুরাইয়া লইতে গোরুর অনেক পরিশ্রম মিছা নষ্ট হয়। যদি প্রত্যেক চাষী কেবল নিজের ছোটো জমিটুকুকে অন্য জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাষ করিত, তবে অনেক হাল কম লাগিত, অনেক বাজে মেহন্নত বাঁচিয়া যাইত।...যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত।—"

শুধু তাহাই নহে কবি মান্ধাতা আমলের হাতিয়ারের পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান প্রয়োগের আহ্বান জানাইয়া বলিলেন,

"...হাতের সঙ্গে হাতিয়ারে মিলিয়া আমাদের কাজ চলিতেছিল। এমন সময় বাষ্প ও বিদ্যুতের যোগে এখনকার কালের কল-কারখানার সৃষ্টি হইল। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, যেমন একদিন হাতিয়ারের কাছে শুধু-হাতকে হার মানিতে হইয়াছে তেমনি কলের কাছে আজ শুধু-হাতিয়ারকে হার মানিতে হইল।...

"এ কথা আজ আমাদের চাষীদেরও ভাবিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে তাহারা বাঁচিবে না।...য়ুরোপ-আমেরিকার সকল চাষীই এই পথেই হুহু করিয়া চলিয়াছে। তাহারা কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে আঁটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে।..."

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, কৃষিতে যন্ত্রবিজ্ঞান প্রয়োগ ও ব্যবহার করিতে হইলে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত-জমায় সম্ভব হইবে না—তাহার জন্য বৃহদাকার সমবায় জোত-জমার প্রয়োজন। এবং যত কঠিন কাজই হউক, ধীর মস্তিষ্কে চাষীদের বুঝাইয়া এই পথেই আনিতে হইবে। তিনি বলিলেন,

"...ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহা একজনে না পারে তাহা পঞ্চাশ জনে জোট বাঁধিলেই হইতে পারে। তোমরা যে পঞ্চাশ জনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক্ পৃথক্ চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে। তখন কল আনাইয়া লওয়া, কলে কাজ করা, কিছুই কঠিন হইবে না। কোনো চাষীর গোয়ালে যদি তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সের মাত্র দুধ বাড়তি থাকে, সে দুধ লইয়া সে ব্যবসা করিতে পারে না। কিন্তু এক-শো দেড়-শো চাষী আপন বাড়তি দুধ একত্র করিলে মাখন-তোলা কল আনাইয়া

ঘিয়ের ব্যবসা চালাইতে পারে। য়ুরোপে এই প্রণালীর ব্যবসা অনেক জায়গায় চলিতেছে। ডেন্‌মার্ক প্রভৃতি ছোটো-ছোটো দেশে সাধারণ লোকে এইরূপে জোট বাঁধিয়া মাখন পনির ক্ষীর প্রভৃতির ব্যবসায় খুলিয়া দেশ হইতে দারিদ্র্য একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে।...আমার কাছে মনে হয়, এই কোঅপারেটিভ-প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে।...”

[সমবায় ১—সমবায়নীতি ॥ পৃঃ ৯-১৬]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ-আমেরিকার কোঅপারেটিভ-প্রণালীর আদর্শের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে উহা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সে যুগে যে বিশেষ বিশেষ বাস্তব ও জটিল সমস্যাগুলি ছিল, কবি তাহা দেখিতে পান নাই। বিশেষ করিয়া, ভারতবর্ষের মত পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশে যেখানে কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ জগদ্দল পাথরের মত দৃঢ়ভাবে চাপিয়া বসিয়া আছে, যেখানে মৌলিক ও গণতান্ত্রিক ভূমি-সংস্কার হয় নাই, যেখানে জমিদার ও মহাজনের দেনার দায়ে চাষীর হাত পা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, সেখানে কোঅপারেটিভ প্রথা কার্যকরী হওয়ার পথে যে বিস্তর দুরতিক্রম্য বাধা আছে, ইহা কবি ভাবিয়া দেখেন নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের সময় ‘Co-operative Credit Societies Act’ পাস হয়। কিন্তু মূলত উহা গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের ঋণদান এবং উহার জন্য গ্রামাঞ্চল হইতে পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের পরে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম শিলাইদহে ও উত্তরবঙ্গে এই সমিতি গঠনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, পতিসর সমবায়-ব্যাঙ্কে তিনি তাঁহার নোবেল-প্রাইজের সমগ্র অর্থটা জমা রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সমবায়-প্রথায় চাষ-বাস ও ক্ষুদ্রশিল্প গড়িয়া তুলিবার কথা বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির নিকট হইতেই প্রথম শুনা গেল এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ভারতের কৃষিসমস্যা বা গ্রামের গরীবদের সম্পর্কে এই ধরনের সচেতনতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে সে-যুগের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের কিছুমাত্র উদ্যোগ ছিল না। পরন্তু তাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে জাতীয় পুঁজি ও শিল্প-প্রসারে উদগ্রীব হইয়া উঠেন। তারপর মহাযুদ্ধের কল্যাণে দেশী ও বিদেশী শিল্পগুলি কিছুটা অস্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি ও বিকাশলাভ করে। এইজন্যই মহাযুদ্ধে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধে কংগ্রেসের ব্রিটেনকে সমর্থনের পিছনে ইহাও কি

অন্যতম গূঢ় কারণ? যুদ্ধের সময়ই Industrial Commission বসে; ১৯১৮ সালের মধ্যভাগে উহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের দিল্লী-অধিবেশনে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে যে সব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। সীতারামীয়া লিখিতেছেন,

"The report of the Industrial Commission, of which Pandit Madan Mohan Malaviya had been a member, also came in for consideration and the Congress passed a resolution weeloming its recommendations and the policy that the Government must play an active part in promoting the industrial development of the country, and hoping that encouragement would be given to Indian Capital and enterprise, and protection against foreign exploitation. The Congress regretted that the question of tariffs had been excluded from the score of the commission's enquiries. The Congress supported the recommendation of the Committee that industries should have separate representation in the Executive Council of the Government of India and that there should be Provincial Departments of Industries.... The Congress regretted the absence in the Report of recommendations for adequate organisation for financing industries and urged the starting of industrial banks." [The History of the Indian National Congress : Vol. I. p. 158].

ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইহা অত্যন্ত মৌলিক ও প্রাথমিক দাবি কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শুধু দেশীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থের খাতিরেই জাতীয় শিল্প সংরক্ষণের বা সম্প্রসারণের দাবি জানাইলেন, গ্রামাঞ্চলের কুটিরশিল্প বা ক্ষুদ্রশিল্প পুনর্গঠনের দাবিতে একটি কথাও তাঁহাদের বলিতে শুনা গেল না। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ দেশীয় পুঁজি ও বৃহদাকার শিল্পকে রক্ষার জন্য যত না বেশী আগ্রহী ছিলেন, তদপেক্ষা অধিক আগ্রহী ছিলেন তিনি বৃহদাকার শিল্পের শোষণের হাত হইতে গরীব ও বেকার মানুষের আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প গড়িয়া তুলিতে। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার উৎস—গ্রামের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা, পক্ষান্তরে কংগ্রেসের পরিকল্পনার উৎস—দেশীয় শিল্পপতিদের স্বার্থ।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে মহাযুদ্ধের অবসান হইল (১১ই নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ঘোষিত হয়)। প্রায় সাথে সাথেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট উইলসন্ ও লয়েড জর্জ প্রমুখ মিত্রশক্তি প্রধানদের পূর্ব ঘোষণা

অনুযায়ী ভারতের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের দাবি জানাইলেন। উহার প্রায় দেড়মাস পরেই দিল্লীতে কংগ্রেসের ৩০তম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। সীতারামীয়া এই অধিবেশনের মূল সিদ্ধান্তগুলির সংক্ষিপ্তসার করিয়া লিখিতেছেন,

"The Congress conveyed its loyalty to the King and congratulations on 'the successful termination of the War' which was waged for the liberty and freedom of all the peoples of the world. Another resolution recorded the appreciation of the Congress of the gallantry of the allied forces and 'particularly of the heroic achievement of the Indian troops in the cause of freedom, justice and self-determination'. Another resolution asked for the recognition of India by the British Parliament and by the Peace Conference of 'one of the progressive nations to whom the principle of self-determination should be applied'...The Congress further demanded an Act of Parliament establishing at an early date complete Responsible Government in India and a place for India similar to that of the Self-Governing Dominions in the reconstraction of Imperial policy...." [Ibid. pp. 157-58]

অবশ্য অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে এই অধিবেশনে বোম্বাইয়ের বিশেষ-অধিবেশনের সিদ্ধান্তের পুনরুক্তি করিয়া 'কংগ্রেস-লীগ রাষ্ট্রশাসন পরিকল্পনা' কার্যকরী করিবার দাবিও জানান হয়। যাহাই হউক, ইহা হইতে মহাযুদ্ধকালীন কংগ্রেসের রাজনীতির মূল চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মহাযুদ্ধের পৈশাচিক তাণ্ডবলীলার উন্মাদ নিশীথের অবসানে ভবিষ্যতের বিশ্বজাতিক মহামিলন-যজ্ঞ প্রতিষ্ঠার প্রথম আয়োজন দেখা দিল বোলপুরের প্রান্তরে—কবিগুরুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে। ৮ই পৌষ ১৩২৫ (২৩শে ডিসেম্বর ১৯১৮) মহাসমারোহে বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইল।

"আমরা মানববিধাতার রাজপথে মহামানবের গান গেয়ে বেড়াব।... মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব"—ইহাই কবিগুরুর 'বিশ্বভারতী'র মর্মবাণী।

পরিশিষ্ট ১

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতাবোধের উন্মেষ সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথমে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। কবির স্বদেশপ্রীতি ও মানবপ্রেমের নিদর্শন হিসাবে তাঁহার প্রথম জীবনের রচনাবলী হইতে এখানে আরও কয়েকটি অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

মাত্র ১৬।১৭ বৎসর বয়সে কবি লিখিতেছেন,

"সেদিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়।
নাহি ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা,
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার!
সকলেই আপনার আপনার লোয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে।
... ...
... ...
নাইক' দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজা,
কেহ কারো কুঠিরেতে করিলে গমন
মর্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস!
প্রকৃতির সব কার্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে,
পৃথ্বী যে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসে নি এখনো,
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।"

[কবিকাহিনী—রবীন্দ্র-রচনাবলী (অচলিত সংগ্রহ) : ১ম খণ্ড]

প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে কবি যখন প্রথম বিলাত যান, সেই সময় বিলাতের ইঙ্গবঙ্গদের সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন,

"... একটি ইঙ্গবঙ্গকে একজন ইংরেজের সম্মুখে দেখো, চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। ভদ্রতার ভারে প্রতি কথায় ঘাড় নুয়ে পড়ছে, তর্ক করবার সময় অতিশয় সাবধানে নরম করে প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ করতে হল বলে অপর্যাপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কথা কন আর না কন, একজন ইংরেজের কাছে একজন ইঙ্গবঙ্গ চুপ করে বসে থাকলেও তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী, প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু তাঁকেই আবার তাঁর স্বজাতি-মণ্ডলে দেখো, দেখবে তাঁর মেজাজ।...

"আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখেছি যে, বাঙালিরা ইংরেজদের কাছে স্বদেশের লোকেদের ও আচারব্যবহারের যত নিন্দে করেন, এমন একজন

ভারতদ্বেষী অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানও করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছা করে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্যপরিহাস করেন। ... তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাঁকে কেউ ভারতবর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করে। সাহেবসাজা বাঙালিদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙালি বলে ধরা পড়েন। ...একজন ইঙ্গবঙ্গ একটি 'জাতীয় সংগীত' রামপ্রসাদী সুরে রচনা করেছেন ...। এ গীত যাঁর রচনা, তিনি রামপ্রসাদের মতো শ্যামার উপাসক নন, তিনি গৌরীভক্ত। এইজন্যে গৌরীকে সম্বোধন করে বলছেন,—

মা, এবার মলে সাহেব হব ;
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব।
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব।
(আবার) কালো বদন দেখলে পরে 'ডার্কি' বলে মুখ ফেরাব।"

[য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র — রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১ম খণ্ড ।। পৃঃ ৫৫৬-৫৯]

তাঁহার দ্বিতীয় বারের বিলাতযাত্রা-কালের একটি ঘটনা সম্পর্কে কবি লিখিতেছেন,

"আজ ডিনার-টেবিলে একটা মোটা আঙুল এবং ফুলো গোঁফওআলা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওআলার গল্প করছিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ নালিশের নাকিস্বরে বললেন—পাখাওআলারা রাত্রে পাখা টানতে টানতে ঘুমোয়। জোয়ান লোকটা বললে তার একমাত্র প্রতিবিধান লাথি কিংবা লাঠি।...আমার বুকে হঠাৎ যেন একটা তপ্ত শূল বিঁধল। এইভাবে যারা স্ত্রীপুরুষে কথোপকথন করে তারা যে অকাতরে একসময় একটা দিশি দুর্বল মানব-বিড়ম্বনাকে ভবপারে লাথিয়ে ফেলে দেবে তার আর বিচিত্র কী ? আমিও তো সেই অপমানিত জাতের লোক, আমি কোন্ লজ্জায় কোন্ সুখে এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই এবং একত্রে দন্তোন্মীলন করি। ."

[য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি—রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১ম খণ্ড ।। পৃঃ ৬১১-১২]

স্ত্রীমজুর-সমস্যা সম্পর্কে কবি লিখিতেছেন,

"...পৃথিবীর ভার বাড়িয়া উঠিলে ভূভার হরণের জন্য অবতারের আবশ্যক হয়। কলকারখানা য়ুরোপীয় সমাজের মধ্যে একদিকে প্রকাণ্ড চাপ দিয়া তার ভার-সামঞ্জস্যের যদি ব্যাঘাত করে তবে স্বাভাবিক নিয়মে একটা বিপ্লব উপস্থিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে। ব্যাপারটা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে আমাদের পক্ষে বলা বড়ই শক্ত ; কিন্তু এই কথাটা লইয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক নাড়াচাড়া চলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"কলের প্রাদুর্ভাব হইয়া অবধি মজুরি সম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ অনেকটা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। পূর্বে বিশেষ কারুকার্যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক ছিল; এবং গৃহকার্যের ভার স্বভাবতই স্ত্রীলোকদের উপর থাকাতে পুরুষদেরই বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসের অবসর ছিল। তাহা ছাড়া পূর্বে অধিকাংশ কাজ কতক পরিমাণ বাহুবলের উপর নির্ভর করিত, সাধ্য কাজ স্ত্রীলোকের মধ্যে ছিল। এখন কলের প্রসাদে অনেক কাজেই নৈপুণ্য এবং বলের আবশ্যক কমিয়া গিয়াছে। সেইজন্য স্ত্রীলোক এবং বালকেও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সহিত দলে দলে মজুরি কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। কিন্তু কেবল কলের কাজ দেখিলেই চলিবে না, সমাজের উপরেও ইহার ফলাফল আছে।

"সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কারখানার মজুরদের সম্বন্ধে য়ুরোপে দুটো একটা করিয়া আইনের সৃষ্টি হইতেছে। কলের আকর্ষণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে খর্ব করাই তাহার উদ্দেশ্য।

"সেপ্টেম্বর মাসের 'নিউ রিভিউ' পত্রিকায় খ্যাতনামা ফরাসী লেখক মূলসিম ফ্রান্সের স্ত্রীমজুরদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

"তিনি বলেন ফ্রান্সে প্রথম যখন বালক মজুরদিগের বয়সের সীমা নির্দিষ্ট করিবার জন্য আইন হয় তখন একটা কথা উঠে যে, ইহাতে করিয়া সন্তানদের প্রতি পিতামাতার স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। তাছাড়া কারখানা-ওয়ালারা ভয় দেখায় যে, শিশু সহায় হইতে বঞ্চিত হইলে কারখানার ব্যয়ভার এত বাড়িয়া উঠিবে যে, কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আইন পাস হইল এবং কারখানা এখনো সমান তেজে চলিতেছে।... বালক মজুরদের পক্ষে প্রথমে আট বৎসর, পরে নয় বৎসর, পরে বারো বৎসর এবং অবশেষে তেরো বৎসরের অন্যূন বয়স নির্দিষ্ট হইয়াছে।

"স্ত্রীমজুরদের খাটুনি সম্বন্ধে যখন কতকগুলি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় তখন ... সকলেই বলিতে লাগিল ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে। যদি কোন বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক বারো ঘণ্টা খাটিতে স্বীকার করে আইনের জোরে তাহাকে দশ ঘণ্টা খাটিতে বাধ্য করা অন্যায়। অনেকে বলেন, স্ত্রীমজুরদের সম্বন্ধে বিশেষ আইন পাস করিলে স্ত্রীজাতির প্রতি কতকটা অসম্মান প্রকাশ হয়। তাহাতে বলা হয় যেন তাহারা পুরুষের সমকক্ষ নহে।

"লেখক বলিতেছেন, যখন গর্ভধারণ করিতে হয় তখন বাস্তবিকই পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের বৈষম্য আছে। কারখানার ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে, স্ত্রীমজুরদিগকে প্রায়ই দুরারোগ্য রোগ বহন করিতে হয়। গর্ভাবস্থায় কাজ

করা এবং প্রসবের দুই-তিন দিন পরেই বারো ঘণ্টা দাঁড়াইয়া খাটুনি এই সকল রোগের প্রধানতম কারণ।

"কেবল আজীবন রোগ বহন এবং রুগ্ন সন্তান প্রসব করাই যে স্ত্রীলোকের অনিয়ন্ত্রিত খাটুনির একমাত্র কুফল তাহা নহে। গৃহকার্যে অনবসর সমাজেব পক্ষে বড়ো সামান্য অকল্যাণের কারণ নহে। পূর্ণ মাতৃস্নেহ হইতে শিশুদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহা হইতে যে কত অমঙ্গলেব উৎপত্তি হইতে পাবে তাহা কে বলিতে পাবে।

"লেখক বলিতেছেন, বাষ্পীয় কল স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে নিজেব কাজে টানিয়া লইয়া স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। স্ত্রী-মজুর এখন স্ত্রী নহে মাতা নহে কেবলমাত্র মজুর।

"ইহা হইতে যতদূব অনিষ্ট আশঙ্কা কবা যায় তাহা এখনো সম্পূর্ণ পরিণত হইবাব সময় পায় নাই। কেবল দেখা যাইতেছে পুরুষদের মধ্যে মদ্যপান এবং পাশবতা ক্রমশ দুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছে এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে নারীসুলভ হৃদয়বৃত্তি শুষ্ক হইয়া মানসিক অসুখ এবং সন্তান পালনে অবহেলা উত্তবোত্তব বৃদ্ধি পাইতেছে।

"দেখা যাইতেছে যুবোপে আজকাল প্রধান সমস্যা এই—জিনিসপত্র না মনুষ্যত্ব, কাহাব দাম দেশী?" [স্ত্রীমজুর—সাধনা, ১২৯৮ মাঘ]

পরিশিষ্ট ২

[রবীন্দ্রজীবনী : ৪র্থ খণ্ড ।। পৃঃ ২৭৭-৭৮ হইতে উদ্ধৃত]

পল্লীসমাজ

প্রতি জেলার প্রধান প্রধান গ্রাম, পল্লী বা পল্লীসমষ্টি লইয়া এক বা ততোধিক পল্লীসমাজ স্থাপন করিতে হইবে। শহর, গ্রাম কি পল্লীনিবাসী সকলেই স্ব স্ব পল্লী-সমাজভুক্ত হইবেন। গ্রাম কি পল্লীবাসীর অভিপ্রায়মত অন্যূন পাঁচ জনের উপর প্রতি পল্লীসমাজের কার্যনির্বাহের ভার থাকিবে। তাঁহারা পল্লীবাসীদিগের মতামত ও সহায়তা লইয়া পল্লীসমাজের কার্য করিবেন। পল্লীসমাজের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে বিবৃত হইল। প্রতি পল্লীর সমাজসাধ্য-মতে এই উদ্দেশ্যগুলি কার্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইবেন।

উদ্দেশ্য

১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য সদ্ভাব ও সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টা।

২। সর্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদ সালিসের দ্বারা মীমাংসা।

৩। স্বদেশ-শিল্পজাত দ্রব্য প্রবল এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেষ্টা।

৪। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যকমত নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫। বিজ্ঞান, ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষা প্রদান ও সর্বধর্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও সর্বতো-ভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি, ধর্মভাব, একতা, স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৬। প্রতি পল্লীতে একটি করিয়া চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা এবং অপারগ, অনাথ ও অসহায় ব্যক্তিদের নিমিত্ত ঔষধ, পথ্য, সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৭। পানীয় জল, নদী, নালা, পথ, ঘাট, সৎকার-স্থান, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা।

৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসী-দিগকে কৃষিকার্যে বা গোমহিষাদির পাল দ্বারা জীবিকা উপার্জনোপযোগী শিক্ষা প্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা।

৯। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন।

১০। গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাহাতে আপন আপন সংসারের আয়বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং অসহায় হইলে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকবণ সংগ্রহ কবা।

১১। সুরাপান বা অন্যরূপ মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে লোককে নিবৃত্ত করা।

১২। মিলন-মন্দির ক্লাব স্থাপন ও তথায় সমবেত হইযা পল্লীব ও স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা।

১৩। পল্লীর তত্ত্ব সংগ্রহ: অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকাব সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসিগণের স্থান ত্যাগ ও নূতন বসতি। বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষিব ও বিভিন্ন ব্যবসায় উন্নতি, অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর), ওলাউঠা, বসন্ত ও অন্যান্য মহামাবীতে আক্রান্ত রোগীব ও ঐ সব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীপুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতিব বিবরণ ও কারণ ধাবাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ কবিযা রাখা।

১৪। জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন ও ঐক্য-সংবর্ধন।

১৫। জেলা সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যে [কন্‌গ্রেস] ও কাযেব সহায়তা কবা।

অর্থের ব্যবস্থা

পল্লীসমাজের কায স্বেচ্ছাদান ও ঈশ্বর-বৃত্তি দ্বাবা চলিবে। যাঁহাদের বিবাদ-বিসংবাদ সালিসিতে মেটান হইবে তাহারা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাপূর্বক সমাজের মঙ্গলার্থ কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন। বিবাহাদি শুভকার্যেও সকলেই স্বেচ্ছাপূর্বক এইরূপ বৃত্তি দিবেন। পল্লীবাসীমাত্রেই সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া সমাজের কাযনির্বাহের জন্য যথাসাধ্য দান করিবেন। পল্লীসমাজের অন্তর্গত সমস্ত হাট বাজার হইতেও ঈশ্বরবৃত্তি সংগৃহীত হইতে পারিবে। প্রতি বৎসর গ্রামে গ্রামে বাবোযারী পূজায় নাচ-তামাশায় যে অর্থ বৃথা নষ্ট হয়. ঐ সমস্ত অপব্যয় সংকোচ করিলে সেই অর্থদ্বারা পল্লী-সমাজের কার্যের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। পল্লী-সমাজ কাযে প্রবৃত্ত হইলে অর্থের অভাব হইবে না।

পরিশিষ্ট ৩

NATIONALISM IN JAPAN

"I do not for a moment suggest that Japan should be unmindful of acquiring modern weapons of self-protection. But this should never be allowed to go beyond her instinct of self-preservation. She must know that the real power is not in the weapons themselves, but in the man who wields those weapons; and when he, in his eagerness for power, multiplies his weapons at the cost of his own soul, then it is he who is in even greater danger than his enemies.

"...Japan must have a firm faith in the moral law of existence to be able to assert to herself that the Western nations are following that path of suicide, where they are smothering their humanity under the immense weight of organizations in order to keep themselves in power and hold others in subjection.

"What is dangerous for Japan is, not the imitation of the outer features of the West, but the acceptance of the motive force of the Western nationalism as her own. Her social ideals are already showing signs of defeat at the hands of politics. ...The moral law, which is the greatest discovery of man, is the discovery of this wonderful truth, that man becomes all the truer the more he realizes himself in others. This truth has not only a subjective value, but is manifested in every department of our life. And nations who sedulously cultivate moral blindness as the cult of patriotism will end their existence in a sudden and violent death...."

[Nationalism. pp. 76-78]

পরিশিষ্ট ৪

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার রচেস্টারে অনুষ্ঠিত উদার ধর্মমতাবলম্বীদের এক সম্মিলন সভায় (Congress of the National Fedaration of Religious Liberals) রবীন্দ্রনাথ যে 'Race conflict' প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তাহার উপসংহারে কবি বলেন,

"Yet, in spite of these untoward aspects of the case I assert strongly that the solution is most assured when difficulties are greatest. It is a matter for congratulation that today the civilized man is seriously confronted with this problem of race conflict. And the greatest thing that this age can be proud of is the birth of Man in the consciousness of men. Its lad has not been provided for, it is born in poverty, its infancy is lying neglected in a wayside stall, spurned by wealth and power. But its day of triumph is approaching. It is waiting for its poets and prophets and host of humble workers and they will not tarry for long. When the call of humanity is poignantly insistent then the higher nature of man cannot but respond. In the darkest periods of his drunken orgies of power and national pride man may float and jeer at it, daub it as an expression of weakness and sentimentalism, but in that is very paroxysm of arrogance, when his attitude is most hostile and his attacks most reckless against it, he is suddenly reminded that it is the direst form of suicide to kill the highest truth that in him. When organized national selfishness, racial antipathy and commercial self-seeking begin to display their ugly deformities in all their nakedness, then comes the time for man to know that his salvation is not in political organizations and extended trade relations, not in any mechanical rearrangement of social system, but in a deeper transformation of life, in the liberation of consciousness in love, in the realization of God in man."

[Modern Review, April 1913.]

পরিশিষ্ট ৫

যুদ্ধকালীন কংগ্রেস-অধিবেশনগুলির সভাপতির অভিভাষণের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

১৯১৪ : মাদ্রাজ-অধিবেশনে সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলেন,

"India has recognised that, at this supreme crisis in the life of the Empire, she would take part worthy of herself and of the Empire in which she has no mean place. She is now unrolling her new horoscope, written in the blood of her sons, in the presence of the assembled nations of the Empire and claiming the fulfilment of her Destiny."

[Congress Presidential Addresses : Vol. II. p. 157]

১৯১৫ : বোম্বাই-অধিবেশনে সভাপতি সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বলেন,

"My first duty to-day is again to lay at the feet of our august and beloved Sovereign our unswerving fealty, our unshaken allegiance, and our enthusiastic homage...

"The question which, above all others, is engrossing our minds at the present moment is the war, and the supreme feeling which arises in our minds is one of deep admiration for the self-imposed burden which England is bearing in the struggle for liberty and freedom, and a feeling of profound pride that India had not fallen behind other portions of the British Empire, but has stood shoulder to shoulder with them by the side of the Imperial mother in the hour of her sorest trial...." [Ibid. p. 187]

১৯১৭ : কলিকাতা-অধিবেশনে সভানেত্রী অ্যানি বেসান্ত বলেন,

"India with her clear vision, saw in Great Britain the champion of Freedom, in Germany the champion of despotism. And she saw rightly. Rightly she stood by Great Britain, despite her own lack of freedom and the coercive legislation which outrivalled German despotism, knowing these to be temporary, because un-English and therefore doomed to destruction; she spurned the lure of German gold and rejected German appeals to revolt." [Ibid. p. 295]

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ঠ

ড

ত

দ

ফ

ব

ল

শ

স

হ

গ্রন্থপঞ্জী

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (তৃতীয় সংস্করণ)—শিবনাথ শাস্ত্রী

সাহিত্যসাধক চরিতমালা : রামমোহন রায় (পরি. চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৩)

" " ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৫)

বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা : শ্রীসুকুমার সেন

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য : শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত সন্ধানে (সিগনেট প্রেস) : জওহরলাল নেহরু

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, (প্রথম প্রকাশ) : শ্রীনরহরি কবিরাজ

শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ : শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (সপ্তদশ সংস্করণ) : স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : শ্রীসুপ্রকাশ রায়

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ (৩য় সংস্করণ) : শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় সংস্করণ) : শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

ঘরোয়া (পুনর্মুদ্রণ ১৩৫১) : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড (পরি. সংস্করণ ১৩৫৩) : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

" দ্বিতীয় খণ্ড (পরি. " ১৩৫৫) "

" চতুর্থ খণ্ড (সংস্করণ ১৩৬৩) "

• সঞ্চয়িতা (পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৪) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনস্মৃতি " "

স্বদেশ (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫৩) " "

কালান্তর " "

গোরা (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫৩) " "

মানুষের ধর্ম " "

শিক্ষা (পরিবর্ধিত সংস্করণ : ১৩৫৭) " "

জাপানযাত্রী (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫৬) " "

সমবায়-নীতি (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৬৭) " "

বলাকা (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫৭) " "

রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সংস্করণ)
প্রথম খণ্ড (পঞ্চম সংস্করণ : ১৩৫২)
তৃতীয় খণ্ড (সংস্করণ ১৮৭৯ শক ১৯৫৭)
চতুর্থ খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ : ১৩৫২)
পঞ্চম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৬২)
সপ্তম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৬০)
অষ্টম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৬০)
নবম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫৩)
দশম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫৭)
একাদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫৮)
দ্বাদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫৮)
চতুর্দশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৬০)
ষোড়শ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৬০)
সপ্তদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ : ১৩৬১)
ষড়বিংশ খণ্ড (প্রকাশ : ১৩৬৫)

The History of the Indian National Congress.
Vol. I. (1885-1935) Reprinted : 1946
—By Pattabhi Sitaramayya.

Congress Presidential Addresses. Vol. I, II
(1935 Edition)—G. A. Natesan & Co., Madras.

Mahatma. Vol. I. & II, (1951 Edition)
—D. G. Tendulkar : The Times of India Press, Bombay.

India Struggles for Freedom (First Edition)
—Hirendranath Mukherjee

Gandhi : A Study (1958)— „

Swami Vivekananda Patriot-Prophet (1954)
—Dr.Bhupendranath Dutta

The Complete Works of Swami Vivekananda.
Vol. IV (Mayavati Memorial Edition 1945)
Vol. V (Mayavati Memorial Edition 1936)
Vol. VI (Mayavati Memorial Edition 1940)

Nationalism (1950 Edition)—Rabindranath Tagore
(Macmillan & Co. Ltd.)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
চৌদ্দ	২৭	চরিত্রপূজা	চারিত্রপূজা
১০	১৪-১৫	কাপড়ের কল	কোলিয়ারী
১১	২০-২৯	সেকাল ও একাল	সেকাল আর একাল
২৪	৭ ৮	কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রদ্বয়ের	কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় ও জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের
৪৯	২	ces	yes
৫০	১৬	'লোকাল গভর্নমেণ্ট এ্যাক্ট'	'লোকাল সেল্‌ফ গবর্নমেণ্ট এ্যাক্ট'
৫৪	২১	'রাজারানী'	'রাজা ও রানী'
৫৫	৫-৬	ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়	ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার হয়
	২৬	চালর্স	চার্লস
	২৬	ব্রাডলাফ	ব্রাড্‌ল (Bradlaugh)
৬২	২১	Song of the Chirt	Song of the Shirt
৮০	১৯	গল্প	গল্প
১২৩	৫	'লোকাল গভর্নমেণ্ট অ্যাক্ট'	'লোকাল সেল্‌ফ গবর্নমেণ্ট এ্যাক্ট'
	১৫	১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে	১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে
১৫০	১৯	Guigot	Guizot
১৫৫	১৭	কৃষ্টি	কৃষ্টির
১৫৭	৬	Cape Cylony	Cape Colony
১৬০	১	আপত্তির	আপত্তি
২৩৬	১৩	পূর্ব-প্রস্তুতি	পূর্বগামী ও পূর্বাভাস
৩৭২	৫ ও ১৮	রাসবিহারী ঘোষ	রাসবিহারী বোস
৪০৪	১১	কবীর	কবির
৪২২	১৩	score	scope
৪২৮	১৭	দেশী	বেশী